ত্রৈমাসিক পত্রিকা

চতুরঙ্গ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

‘আমাদের

শান্তিনিকেতন

আমাদের সব হতে আপন...
মোরা বারে বারে দেখি
তারে নিত্যই নূতন।’

যিনি প্রথম যাচ্ছেন তাঁর কাছে শান্তিনিকেতন একটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মতন লাগবে। আর যিনি বার বার দেখবেন তাঁর কাছেও শান্তিনিকেতন কোনদিন পুরোনো হবার নয়। এখানকার খোলা আকাশ লাল মাটি আর খোয়াই, শালবীথি আর আম্রকুঞ্জ, ফ্রেস্কো আর ভাস্কর্য, উত্তরায়ণ এবং সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আমাদের মনের গূঢ়তম মূলে, স্নায়ুর কোষে কোষে অব্যক্ত আকর্ষণ ছড়িয়ে দেয়। বাঙলা দেশের সত্তার সত্যতম রূপ এমন ক'রে আর কোথায় অভিব্যক্ত হয়েছে?

শান্তিনিকেতনে একটি নতুন টুরিস্ট লজ খোলা হয়েছে।

	থাকা (জনপ্রতি)	খাওয়া
ত্রিতল গৃহ	৮৲ টাকা	৭৲ টাকা (নিরামিষ) ৮৲ টাকা (আমিষ)
এয়ারকণ্ডিশন্‌ড কটেজ (গ্যারেজ আছে)	১৫৲ টাকা	১৮৲ টাকা

লজের টুরিস্ট ট্যাক্সিতে বক্রেশ্বর, মসাঞ্জোর, জয়দেব-কেন্দুলি, নান্নুর বা তারাপীঠেও ঘুরে আসতে পারেন।

যোগাযোগ করুন: ম্যানেজার, টুরিস্ট লজ, পোঃ বোলপুর, ফোন: বোলপুর ১৯৯
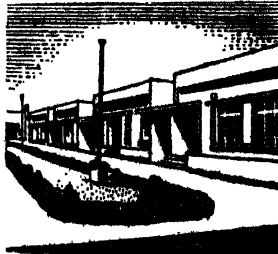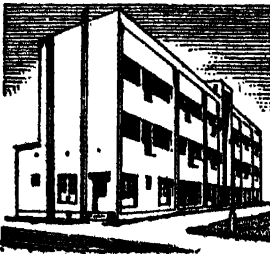
অথবা **টুরিস্ট ব্যুরো**
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২ ডালহৌসি স্কোয়ার ঈস্ট কলিকাতা-১
ফোন: ২৩-৮২৭১ গ্রাম: "TRAVELTIPS"

দেশভ্রমণ
বিশ্বশান্তির সহায়

PCP/TB 38

অষ্টাবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা চতুরঙ্গ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৩

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

পূর্বেই দেখেছি যে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যের সাধনা প্রবল কিন্তু তা সত্বেও স্থায়ীভাবে একতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা প্রাচীন ভারতে সফল হয়নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে ঐক্যের সাধনা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্য, কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ করা চলে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিকাশে সে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং আজ পর্যন্ত সমাজজীবনে তাদের প্রভাব দেখা যায়। রাজা এবং রাজ্য ভারতবর্ষে অনবরত বদলেছে কিন্তু তা সত্বেও প্রায় দু'হাজার বৎসরেও সমাজের সংগঠন বা জীবনধারার বিশেষ বদল হয়নি। ভারত ইতিহাসের আদিযুগে এদেশে যে গ্রামতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি এক অর্থে আজো বর্তমান।

বেদ এবং উপনিষদে যে সমাজের ছবি মেলে, সে সমাজ গণতান্ত্রিক এবং লোকমত নির্ভর। নির্বাচিত জনসভা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের নির্দেশ অনুসারে তখন সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। মনে হয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজাও জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনমত রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে, আবার কখনো নির্বাসিত রাজাকে সিংহাসনে পুনর্বার বসিয়েছে। ছোট ছোট রাজ্যগুলি কালক্রমে যখন বৃহত্তর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল, তখন নির্বাচিত জনসভার ক্ষমতাও ধীরে ধীরে কমে এল। জনসভাগুলি আজ লুপ্ত, কিন্তু আজো ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব এবং গ্রামজীবনে পঞ্চায়েতের আজো যে অনির্দিষ্ট কিন্তু বিরাট প্রভাব, তা থেকেই বোঝা যায় যে ভারতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ কোনদিনই একেবারে লুপ্ত হয় নি।

ইতিহাসের আদিযুগে কয়েকটি গ্রাম মিলে নিজেদের সমিতি বা গ্রাম সভার নির্বাচন করত। সমিতির সমস্ত সদস্যের যে কোন প্রশ্ন তোলবার এবং স্বাধীনভাবে আলোচনা করবার অধিকার ছিল। সমিতিতে যে কেবল রাজনৈতিক প্রশ্নের বিচার হত, তা নয়। সামাজিক এবং ধর্ম সম্পর্কিয় বিভিন্ন সমস্যারও সেখানে আলোচনা এবং সমাধান হত।

বৌদ্ধ যুগে যে সমস্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলিও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। গ্রাম ও জনপদভিত্তিক এ ধরনের গণতন্ত্র মৌর্য সাম্রাজ্যে স্থাপনের পরেও একেবারে লোপ পায় নি। সাম্রাজ্য বলতে আজ যা বোঝায়, অশোকের সাম্রাজ্যকে সে অর্থে বোধ হয় সাম্রাজ্য বলা চলে না। বহু ছোট বড় রাজ্যের শিথিল ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট বললেই বোধ হয় তার সঠিক পরিচয় মিলবে। এ কথা স্মরণ রাখলে অশোকের সাম্রাজ্যের প্রসার কিভাবে হল তা' বোঝা সহজ হয়। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে বিন্দুসারের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য বর্তমান হায়দারাবাদের দক্ষিণে প্রসারিত হয় নি। অশোক কলিঙ্গ অথবা উড়িষ্যা শস্ত্রবলে জয় করেছিলেন কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে অন্য কোন বিজয় অভিযানের বিবরণ মেলে না। তা সত্ত্বেও অশোকের সাম্রাজ্য বর্তমান মহীশুর ছাড়িয়ে প্রায় কেরল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। মনে হয় যে হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে যে সব ছোট ছোট গণতন্ত্র ছিল, তারা স্বেচ্ছায় অশোকের বিরাট কিন্তু শিথিল যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেছিল বলেই অশোকের সাম্রাজ্য এত বিস্তার লাভ করে।

যে দেশে অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, সেখানে এ ধরনের গ্রামভিত্তিক গণতন্ত্রের বিকাশ স্বাভাবিক। আজো ভারতবর্ষের অর্থনীতি মুখ্যত কৃষিনির্ভর, তাই বার বার বিভিন্ন রাজ্য ও রাজবংশের উত্থান-পতন সত্ত্বেও এ দেশে গ্রামীন স্বনির্ভরতা এখনো অটুট। কৃষিজীবী সমাজের মানুষ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেদের খোরাক পোষাক এবং জীবিকার অন্যান্য প্রয়োজন নিজেরাই বহুক্ষেত্রে মেটাতে পারে। সাম্প্রতিক জগতে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজন অস্বীকার করে স্বনির্ভর বা autarchy গড়বার সাধনা, কৃষিজীবী সমাজেই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মিলবে। ভারতবর্ষের গ্রামসমাজ তাই পুরাকালে স্বতন্ত্র ছিল, আজো সে স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি বজায় রয়েছে। পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত গ্রামস্বাতন্ত্র্য তাই ভারতীয় সমাজ জীবনের অন্যতম ও অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় অর্থনীতি আজো প্রধানত কৃষিনির্ভর কিন্তু সমাজের বিবর্তনে কোন কালেই কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর থাকতে পারে নি। আদি যুগ থেকেই এদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ সুরু হয়। তার ফলে সমাজের মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ, কালক্রমে তাই চতুর্বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদে রূপান্তরিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিরও সম্প্রসারণ ঘটল, গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির বদলে আঞ্চলিক বা দেশব্যাপী অর্থনীতির সম্ভাবনা দেখা দিল। এই পরিবর্তনের রাজনৈতিক প্রকাশে স্বতন্ত্র গ্রামসভাগুলি রাজ্য বা সাম্রাজ্যের অঙ্গে পরিণত হল। রাজ্য বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কার্যকলাপের পরিমাণ ও প্রকৃতি দিন দিন জটিল হয়ে উঠল। শাসনের উৎকর্ষ ও বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়ীত্ব এবং ক্ষমতা বাড়তে সুরু করল। ফলে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসনের পার্থক্য দিনদিন স্পষ্টতর হতে লাগল, এবং অনিবার্যভাবে শাসনের দায়ীত্ব এবং ক্ষমতা দুইই গ্রাম সমিতির কাছ থেকে কেন্দ্রের হাতে আসতে লাগল।

এ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও কৃষিকর্ম ভারতবর্ষের প্রধান অর্থনৈতিক প্রকাশ রইল বলে গ্রামের স্বনির্ভরতা হ্রাস হলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। বহু পরিবর্তনের মধ্যেও আজ পর্যন্ত গ্রাম শাসনের ঐতিহ্য তাই এদেশে বজায় রয়েছে। আজো গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদে বিচার করে, স্থানীয় শাসনকার্যে অংশ নেয়, সমাজের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো পঞ্চায়েতে এ সব কাজের কোন আইন-

সঙ্গত বা সংবিধানিক ভিত্তি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিরকালের রীতি বলে আজো পঞ্চায়েতের নির্দেশ বহুক্ষেত্রে সরকারী আদালতের হুকুমের চেয়েও বেশী কার্যকরী। বস্তুতপক্ষে সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের আদেশ যেভাবে পালিত হয়, রাষ্ট্রের বিরাট শক্তি সত্ত্বেও রাষ্ট্র নির্দেশের বেলা তা হয় না। দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন ভারতের রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনেক বেশী, কিন্তু পঞ্চায়েতের এ প্রভাব শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও সমান কার্যকরী।

ভারতীয় গ্রামসমাজের জীবনে এই যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা, জনসাধারণের আচারে ব্যবহারে তার স্পষ্ট পরিচয় মেলে। সামাজিক জীবনে এ ধারা-বাহিকতার ফল মোটের উপর কল্যাণকর হয় নি। অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতার ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে জড়তা এসেছে, কাজেই এদেশে সম্পদ উৎপাদন অন্য দেশের তুলনায় অনেক মন্থর। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোর স্থায়ীত্বের ফলে এ দেশে জন-সাধারণের মধ্যে সংস্কার ও পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কৃষক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ ও সংরক্ষণশীল। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, ব্যবসাবাণিজ্যে বেচাকেনার মধ্য দিয়ে জিনিষপত্র অনবরত হাত বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যনির্ভর সমাজের মানুষের চিন্তা ভাবনাতেও পরিবর্তন আসে, নতুনকে সহজে গ্রহণ করবার মনোবৃত্তি গড়ে উঠে। ভারতবর্ষে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও প্রাচীনপন্থী গ্রাম সভার প্রভাব বেশী বলে সাধারণ গ্রামবাসী সংরক্ষনশীল এবং পরিবর্তন বিরোধী। গ্রাম সভার ব্যাপক প্রভাবে জাতীয় ঐক্যবোধেরও হানি হয়েছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মানুষ বারবার যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ভারতবাসীর স্বাজাত্যবোধ প্রবল কিন্তু রাজনীতির বেলায় সে ঐক্যবোধের বদলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মনোভাবের পরিচয় বারবার মেলে।

বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথার বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় সংস্কৃতির সামাজিক বিকাশের শক্তি এবং দুর্বলতা দুইই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। জাতিভেদ প্রথার দোষগুলি সহজেই চোখে পড়ে। জাতিভেদের ফলে ভারতীয় জীবনের ঐক্য ব্যাহত হয়েছে। গণতন্ত্রের বিকাশে জাতিভেদ প্রবল অন্তরায়। জাতিভেদ তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষকে উন্নাসিক ও অহঙ্কারী করে। সমাজ যাদের নীচ জাতি মনে করে, তাদের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস ও দাস-মনোবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। তথা কথিত উচ্চ এবং নীচকে বিচ্ছিন্ন করে জাতিভেদ সকলের মধ্যে এক সহজ সাধারণ মানবিকতার বিকাশে বাধা দিয়েছে। জাতিভেদ প্রথার এসব দোষ স্পষ্ট বরং অন্য বহু দোষেরও উল্লেখ সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে বাস্তবজীবনে তার ব্যতিক্রম ঘটলেও পরিকল্পনায় এবং আদর্শে পরমত সহিষ্ণু ও সহনশীল মনোভাবই জাতিভেদের ভিত্তি।

জাতিভেদকে কোন অর্থেই সহনশীল মনোবৃত্তির প্রকাশ বলা অনেকেরই পছন্দ হবে না। কথাটা নিশ্চয় অদ্ভুত শোনায় কিন্তু বিচার করে দেখলে তাকে একেবারে অযৌক্তিক বলা চলে না। ভারতবর্ষে একের পরে এক বহু বিভিন্ন জাতি বিজয়ী হিসাবে এসেছে এবং কালক্রমে বিজিতদের দল ভারী করেছে। সে সব জাতির ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, বহুক্ষেত্রে রঙ এবং চেহারা আলাদা। আর্য অভিযাত্রীরা এদেশের আদিম অধিবাসীকে অনার্য, অসভ্য বলেছে, ঘৃণা ও হিংসার চোখে দেখেছে। বিজয়দীপ্ত গর্বিত আর্য এবং বিজিত হতমান বিভিন্ন অনার্য জাতি যে সবাই একই গোষ্ঠির মধ্যে মিলবে

এ কথা প্রথম দৃষ্টিতে কল্পনা করা কঠিন। স্বভাবতই মনে হবে যে যুযুধমান বিভিন্ন জাতি পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি করে এক দলই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় আঠারো এবং উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় অভিযাত্রীদের সামনে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সে যুগে ইয়োরোপীয়দের যে পার্থক্য, আর্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে প্রাচীন যুগের অনার্য ভারতবাসীর পার্থক্য তার চেয়ে বেশী ছিল না। বরং বলা চলে যে ইয়োরোপীয় অভিযাত্রীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তার তুলনায় আর্য অভিযাত্রীদের সমস্যা অনেক বেশী জটিল ছিল। ইয়োরোপীয়রা যখন আমেরিকায় বা আফ্রিকায় পেঁছিল, তখন ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দানা বেঁধেছে, ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে তাই সাংস্কৃতিক পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। তেমনি আমেরিকা বা আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির মধ্যেও সংস্কৃতির মাপে বিশেষ তারতম্য ছিল না। কাজেই একদিকে ইয়োরোপীয় অভিযাত্রী এবং অন্যদিকে আদিম দেশবাসী—এই দুই লোক সমষ্টি এবং তাদের সংস্কৃতির সংঘর্ষই সেদিন প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং সে যুগের মানুষ তারই সমাধান খুঁজেছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য অভিযাত্রীরা এসেছিল, তখন ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সমস্ত স্তরের সভ্যতার পরিচয় মেলে। হারাপ্পাবাসীরা সেদিন সভ্যতার উচ্চশিখরে পেঁছেছে অথচ বনে জঙ্গলে আদিম অধিবাসীরা কৃষিকার্যও শেখে নি। আর্য অভিযাত্রীরা সেদিন সংস্কৃতি, জাতি এবং ভাষার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন এক বিরাট ও বিচিত্র জগতের সম্মুখীন হয়েছিল। ইয়োরোপীয় অভিযাত্রীর সমস্যা ছিল দ্বৈত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষের অবসান, আর্য অভিযাত্রীদের সমস্যা বহুসংস্কৃতি ও সভ্যতার পরস্পর বিরোধের সমাধান ও সমন্বয়।

ইয়োরোপীয় অভিযাত্রীরা এ সমস্যার যে সমাধান করেছিল, আর্য অভিযাত্রীদের সমাধানের তুলনায় তা অনেক বেশী নির্মম। আমেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় আদিম অধিবাসীরা প্রায় নির্মূল হয়ে গেল, আফ্রিকায় তারা দাসজাতিতে রূপান্তরিত হল। তুলনায় আর্য অভিযাত্রীরা জাতিভেদ প্রথার মাধ্যমে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের বাঁচবার সুযোগ দিয়েছিল বলে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। একথা সত্য যে ন্যায়ের দৃষ্টিতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমাজে হেয় এবং হীন করে রাখা মনুষ্যত্বের অপমান এবং হৃদয়বান কেউ তার সমর্থন করবেন না। তবু ইতিহাসের দৃষ্টিতে বলতে হয় যে অন্যায় হলেও জাতিভেদ প্রথার কল্যাণে অনুন্নত ও দুর্বল জাতিগুলি অন্তত পক্ষে বেঁচে থাকবার সুযোগ পেল। বহু বিভিন্ন ধরনের জাতি ও মানুষকে এক সমাজ বন্ধনের মধ্যে এনে সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরকে এক ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে জাতিভেদ প্রথার দান একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

বিভিন্ন জাতির মানুষ কিভাবে এক সমাজে বাস করতে পারে, তার ব্যবস্থা করবার জন্য জাতিভেদ প্রথার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, উদ্দেশ্য এবং ঐতিহাসিক উদ্ভবের বিচারে এ কথা হয়তো সত্য কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। প্রথম দিকে জাতিভেদ প্রথায় সমাজে ব্যক্তির স্থান ও মর্যাদায় অদলবদলের সম্ভাবনা ছিল বলে অনেকে তাকে মেনে নিয়েছে। আর্যদের ধর্মবিশ্বাসে যেমন দ্রাবিড় দেবদেবীর স্থান হয়েছে, ঠিক তেমনি দ্রাবিড় পুরোহিতেরাও ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়েছে। প্রথমদিকে বৃত্তির ভিত্তিতে জাতি নির্ণয় হত এ কথা বলা চলে কিন্তু কালক্রমে বৃত্তির বদলে জন্মগত অধিকারে জাতি নির্দেশ সুরু

হল। বর্ণাশ্রম প্রথা তাই প্রথম যুগে সমাজকে বিভক্ত করে নি বরং এক বর্ণ হতে অন্য বর্ণে উন্নত হবার সম্ভাবনায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে একতা বোধের সৃষ্টি করেছে, আর্য, অনার্য এবং দ্রাবিড়ের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে হ্রাস করেছে।

বর্ণাশ্রম প্রথা আর একভাবেও সামাজিক সংঘর্ষের সমাধানে সাহায্য করেছে। সাম্প্রতিক ইয়োরোপে শ্রেণী সংঘর্ষ সামাজিক ঐক্যকে পদে পদে ব্যাহত করে। বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক ইয়োরোপে সমাজের যে সমস্ত সমস্যা তার অধিকাংশই শ্রেণী বিদ্বেষ ও শ্রেণী সংঘর্ষের ফল। ভারতবর্ষের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর বলে এদেশে শ্রেণী সংঘর্ষ তত তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি। কৃষিনির্ভর সমাজে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব অনেক বেশী, সেজন্যও সেখানে শ্রেণীসংঘর্ষ দানা বাঁধে না। কিন্তু এ সব কারণ ছাড়াও বর্ণাশ্রম প্রথায় বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা, সেজন্যও ভারতবর্ষে শ্রেণী সংগ্রাম কোন দিনই তীব্র হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতের সুখের আশায় মানুষ বর্তমানের দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। বর্ণাশ্রম প্রথায় মানুষ ভবিষ্যতের আশা যতদিন দেখেছে ততদিন সে প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি। বর্ণাশ্রম প্রথায় বৃত্তি অথবা গুণের ভিত্তিতে ব্যক্তির উন্নয়ন ও অবনয়নের সম্ভাবনা যেদিন লোপ পেল, জন্মগত অধিকারে জাতিনির্ণয় এবং সমাজে ব্যক্তির স্থান নির্দিষ্ট হতে সুরু করল, সেদিন আর জাতিভেদ প্রথার কোন সার্থকতা রইল না।

ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার বৈচিত্রের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্য ও ধারাবাহিকতার পরিচয় মেলে। আজ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পরস্পরের পার্থক্যকেই বড় করে দেখান হয়। তার রাজনৈতিক কারণও স্পষ্ট। বিভেদের উপর যতই জোর দেওয়া হোক, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যে ঐক্য তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। উত্তর ভারতের প্রধান ভাষাগুলি আর্য সংস্কৃতির দান কিন্তু আর্য ঐতিহ্যের বাইরেও দ্রাবিড় এবং আদিবাসীদের সৃষ্ট বহু ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে। অনেক পণ্ডিতের মতে তামিল ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে পুরাতন এবং সংস্কৃতের মতই সমৃদ্ধ। বর্ণাশ্রম প্রথায় যেমন বিভিন্ন জাতি মিলে মিশে এক সমাজে থাকবার সুযোগ পেয়েছে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাও তেমনি সংস্কৃতির মিলন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য স্বীকার করে নিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবাধ বিকাশের সুযোগ লাভ করেছে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে সংস্কৃত ভাষা আদি ভাষা নয়, পূর্বেকার কথিত কোন ভাষাকে--হয়তো তারই নাম প্রাকৃত--সংশোধন ও সংস্কার করে সুললিত সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি।

আদি ভাষা না হলেও ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষাকেই সংস্কৃত শব্দে এবং সংগঠনে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব এত গভীর যে এককালে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন যে অন্ততপক্ষে উত্তর ভারতের সমস্ত ভাষাই সংস্কৃতের কন্যাস্থানীয়। আজ সে বিশ্বাস টলে গেছে এবং সংস্কৃতের প্রভাব স্বীকার করেও প্রাকৃতের বিভিন্ন রূপের মর্যাদা স্বীকৃত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে তামিলের মতন প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষাও সংস্কৃতের প্রভাব এড়াতে পারে নি। সংস্কৃতের প্রভাব আজো কমে নি বরং দিন দিন বেড়ে চলেছে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে প্রথমে বাঙলা এবং সম্প্রতি হিন্দীর বিকাশে সংস্কৃতের প্রভাব যেভাবে কার্যকরী তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাঠান মোগল যুগের পূর্বেও বিদেশী অভিযাত্রীরা ভারতবর্ষে তাদের নিজেদের ভাষা নিয়ে এসেছিল কিন্তু কালক্রমে সে সমস্ত ভাষা সংস্কৃতের সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। মধ্যযুগে ভারতীয় ভাষার সঙ্গে আরবী-ফারসীর সমন্বয়ে

উর্দুর সৃষ্টি হল, তার ব্যাকরণ এবং ভাষার সংগঠন সংস্কৃতভিত্তিক। উর্দুভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বহু আরবী ফারসী শব্দ এসেছে কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের পরিমাণও কম নয়। সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিকাশের ইতিহাসে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথম যুগের তামিল কাব্যে আর্য বিদ্বেষ যত প্রবল, সেকালের সংস্কৃত কাব্যে অনার্যের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ ঠিক সমান তীব্র। কালক্রমে এ বিদ্বেষ কমে এল এবং সমাজজীবনে যেভাবে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে শিখল, সেই সহনশীলতা ও পারস্পরিক প্রীতি বিভিন্ন ভাষার কাব্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করতে সুরু হল। মধ্যযুগের বৈষ্ণবকাব্য, ভক্তিকাব্য এবং সুফী কবিতায় মানবিকতার যে চরম বিকাশ, এই সমন্বয়পন্থী উদার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

কবিতা
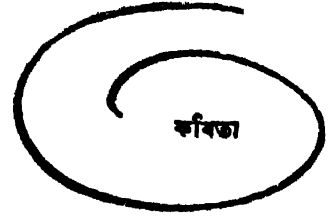
শিল্পীর উপলব্ধি

মনীশ ঘটক

অনেক বেলা ছিল যখন বেরিয়েছিলাম বনে
একা একা. একেবারে একা,
ভেবেছিলাম নিরালাতে একান্তে এক কোণে
হয়ত তোমার পেয়ে যাব দেখা।
দিনের আলো নিবে এল, সূর্য গেল পাটে
বিকিকিনি বন্ধ হল চেতনপুরের হাটে,
মোষের পিঠে ন্যাংটো ছেলে দেখা দিল মাঠে,
দিন শেষের যাত্রীজাহাজ ভিড়ল এস্টেশনে
ভোঁয়ের সাথে উড়ল ধোঁয়ার রেখা।

বনের পথ কোন বিপথে পথ হারিয়েছিল
পঁউছে ছিল হাটের মধ্যিখানে,
তোমায় একা পাওয়ার কথা কে ভুলিয়ে দিল
মন ভোলালো হট্টগোলে গানে।
দুপুর রাতে পাগড়ি মাথায় সড়কি কাঁধে নিয়ে
টিম্‌টিমে লণ্ঠনের আলো আলবালে ঠিক্‌রিয়ে
ডাকহরকরা ছুটে চলে ঘণ্টি ঠিনঠিনিয়ে
শহর থেকে যেমন গাঁয়ের পানে,—
এমনি সারাজীবন ধরে ছোটাছুটির ফাঁকে
ঘরের থেকে কাজে, আবার ঘরে,
নয় সে একা, সে খবর কি ডাকহরকরা রাখে?
কতজনার ঝক্কি তাহার 'পরে:

কতো সন্ধি কতো লড়াই কতো ভাঙাগড়া
কতো কান্না কতো হাসি কতো বোঝাপড়া
কতো ফন্দী কতো ফিকির দুঃখসুখে ভরা
কাঁধে বয়ে বেড়ায় নিজের করে'।

ক্লান্ত দেহে যতেক বোঝা পৌঁছে সবার দ্বারে
কপাল থেকে মুছে ঘামের ফোঁটা,
'দিন ত গেল সন্ধে হল পার করো আমারে'
হয়ত ভাঁজে, গান জানে না গোটা।
আমার মতো হয়ত ভাবে যাওয়া আসার শেষে
পৌঁছে যাবে ঘাট পেরিয়ে একলা তোমার দেশে,
আমার মতো সেও জানে না, কী যে সর্বনেশে
সবায় ফেলে তোমার পাছে ছোটা!

জেনেছি আজ একলা তুমি দাও না ধরা কা'রে
মিথ্যে একা খোঁজে তোমায় তারা,
সবার মাঝে সকল হয়ে আছো একাকারে
ধরণ তোমার এমনি ছিষ্টিছাড়া।
না জেনে দশজনার বোঝা হরকরা বয় কাঁধে
পথ ভুলিয়ে আমায় ঘোরাও গোলক ধাঁধার ফাঁদে,
একলা কেউ নেইক কোথাও বিশ্বনাটের ছাঁদে
অনেক দেখে অনেক ঠেকে শিখেছি এই বারে
দাও তবে দাও সবা'র মাঝে সাড়া॥

ডী কুনশ্‌ট্‌ ডের ফুগে

বিষ্ণু দে

যেহেতু স্মৃতির মাঠে কোনওদিন গুচ্ছে গুচ্ছে সোনা
তুলি নি, ভরি নি বক্ষ ঐশ্বর্যের গার্হস্থ্যে পাণ্ডুর।
তাই তো খামারে নেই চতুষ্পদ লুব্ধ আনাগোনা,
তাই তো হৃদয় পূর্ণ অদ্যাবধি আদিগন্ত দূর

হরিৎ অথবা কৃষ্ণ রক্তিম বিস্তারে, নীলিমায়
শরীরের স্বস্তি পাই মননের দীর্ঘ স্বাধীনতা—
যতটা সংগত মর্ত্য নির্বিকার জৈবিক সীমায়,
এবং সেখানে মুক্তিস্রোত পায় সত্তার দীনতা।

সুতরাং যে ভাবেই ক্ষান্তি হোক্, মাস বা বৎসর
দীর্ঘসূত্র সময়ের হাসপাতালে ভুগে বা না ভুগে
—জানি তাও তুচ্ছ, বিশ্বে সত্য শুধু সৌন্দর্য দুস্তর
এবং রচনা করা মহানদী—ডী কুনশ্‌ট্‌ ডের্‌ ফুগে॥

ডী কুনশ্‌ট্‌ ডের ফুগে—বাখের বিখ্যাত প্রবল কীর্তি : ফুগের শিল্পরচনা।

রাস্তায়

অরুণ মিত্র

ভোরের দিকে এই এক সুষমা
দুধারে দেয়াল দরোজা আবছা
রাস্তার ধুলো শান্ত শুয়ে আছে
আঁজলা ক'রে তুলে ছিটিয়ে দাও
অমনি যেন মধুবৃষ্টি হবে:
তোমার জন্যে অভ্যর্থনা রেণুতে রেণুতে
বিভোর নদীতে পেঁছে দিয়ে
তোমাকে আশ্চর্য ক'রে দেবে।

তুমি যে হিংস্র রোদে বেরিয়ে এসেছিলে
তোমার পড়ন্ত বেলা রক্তাক্ত জ্বলছিল
চেনা অচেনা মুখের যন্ত্রণায়
তোমার অন্ধকার চৌচির হয়েছিল
নিশ্বাস পড়া এবং থামার মধ্যে যে আর তফাৎ করা যায় নি
এ সব ভুলে যাবার ইতিহাস;
তুমি যেন এক বিদেশী বন্ধু নতুন এলে
তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে মৃদু স্রোতে
গুঞ্জনের মধ্যে,
কুয়াশার মোড় তোমাকে ইশারা দেয়।
অথচ ভালো ক'রে দেখো
ধুলোর উপর লাল ছোপগুলো এখনো কি ভীষণ তাজা!

নাচের পুতুল

সুধাংশু ঘোষ

পড়ন্ত বেলায় বৃষ্টি থামল। দুপুরের পর থেকে একবারও কমতির দিকে যায় নি। আমি তো তখন থেকে বসে বসে দেখছি। এতক্ষণ খুব ঝাপসা ছিল সামনেটা। সব ভিজিয়ে, সামনের রাস্তাটা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে এইবার বৃষ্টিটা থামল। এখন বরং ছেঁড়াছেঁড়া দল-ছুট মেঘ খুঁজতে হবে নীল আকাশে। একটু আগেও নোংরা কাপড় দিয়ে পুরোটা ঢাকা ছিল। আমার এই দোতলার বারান্দা থেকে আকাশের অনেকটা দেখা যায়। আমার বাড়ির সামনের সযত্নলালিত ছোট বাগানের সব গাছের পাতা এখন গাঢ় সবুজ। বাগানের ফটক পার হয়ে পশ্চিমমুখো রাস্তাটা মসৃণ, বৃষ্টিতে ধুয়ে নিখাদ কাল।

একটু নিস্তেজ রোদ্দুরও উঠেছে। সব বেশ ভাল, কেমন নরম, সবুজ, স্নিগ্ধ। তবু আমার এই দোতলার বারান্দার মোজেক করা মেঝেয় কোথা থেকে যেন একরাশ কাঠ-পিঁপড়ে এসে উঠেছে। মোটা একটা সার বেঁধে বেতঝোপের সাপের মতো লতিয়েলতিয়ে এগোচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে দিনটাকে কেমন বুড়োবুড়ো লাগল।

ভিজে হাওয়ায় অকৃপণ রমণীয় গন্ধ ছড়িয়ে ভেতরের কোন ঘর থেকে আমার স্ত্রী এই বারান্দা হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। বারান্দাটুকু পার হবার সময় আমার গভীর কোমল নিচু চেয়ারের পেছন থেকে নিজেকেই যেন ফিসফিস করে কিছু বলে গেল। কথাটা কানে স্পষ্ট হয়ে না পোঁছলেও আমি ধরে নিতে পারলাম। ওর জানা আছে, আমি ঠিক ধরে নিতে পারব। ও বলে গেল : বেরোচ্ছি।

গ্যারাজ থেকে নিপুণ ক্ষিপ্রতায় বের করে আনল গাড়িটা মসৃণ নিখাদ কাল রাস্তাটা পার হয়ে অন্য বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হল। তার আগে স্টিয়ারিংয়ের ওপর একটা হাত, কাঁধ, কান, গালের একপাশ একটুক্ষণের জন্য দেখলাম। বারান্দাটুকু পার হবার সময় মুখ ঘুরিয়ে ওর মুখের দিকেও একবার তাকিয়েছিলাম। নিরক্ত শ্বেতপাথরের মতো। না, তার থেকেও সাদা, চোখ আহত হবার মতো ফর্সা। তবে উজ্জ্বলতা মরেছে, ত্বক কিছু শিথিল। তার মধ্যে ঠোঁটে ভয়ঙ্কর লাল, আঁকা ভুরু বড় বেশি সূক্ষ্ম। চলায় যতই আত্মপ্রত্যয় দেখাক, দশপনের বছর আগেকার সেই ঋজুতা কোথায়!

এখনই বেরোল কেন। এই মরা রোদ্দুরটাও পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার খানিক পরে ছায়াছায়া অন্ধকারে বেরোলে পারত! আমি তো আজ গাড়ি চাইতাম না। আমি তো আজ বসেই আছি এই বারান্দায়। পাশের নিচু গোল টেবিলে পাত্রটা শূন্য। ফেনার মত এক-আধ বিন্দু তলানি পড়ে আছে।

চতুষ্কোণ নকশার জাফরির মধ্য দিয়ে এসে কিছু চৌকো রোদ্দুর পড়েছে আমার পায়ের কাছে। চিঠির মতো। আমার হাতে একখানা চিঠি। তীব্র চমক দেবার মতো চিঠি। মৃন্ময় লিখেছে। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু মৃন্ময়। তার সব কিছু আমি জানি। সে আমাকে বলেছে। তার ডায়রি পড়েছি আমি। তাই আজ এই চিঠি পেয়ে এমন চমক।

কাটপিঁপড়ের সারটা বেতঝোপের সাপের মতো লতিয়েলতিয়ে এগোচ্ছে। আমার পা স্পর্শ করার আশঙ্কা নেই। আমার দুটো পা-ই মেঝে থেকে একটু ওপরে তোলা আছে।

নিচু গোলটেবিলটা বুকের কাছে। ইচ্ছে করলে পাত্রটা আবার পূর্ণ করে নিতে পারি।

সন্ধ্যে নাগাদ কেল্লার কাছে গঙ্গার ধারের রেলিংয়ে ঝুঁকে মৃন্ময় দাঁড়িয়েছিল। সামনে জলের শব্দ, প্রায় নির্জন একটা জাহাজে অজস্র আলোর মালা। দীর্ঘ শরীর বেঁকিয়ে নিচু হয়ে লোহার উনুনের ওপর চাপান পেতলের কলসি থেকে ভাঁড়ে চা নিল। পাশে তাকিয়ে বলল,—তুমি নেবে না?

অমলা ঠোঁট উল্টে একটা ঘৃণাসূচক শব্দ করল। গরম ভাঁড়টা মৃন্ময় দ্রুত হাত বদল করছে দেখে মজা পেয়ে হাসল। ভাঁড়টা ধরে থাকতে না পেরে মৃন্ময় অবশেষে রেলিংয়ের ওপর নামিয়ে রাখল, আঙুল দিয়ে একটু ছুঁয়ে রইল, হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় গড়িয়ে না পড়ে। মৃন্ময়ের আঙুলের রঙ আদর করেও শ্যাম বলা যায় না।

অন্ধকারে ঘাসের ওপর বসে অমলা কাঠের চামচে থেকে তারিয়ে তারিয়ে আইসক্রীম চাটছিল। বারবার কলসির চা ফিরিয়ে দিয়ে এখন আর এক ভাঁড় নেবার জন্য মৃন্ময় ডাকল একজনকে। অমলা লোকটাকে হাঁকিয়ে দিল।—আগে থেকেই বিষ ঢালছ কেন গলায়! দেখ আগে, আমি তোমাকে বিষের পাত্রের দিকে নিয়ে যাই কি না।

—তুমি বিষ কিনা আগে চেখে দেখতে বলছ?

অমলা খুব রাগ দেখাল। হাত থেকে আইসক্রীমের কাপটা ফেলে দিল না অবশ্য। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—আজ এমন চা-হ্যাংলা হয়েছো কেন বল তো! চল আমাদের বাড়ি। দাদার এক বন্ধু খানিকটা খুব ভাল চা পাঠিয়েছেন।

অনেকক্ষণ বাসে ঝুলে অমলাদের গলি। বাড়ির কাছে এসে হয়ত মৃন্ময়ের চলায় দ্বিধা দেখেছিল। অমলা হেসে বলল,—চলে এসো তো বীরের মতো আমার সঙ্গে। বাড়িতে এখন বউদি ছাড়া আর কেউ নেই। দাদা ট্যুরে।

সেই প্রথম অমলাদের বাড়ি।

সেই বয়েসটা লতিয়ে লতিয়ে এখন কোথায় এসেছে!

মৃন্ময়ের আস্তানায় আসতে অমলার কোন অসুবিধে ছিল না। মা মারা যাবার পর থেকে ঘরখানা মৃন্ময়ের একার। অন্যান্য ঘরের জ্যাঠতুতো ভাই ও বউদিদের সঙ্গে সকালের চা এবং দুবেলার খাওয়া ছাড়া আর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ঘরখানা ছোট, চাপা, উত্তর-মুখো, অন্য ঘর সংলগ্ন স্নানের ঘর ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। তথাপি ঘরখানা ছিল মৃন্ময়ের একার।

তখন সরোদ বাজানোর নেশা ছিল। কেমন একাগ্রতা ছিল তখন মৃন্ময়ের চরিত্রে!

দরজাটা ভেজিয়ে বাজনাটা নিয়ে বসেছিল। চেতনা ছিল না অন্য কোন ধ্বনি বিষয়ে। দরজায় কে ঠুক্‌ঠুক্‌ করছে কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না। আপনি দরজাটা খুলে গেলে অমলা ভেতরে এলো। মৃন্ময় বাজনাটা সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, অমলা বলল,—আমি শুনছি যে!

মিনিট পনের গমক আর ঝঙ্কার। যখন থামল তখনো মৃন্ময় ধ্বনির নেশায় দুলছে।

চার দেয়ালে, মেঝেয়, আসবাবে চোখ বুলিয়ে এনে অমলা বলছিল,—তুমি কি বাড়ি-টাড়ির খোঁজ করছো?

এই ঘরে মা-র মৃত্যু হয়েছিল। মা-র নিঃসাড় শরীর তখনো এই ঘরে, মৃন্ময় মেঝেয় বসে একটা চেয়ারে গাল পেতে কব্জি দিয়ে চোখ ঢেকেছিল অনেকক্ষণ। এঘর ছাড়তে হবে। বাড়ি সত্যি খোঁজা দরকার। অমলা কেমন দূর দেখতে পারে, চোখের সামনে যা

রয়েছে তা ছাড়িয়ে কেমন দূরকে বিদ্ধ করে অমলার তৃষ্ণার্ত চোখ। অমলার নাম তৃষ্ণা হলে ভাল হত।

আরও কয়েক মাস অমলার সঙ্গে চাখানা, কফিখানা, মাঠ, গঙ্গার তীর, বটানিক্স, স্টিমার পার্টিতে সুন্দরবনের যতটা নৈকট্য নিরাপদ। এসবের মধ্যেও হন্যে হয়ে বাড়ি খুঁজছিল। অবশেষে বাড়ি মিলল। ভবানীপুরের সেই দুঘরের ফ্ল্যাট। তখন আর অনুষ্ঠানটার কোন বাধা ছিল না।

ফ্ল্যাটটা ছিল চারতলায়। তবু প্রথম প্রথম উঠতে একবারও কষ্ট হয় নি। চারজন দাঁড়ান যায়, দুখানা চেয়ার নিয়ে দুজন বসা যায়, এমন একটা বারান্দাও ছিল রাস্তার দিকে।

মৃন্ময়ের চাকরি ছিল, বাজনা ছিল, অমলার প্রায় প্রতি মাসে নতুন করে ঘর সাজানোর দারুণ নেশা।

শরীরে একটুও বাড়তি মেদ নেই, দৈর্ঘ্য খুব বেশি, চুল ছোট করে ছাঁটা, এমন কাল রঙের যুবক ছুটির দিন পর পর কয়েক ঘণ্টা বিছানায় পা গুটিয়ে একটা সরোদ কোলে করে বসে আছে, দৃশ্যটা হয়ত বেমানান। এমন আদলের যুবক সমাজসংসারের সব সফলতার চাবিকাঠি নিজের মুঠোয় আনবার সাধনায় মুখে ফেনা তুলে ঘোড়ার মতো উদয়াস্ত ছুটছে দেখতে পেলে হয়ত চোখ তৃপ্ত হয়। অথচ মৃন্ময় শুধু বাজনাটার তারে আঙুলের ঘা মারছিল। প্রত্যেকটি আঘাতে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ কেমন লাফিয়ে ওঠে, আবার তখনই যেন মারাত্মক বিষের ক্রিয়ায় ঢলে পড়ে। হয়ত বিশেষ বিশেষ ধ্বনিতে কিছু তীব্র বিষ থাকে।

কিছু একটা নতুন করে সাজাতে সাজাতে অমলা ধ্বনিতরঙ্গের খাদে টুপটুপ করে কয়েকটা কথা খসিয়ে দিল,—সরোদ বাজানো বেশ মেহনতের কাজ, তাই না?

কথাগুলো আক্ষরিক অর্থে কাঁটায় কাঁটায় সত্যি এবং সরল। তথাপি মৃন্ময় কিছু বুঝতে পারল না। শুধু অমলার গলার স্বরান্তরে আঙুল আর নড়ল না। বাজনাটা কোল থেকে নামিয়ে রাখল।

এইবার অমলা মুখ ফিরিয়ে বলল,—থামলে যে!

বোকাবোকা হাসল মৃন্ময়,—তোমার ঘর সাজানো দেখছি।

তৃতীয় কি চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীর রাত্তিরে নিমন্ত্রিত দুচারজন বন্ধু চলে গেলে বারান্দার স্বল্প আলোয় চুপচাপ বসেছিল। অনেক নিচে রাস্তাটা নির্জন। অন্য ফ্ল্যাট থেকেও কোন শব্দ আসছিল না। আজ বাড়িতে ফুলের প্রাচুর্য ছিল। মৃন্ময়ের চিরকাল ধারণা, অন্ধকারে গন্ধ তীব্রতর হয়। ঘরের আলো বারান্দায় আসছিল। আলোটা নেভাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তখনই অমলা হঠাৎ বলল,—এরপর? যেন কখন থেকে একটানা সংলাপ চলছে।

আবার চেয়ারটায় বসল মৃন্ময়। রুটিতে মাখনের মতো কথায় হাসি মাখিয়ে বলল,—এরপর কেউ এলে তোমাকে মা বলে ডাকবে!

এবংবিধ রসিকতায়ও অমলার চোখ খুশীতে ছলছলিয়ে উঠল না। বরং তার নির্লিপ্ততা স্পষ্ট ধরতে পারল মৃন্ময়। উৎসবের রাত্তিরেও এমন নির্লিপ্ততা বড় বেশি ভারী লাগল, মনের পরতে চেপে বসার মতো।

বারান্দাটা খুব ছোট। দুখানা চেয়ারের হাতল পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে আছে। তবু অমলা মনে হল অনেক দূর। সামনের কয়েকটা বাড়ির ছাত ডিঙিয়ে দূরে কিছুতে চোখ রেখেছে। তার চুল, শাড়ি ইত্যাদি থেকে রমণীয় কোন সুবাস মৃন্ময়ের অনুভব স্পর্শ

করল না।

—কিছু একটা করব ভাবছি। অমলা চোখ নামিয়ে আনল বারান্দায়।—একটা চাকরি টাকরি পেয়ে যেতে পারি। হীরক বলছিল।

আমার মতো আরো অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল মৃন্ময়ের। যেমন হীরক। চামড়ার ব্যবসা করে লাল।

মৃন্ময়ের বিশ্বাস, বিবাহবার্ষিকী মূলত স্মরণোৎসব। কিন্তু দেখা গেল, অতীতকে ফেরানো অমলার স্বভাব নয়। অন্যদের সঙ্গে আজ হীরক এসেছিল। অমলার মনে যে ইচ্ছে রোপণ করে গেছে, তার বীজ এখন ফাটছে।

অবশ্য কয়েক মাসেই মৃন্ময় তার ভুল শুধরে নিয়েছিল। বুঝেছিল, বস্তুত অতীতকে ফেরানোই অমলার স্বভাব। হীরকের সাহায্যে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চাইছিল। ভবানীপুরের সেই দুঘরের ফ্ল্যাট পাবার আগের দিনগুলোকে ফেরাতে চাইছিল। যদিও জানাই ছিল ঠিক তেমন করে কোন কিছুই আর ফেরে না। শুধু ফিরে পাবার অথবা ফিরে যাবার চেষ্টায় মৃন্ময়ের কোন ভূমিকা ছিল না। সে যেন মঞ্চে তার ভূমিকা শেষ করে পাশের সবুজ ঘরে চলে গেছে, অথচ নাটকের তখনো অনেক বাকী।

অমলা ঠিক চাকরিটাকরি খুঁজছিল না, বলা বাহুল্য। যে-চাকরি সে পেতে পারত, তার প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। দুঃসহ তৃষ্ণার চোখে কোন নিরবয়ব দূরকে বিন্ধ করছিল, সেই ছোট ফ্ল্যাটের প্রাত্যহিকতার বিবর্ণ নকশা নখ দিয়ে কুরেকুরে ছিঁড়ছিল।

অথচ কখনো খুব স্থূল কিছু মৃন্ময় দেখেনি। হীরক বন্ধুই ছিল, শুধু ইদানীং অমলার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর মনে হয়েছে। আশ্চর্য সহজ গলায় মৃন্ময়ের সঙ্গে হীরকের বিষয়ে কথা বলেছে অমলা। এমনকি পার্ক স্ট্রীটের রেস্টরাণ্টের গল্পও, যেখানে নিয়মিত চা-কফির জন্য যাওয়ার কথা মৃন্ময় কখনো ভাবেনি। ফ্ল্যাট পাওয়ার আগে এক-আধবার গিয়েছে ওপাড়ায়, সখ করে। তার স্বাভাবিক দৌড় ছিল মধ্যবিত্ত চা-খানা পর্যন্ত।

স্থূল কিছু সত্যি কখনো দেখেনি। যেমন, অসময়ে হঠাৎ বাড়ি ফিরে নাটকে দৃশ্যের মতো ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকার ঘরে অমলা ও হীরকের দুটো ছায়াশরীরকে দ্রুত দূরে সরে যেতে দেখেনি।

অসতর্ক কথার টুকরো, হাসি, মুখের আকস্মিক রঙ বদল ইত্যাদি জুড়েজুড়ে মৃন্ময় দেখেছিল, তার এবং অমলার মাঝখানে একটা পাঁচিল উঠছে। তাছাড়া চোখের বাইরে নিশ্চয়ই আরো কিছু দেখেছিল। না হলে ভূমিকা শেষ করে সবুজ ঘরে চলে গিয়েও আবার খ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে মঞ্চে ফিরে এলো কেন?

মৃন্ময় এই প্রথম নিজের চেহারার বাইরের আদলের মর্যাদা রাখল। উদয়াস্ত ক্ষিপ্র ঘোড়ার মতো মুখে ফেনা তুলে ছুটে দেখিয়ে দিল, সেও পারে।

মৃন্ময়ও চাকরি ছেড়ে চামড়ার ব্যবসায় নামল। আর সত্যি মনেপ্রাণে চামড়ার ব্যবসায় লাগলে সাফল্যের চাবি মুঠোয় চলে আসতে কতদিন লাগে?

ভবানীপুরের দুঘরের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিল। বনেদীপাড়ায় ফ্রীজ, গ্রাম ইত্যাদি প্রতীক-শোভিত নিজস্ব বাড়িতে চলে এলো। হীরকের গাড়ির মতো প্রকাণ্ড কাল গাড়িতে মৃন্ময়ের পাশে বসতে পারল অমলা, যে-গাড়ি লাল আলোর বাধায় থেমে থাকলে ইঞ্জিন চালু আছে কিনা বোঝা যায় না।

তথাপি, মামুলি মোটাদাগ বরাবর এতদূর এসেও, মৃন্ময়ের মনে হল, মঞ্চে শুধু তার

একার খুরের শব্দ, একারই হ্রেষা। শ্বেত তুরঙ্গমীর তৃষ্ণার শান্তি দূর বনের সরোবরে।

অক্টোবরের এক রাত্তিরে পাশের খাটে লেপ সরিয়ে অমলা বিছানায় উঠে বসল। —দার্জিলিং বেড়াতে যাব। পরশুদিন। তুমি, আমি আর হীরক। সময় নেই, যেতে পারবে না, এসব বললে চলবে না কিন্তু।

মৃন্ময় সবে চামড়ার কারবারে হাত দিয়েছে, সবে নিপুণ মমতায় চামড়া তুলে নিতে শিখেছে। তার হঠাৎ শৈলাবাসে বেড়াতে যাবার বিলাস পোষায় না। এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল,—আমি কেমন করে যাব! আমার সত্যি সময় নেই।

অমলা আবার বালিশে মাথা রেখে লেপ টেনে গলা পর্যন্ত ঢাকল।

মৃন্ময়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেল অমলা। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু অবশ্যই ছিল না। বরং নিজে যে যেতে পারল না তার জন্যই লজ্জিত থাকবার কথা। কিন্তু মৃন্ময়ের মনের কোথায় যেন মধ্যবিত্ত সংস্কারের দুর্গন্ধ পাঁক থিকথিক করছিল। সেখানে এখন বিষাক্ত বাষ্প বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে ফাটছিল। পনের দিন শূন্য ঘরে দাপিয়ে বেড়াল মৃন্ময়।

অমলারা ফিরে আসার এক মাসের মধ্যে এক রাত্তিরে মৃন্ময় বিছানায় উঠে বসল। -তোমার সঙ্গে মুসৌরী বেড়াতে যাব। কালই। গুছিয়ে নিও।

—এই তো বেড়িয়ে ফিরলাম। তাছাড়া এসময়ে কেউ মুসৌরী যায় না কি! এটা তো অফ্ সীজন।

- আমি এখন সময় পেয়েছি, এখন যাব। গুছিয়ে নিও। মৃন্ময় দাঁতের ওপর দাঁত রেখে পিষছিল। অন্ধকারে পাশের খাটের দিকে অমলা তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না। মৃন্ময়ের চাপা ঠোঁটের ওপাশে দাঁতে দাঁত ঘষার মৃদু কঠিন শব্দ মুখের মধ্যের পরিমিত হাওয়া জড়িয়ে রইল, অমলার কানে পৌঁছল না।

মুসৌরীর পাহাড় থেকে দুটো ঘোড়ায় চেপে দেরাদুনের দিকে নামছিল। দুঃসহ শীত, সন্ধ্যের অস্বচ্ছতা সব দিকে, ভিজে মসলিনের মতো কুয়াশা ঢালের ঝোপঝাড় ঢেকেছে। পাহাড়ীরা নিচে নেমে যায় এমন শীতেও মৃন্ময়ের কপালে ঘামের বিন্দু, তৃতীয় একটি ঘোড়ার মতো নিশ্বাসের শব্দ। খানিকক্ষণ থেকে মৃন্ময় কেবলই অমলার ঘোড়াটাকে ডাইনের খাদে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল। মৃন্ময় বুঝল, অমলা বুঝেছে। কিন্তু অমলা কোথায় যাবে? লাগাম টেনেটেনে বাঁয়ে সরে যেতে চাইছিল, পারছে না, বাঁ পাশেই মৃন্ময়, শুধুই তাকে ডাইনে ঢালের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মৃন্ময়ের মতলববাজ দুটো চোখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই অমলা সব আত্মসম্মান চুলোয় দিয়ে বিশ্রী ভয়ার্ত একটা চিৎকার তুলল। অথচ তখনই মৃন্ময় মোক্ষম ধাক্কাটি দেবার জন্য লাগামে ডাইনে টান মেরে নিজের ঘোড়ার পেটে লাথি কষিয়েছে।

অশ্বনির্বাচনে হয়ত ভুল হয়ে থাকবে। অসহায় স্ত্রীলোকের ভয়ার্ত চিৎকারে অমলার ঘোড়া আকস্মিক লাফ মেরে দু'পা এগিয়ে গেল, আর মৃন্ময়ের ঘোড়াটা ঝোঁক সামলাতে না পেরে গড়িয়ে পড়ল ডানদিকের খাদে।

দেরাদুনের হাসপাতালে মৃন্ময়ের কয়েক মাস কাটল। হাসপাতালে স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই একটা পা কেটে ফেলতে হল হাঁটুর সামান্য ওপর থেকে।

ফিরে এসে মৃন্ময় আর চামড়ায় হাত দিল না। কয়েক মাস শুয়ে বসে থেকে, ক্রাচ

নিয়ে হাঁটা অভ্যেস করে, একটা ছোট দোকান খুলল। একটা স্কুলের ফটকের পাশে দোকান। দোকানে প্রধানত ছাত্রদের দরকারী জিনিসপত্র ছিল। এই সময়েই মৃন্ময় তার ডায়রি লিখছিল। তার ডায়রিতে তাবৎ স্ত্রীলোকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পাওয়া সঙ্গত ছিল বলে আমার বিশ্বাস।

আন্দাজ করা অসম্ভব ছিল না, তবু কবুল করে রাখা ভাল: হীরক আমারই নাম। অমলা এখন আমার স্ত্রী। এখন অবশ্য একটু বেরিয়েছে। রোজই প্রায় বেরোয়। আজ একটু আগে আগে। সন্ধ্যেয় বেরোলেই পারত। শিথিল ত্বক, নিরক্ত সাদা মুখ, ঠোঁটে অমন লাল—ঈষৎ অন্ধকারেই ভাল।

চৌকো রোদ্দুরগুলো অনেকক্ষণ নেই। নিচের বাগানে, পায়ের কাছে টেবিলের তলায় অন্ধকার। বারান্দায় আলো জ্বালতে দিইনি। হাত থেকে মৃন্ময়ের চিঠিখানা কোথায় যেন পড়ল। আমার আঙুল একটু কাঁপছে বুঝতে পারছি। নিচু গোল টেবিলের পাত্রটা আর একবার পূর্ণ করে নিয়েছিলাম।

সম্পর্ক এমন তেতো হয়ে গেলেও মৃন্ময় আমাকে ছাড়ে নি, একেবারে খারিজ করে দেয় নি। বরং তার ডায়রির পাতায় চোখ বুলোতে দিয়েছিল। আগেকার ঘনিষ্ঠতা অবশ্য আর ছিল না, থাকা সম্ভব নয়।

যৌবনকালে অন্য এক মৃন্ময়কে আমি জানতাম। চেহারা অন্য ইঙ্গিত করলেও আসলে কিছুটা অলস প্রকৃতির, বাজনাটাজনা কোলে নিয়ে একটানা কয়েক ঘণ্টা বসে থাকত। শুধু পরে বছর কয়েক তার চেহারার বাইরের আদলকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছিল। এখন আবার একচাপ ঘন গভীর বিতৃষ্ণার মতো দোকানে বসে থাকত, গলিতনখদন্ত।

চারদিন আগে তার চিঠিখানা পেয়ে দারুণ চমকে উঠেছিলাম। এমন যে হতে পারে, হয়, আমি ভাবি নি। চিঠিখানা মৃন্ময়ের বিবাহের। স্কুলের দরোয়ানের বালবিধবা এখন স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়ে দামিনীর সঙ্গে বিয়ে। দামিনীকে দেবে বলে মৃন্ময় গুহায় বসে সুবর্ণকঙ্কন বানাচ্ছিল, আমি জানতাম না।

কাল বিয়ের তারিখ ছিল। গিয়েছিলাম।

গলিতে দরজার দুপাশে মাটির জলভরা কলসে কলাগাছ ছিল। সানাই ছিল না, তবে জোরাল আলো ছিল, কালচে লাল সাটিনের পর্দা। ভেতরে অভ্যাগতদের মধ্যে বর বসেছিল। জরিপাড় তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, কপালে চন্দন। বরের পেছনের তাকিয়া আর দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকে মেঝেয় শোয়ান ক্রাচ। আমাকে দেখে মৃদু মৃদু হাসছিল মৃন্ময়।

কাঠপিঁপড়েগুলো বজ্জাত। কখন মেঝেয় পা নামিয়েছি মনে নেই। সুবিধে পেয়ে দুচারটে কামড়ে দিল!

কয়েক মাস আগে অমলার সঙ্গে আবার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। অমলার বার বছরের ছেলে জলাপাহাড়ের স্কুলে পড়ে। তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

অন্য একটি ছেলের সঙ্গে অমলার পুত্র বিকেলবেলা জলাপাহাড়ের চূড়োয় ওঠার পথে দৌড়ে দৌড়ে বারবার একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের চড়াই উৎরাই পার হচ্ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই অমন করছিল। খানিকক্ষণ আমাদের দেখল না। হয়ত পাশ দিয়ে ছুটে যাবার সময় আমাদের অপরিচিত ভ্রমণবিলাসী ভেবেছে। অপরিচিতদের প্রতি আশ্চর্য অনীহা ওই স্কুলের পরিবেশে জন্মায়।

ডাকাডাকি করে তাকে পেলাম। অন্য ছেলেটি আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখিয়ে চলে গেলে অমলার ছেলে আমাদের কাছে পথের পাশের রেলিংয়ে এসে বসল। হাঁপাচ্ছিল। সারা মুখ এবং কোমল অঙ্গের অন্য আদুড় অংশ কুঁচবরণ। এদেশের মুখ বলে চেনা কঠিন।

ঠিক মাথার ওপরে কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ। রেলিংয়ের পাশ থেকেই ঢাল নেমে গেছে লতাগুল্মে আচ্ছাদিত দূর উপত্যকায়। অমলার ছেলের ঠোঁট পুরু, ফোলা গাল, মোটা ভুরু। আমার, অমলার, মৃন্ময়ের—কারো মুখের সঙ্গে মেলে না। অমলার ছেলের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আদর করছিলাম। তখন দূর উপত্যকার দিকে আমার চোখ ছিল।

—উঃ, লাগছে!

ভয়ে কেঁপে উঠে শিরাজাগা হাত সরিয়ে নিলাম। একটু সরে দাঁড়ালাম। অমলা একাই তার ছেলের সঙ্গে কথা বলুক, একাই ছেলেকে আদর করুক।

আঙুলগুলো বেশ কাঁপছে বুঝতে পারছি। অনেকক্ষণ ধরে পুতুলের সঙ্গে বাঁধা অদৃশ্য সুতো টানতে টানতে এখন দৃশ্যাবলী বড়ই অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে।

আন্দাজ করা মোটেই কঠিন ছিল না, তথাপি সত্যি কথা সরল করে বলে রাখা ভাল: আমি হীরক নই। হীরক ছিল, হীরক আছে, একাধিক, কিন্তু আমি হীরক নই। চোর-চোর খেলা পুরোপুরি থামিয়ে বলে রাখি, আমি মৃন্ময়, যদিও মৃন্ময় আমার নাম নয়। মৃন্ময় আমার ইচ্ছের পুতুলের নাম। ইচ্ছেগুলো অমন রঙ পেলে, অমন আদল পেলে আমি নাম না দিয়ে কী করে পারি? ইচ্ছেগুলো অমন নাচলে আমি আঙুল কাঁপছে বলে একটানে সুতো গুটোই কী করে?

কিন্তু রাত্তির কম হল না। অমলা এখনো ফিরছে না কেন? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। দুই আস্ত পায়ের ওপর শরীরের আংশিক ভার রেখে, বারান্দার রেলিং ধরে সামনে ঝুঁকলাম। নিচে বাগান অন্ধকার। বাগানের কোণে মালীর ঘুপসি ঘরে আলো জ্বলছে। দামিনী আমার বাগানের মালীর মেয়ে, মৃত্তিকাবর্ণ, দুরন্ত স্বাস্থ্যবতী। তাকে আমি দূর থেকে দেখেছি, প্রায় রোজ দেখি।

ফটকের সামনের রাস্তায় প্রকাণ্ড কাল গাড়িটা নিঃশব্দে ফিরছে। অন্ধকারেও উইন্ড-স্ক্রীনের মধ্য দিয়ে অস্বাভাবিক সাদা একটা মুখ অস্পষ্ট দেখা গেল। সেদিকে হয়ত সাগ্রহে তাকিয়ে রইলাম। এখনো তো অন্তত রাত্তিরে একই ঘরে শয্যা।

মুদ্রামূল্যহ্রাস

অশোক মিত্র

অপব্যবহারে এবং বহুব্যবহারে পুরোনো পরিচিত কথার অর্থ ক্রমশ ক্ষয়ে আসে। নেতৃস্থানীয়দের কল্যাণে জাতীয় সংকট কথাটিরও এই হাল হবার উপক্রম। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় অহরহ, আমরা সংকটের শঙ্কাকাহিনী শুনে আসছি। পরিকল্পনার সংকট, প্রতিরক্ষার সংকট, খাদ্যসংকট, রাজ্যপুনর্গঠন সংকট, কাশ্মীর সমস্যা-সংলগ্ন সংকট: সংকটের আবর্তে আমাদের উথাল-পাথাল অবস্থা। বেলায়-অবেলায় সংকটের উল্লেখ করা হয় দেশবাসীদের সুসংবদ্ধ করে দৃঢ়চিত্তে কোনো সমাধানের দিকে এগোবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু, এটা হয়তো জাতীয় চরিত্রগত স্খলন, না নেতাদের, না সাধারণ লোকের, উৎসাহ বা অধ্যবসায় খুব বেশিদিন টিঁকে থাকে। গোড়ার দিকে বাগবিভূতির অভাব হয় না, কিন্তু কয়েকটা দিন গড়িয়ে গেলেই, কথার সঙ্গে কাজের, বলনের সঙ্গে চলনের আদৌ সম্বন্ধ থাকে না। আমাদের সবাইকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে, সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে, দেশে যা খাদ্য আছে তা সমস্ত প্রদেশের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে নিতে হবে, ইত্যাদি সব ভালো-ভালো কথা বছর ভরেই শোনা যায়। কিন্তু নেতারা যা বলেন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তার কোনো স্বাক্ষর থাকে না। স্বভাবতই সাধারণ লোকের উৎসাহ-উদ্দীপনাও দু' দিনেই মিলিয়ে যায়। প্রারম্ভোক্তিতে আমাদের জীবনীশক্তি ব্যয়িত; একমাত্র কথার নিষ্কাশনেই যেন কর্তব্যের কৈবল্যপ্রাপ্তি; তারপর যেন আর কিছু করবার-ভাববার নেই, শুধুই স্থবিরতা। কয়েক বছর বাদে হয়তো নতুন এক 'সংকট' মাথা চাড়া দেবে, তখন ফের উত্তেজনা, পুরোনো বিভঙ্গে নতুন করে আবার শব্দকল্পদ্রুমে অবগাহন।

এধরনের শূন্যকুম্ভবৃত্তি সত্ত্বেও দেশ এতদিন অবিকল আছে কারণ দেশের সাধারণ লোক অসম্ভব ধৈর্যশীল। তাছাড়া, পণ্ডিত নেহরুর ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক, অথবা আমরা চল্লিশ-পঞ্চাশ কোটি লোক-ঠাসা একটি মস্ত শক্তিশালী জাতি, এই কিংবদন্তীর জন্যই হোক, বিদেশীরাও আমাদের সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখেছে, আমাদের নানা উপায়ে সাহায্য করে কৃতকৃতার্থ বোধ করে এসেছে। দেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে পণ্ডিত নেহরু জনসাধারণকে আশার বাণী শুনিয়েছেন, পরিকল্পনার ফলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আর্থিক অবস্থা কী রকম আশ্চর্য মোড় নেবে তা নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন, দেহাতি লোকেরা চোখ গোল করে তা শুনেছে, মেনে নিয়েছে। ব্যক্তিত্বে মস্ত জাদুর ছোঁয়া ছিল পণ্ডিত নেহরুর, যখনই যা বলতেন, তন্মুহূর্তে লোকের মনে গভীর বিশ্বাস উদ্রেক করতো। আর্থিক উন্নতির হার তেমন-একটা উপলগতি নয়, কিন্তু আপাতত না-ই বা তা হলো; পণ্ডিতজী তো বলে দিয়েছেন, কয়েক বছর বাদে সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব বাড়বে, আপাতত অতএব, এসো, আমরা ধৈর্য ধরে থাকি। পণ্ডিতজীতে আস্থা রাখো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখছো না, ইতিমধ্যেই আমাদের রাজনৈতিক হাল কেমন বদলে গিয়েছে। কয়েক বছর আগেও ছিলাম নিচের-দিকে-মুখ-ফেরানো, পরাধীন জাতি, আর আজ চারদিকে আমাদের সম্মানঘোষণা, পররাষ্ট্র-নীতির সৌকর্যে কোথায় উঠে গিয়েছি আমরা, ইংরেজ-মার্কিন-রুশ সবাই আমাদের ভয়ে

থরহরিকম্প, সবাই আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক, আমাদের জন্য ওরা সর্বদা সব-কিছু প্রস্তুত করে রাখছে।

নিজেদের সম্বন্ধে অবশ্যই আমরা মস্ত ধারণা পোষণ করে আসছিলাম। এবং এটাও ঠিক, বিদেশীদের মধ্যে অনেকেরই আমাদের সম্বন্ধে ভয়ভীতিসন্ত্রাসের ভাব ছিল। তাই, যদিও আর্থিক অবস্থার তেমন দ্রুত উন্নতি ঘটছিল না, নানা ধরনের দৈনন্দিন কলহ জাতীয় জীবনে ছায়া ফেলছিল, এখানে ওখানে প্রায় প্রত্যহ ছোটোখাটো নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছিল, অতি অবলীলাক্রমে আমরা সব-কিছু তুচ্ছ করে এতগুলি বছর কাটিয়েছি। নেতারা মাঝে-মাঝে সংকটের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন, বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিজেরাই ক'দিন বাদে ভুলে গিয়েছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি ব্যাহত থেকেছে, তাহ'লেও তেমন-একটা অসুবিধা হয় নি, কারণ বিদেশী সাহায্য প্রতিনিয়ত আভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ করেছে।

এই নির্ঝঞ্ঝাট অস্তিত্বে প্রথম চিড় ধরলো ১৯৬২ সালে। বিদেশীরা যে এতদিন আমাদের সম্ভ্রম দেখিয়ে আসছিল, স্বীকার করে নেওয়া ভালো, সেটা, পণ্ডিত নেহরুর ভাবাদর্শের জন্য ততটা নয়, আমরা অতীব প্রতাপশালী জাতি, আমরা বিরক্ত হলে ওদের নিজেদেরই ক্ষতি হবার আশঙ্কা, এধরনের ধারণা ছিল বলেই। চীনেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আমরা মোটেই সুবিধে করতে পারি নি, আমাদের যতটা ক্ষমতাবান ভাবা গিয়েছিল আসলে মোটেই ততটা নই, এই খবর ছড়িয়ে পড়ার ফলে আমাদের সম্বন্ধে বিদেশে ভীতি-শ্রদ্ধার ভাব ভীষণভাবে হ্রাস পেলো। আরো-একটা কথা। বিদেশের নানা সংবাদপত্র ঘাঁটলে বেশ বোঝা যায়, যে-কারণে চীনেদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বাধলো, সেই সীমান্ত-বিরোধের ব্যাপারে বাইরের অনেকেই মানতে রাজি নয় যে আমাদের যুক্তিতে শতকরা একশো ভাগ ন্যায়, চীনেদের যুক্তিতে একশো ভাগ শূন্য। মোহমুক্তির এটাও একটা কারণ।

বাইরে আমাদের সম্মানহানির সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরেও ঋতুবদলের পালা। হঠাৎ প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়ের বহর বছরে পাঁচশো কোটি টাকার মতো বেড়ে গেলো। কিন্তু, শত উদ্বোধন-আহ্বান সত্ত্বেও, জাতীয় সঞ্চয়ের মাত্রা রাতারাতি ঊর্ধ্বগতি হবার নয়। তাই গত কয়েক বছর ধরে দেশের লোকের হাঁসফাঁস অবস্থা, সরকারি খাতে খরচ বেড়ে-বেড়েই চলেছে, আয় বা উৎপাদন তুলনায় বাড়ে নি, জিনিশপত্রের দাম অতএব যে হু-হু হারে চড়বে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হলেও তা সব খরচ মেটাবার পক্ষে প্রতুল নয়, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বিদেশী উপকরণ-সরঞ্জামের চাহিদাও বিস্তৃত হয়েছে, সুতরাং ১৯৬৩ সাল থেকে আমাদের পরমুখাপেক্ষা ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। অদূর অতীতে আমরা যে বৈদেশিক সাহায্য পেতাম তা গ্রহণে গ্লানির ভাব মোটেই ছিল না, যাঁরা সাহায্য দিতেন তাঁরাও সমীহ করেই দিতেন; অন্যপক্ষে, ইদানীং যে-সাহায্য আসছে, তার সূত্রে কেমন এক অসম সম্পর্ক—দাতারা যেন দয়াপরবশ হয়ে দিচ্ছেন, এবং ভিখিরীর মন্যতা নিয়ে আমরা তা গ্রহণ করছি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু তা হলেও আমরা কোনোক্রমে টিঁকে ছিলাম। অপরের সাহায্য যাচ্ঞা করে দিনযাপন চলছিল, কিন্তু অন্তত আশা ছিল দেশের উৎপাদন ও সঞ্চয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেই এ-অবস্থার নিরসন ঘটবে। ১৯৬৫ সালের ঘটনাবলী সমস্ত হিশেব তছনছ করে দিয়েছে। তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে লিপ্ত হলাম আমরা। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে যে-ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে, তার সম্পূর্ণ সালতামামি সম্ভব নয়; কেউ বলেন ঐ এক মাসে তিন-চারশো কোটি টাকার মতো অস্ত্রসরঞ্জাম-ঘরবাড়ি-ফসল নষ্ট

হয়েছে, কেউ বলেন আরো বেশি। তার চেয়েও যা মস্ত সমস্যা হয়ে দেখা দিল, পাকিস্তানের প্রতি আমাদের বিরূপভাব পশ্চিমের দেশগুলি মোটেই পছন্দ করে না, সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধবার সঙ্গে-সঙ্গে তারা সবাই আমাদের সাহায্য দান থেকে বিরত হলো। যা একবার বন্ধ হয়ে যায়, তাকে ফের চালু করতে বহু কাঠখড় প্রয়োজন। যুদ্ধ থামলো, তাসখন্দে সন্ধি স্থাপিত হলো, কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলির অর্থভান্ডার আপাতত অনুন্মুক্তই রইলো।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখন আর কোনো মোহ নেই, ইদানীং যে-সাহায্য আসছে তাতে সূক্ষ্ম হিশেবের অনুপাত তাই ক্রমশ বর্ধমান। যে-যুক্তির নির্ভরে গত দশ-বারো বছর ধরে পশ্চিমের দেশগুলি আমাদের ঋণ দিয়ে এসেছে তার মূল সূত্র হলো : ঋণদানের ফলে ভারতবর্ষে বিনিয়োগ বাড়বে, জাতীয় আয়ের প্রগতি ক্ষিপ্রতর হবে, সুতরাং অচিরে একদিন সঞ্চয়ক্ষমতাও বাড়বে, তখন বৈদেশিক সাহায্যরও প্রয়োজন ফুরোবে। কিন্তু, বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে, জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার এখনো সামান্য, এবং সঞ্চয়ের বহরও প্রায় পুরোনো বিন্দুতে স্থিত। মার্কিন সরকার এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, তাঁরা নিজেদের দেশের লোকদের উপর কর চাপিয়ে সেই সংগৃহীত অর্থ ভারতবর্ষে সাহায্য হিশেবে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু এ তো কুবেরের ধন নয়, অনির্দিষ্ট কাল ধরে সাহায্য পাঠানো সম্ভব নয়। এত সাহায্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ দ্রুত এগোতে পারছে না। তার মানে বিদেশ-থেকে পাওয়া অর্থের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। মার্কিনিরা ভিয়েৎনাম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যুদ্ধের গহ্বরে তাদের সামর্থ্যের একটা বিরাট অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের অন্যত্র অর্থনৈতিক সাহায্যের বহর এমনিতেই হ্রাস পাওয়ার দিকে। অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি প্রধানত সাহায্যদান করে থাকে মার্কিন চাপে; দলপতির দাক্ষিণ্যে ভাঁটা পড়লে পশ্চিম জার্মানী বৃটেন ইত্যাদি দেশও হাত গুটিয়ে আনবে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যতই অবনতির দিকে যাচ্ছে, মার্কিনিদের পরমত-অসহিষ্ণুতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবো, তারা অথচ আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের পরামর্শ নেবে না এটা কিছুতেই হতে দেওয়া চলে না : এরকম একটা জঙ্গি মনোভাব মার্কিন সরকার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের আচারব্যবহারে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থ-নীতির গতিক্রম সম্বন্ধে পশ্চিমে একটা প্রচ্ছন্ন উষ্মার ভাব বহুদিন থেকেই জমা হচ্ছিল। আমাদের সংবিধানের সূত্র ধরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মারফৎ কতগুলি বিশেষ অর্থ-নৈতিক সিদ্ধান্ত রূপায়নের চেষ্টা চলেছে দেশে গত পনেরো বছরে। শুধু জাতীয় আয়ের সামগ্রিক উন্নতিই উদ্দেশ্য নয়, পরিকল্পনার সাহায্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য কমাতে হবে, বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থার উচ্চাবচতা ঘোচাতে হবে, ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে আমাদের এগোতে হবে: এ সমস্ত শর্তই আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীকারভুক্ত ছিল। লক্ষ্য-পূরণের জন্য আমরা তাই মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর রাষ্ট্রীয়করণের সংকল্প গ্রহণ করেছি, কিছু-কিছু শিল্পে সরকারি খাতে নতুন বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছি। শিল্পের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়ার এবং উৎপন্ন সামগ্রীর বণ্টন তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মৌলিক জিনিশ বেচাকেনা থেকে কেউ অযৌক্তিক লাভ যাতে না করতে পারে, এবং ন্যায্য মূল্যে শিল্পপ্রাণগত জিনিশ যাতে সকলের কাছে পৌঁছুতে পারে, তার জন্য এই ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের পূর্বসম্মতি ছাড়া কোথায়ও কোনো বৃহৎ শিল্প উদ্যোগ করা যাবে না, এই অনুশাসনেরও একই উদ্দেশ্য।

সংবিধাননির্দিষ্ট নীতিপালনে অনেক স্খলন-বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে, বণ্টনের অসাম্য

ঘুচছে না, সমাজতন্ত্র পরাহত থাকছে, আমাদের অনেকেরই মনে এরকম সংশয় পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। কিন্তু বিদেশীদের আপত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমের বন্ধুদের বক্তব্য, নিয়মের নিগড়ে আমাদের দেশের ধনব্যবস্থা বাঁধা পড়েছে, চাহিদার ইশারায় সাড়া দিয়ে যে-ধরনের সচ্ছল উন্নতি অন্যত্র সম্ভব হয়েছে তা ভারতবর্ষে অসম্ভব, যে-যে জিনিশের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে—সিমেন্ট, কয়লা, কাগজ বা অন্য-কিছু—লাভের সম্ভাবনা সেখানে কম, সুতরাং নতুন বিনিয়োগ হয় নি, উৎপাদনে ভাঁটা পড়েছে, দাম চড়া থেকেছে, প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। যাঁদের বিনিয়োগ করার মতো টাকা আছে, তাঁরা সেই টাকা অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় শিল্পে খাটিয়েছেন, প্রচুর লাভ করেছেন, সুতরাং বড়োলোকদের বেশি বড়-লোক হতে না-দেওয়ার সংকল্পও ব্যাহত হয়েছে। সীমিত চাহিদার সঙ্গে সূত্রগত উৎপাদনক্ষমতা চার কি আরো বেশি সংস্থার মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনে সুষ্ঠুতা আসে নি, দাম বেশি থেকেছে। অনির্দিষ্ট দামে সার বিক্রি করবার অনুমতি না পাওয়ায় তেমন কেউ উৎপাদন বাড়াবার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন নি, তাই কৃষির উন্নতিও এক জায়গায় থমকে থেমেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন সরকারের সুদৃঢ় মত, দ্রুত আর্থিক প্রগতি ও সমাজতন্ত্র দুটো একসঙ্গে সম্ভব নয়, একটা না-ছাড়লে অপর লক্ষ্যও আয়ত্তের বাইরে থাকবে। তাছাড়া, উৎপাদন না-বাড়লে উৎপাদনের ব্যয় কমবে না, সুতরাং দেশজ জিনিশ রপ্তানী করতে ভীষণ বেগ পেতে হবে, এবং বিদেশজাত জিনিশের আপেক্ষিক মূল্যহ্রস্বতার জন্য আমদানীর চাপও অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রবল থেকে যাবে। এই অবস্থায় জাতীয় আয় ছাপিয়ে ব্যয় উপচে উঠবে, কোনোক্রমেই দেশ পরনির্ভরতা কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে না।

মৃদুমন্দস্বরে অনেক দিন ধরেই ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ আমাদের সরকারকে অনুযোগ জানিয়ে আসছিলেন, নানাভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিল আমূল অর্থ-নৈতিক সংস্কার সাধিত না হলে সাহায্যের পরিমাণ অটুট রাখা মুস্কিল হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রত্যক্ষ হুমকি দেওয়াটা নম্রতা-শিষ্টতায় বাধছিল। পাকিস্তানী যুদ্ধের সুযোগে যা প্রত্যক্ষভাবে করা সম্ভব হতো না, তা হাঁসিল করার তির্যক সুযোগ ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন সরকার হাতের মুঠোয় পেলেন। সে-সুযোগের তাঁরা সদ্ব্যবহার করলেন। খরচ বেড়েছে, যুদ্ধে ক্ষয় হয়েছে, বিদেশী তৈজসের অভাবে অনেক শিল্পে ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা, মুদ্রা-স্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়তে শুরু করেছে, অর্থব্যবস্থা এলিয়ে পড়ার উপক্রম। নেতারা কিছুদিন অবশ্য চেঁচালেন বিদেশী সাহায্য বাদ দিয়েই আমরা চলবো, স্বয়ম্ভরতায় দীক্ষা নেবো, ব্যয় কমিয়ে আয়ের গণ্ডির মধ্যে এনে ফেলবো, নিজেরা না-খেয়ে না-পরে রপ্তানীর ব্যবস্থা করবো। কাজের বেলায় কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উৎসাহ কেমন মীইয়ে গেলো। যে-মুহূর্তে খবর বেরোলো যে, বোঝার উপর শাকের আঁটি, চলতি বছরে খাদ্যশস্য আগের বারের তুলনায় দেড় কোটি টনের মতো কম হবে, এবং মার্কিন দেশ থেকে খাদ্যভিক্ষা ছাড়া উপায়ান্তর নেই, যুক্তিতর্কের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেলো, স্বয়ম্ভরতায় যাঁরা ঘোর বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা অনেকেই আপাতত ঘোর নাস্তিক বনে গেলেন। আসলে এঁরা কেউই ঝুঁকি নিতে রাজি নন। বিদেশী সাহায্য যথাসম্ভব কম গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা সম্ভব, এমনকি প্রতিরক্ষার দায় মেটানোও কষ্টকর নয়। কিন্তু এই দায়িত্ব পূর্ণ করতে হলে সমাজের কাঠামো, করনীতি, শিল্পব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা অনেক-কিছুই বদলে নিতে হয়, জাতীয়

আয়ের ভোগ্যাংশে কামড় বসাতে হয়, বিশেষ-এক সংগঠিত-সম্মিলিত জাতীয় আবেগ উদ্বোধন করতে হয়। মনে হয় সেই সাহস বা উৎসাহ মরুপথে হারিয়ে গেছে।

বাইরের চাপে তাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি। পণ্ডিত নেহরু বেঁচে থাকলে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমবশত বিদেশীরা হয়তো এতটা ছেঁকে ধরতেন না, কিংবা হয়তো আমাদের আত্মবিশ্বাসের ভাণ্ড এতটা শূন্যতায় গিয়ে ঠেকতো না, এবং, অন্তত আরো কিছুদিন হয়তো, চাপে পড়ে কাবু হতে আমরা অস্বীকার করতাম। কিন্তু ঋতুবদল হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ধৃতি অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে গত একবছর-দু'বছরে। রাজনীতির হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে, কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা এবং প্রতাপ বেড়ে চলেছে। অথচ দেশচালনার প্রধান দায়িত্বগুলি এখনো কেন্দ্রকেই নিতে হয়। উন্নয়ন-প্রকল্পের টাকা জোগাতে হয় কেন্দ্রকে, প্রতিরক্ষার রসদ সংগ্রহও কেন্দ্রের দায়িত্ব, প্রতি বছর রাজ্য সরকারগুলির গতানুগতিক অর্থাভাবও কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ণ করতে হয়। যে-বস্তুর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, বৈদেশিক মুদ্রা, কেন্দ্রীয় সরকারকেই উদ্যোগী হয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়, অন্যথা সব-কিছু নিশ্চল হবার আশঙ্কা। খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, এবং লোকে না-খেয়ে মারা গেলে, প্রতিক্রিয়ার আগুনে পুড়ে ছাড়খাড় হবার আশঙ্কা সবচেয়ে আগে কেন্দ্রীয় সরকারের।

এতগুলি দায়িত্ব যেখানে, পর্যাপ্ত সংগতি না-থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। অন্ধ্র কিংবা মাদ্রাজের উদ্বৃত্ত চাল যদি রাজ্যসরকারদ্বয় কেরল বা বাংলা দেশের জন্য ছাড়তে রাজি না-হন, কেন্দ্রীয় সরকারকেই তাহলে উদ্যোগী হয়ে বাইরে থেকে আমদানীর ব্যবস্থা করতে হয়। রাজ্য সরকারগুলি যদি পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে অঙ্ক পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বিদেশে যেতে হয়। খাদ্যশস্য-সংগ্রহ এবং রাজস্ব-সংগ্রহ, এই উভয়ান্বেষণে কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বছর প্রতি পদে রাজ্য সরকারদের দ্বারা ব্যাহত হয়েছেন। দেশের ভিতর থেকে খাদ্য কিংবা কর সংগ্রহে অনেকরকম বাধাবিপত্তি, রাজনৈতিক কলহ-কলরোল; কী দরকার তাহলে এই ঝামেলার মধ্যে গিয়ে; তার চেয়ে বরঞ্চ বিদেশে এক মন্ত্রী ও দুই আমলাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক; তাঁরা তিন সপ্তাহের মধ্যেই পর্যাপ্ত খাদ্য ও পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করে ফিরতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-দের চটাবার সাহস নতুন দিল্লিতে উপস্থিত কারো নেই; ক্রীড়নকমন্যতার বশীভূত হয়ে পাথেয়-অন্বেষণের তাগিদে বিদেশী দাক্ষিণ্যের জন্য হেলে পড়া তাই প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যেতে চায়।

এই অবস্থার চক্রেই গত জুন মাসের মুদ্রামূল্যহ্রাস। প্রশাসনিক কাঠামোয় নানা খুঁত, জিনিশপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাবার মতো দুর্জয় সাহস সরকারের নেই। প্রতিরক্ষার ভার কমানো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে সম্ভব নয়। রাজ্য সরকারগুলির কাছে সাহায্যভিক্ষা করা বৃথা, তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক সমস্যাদিতে ডুবে আছেন। খাদ্যের বণ্টনব্যবস্থা সুষ্ঠু নয়, বিদেশী খাদ্যশস্য বন্ধ হয়ে গেলে যে-কোনোদিন এখানে-ওখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কাঁচামালের অভাবে কলকারখানা বন্ধ হবার আশঙ্কা, সুতরাং অচিরে কিছু বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিদেশীরা সাহায্য না করলে, কী জানি, হয়তো সারের উৎপাদনও সম্প্রসারিত হবে না, কৃষিকর্ম পর্যন্ত যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

ভয়, আতঙ্ক, সেই সূত্র ধরে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ উভয়বিধ : আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের 'আদর্শগত গোঁড়ামি' বিদেশীদের নির্দেশে ক্রমশ ঝেড়ে ফেলেছি। শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আস্তে-আস্তে সরকার শিথিল করে দিচ্ছেন, মৌল দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণের সূত্রটি সম্প্রতি অবহেলা করছেন, সারোৎপাদন এবং বণ্টনে বিদেশী সংস্থাগুলির জন্য নানা সুযোগসুবিধা করে দিচ্ছেন, এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রস্তাবিত অঙ্ক আনুপাতিকভাবে সঙ্কুচিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী যা-ই বলুন, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আদর্শের নিগড় হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে।

কিন্তু অল্পে সুখ নেই, আমাদের বিদেশী বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধের তালিকা উত্তরোত্তর বেড়েই গেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সংস্কারের অঙ্গ হিশেবে টাকার বহির্মূল্যহ্রাসের দাবি তীব্রতর করে আনছিলেন। মুদ্রামূল্যহ্রাসের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলি গত তিন-চার বছর ধরে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে বহুবার বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং ভারত সরকারের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বিদেশী সরকারের যুক্তি : ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গত কয়েক বছরে অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, ফলে রপ্তানী ব্যাহত হয়েছে, এবং আমদানীর চাহিদা বেড়েছে। আমদানীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য অবশ্যই আসছে, কিন্তু তাতেও সমস্যা ঘুচছে না, সরকার আমদানী নিয়ন্ত্রণপ্রথা প্রচলন করতে বাধ্য হয়েছেন। এই প্রথায় গলদ অনেক : অকারণ দেরি ঘটছে, আমলাদের সিদ্ধান্ত-বিচারে অদ্ভুত-কিম্ভূত ভুল দেখা দিচ্ছে, নানা দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমদানী জোর করে চেপে রাখার ফলে অবশ্য বহু নতুন শিল্পের উদ্গম হচ্ছে; যেহেতু দেশে চাহিদা অঢেল, যে-কোনো নতুন তৈরি জিনিশ প্রায় যে-কোনো দামে বিক্রি হচ্ছে, উৎপাদকের লাভও হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু এভাবে বিনিয়োগশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদনশৈলীতে সুষ্ঠুতা আসছে না, এরকম চলতে থাকলে তাই রপ্তানী বৃদ্ধির আশা পরাহত। বরাবরই বিশ্ব ব্যাঙ্কের মত, মুদ্রামূল্যহ্রাস পেলে আমদানীর চাহিদা স্বতই কমে যাবে, সেদিকে সাশ্রয় হবে; অন্যদিকে রপ্তানী থেকে যেহেতু লাভের বহর সম্প্রসারিত হবে, পাট, চা, লোহা, কয়লা, কার্পাসবস্ত্র, তৈলশস্য কিংবা দেশে হালে-তৈরি-শুরু-হওয়া যন্ত্রপাতি বা বৈদ্যুতিক অথবা রাসায়নিক সরঞ্জাম ইত্যাদি অনেক বেশি পরিমাণে বিদেশে চালান হবে। যদিও শুরুতে বিদেশী পণ্যনির্ভর উৎপাদনজাত জিনিশপত্রের দাম বাড়বে, এই মূল্যবৃদ্ধি তেমন দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না। রপ্তানী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা একটু আলগা করে দিলেই জাতীয় উৎপাদনে প্রাচুর্যের জোয়ার আসবে, সুষ্ঠুতা আসবে, সেই সুষ্ঠুতা থেকে আরো বেশি রপ্তানী, যে-রপ্তানী থেকে আরো বেশি উৎপাদন। এমন ধাপে-ধাপে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই মূল্যমান স্থিতিশীল হবে।

যুক্তিগুলি পুরোনো, এবং ভারত সরকার এ-বছরের মে মাস পর্যন্ত এককাঁড়ি প্রতি-যুক্তি নিয়ে লোকসমক্ষে হাজির হচ্ছিলেন। যেমন, মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে আমদানী কমবে এ-আশা অমূলক, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই বৈদেশিক পণ্যের চাহিদা ন্যূনতম করে এনেছি, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ফলে কোনো অদরকারি বিদেশী জিনিশই আসতে দেওয়া হয় না, সুতরাং আমদানী আরো কমাবার প্রশ্নই ওঠে না, সে-চেষ্টা করলে ভীষণ দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেবে। রপ্তানী বৃদ্ধির আশাপোষণও তেমন সমর্থনযোগ্য নয়, অন্তত

ন'মাস-ছ'মাসের মধ্যে রপ্তানী বাড়বার কোনো সম্ভাবনাই নেই। যে-যে তৈজসের উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বের বাজারে তাঁদের কোনোটার উপরই একচেটিয়া বাণিজ্যের আধিপত্য আমাদের নেই, সুতরাং মুদ্রামূল্যহ্রাস হলেও বৈদেশিক মুদ্রায় চটের কি চায়ের কি কার্পাসবস্ত্রের দাম পড়বে না; বড় জোর যা হতে পারে এসমস্ত জিনিশপত্র বিদেশের বাজারে বিক্রি করলে স্বদেশী মুদ্রায় আমাদের ব্যবসাদারদের লাভের পরিমাণ বাড়বে, সুতরাং তাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহী হবেন। কিন্তু এখানেও সমস্যা থেকে যায় : আমরা বাড়তি উৎপাদনে সক্ষম হলেই বাড়তি রপ্তানী করতে পারবো। পাটের জন্য আমরা অনেকটাই নির্ভর করি পাকিস্তান ও শ্যামদেশের উপর; মুদ্রামূল্যে-হ্রাসের ফলে বিদেশ-থেকে-আনা পাটের দাম বাড়বে, চটের উৎপাদন তাতে বরঞ্চ ব্যাহতই হবে। এমনকি কার্পাসবস্ত্র উৎপাদনের জন্য পর্যন্ত আমরা মিশর কি মার্কিনমুলুক থেকে উৎকৃষ্ট তুলো আমদানী করি, তারও তো দাম বাড়বে। চায়ের ফলন এক নিমেষে বাড়ানো সম্ভব নয়; প্রকৃতির করুণা থাকলেও, আজ যদি উৎপাদনবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তাহলে চায়ের ফসল বাড়বে হয়তো তিন বছর বাদে। উৎপাদন, পরিবহন এবং পোত-ব্যবস্থার উন্নতি না ঘটলে লোহার রপ্তানী বাড়ানো অসম্ভব। তাছাড়া, যতদিন কৃষির উন্নতি হচ্ছে না, দেশের তৈলবীজ বেশি করে বিদেশে পাঠানোর যৌক্তিকতা নিয়ে মস্ত তর্ক বাধবে। আমাদের নতুন-তৈরি-করতে-শেখা যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক সরঞ্জামের দাম মুদ্রামূল্যহ্রাসে হয়তো বিদেশি মুদ্রায় কমবে, কিন্তু দাম যে-পরিমাণ কমালে বিদেশের বাজারে বিক্রি সম্ভব, তার জন্য হয়তো একটা বিষম হারে মুদ্রামূল্যহ্রাস প্রয়োজন, কিন্তু তা করতে গেলে আমাদের অন্য অযুত অসুবিধা।

এই ক'বছর তাই ভারত সরকার প্রাণপণে প্রতিবাদ করে বলছিলেন, মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে আমদানীও কমানো যাবে না, রপ্তানীও তেমন বাড়বে না, সুতরাং কেন। বিশেষ করে, মুদ্রামূল্যহ্রাস ঘোষণার অব্যবহিত পরে একদফা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি অবধারিত। যদি উৎপাদন চট করে না বাড়ে, তাহলে জিনিশপত্রের দাম পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আরো ঊর্ধ্বগতি হবে, এবং সাধারণ লোকের কষ্টের সীমা থাকবে না। আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অনেক দুর্বলতা, একবার দাম-বাড়া শুরু হলে তা ঠেকিয়ে রাখতে সরকারের নাভিশ্বাস উঠবে। আরো একটা সমস্যা আছে। মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে প্রতি বছর পূর্বকৃত বৈদেশিক ঋণের ফেরৎ কিস্তি ও সুদের হিশেব টাকার অঙ্কে অনেকটা বেড়ে যাবে; আরো যা বাড়বে তা সরকারি খরচের বহর—কারণ সরকারি বিনিয়োগে বিদেশী তৈজসের দরকার, প্রতিরক্ষার জন্যও বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র প্লেন ইত্যাদি প্রয়োজন, নানা ইতস্তত ব্যয়ের ব্যাপার তো আছেই। অতএব সরকারি খাতে খরচের মাত্রা হঠাৎ চড়বে, এবং আয়ব্যয়ের হিশেব মেলাতে সরকারকে অতিরিক্ত রাজস্বের কথা ভাবতে হবে। যেখানে এমনিতেই জিনিশপত্রের দাম বেড়ে চলেছে, এবং দৈনন্দিন নানা অভাব-অভিযোগ, করবৃদ্ধির প্রস্তাবে লোকে মারমুখো হয়ে আসবে।

মুদ্রামূল্যহ্রাস প্রস্তাবের স্বপক্ষে-বিপক্ষে উত্থাপন করা এই যুক্তিগুলির সারসত্তা বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের চাপ উদগ্র হবার আগেও যা ছিল, পরেও ঠিক তাই। এ বছরের মে মাস পর্যন্ত ভারত সরকার যে-যুক্তিগুলি খণ্ডন করতেন, জুন মাসে থেকে ঠিক সেগুলিই বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়ে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরছেন। মুশকিল হলো মুদ্রামূল্যহ্রাসের মতো একটা ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা সম্ভব নয়। এমন বলা চলে না যে একদিন-দুদিনের জন্য যাচাই করে দেখবো টাকার বৈদেশিক মূল্য কমিয়ে দিলে

দেশের লাভ হয় কি ক্ষতি হয়; লাভ হলে সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকবে, ক্ষতি হলে পুরোনা মূল্যমানে প্রত্যাবর্তন করবো। জুন মাসের ঘোষণার পর প্রায় তিন মাস হলো। দেখে-শুনে মনে হয়, ভারত সরকারের প্রাক্তন আশঙ্কাই ঠিক, রপ্তানী তেমন বাড়বে না, এবং জিনিশপত্রের দাম ক্রমশই বেড়ে চলবে। সামান্য পরিমাণ রপ্তানী বাড়লে কাজ হবে না। যে-হারে টাকার বিদেশী মূল্য হ্রাস করা হয়েছে, তার আনুপাতিক হিশেবেরও বেশি রপ্তানী না-হলে কোনো লাভ নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পুরোনো রপ্তানী অব্যাহত রাখার জন্যই এখন কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সরকার সাহায্য বিলোচ্ছেন। বিদেশজাত খাদ্যশস্য, কেরোসিন ইত্যাদি জিনিশের দাম বাড়লে সাধারণ লোকের অসম্ভব কষ্ট হবে, সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুরোনো দামে এ-সমস্ত জিনিশ বণ্টন করে ক্ষতির ভার বহন করবেন। কিন্তু সরকারি খাতে এই ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরিক্ত রাজস্বের দরকার হবে। আর যা মস্ত ক্ষতি, চতুর্থ পরিকল্পনার পরিসর বাধ্য হয়েই এবার সংকুচিত করে আনতে হয়েছে। দেখে-শুনে মনে হয় না সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারবেন, ফলে দ্রব্যমূল্য অচিরে আরো বাড়বে। সব মিলিয়ে চারদিকে এক আর্তির অবস্থা।

এক হিশেবে অবশ্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের লোকেরা ঠিক কথা বলেছিলেন, এখন থেকে হয়তো আমাদের আমদানীর বহর সত্যি-সত্যিই কমবে। কিন্তু তা কমবে যেহেতু বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাবে, মুদ্রামূল্যহ্রাসের সঙ্গে তার কোনো কার্যকারণসম্পর্ক নেই। এবং এখানেই ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের শোকান্তিক দিকটা প্রকাশ পাচ্ছে। সরকারের দুর্বল ভয়-খাওয়া অবস্থা। আতঙ্ক ছিল বিদেশীদের কথা মেনে টাকার মূল্য কমিয়ে না-দিলে হয়তো সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে, চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ অনারব্ধ থাকবে, কল-কারখানা বন্ধ রাখতে হবে, জিনিশপত্রের দাম ভীষণ চড়বে। সুতরাং মূল্যহ্রাস ঘোষণা করা হলো, আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আমূল রদবদলের সূত্রপাত করা হলো, কিন্তু আখেরে লাভ হলো না কিছুই। যদিও বিদেশীরা কৃপা করে কিছু-কিছু পয়সাকড়ি ফের দিতে শুরু করেছেন, ১৯৬০-৬৪ সালের তুলনায় সাহায্যের অঙ্ক ভীষণ কমে এসেছে। এখন থেকে যা সাহায্য আসবে, আশঙ্কা হয় নির্দেশ দেওয়া থাকবে তার একটা বড়ো অংশ যেন ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সম্প্রসারণে ব্যয় করা হয়। এই ব্যবস্থায় না-বাড়বে জাতীয় সঞ্চয়, না-বাড়বে আমাদের স্বয়ংভরশীলতা, না-প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র।

স্বীকার করে নেওয়া ভালো, আপাতত ঘোর অন্ধকার। মুদ্রামূল্যহ্রাস-সম্পর্কিত ঘটনাবলী থেকে একটা শিক্ষা স্পষ্ট হয়ে এসেছে, যদিও আমাদের নেতৃস্থানীয়রা তা মেনে না-ও নিতে পারেন। জাতির নিহিত সমস্যাগুলির কোনো ছুটকো-ছাটকা সমাধান সম্ভব নয়; সঞ্চয় বাড়াতে হলে দেশের লোককে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে, উৎপাদন ও রপ্তানী বাড়াতে হলে আমাদের ক্রিয়াকর্মে সুষ্ঠুতা আনতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকাদির কথা ভেবে যদি অপ্রিয় কর্তব্যপালনে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই, যদি বিদেশীদের কাছে নীতিসমর্পণ করে সস্তায় মুক্তি উপায় খুঁজি, তাহলে জাতীয় উন্নতি পরাহত। আমাদের দায়ের ভার বাইরে থেকে কেউ বইতে আসবে না, যদিই বা আসে প্রতি-দানে আমাদের আত্মাকে, চিন্তাকে, স্বাধীন সত্তাকে বিকিয়ে দিতে হবে।

শুভ বিবাহ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রথম খবরটা খুবই ফলাও করে কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিল—আপনারা অনেকেই পড়েছেন। পাঁচ ছ বছর আগের ঘটনা হলেও কারও কারও মনে আছে নিশ্চয়। কারণ সে সময় যথেষ্ট ঢাকঢোল বাজানো হয়েছিল ঘটনাটা নিয়ে। বাংলা দৈনিকের যে নিজস্ব সংবাদদাতারা সংবাদের জায়গায় কাহিনী পরিবেশন করার পক্ষপাতী, তাঁদের পক্ষে এইসব খবর দৈবপ্রেরিতের মতোই। এসুযোগ তাঁরা ছেড়ে দেবেন তা সম্ভব নয়। বেশ কয়েকদিন ধরেই সংবাদসাহিত্য-জগতের নায়িকা হয়ে ছিলেন মানসী সোম। তাঁর জীবনী, তাঁর বাবা-মার জীবনী, তাঁদের তাবৎ ইতিহাস, কর্মস্থলের সহকর্মিণী মায় সেখানকার দাসীদের পর্যন্ত বিস্তারিত বিবৃতি ছাপা হয়েছিল। সবই কাব্য ও আবেগময়, সবই নাটকীয়—সুতরাং ভুলে যাওয়ায় কোন কারণ নেই। ছবিও ছাপা হয়েছিল—একাধিক; বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন ভঙ্গীর।

দ্বিতীয় খবরটি খুব সামান্য—সম্প্রতি বেরিয়েছে। চোখে পড়ার কোন কারণ নেই। সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের শেষে কিম্বা বাজার দরের পাদপূরণ হিসেবে ছাপা হয়েছিল কোন কোন কাগজে। বড় দু একটা কাগজে আদৌ ছাপা হয় নি। কিন্তু সে খবরের কথা পরে বলছি। আগেরটা আগে সেরে নিই। তবে তারও আগে নায়কের একটু পরিচয় বোধ হয় দেওয়া দরকার। পরিচয় দেবার মতো বিশেষ কৃতিত্ব ছিল না, সেটা পরে অর্জন করল সে। সুবিমল দত্ত নাম, আঠারো উনিশ বছরের ছেলে, বছর দুয়েক আগে ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করার পর ও-পাট চুকিয়ে দিয়ে রকবাজী করত—এই তার যা পরিচয়। বাবা রেলের টিকিট কালেক্টার—অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বেলেঘাটায় দুখানা ঘর ভাড়া করে থাকতেন। টিকিটের অনুকল্প পয়সা, দুধ মাছের ভাগ ইত্যাদি কুড়িয়ে বাড়িয়েও যা আয় তাতে ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা দেওয়াও কষ্টকর—প্রাইভেট টিউটার রেখে পড়াতো তো কল্পনার বাইরে।

এর মধ্যেই একদিন বন্ধুতে বন্ধুতে রেষারেষির ফলে একটি স্কুলের ছাত্র খুন হল, রাস্তার ওপর, সন্ধ্যার সময়—অনেকের চোখের সামনে। সে ঘটনার কথাও কাগজে বেরিয়েছিল, আপনারা দেখে থাকবেন। কেউ বলল মেয়ে নিয়ে আকচাআকচি, কেউ বা অন্য কারণ দিল। কিন্তু কারণ যাই হোক সুবিমল আর তার ছোট ভাই সুশান্ত সেই খুনের দায়ে ধরা পড়ল। ওদের বাবা স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে মামলা লড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন সুবিমল বাধা দিল। জীবনে এই প্রথম বোধহয় বাবার অবস্থা উপলব্ধি করল সে। প্রায় হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, বহুলোক সাক্ষী, ছাড়া পাবে না কিছুতেই, মাঝখান থেকে বাবা সর্বস্বান্ত হবেন। এখনও দুটি ছেলের পড়ানো বাকী, তিনটি মেয়ের বিয়ে।

সে নিজেই অপরাধ স্বীকার করল। হ্যাঁ, অনেকদিন ধরেই রাগ ছিল ছেলেটার ওপর, বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না। সেদিনও আঁতে-ঘা-দেওয়া এমন একটা কথা বলেছিল যে রাগ সামলাতে পারে নি আর। লোহার ডাণ্ডাটা, ওদের পাশের বাড়ির ভাঙ্গা জানলার গরাদে—নিয়েই এসেছিল, প্রস্তুত হয়ে। ছোট ভাই জানত না কিছু,

এমনি গোলমাল বেধেছে মনে করে ছুটে এসেছিল, সুবিমলই খুনটা করেছে। মারবে ঠিক ভাবে নি, রাগের চোটে আঘাতটা মারাত্মক হয়ে গেছে। ইত্যাদি—

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই কথা বলে গেল সে। সুতরাং মামলা আর চালাবার কিছু ছিল না। আদালত সবদিক বিবেচনা করে ফাঁসির হুকুম দিলেন না—তাই বলে খুব দয়াও করলেন না। কোল্ড্ ব্লাডেড্ মার্ডার—আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে এসে খুন করেছে—যাকে খুন করেছে তার মাত্র ষোল বছর বয়স, সে এমন কোন প্রোভোকেসন-এর কারণ হতে পারে না—যার জন্য এতখানি রাগের কোন যথার্থ কৈফিয়ত খুঁজে পাওয়া যায়; ভাল ছেলে, বিপুল সম্ভাবনা তার সামনে পড়েছিল, তার কথা চিন্তা করলে বিন্দু-মাত্রও দয়া দেখানো চলে না; এই ধরনের অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন হাকিম।

পাড়ায় একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। যে খুন হয়েছে সে সুশান্তরই বন্ধু, এক ক্লাসে পড়ত। তার ওপর সুবিমলের রাগের কী কারণ থাকতে পারে? সুবিমলের নিজেরই বিরাট বন্ধুর দল ছিল, ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোন প্রয়োজন ছিল না। সবাই বলল—ছোট ভাইকে বাঁচাতে আর বাপকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজর ওপর এই দায় তুলে নিয়েছে সে। এই একটি ঘটনায় পাড়ার বখা এবং রকবাজ ছেলে সুবিমল 'হিরো' হয়ে গেল। সকলেই বললেন, কার মধ্যে যে কী কোয়ালিটীজ থাকে তা কেউ বলতে পারে না, এমনি এক একটা চরম পরীক্ষার মুহূর্তে বেরিয়ে আসে, তখন আসল মানুষটাকে চেনা যায়। কেউ কেউ এমনও বললেন, এই ঘটনাই যদি শরৎ চাটুয্যে লিখতেন তোমরা বলতে গাঁজাখুরী, অবিশ্বাস্য। ওরে বাবা, তিনি যে এমনি অধঃপতিত, ব্রাত্য, ভবঘুরে নেশাখোর বিশ্ববকাটেদের মধ্যে মহত্ত্ব নিজে দেখেছিলেন, তাই সে কথা লিখতেও পেরেছেন।

এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গের কথা মানসী সোমের কানেও পেঁৗছল। পেঁৗছনোর কথা নয়—কারণ মানসীরা থাকে বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়ায়, ঘটনাটা বেলেঘাটার। তবু পেঁৗছল তার কারণ যে ছেলেটি খুন হয়েছিল সে মানসীরই মামাতো ভাই হত—দূর সম্পর্কের।

এর আগে মানসী সুবিমলকে দেখে নি কখনও, নামও জানত না। ঘটনার পরেই বা দেখবে কখন, তবু এই 'হিরোইজ্‌ম্' তার মনে গভীর রেখাপাত করল। সে তখন স্কুল-ফাইনাল পাস করে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, 'হিরো ওঅরশিপ' বা বীরপূজারই বয়স সেটা। সে মনে মনে সুবিমলের একটা চেহারাও কল্পনা করে নিল। লম্বাচওড়া চেহারা, চওড়া বুকের ছাতি, মাজামাজা রঙ—মাথায় একমাথা অবিন্যস্ত চুল, চোখে দুর্বলদের সম্বন্ধে অপরিসীম করুণা।

এই ঘটনার বছর দেড়েক পরে একদিন খবর বেরোল কাগজে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুবিমল দত্ত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে, আরও কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণও হয়েছে। অতঃপর সে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এখন থেকেই—নিজস্ব সংবাদদাতাদের চেষ্টায় সে খবরও পাওয়া গেল, একসঙ্গেই।

আসলে সুবিমল শুনেছিল—হাজতে থাকতেই যে, সশ্রম কারাদণ্ডের শ্রমটা এড়াবার প্রকৃষ্ট পন্থা, বিশেষ অল্পবয়সী ছেলেদের পক্ষে—লেখাপড়ার আশ্রয় নেওয়া। সেই মনে করে প্রথমেই লেখাপড়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল সে, এবং ইতিপূর্বে যে সব কারণে পড়াটা এগোয় নি, যথা—সিনেমা, খেলা, রেডিও এবং আড্ডা—তার কোনটাই না থাকায় নির্বিঘ্নে

পড়তেও পেরেছিল।

এই সময়ই মানসী মনে মনে তার এই কঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করল, যদি কোন দিন সম্ভব হয়, এই সুবিমলকেই বিয়ে করবে সে, অন্যথায় চিরকুমারী থাকবে।

মানসীর বাবা অবশ্য এ প্রতিজ্ঞার কিছুই জানতেন না, মেয়ে বি.এ. পাস করার পরই পাত্র খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মানসী বাবাকে গিয়ে ধরল,—এখন থাক না বাবা, এম.এ.টা পড়ে নিই। অতশত বুঝলেন না তিনি, মেয়ের মনোভাব—সাধারণ মনোভাবই বাপেরা বুঝতে পারে না—এ তো অস্বাভাবিক, দুচারবার মৃদু আপত্তি করে রাজী হয়ে গেলেন। মানসী যথাসময়ে এম.এ. পাস করল। ইতিমধ্যে কাগজে ছোট্ট একটি খবর লক্ষ্য করে রেখেছে সে—সুবিমল আই.এ. পাস করেছে, বি.এ.'র জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এবার আর তার কোন দ্বিধা রইল না, বাবা এক বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ারকে পাত্র ঠিক করছেন খবর পেয়ে সোজাসুজিই গিয়ে বলল,—এখন বিয়ে করা আমার হবে না বাবা, যদি ভগবান কখনও দিন দেন, আমিই আপনাকে বলব। পাত্র আমার ঠিক করাই আছে, কিন্তু সেও এখন হতে পারবে না।

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। তবু তখনও ভেবেছিলেন পাত্র ওর সহপাঠী কেউ, এমন তো আক্‌ছারই হচ্ছে, উপার্জন করতে শুরু করেনি বলেই দেরি হবে—কিম্বা অন্য কোন জাতের পাত্র, অথবা দুটোই—তিনি বললেন,—তা বেশ তো, কে সে পাত্র শুনিই না, সেটুকু বলতে দোষ কি? আমার এমন কোন প্রেজুডিস কি দেখেছিস যে অন্য জাতের পাত্র হলে আমি বিয়ে দেব না, আপত্তি করব?

তবুও সহজে বলতে চায়নি মানসী, প্রতিক্রিয়াটা কী হবে তা সে জানত। শেষে অনেক পীড়াপীড়ি বিশেষ মার কান্নাকাটিতে প্রকাশ করল নাম-ধাম-পরিচয়!

ওর বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন যে প্রথমটা মুখে কথাই সরল না বহুক্ষণ, তারপর খুব খানিকটা হেসে নিলেন, বললেন,—আমার পিসীমা বলতেন মেয়েদের বেশী পড়াতে নেই, মাথা খারাপ হয়ে যায়। তা কথাটা এখন দেখছি সত্যি। তাকে বিয়ে করবি কি রে, খুনী আসামী, বিশ্ববকা ছেলে—তাকে চোখে দেখিসও নি আজ পর্যন্ত, তাকে তোর পছন্দ হল! তাছাড়া, তার তো যাবজ্জীবন জেল—কবে বেরোবে তার কি কিছু ঠিক আছে! যা যা, জ্বালাস নি বেশী, গুচ্ছের সিনেমা দেখে দেখে এইসব নাটুকে-পনা হচ্ছে!

কিন্তু মানসী তার সঙ্কল্পে দৃঢ়, বললে,—তুমি বেশ জানো সে খুন করেনি, ছোট ভাইয়ের জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, সে বাপমার বেশী প্রিয়—সে গেলে তাঁরা কষ্ট পাবেন এই জন্যেই সে স্বেচ্ছায় এই দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। আর বকাটে যে নয় তার প্রমাণ এই-ই যথেষ্ট, এতখানি স্যাক্রিফাইস যে করতে পারে, যার এতটা বিবেচনা বাবা-মা ফ্যামিলির জন্যে, সে আর যাই হোক বকা হতে পারে না। তা ছাড়া কাগজে তো দেখেইছ—টপটপ একটার পর একটা পাস করছে সে। বি.এ. পাসও করবে তা আমি বেশ জানি। দেখা—না-ই বা দেখলাম, কানাখোঁড়া নয়—তাহলে জানতে পারতাম।...আর যাবজ্জীবন এখন আর যাবজ্জীবন নয়—ম্যাক্সিমাম কুড়ি বছর, শুনেছি, সৎভাবে থাকলে তার ঢের আগেই ছেড়ে দেয়। এসময়টুকু অপেক্ষা করতে পারব। অনেকে তো বিয়েই করে না, ভেবে নাও আমিও চিরকুমারী রইলুম। তোমার অন্য ছেলেমেয়ে আছে, তাদের সংসারী করো, আমাকে তোমরা খরচের খাতায় লিখে রাখো।

এরপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল। কান্নাকাটি, রাগারাগি, চেঁচামেচি—আত্মীয়-

স্বজনদের আনাগোনা—বোঝানোর চেষ্টা, কিছুই বাদ গেল না। শেষে ওর বাবা ডাক্তার ডাকবার প্রস্তাব করলেন, স্নায়ুবিদ্ বা মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাকা হবে কিনা—এই নিয়ে যখন আলোচনা চলছে তখন মানসী প্রাণপণে ছুটোছুটি করে ওর এক অধ্যাপকের চেষ্টায় এই চাকরিটা যোগাড় করে ফেলল, ঝিনুকপাড়া ফকিরচাঁদ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ, মৌখিক কথা রইল যে দুতিন বছরের মধ্যে বি.টিটাও পাস করে নেবে। মাইনে নিতান্ত কম নয়, ফ্রি কোয়ার্টার, ইস্কুলের ঝিই দুবেলা রেঁধে অন্যান্য কাজকর্ম করে দেবে, তার জন্য তাকে মাইনে দিতে হবে না, দুবেলা খেতে দিলেই হবে।

বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিজয়গর্বে নিজের স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল মানসী। এক বান্ধবীর কাছ থেকে শ-দুই টাকা ধার নিয়েছিল, যাবার পথে একেবারে বিছানাপত্র কিনে নিয়ে গেল।

অবশ্য তাতেই যে ওর বাবা-মা একেবারে হাল ছেড়েছিলেন তা নয়, চিঠিপত্র আনাগোনা অব্যাহত রেখেছিলেন। ওর ছোট বোন তো এসে মাস দুই প্রায় ওর ঘরে কাটিয়ে গেল, সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল যে দিদিভাইকে রাজী করিয়ে তবে সে ফিরবে—কিন্তু দেখা গেল 'দিদিভাই'-এর প্রতিজ্ঞা আরও দৃঢ়ভিত্তিক, তাকে অত সহজে টলানো যাবে না। মানসী নিজেই নিজেকে শবরী আখ্যা দিয়েছিল, বলত,—আমার এ শবরীর প্রতীক্ষা, দেখা যাক এযুগের রামচন্দ্রকে পাই কিনা!

অবশ্য সে যুগের শবরীর মতো চুপ করে বসে থাকার মেয়ে সে নয়। ত্রেতার শবরী বালিগঞ্জের এম.এ পাস করা মেয়ে হলে বোধকরি অযোধ্যা পর্যন্ত ধাওয়া করত—মানসী জেলখানা অবধি চলে গেল। সুবিমলের সঙ্গে দেখা করবে সে, অনুমতি চাই।

সুবিমল এতশত জানত না। সে কোনদিন স্বপ্নেও আশা করেনি তার জন্যে কোন শিক্ষিতা ধনী-দুহিতা বসে তপস্যা করবে। জেলখানার 'মেজ সাহেব' যখন তাকে জানালেন যে এক মানসী সোম তার সঙ্গে দেখা করতে চায়—তখন সুবিমল একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, এ নামে তো কৈ কাউকে চিনি না, সে আবার কে? কী চায়?

এ পর্যন্ত তার বাবা আর মা ছাড়া কেউ তার সঙ্গে কোন দিন দেখা করতে আসে নি, তাও এখানে আসার পর থেকে তাঁরাও আসতে পারেন নি। বাবাও তম্বির করে বিহারে বদলি হয়ে গেছেন, নইলে মেয়ের বিয়ে হয় না। পাস পান বটে কিন্তু যাতায়াতে অন্য খরচ আছে—সে তাঁদের সাধ্যের বাইরে। বাসা তুলে দেওয়ার ফলে ভাইরাও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সুশান্ত কোন্ কারখানায় চাকরিতে ঢুকেছে—কোন আত্মীয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ নেই আর। আগে এক আধটা চিঠি আসত, এখন তাও আসে না।

সুতরাং এ কোথা থেকে কে এল—কিছুতেই ভেবে পেল না সুবিমল।

মেজসাহেব মুখ টিপে হাসলেন, বললেন,—এম.এ পাস, গার্ল স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, বালিগঞ্জের মেয়ে—তোমাকে বিয়ে করতে চায়, দরখাস্ত করেছে জেলে থাকতেই বিয়েটা রেজেস্ট্রী হওয়া সম্ভব কি না!

—সে আবার কি? মাগীটা পাগল বুঝি? দোহাই স্যার, পাগলের সামনে আমাকে পাঠাবেন না।

—চুপ চুপ, পাগল কি, শুনছ মাস্টারী করে!...আমাদের এক আণ্ডার সেক্রেটারীর মেয়ে, দুঁদে লোক, ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন ভদ্রলোক, মেয়েটা বেঁকে

দাঁড়াতেই তো হল না। ওর ধনুর্ভঙ্গ পণ, তোমাকে পেলে তোমাকে বিয়ে করবে—নইলে করবে না। তোমারই তো ভাল হে ছোকরা, দেখতেও খারাপ নয়, রোজগার করছে, বড়-লোকের মেয়ে, বাপ যতই বলুক কিছু কি আর দেবে না, অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা যাকে বলে!

কিন্তু সুবিমল কিছুমাত্র আশ্বস্ত হয় না। বলে,—যতই বলুন স্যার, ওর মাথা খারাপ। আমাকে দেখল না জানল না, আমিও কখনও তাকে চোখে দেখলুম না—আমাকে বিয়ে করবে কি?...না না, স্যার আপনি বলে দিন, ওসব দেখাটেখা হবে না, আমি দেখা করতে পারব না।

সাহেব বলেন,—অমন হয় হে হয়—এখনও তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি, মনপ্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছি! গান শোন নি? দেখা করো না, দেখা করতে দোষ কি? তেমন ভায়োলেন্ট পাগল তো নয়—মন্দ কি, যদি খেলিয়ে তুলতে পারো! অমন একটি তদ্বিরকারিণী থাকলে চাই কি চট্ করে খালাসও হয়ে যেতে পারে—

খুব আশ্বস্ত হয় না সুবিমল, যদিও শেষ পর্যন্ত দেখা করতে যেতেই হয়।...

মানসীকে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেল সে, এত কম বয়স—হেডমিস্ট্রেস শুনে ভাবতেও পারে নি। বেলেঘাটার গলির সেই রকবাজী জীবনে এই রকম শিক্ষিতা স্মার্ট মেয়েদের দূর থেকেই দেখেছে ওরা—আর টিটকিরি দিয়েছে। তারা সুদূর, ওদের আশা বা আয়ত্তের বাইরে বলেই টিটকিরি দিয়েছে—মেয়েদের গায়ের ঝাল মেটাবার মতো। এই রকম মেয়ে সত্যি সত্যিই তাকে বিয়ে করতে চায়?...অবাক যেমন হল, একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল তার। মাথা যে এর খারাপ সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র রইল না। তা নইলে এমন অসম্ভব কল্পনা মাথাতেই বা যাবে কেন? আরও ভয় হল তার, এ মেয়ের সঙ্গে কি সে কোনদিন ঘর করতে পারবে? তাকেও শিক্ষিত ধরে নিয়েই মানসী তার সঙ্গে কথা কইছে, অর্ধেক কথা ইংরেজীতে বলছে, কিন্তু ওর বক্তব্যের বারো আনাই তো সুবিমলের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। সে বি.এ পরীক্ষা দিয়েছে ঠিকই, হয়ত পাসও করবে—বাকী দুটো পরীক্ষা থেকেই বুঝে নিয়েছে যে যেমন-তেমন ভাবে পাস করতে গেলে খুব একটা বিদ্যার দরকার হয় না—কিন্তু তার থেকে যে এ মেয়ে ঢের বেশী লেখাপড়া জানে, সে কোন দিন এম.এ পাস করলেও এর ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না! সারা জগত যেন এর মুঠোর মধ্যে, এমন ভাবেই কথা কইছে।

সুবিমল গম্ভীর হয়ে রইল সমস্তক্ষণ, কথা যখন কইল তখনও বিজ্ঞভাবে, ধীরে ধীরে বলল। এসব পাগলামি ত্যাগ করতে বলল সে, তার মতো দাগী আসামীর সঙ্গে ওর মতো মেয়ের বিয়ে হয় না, হতে পারে না। তাছাড়া তার এখন ছন্নছাড়া জীবন, যদি কোনদিন ছাড়া পায়ও, কোথায় যাবে কী করবে তা কিছুই জানে না, এ অবস্থায় সে জীবনকে একটা ভদ্রমেয়ের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়াতে চায় না, নিজেরও কোন বন্ধনে যেতে ইচ্ছে নেই আপাতত। মানসী যেন আর এ নিয়ে মাথা না ঘামায়, সে তার বাপের পছন্দ মতো বা নিজেরই পছন্দ মতো একটি সৎপাত্র দেখে বিয়ে করুক, সুবিমল সর্বান্তঃকরণে এই চায়। তার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ (কথাটা বেশ ভারিক্কী শোনাল বলেই মনে হল তার) রইল।

যদিচ সুবিমলের চেহারাটা মানসীর এতদিনের ধারণার সঙ্গে একেবারেই মিলল না, কোথায় সেই লম্বাচওড়া দরাজছাতি তরুণ যুবক, এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল (অবিন্যস্ত?) —আর কোথায় এই শ্যামবর্ণের পাকাটে ধরণের রোগা চেহারার লোক, চুলগুলো ছোট করে

ছাঁটা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি!—কিন্তু তবুও এই কথাবার্তাতেই মানসী আরও যেন বেশী করে আকৃষ্ট হল। এও তো সেই আত্মোৎসর্গেরই ব্যাপার, পাছে মানসী সুখী না হয়, পাছে তার বাবা-মা দুঃখিত হন, সেই জন্যেই এ সৌভাগ্য ও সুখ যেন জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে।

ফলে জেদ বেড়েই গেল মানসীর।

জেলের মধ্যেই বিয়ে করার অনুমতি পাওয়া যায় কিনা—প্রথমটা সেই চেষ্টাই করল দিন কতক। কিন্তু ওপর-ওলারা রাজী হলেন না। দুজনেই কয়েদী হলে না হয় হত, এ একজন বাইরে থাকবে আর একজন ভেতরে, শুধু একটা রেজেষ্ট্রী করে লাভই বা কি?

এই উপলক্ষে আরও বার কতক মানসী দেখা করল সুবিমলের সঙ্গে। আরও দু একদিন গম্ভীর একটু রগচটা ভাব বজায় রেখেছিল সে, তারপর তারও যেন একটা নেশা লাগল। মানসীর চোখের তন্ময়তা দেখে তারও মনে হল যে হয়ত কিছু অসাধারণত্ব আছে তার, এতদিন তার আত্মীয়রা বুঝতে পারে নি, এ শিক্ষিত মেয়ে বলেই চিনতে পেরেছে।

ক্রমশ মানসীর পূজো তার প্রাপ্য বলেই মনে করতে লাগল।

মানসী বিস্তর তদ্বির করেও যখন রেজেষ্ট্রী বিয়ের অনুমতি পেল না, তখন সে অধিকতর সাফল্যের জন্য চেষ্টা করতে লাগল—অর্থাৎ সুবিমলের মুক্তির। প্রায় দশ বছর পূর্ণ হতে চলল তার জেল খাটার, এই সময়ে তার নামে কোন অভিযোগ নেই, লেখাপড়া করে নিজের চেষ্টায় বি.এ পাশ করেছে সে, এখন তাকে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে মুক্তি দিতে পারেন। প্রথম দিন কতক কলকাতায় বিস্তর ছুটোছুটি করল সে, বিধানবাবুকে গিয়ে ধরল, তাতেও যখন কাজ হল না, তখন দিল্লীতে গিয়ে প্রায় মাসখানেক বসে থেকে স্বয়ং নেহরুকে ধরল। নেহরু ওর সঙ্গে কথা কয়ে বিস্মিত হলেন, মুগ্ধ হলেন ওর এই নিষ্ঠায়, প্রতিশ্রুতি দিলেন, কী করতে পারেন দেখবেন। তবু তারও পরে—প্রায় বারো বছর জেল-খাটার পর সুবিমলের মুক্তির হুকুম বেরোল।

ইতিমধ্যে মানসী বি.টি পাস করেছে। অবশ্য তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, এম.এ-তে হাই সেকেন্ড ক্লাস ছিল তার, অধ্যাপকরা চেষ্টা করেছিলেন তাকে কোন কলেজে লেকচারার করে দিতে। তার যা আত্মীয়স্বজন, এমনিও একটা অধ্যাপিকার পদ পাওয়া খুব দুর্লভ হত না। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে দিকে যায় নি মানসী। কলকাতা তো নয়ই কলকাতার কাছাকাছি থাকারও ইচ্ছে নেই তার। শহরের আত্মীয়সমাজে এই ব্যাপার নিয়ে নানা কথা শুনতে হবে, মফস্বল কলেজেও ঐ একই অবস্থা, সেখানে আবার শিক্ষিত ভদ্রলোকের গণ্ডী ছোট—প্রত্যেকের প্রত্যেকটি কথাই অপরের সমালোচনার বিষয়বস্তু। তার চেয়ে এ বেশ আছে। বাসাটি ভাল, ভাড়া লাগে না, মেয়েরা তাকে ভালবাসে, শহরের মেয়েদের মতো বাচাল কি উদ্ধত নয়, লেখাপড়াতেও মন আছে। ওর যা আয় দুজনের সংসার ঢের চলে যাবে। বাজার তো এখানে করতেই হয় না—সব্জি ফল মাছ প্রায়ই কোন না কোন ছাত্রীর বাড়ি কিম্বা সেক্রেটারীর বাড়ি থেকে আসে। সে যে খুব একটা আত্মত্যাগ করেই এখানে পড়ে আছে—সে বিষয়েও তারা সচেতন এবং কৃতজ্ঞ, সর্বোপরি এই শান্ত নির্জন স্থানে থেকে স্বভাবটাও হয়ে গেছে কুড়ে, এখন আর শহরে গিয়ে কলেজে পড়ানোর কথা ভাবতেই পারে না সে।

সুবিমল যখন ছাড়া পেল তখন একমাত্র মানসীই তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার বাবা এ খবর জানেন না, মা মারা গেছেন, ভাইদের খবরও জানা নেই তার, আর কাউকে

তাই আশাও করে নি। মানসীর চেষ্টাতেই যে সে এত আগে ছাড়া পেল, মানসী যে অসাধ্য সাধন করেছে তার জন্যেই, সে কথাও শুনেছিল। সে জানতই যে মানসী অপেক্ষা করবে। ওরা দুজন কলকাতায় এসে সোজা রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলল—মানসীর কোন বান্ধবী বা আত্মীয়কে খবর দেয় নি সে, ইস্কুলের বৃদ্ধ সেক্রেটারী এসেছিলেন, ওখানকার স্থানীয় জমিদার, তিনি আর তাঁর সরকার সাক্ষী হবেন বিয়েতে। বিয়ে সেরে একটা হোটেলে খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে একেবারে রওনা দিল ঝিনুকপাড়া। উৎসাহী সেক্রেটারী বাবুই তাবৎ খরচ দিলেন, সাহেবী হোটেলে খাওয়ালেন এবং ফার্স্ট ক্লাস-এর ভাড়া দিয়ে নিয়ে গেলেন ওদের। বাবা এ বিয়েতে রইলেন না বটে—কিন্তু এঁর জন্যে সে অভাবটা অত বুঝতে পারল না মানসী। কৃতজ্ঞতায় চোখ ছলছল করতে লাগল ওর, ভাগ্যে সে এ ইস্কুল ছেড়ে কলেজে পড়াতে যায় নি!...

এ যুগের শবরী যখন তার রামচন্দ্রের মুক্তির জন্য দিল্লী কলকাতা ছুটোছুটি করছে—সেই সময়ই খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছিল কাগজে কাগজে, ছবি বিবৃতি ইতিহাস—মায় পাত্রপাত্রীর নাড়ীনক্ষত্রর খবর বেরিয়েছিল। প্রথমটা মানসীর বাবা কিছু বিরক্ত হয়েছিলেন এই অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে—কিন্তু পরে বিজ্ঞাপনের মোহেই একটু যেন গর্বও অনুভব করেছিলেন, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে মেয়েটার মাথা বোধহয় অতটা খারাপ নয়। তবে তাঁর মনোভাবের এ পরিবর্তন মানসীর জানবার সুযোগ ঘটে নি। সে নিজে নিরতিশয় তৃপ্তি পেয়েছিল এটা ঠিক, তার তপস্যা যে সার্থক হয়েছে—উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু খবরের কাগজের ঢাক একটা উপলক্ষে বেশীদিন বাজানো চলে না, সুতরাং এতকাণ্ড করে যে বিয়ে, সেটা যেদিন সত্যি সত্যিই হল সেদিনের খবর কেউ টের পেল না। সুবিমলও খবরের কাগজের এই প্রচারের ব্যাপার শুনেছিল, পড়েও ছিল কিছু কিছু, আজ জেলখানার দোরে ফুলের মালা না হোক—ক্যামেরা নিয়ে রিপোর্টাররা থাকবেন ভীড় করে—ভেবে রেখেছিল, এই অনাড়ম্বর বিয়েতে সে একটু যেন ক্ষুণ্ণই হল। দুতিনবার অনুযোগও করল, 'কাগজে খবরটা দেওয়া হয় নি বুঝি। দেওয়া উচিত ছিল, ওরা পরে টের পেলে আপসোস করবে খুব!'

এই উচিতটা যে কার ছিল তা বোঝা গেল না, সুতরাং শ্রোতারা চুপ করে রইল।

কলকাতা যাবার আগে তার ঘর—এখন তাদের ঘর—মোটামুটি সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল। সেক্রেটারী মশাইয়ের উদ্যোগে একটা ডবল তক্তাপোশ এবং প্রশস্ত বিছানারও ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়তি চেয়ার টেবিল, ফুলদানিতে ফুল, তাকে নতুন কিছু পেপার-ব্যাক বই—কিছুরই অভাব ছিল না। ধূমপানের অভ্যাস আছে কিনা সুবিমলের, সেটা জানা না থাকায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই এক প্যাকেট ভাল সিগারেটও আনিয়ে রেখেছিল। সুবিমল ঘরে ঢুকে সাজসজ্জা দেখে একটু আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেও—এমন ঘর দোর আসবাব তার পৈতৃক বাড়িতেও ছিল না, বলাবাহুল্য—যদিচ খাট একটা আনিয়ে রাখবে মানসী, খাট আর গদি, আশা করেছিল সে; তার একটা ধারণা ছিল যে বিয়েতে পাত্রীপক্ষ খাট বিছানা দেয়ই—টেবিলের ওপর সিগারেটটা দেখে যেন জ্বলে উঠল, এ কি, সিগারেট কে খাবে! বিড়ি, বিড়ি চাই আমার। কতকাল যে বিড়ি খাই নি, সেই চোদ্দ বছর বয়স থেকে অভ্যেস করেছি—আর ওখানে শালা গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। সিগারেট তবু জেলার সাহেবের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে-ফাইফরমাশ খেটে খুশী করে পেতুম দু একটা, চুরিও

করেছি মধ্যে মধ্যে ডেস্কের মধ্যে থেকে, বাবুরাও দিত কেউ কেউ—কিন্তু বিড়ির তেষ্টা কি আর সিগারেটে মেটে! যাদের পয়সা আসত বাইরে থেকে তারা দেদার আনাত ওয়ার্ডারকে দিয়ে, আমাকে আর কোন্ শালা পয়সা দিচ্ছে বলো! যারা বিড়ি আনাত তাদের কাছে মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যেত না একটা, বলে মাগের ভাগ দিতে পারি—বিড়ির ভাগ দিতে পারব না!

একটু কি স্বপ্নভঙ্গ হল শবরীর? হলেও টের পেতে দিল না সে, বলল,—আচ্ছা সে আমি আনিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ও নোংরা নেশাটা ছাড়তে হবে আস্তে আস্তে। এখানে আমার স্বামী বিড়ি খেলে চাকরবাকররা অশ্রদ্ধা করবে।

মনে মনে জপ করে সে, আজকের রাত বাসররাত তাদের, আজ কোন ছায়াকে ম্লান করতে দেবে না তাদের এত সাধনার মিলনকে।

ম্লান হয়ও না অবশ্য। অন্য শিক্ষিকারা এসে পড়েন, তাঁরা নিজেরাই যোগাড়যন্ত্র করে একটা ভোজের আয়োজন করে রেখেছিলেন—মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এক ঝুড়ি ফুল সংগ্রহ করে ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেল, দুটো গোড়ে মালাও রেখে গেল--বিছানার পাশে একটা থালায়। খাওয়াদাওয়া হৈ-হুল্লোড়ে কখন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি হয়ে গেল, তা কেউ টেরও পেল না। প্রথমটা সুবিমল একটু গাম্ভীর্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রইল না। তার ফলে অন্য মহিলাদের ঠাট্টাতামাসার জবাবে যেসব ভাষা বেরোতে লাগল তার মুখ দিয়ে, তাতে রীতিমতো সঙ্কোচই বোধ করল মানসী। শিক্ষিত—বি.এ পাস করেছে যখন তখন শিক্ষিত বৈকি—ছেলের মুখ থেকে এ ধরনের ভাষা বেরোয় তা সে জানত না। পাড়ার রকবাজ কেন রাস্তার 'মোড়বাজ' অর্থাৎ চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যেসব ছেলেরা আড্ডা দেয় তাদের সঙ্গেও মেশার বা কাছাকাছি যাওয়ার কখনও কারণ ঘটে নি মানসীর—তাই তার কানে যেন আরও বেশী আঘাত লাগে। তবু সে হতাশ হয় না, শুধু মনে মনে ভাবে, তার আরও একটা সাধনা বাকী আছে—স্বামীকে ভদ্র করে তোলার।

মাস খানেক পরে কথাটা তোলে মানসী, জনার্দন বাবু মানে আমাদের সেক্রেটারী বলছিলেন, এখানকার ছেলেদের ইস্কুলে একটা পোস্ট নাকি খালি আছে টিচারের, জিওগ্রাফী আর অঙ্ক পড়াতে হবে নিচের ক্লাসে, সে কি তুমি পারবে? কী সাবজেক্ট ছিল তোমার—তাও তো জানি না।

—রক্ষে করো বাবা, অঙ্ক আর ভূগোল ও দুটো সাব্জেক্টকেই যমের মতো ভয় করেছি চিরকাল, কী করে যে স্কুল ফাইনালে অঙ্কে পাস করলুম তা আমিই ভেবে পাই না।... তার পর থেকে তো মা বলে ত্যাগ করেছি অঙ্ককে। ওখানে য়্যাসিস্টান্ট জেলার বাবু আমাকে খাতা লেখার কাজ দিয়েছিলেন একবার—এমন ভুল হল যে খাতাকে খাতাই বদলাতে হল শেষ পর্যন্ত।...তাছাড়া ও মাস্টারী করা—গাধা পিটনো—ও আমার পোষাবে না। ওসব চেষ্টা করো না।

—মুশকিল, এখানে তো অন্য আর কাজও নেই। ইস্কুলে মোটে একটি করে কেরানী থাকে—তা এখন যাঁরা আছেন তাঁরা দুজনেই বেশ শক্তসমর্থ—সে পোস্ট এর ভেতর খালি হওয়ার কোন চান্স্ নেই।

—খালি হলেই বা নিচ্ছে কে? ইস্কুলের কেরানীগিরি তো আরও ওয়ার্স! ছেলেরা যে চোখে দেখে জানি তো।...তাছাড়া এখন কিছু দিন আমি কাজকর্ম করতেও পারব না।

জেলে কি শরীরের কিছু থাকে? এখন বেশ কিছুদিন লাগবে ধাক্কা সামলাতে। তারপরই মুখখানা বিকৃত করে যেমন এক রকমের ব্যাঙের সুরে বলে,—কেন, এর মধ্যেই কি অসহ্য লাগছে নাকি? খরচায় টান ধরছে? জেলফেরৎ দাগী আসামী সহজে কোন কাজ পাব না জেনেই তো বিয়ে করেছিলে, এখন আবার কাজের জন্যে হাঁপিয়ে উঠলে কেন? আমিই তো তখন আপত্তি করেছিলুম, সাফ্ জানিয়ে দিয়েছিলুম আমার কিস্সু নেই, এক পয়সা কেউ দেবেও না—তখন তো খুব গলাবাজী করে লেক্চার ঝেড়েছিলে—যেমন করেই হোক খাওয়াব, আমার যা আছে তাতেই চলে যাবে!...এখনও তো একমাস কাটে নি বাবা, এর মধ্যেই অরুচি ধরে গেল!

—আমি কি তাই বলেছি। তোমারই বসে বসে বিশ্রী লাগতে পারে বলে—। পুরুষ মানুষ কাজ না পেলে মনমরা হয়ে পড়বে ভেবেই—। শরীর খারাপ জেনেও কাজ করতে বলব আমি কি এমনি অমানুষ!

বলতে বলতেই যেন চোখে জল এসে যায় মানসীর। সে সেটা গোপন করতেই ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই শুনতে পায় সুবিমল বলছে,—কিচ্ছু বিশ্রী লাগবে না বাবা, অনেক দিন পরে একটু নিজের মতো থাকবার দিন পেয়েছি—এখন কিছুদিন তো হাত পা মেলে থাকি!

বিড়ির নেশাটা কমাতে পেরেছে মানসী—কিন্তু তার ফলে বিড়ির চেয়েও কড়া সিগারেট আনিয়ে দিতে হয়েছে, সে গন্ধটা আরও অসহ্য লাগে তার। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। সুবিমলের কথা বলার ধরণটাই যেন কেমন খারাপ হয়ে গেছে—এমন অন্তর্ভেদী কথা বলে, আর ভাষাটাও এমন—মনে মনে ইতর শব্দটার অনুকল্প অন্য কোন ভদ্র শব্দ খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়—ইয়ে যে, আজকাল ওর আচরণের প্রতিবাদ করা কি তা নিয়ে কোন অনুযোগ করাই ছেড়ে দিতে হয়েছে মানসীকে।

এখানে আসার পর মাস-তিনেক সত্যিই কোথাও নড়ল না সুবিমল। শুধুই খেয়ে ঘুমিয়ে চা খেয়ে সিগারেট খেয়েই কাটিয়ে দিল সময়টা। একটা সুবিধা—মানসীর তরফ থেকে—ও কারও বাড়ি বড় একটা বেড়াতে যেত না। সুবিধা এই জন্যে যে, জনসমাজে সাধারণ আলাপের অভ্যাসটাই একেবারে চলে গিয়েছিল ওর, কথাবার্তা বলতে গেলেই যে শ্রেণীর ভাষা সহজে বেরোত মুখ দিয়ে তাতে মানসী মনে মনে লজ্জায় মরে যেত।

হঠাৎ, এই তিন মাস পরে একদিন সকালে স্ত্রীকে বলল,—গোটা পাঁচেক টাকা রেখে যেও, আজ একবার শহরে যাব ভাবছি।

অবাক হয়ে যায় মানসী,—শহরে? হঠাৎ?

—এমনিই। ঘুরে আসি একটু।

—না, মানে যদি কোন জিনিসের দরকার থাকে তো আমি ভোলাকে দিয়েই আনিয়ে দিতে পারি, ও তো প্রত্যহই একবার যায় বিকেলে ডাক নিয়ে।

হঠাৎ যেন খিঁচিয়ে ওঠে সুবিমল,—কেন, আমি কি তোমার নজরবন্দী আছি নাকি? ওসব বাপু আমার পোষাবে টোষাবে না—সাফ্ বলে দিচ্ছি, সরকারী জেল থেকে বেরিয়ে এসে মাগের জেলে আটকে থাক্‌ব—সে আমি পারব না। বলো, এখনই এই এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি। সে বান্দা আমাকে পাওনি যে দুবেলা দুমুঠো ভাত দিচ্ছ বলে কান ধরে ওঠাবে বসাবে।

বেশ চেঁচিয়েই বলে সে, রান্নাঘরে ঝি মানসীর ভাত বাড়ছে তখন, তার না-শোনবার কোন কারণ থাকে না। লজ্জায় মরে যায় যেন মানসী, তাড়াতাড়ি পাঁচটা টাকা এনে সামনে রেখে বলে,—কী সামান্য কথায় কি উত্তর যে দাও তুমি তার ঠিক নেই। ছি ছি, ঝি-চাকররা কি মনে করে বলো দিকি! তুমিই বলো শরীর খারাপ—তাই বলছিলুম যে যদি কোন জিনিস আনাবার দরকার থাকে তো আনিয়ে দিচ্ছি।

—ওঃ, পয়সা দিয়ে ঝি-চাকর রাখব—তাকে সমীহ করে কথা বলতে হবে, ছোঃ!

শহর পাঁচ মাইল মাত্র এখান থেকে, নিয়মিত বাস যাতায়াত করে, গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও ফিরে আসা যায়।

মানসী সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখল, সুবিমল তার আগেই ফিরে এসেছে। বেশ খুশী খুশী ভাব, একটা হিন্দী ফিল্ম-এর গান ভাঁজছে গুণগুণ করে।

সকালের মেঘটা কাটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই মানসী বলল,—কৈ, শহর থেকে কি আনলে?

—কী আবার আনব, এমনি ঘুরে ফিরে এলুম খানিক। তোমার এই কুয়োর মধ্যে বসে বসে একঘেয়ে লাগছিল তাই—।

তাতে পাঁচটা টাকার কী দরকার পড়ল, প্রশ্নটা ঠোঁটের ডগায় এলেও করতে সাহস করল না মানসী।, আবার কি কটু কথা শুনবে কে জানে।

এর পর কদিনই ইস্কুল থেকে ফিরে কী রকম একটা বিজাতীয় গন্ধ পায় মানসী বাড়ির মধ্যে, ধরতে পারে না ঠিক। বাড়ির আনাচেকানাচে দেখে কিছু পচল কি না—অথচ ঠিক পচা গন্ধ বলেও মনে হয় না। ঘর তো প্রায় সব সময়ই সস্তা কড়া সিগারেটের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবু তা ছাপিয়েও গন্ধটা যেন পীড়া দেয়। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কোন্ নেতার মৃত্যু উপলক্ষে দুপুর বেলাই স্কুলে ছুটি হয়ে গেল। সাধারণত এইসব ছুটিগুলোয় অফিসে বসে বকেয়া জমে-থাকা কাজগুলো সারে সে, সেদিন শরীরটা ভাল লাগল না, সোজা বাড়ি চলে এল। আর ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল একটা চকচকে ছোট কলকেতে কী সেজে গাঁজার মতো টানছে সুবিমল।

—তুমি—তুমি গাঁজা খাও? যেন আর্তনাদ করে ওঠে মানসী।

—গাঁজা নয় ঠিক—দুতিন রকম মিশোনো আছে, সুল্‌পা—সুল্‌পা জানো, তাও আছে। বেশ নির্বিকার ভাবেই উত্তর দেয় সুবিমল, বলে, ওখানে থাকতে এক শালা ওআর্ডার এই নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, না করে কি উপায় ছিল, নইলে এমন সব অত্যেচার করত—সে তোমাকে বলা যাবে না—। অনেক চেষ্টা করলুম কাটাবার—তিনমাস কোথাও বেরোইনি দেখলেই তো কিন্তু আর পারা গেল না। এ-এই একবার, এসময় তো তুমি থাকো না—তাও বলো তো বাগানে গিয়ে না হয়—

মানসী আর উত্তর দিতে পারল না, কথাই কইতে পারল না, কোনমতে টলতে টলতে সেই ইস্কুলের জামাকাপড়েই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ আর হতাশা ও ব্যর্থতা সংযমের বা চক্ষুলজ্জার বাঁধ মানল না, বালিশে মুখ গুঁজে হু-হু করে কাঁদতে লাগল সে, বুকফাটা কান্না।

সেদিন রাত্রে স্বামীস্ত্রীতে কথা হল না, সুবিমলও ঘাঁটাতে সাহস করল না। প্রথম দিককার বেপরোয়া ভাবটা তার কেটে গেছে—এখন আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে

অনেকখানি—ইদানীং খাওয়াদাওয়ার জুৎ না হলে রীতিমতো স্ত্রীকে শুনিয়ে ঝির ওপর তম্বি করে সে—সুতরাং এখন একটু একটু ভয়ই করতে শুরু করেছে যেন স্ত্রীকে।

পরের দিন সকালে উঠে মানসীই প্রথম কথা কইল। সে এতদিনে চিনে নিয়েছে সুবিমলকে—মিছিমিছি রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি করে কোন লাভ নেই, পাঁকে ঢিল ছুঁড়লে সে পাঁক ছিট্‌কে নিজের গায়েই আসবে আগে। সে বেশ শান্তকণ্ঠেই বলল,—দ্যাখো, তুমি এবার কিছু কাজকর্ম করো, যা হয়। ছোটখাটো কোন ব্যবসা করতে চাও তো করো—সামান্য পুঁজির দরকার হয়, দু-এক হাজার, আমি দেব—না হয় যদি চাকরি করতে চাও তো তাও দেখতে পারি একে-ওকে বলে। টাকার দরকার বলে বলছি না, তোমার টাকা তুমিই রেখো—একটা কিছুতে এনগেজ্‌ড্‌ হয়ে থাকা দরকার। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা—ছেলেবেলায় ইস্কুলে নিশ্চয় শুনেছ, কথাটা খুব খাঁটি কথা—

—নাও, সক্কাল বেলা—এখনও পেটে কিছু পড়ল না, লেকচার ঝাড়তে শুরু করলে! লাও বাবা, একেই বলে মাগের ভাত! ঝাড়ু মারো এমন ভাতের মাথায়, আমারই ঝকমারী হয়েছিল তোমার মতো জাঁহাবাজ মেয়েছেলের ভাঁওতায় ভোলা—

—দ্যাখো, যা বলো বলো—আমিও আর তোমার ঐ ইতর কথার ভয়ে চুপ করে থাকতে রাজী নই। যদি আমার কথা না শোন, আমি তোমার সামনে বসে উপোস করে মরব বলে দিলুম!

স্ত্রীর এ ধরনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নয় সুবিমল, সে একটু ঘাব্‌ড়ে গেল। খানিকক্ষণ গুম্‌ হয়ে বসে থেকে বললে,—ও চাকরি-বাকরি আমি করতে পারব না, টাইম ধরে যাওয়া আর পরের তাঁবে হেঁই-গো মশাই হেঁই-গো মশাই করা—আমার ধাতে সইবে না। তাছাড়া কীই বা আমার বিদ্যেবুদ্ধি আর কীই বা সুপারিশ! ভাল চাকরি তো আর মিলবে না।...দেখি দিনকতক শহরে বাজারে ঘুরি, কী করা-টরা যায় দেখি।

বলল কিন্তু তারপরও আটদশদিন নড়ল না কোথাও। ওর মেজাজের ভয়ে মানসীও তাগাদা দিতে সাহস করেনি প্রথম প্রথম—কিন্তু দশ দিন কেটে যেতে অগত্যা বলতে বাধ্য হল,—কৈ, কী হল তোমার শহরে যাওয়া?

—উঃ, ভ্যালা জ্বালা হল তো দেখছি। দিনরাত খ্যাচখ্যাচানি ভাল লাগে না। বলি মানুষের শরীর-গতিক মনমেজাজ বলে একটা কথা আছে তো!

আর কথা বাড়াতে সাহস করে না মানসী।

যাই হোক, তবু তাইতেই বোধহয় কাজ হয় কিছু। দিন দুই পরে সত্যি-সত্যিই একদিন খাওয়া-দাওয়া করে শহরে যায়, ফেরে একেবারে সন্ধ্যে নাগাদ। উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে মানসী,—কী হল, কি বুঝলে? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে!

—হ্যাঁ—অমনি একদিন আমি গেলুম আর ব্যবসাগুলো হাত জোড় করে সার বেঁধে এসে দাঁড়াল—বাবুমশাই আমাকে ধরুন, আমাকে ধরুন! বাজার জিনিসটা কি আর এক-দিনে স্টাডি করা যায়!—আরও যা বলে তা না লেখাই ভাল।

কথাটা সত্যি। মানসীই যেন একটু লজ্জিত বোধ করে। চুপ করে যায় সে।

এরপর দু-একদিন ছাড়া ছাড়াই শহরে যেতে শুরু করল সুবিমল। ইদানীং আর পয়সা চাইতে হয় না, পুরুষ মানুষ প্রত্যেক কথায় স্ত্রীর কাছে হাতখরচার জন্যে টাকা চাইবে সে বড় খারাপ দেখায়। মানসী আজকাল ওর হাতখরচা বাবদ মধ্যে মধ্যে পাঁচসাত টাকা একটা ড্রয়ারে রেখে দেয়, সুবিমলকে বলাই আছে, তার বিড়ি সিগারেট নাপিত খরচা

তাই থেকেই করে। বাস ভাড়া বা শহরে চা-পান খাওয়ার জন্যও আর নতুন করে কিছু দেয় না মানসী—ড্রয়ারে খুচরো কমে আসছে দেখলেই আবার রেখে দেয় কিছু। হাতখরচা বলে থোক্ একটা টাকা ধরে দিতেও তার লজ্জা করে।

বেশ কদিন ঘোরাঘুরির পর আবার একদিন মানসী কথাটা পাড়ল। সেদিন আর সুবিমল খিঁচিয়ে উঠল না। বলল,—দাঁড়াও, দাঁড়াও, রোসো। একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, ওখানকার আবগারী দোকানটার লাইসেন্স বদল হবে, চেষ্টায় আছি সেইটে নেবার। সেই জন্যেই ঘোরাঘুরি করছি।

—সে তোমাকে দেবে কেন?

—কেন দেবে না? আমি গ্র্যাজুয়েট নই? তাছাড়া জনার্দনবাবু যদি বলেন—

—কিন্তু সে তো শুনেছি অনেক টাকা ডিপোজিট রাখতে হয়?

—আরে সে হয়ে যাবে। এ তো শুধু গাঁজা আর আপিং—মদ তো আলাদা। খুব বেশী লাগবে না। তাছাড়া লাইসেন্স পেয়েছি জানলে অমন অনেক মিঞা ধার দেবে।

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে। তারপর থেকে প্রায় রোজই শহরে যেতে শুরু করল সে। ফেরে কোন কোনদিন শেষ বাসে, কোনদিন বা আরও পরে—রিক্সা করে। প্রশ্ন করলে ভারিক্কী চালে উত্তর দেয়, এ কি হাতের মোয়া যে হাত-পাতলেই পাওয়া যাবে? এর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

সে কাঠখড় পোড়ানোর নমুনা পাওয়া গেল কদিন পরেই। সাইকেল রিক্সা করে আসতে আসতে ঘুমিয়ে পড়েছিল—রিক্সাওলা এসে বললে,—কেউ নামিয়ে নেন আজ্ঞা, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে রেস্কাতেই।

এতরাত অবধি খাবার সাজিয়ে মানসী বসে অপেক্ষা করছে!

বিরক্তিতে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল,—ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও না।

—উঁহু, উঠবেক নাই। নেশা করেছে বাবুটা, মদ, মদ খেয়েছে।

—মদ! কী বলছ?—মাথাটা যেন ঘুরে ওঠে মানসীর।

—দেখেন না কেন এসে।

অগত্যা উঠতে হয়, ঝিকে ডাকে না সে, রিক্সাওলাকেই বলে আর একদিকে ধরতে।

ধরাধরি করে ঘরে এনে চেয়ারে বসাতেই ঘুম ভাঙ্গে সুবিমলের।

—ইস ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, না? বললুম শালাকে যে ও জিনিস ছোঁব না—শালা এমন জেদ করলে—

—তুমি, তুমি মদ খেয়ে এলে? অতিকষ্টে কথা কটা বেরোয় মানসীর মুখ দিয়ে।

হঠাৎ যেন সুবিমল চটে ওঠে, নেশাটা কেটে যায় তার।

—হ্যাঁ, খেয়েছি। কী হয়েছে তাতে? এক আধ দিন নেশা করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি।...মানুষেই মদ খায়—গরু ভেড়াকে কখনও মদ খেতে দেখেছ কোথাও?

আর শুনতে পারে না মানসী, ছুটে পাশের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাতেও রেহাই পায় না শেষ অবধি। দমাদ্দম কপাটে লাথি মারতে থাকে সুবিমল। সে আওয়াজে হয়ত ঝি উঠে পড়বে, হয়ত পাশের বাড়ি থেকে চক্রবর্তী বাবুরা ছুটে আসবেন—কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। অগত্যা দরজা খুলে দিতে হয়, খাবারও বেড়ে দিতে হয় সামনে—এবং শেষ পর্যন্ত পাশে গিয়ে শুতেও হয়।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়ার পর ইস্কুলে যাবার সময় একটা কাগজের টুকরো স্বামীর সামনে রেখে চলে যায়। কালকের ঘটনার পর আর কথা কইতে সাহস হয় না ওর—কী বলতে কি বলে ফেলবে সে ভয় তো আছেই, হয়ত কথাও কইতে পারবে না ভাল করে, তার আগেই চোখে জল এসে পড়বে।

কাগজে লিখেছিল,—আমার ঘাট হয়েছে তোমাকে রোজগার করতে বলা—তোমার আর শহরেও যেতে হবে না, ব্যবসাও করতে হবে না। দেরাজ থেকে টাকা পয়সা সরিয়ে নিয়েছি —কিছু মনে করো না। বিড়ি সিগারেট সব কেনা আছে, পয়সা আর লাগবেও না।

স্কুল থেকে ফিরে দেখল, সেই কাগজেরই উলটো পিঠে লেখা আছে,—আমি কাউকে দাসখৎ লিখে বসে নেই যে তার কথায় উঠতে বসতে হবে। চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে চললুম। ওঁকে দিয়ে দিও, নইলে তোমারই লজ্জার কারণ হবে। বলেছি যে ভুলে চাবি নিয়ে ইস্কুলে চলে গেছ।

গুম্ হয়ে বসে ছিল মানসী, ইস্কুল থেকে এসে তখনও কাপড় ছাড়েনি, মুখে-হাতে জল দেয়নি। ঝি বীণার মা রান্না শেষ করে এসে দাঁড়াল,—দিদিবাবু ওঠো, গা ধোও, একটুকু চা খাও, কখন কী করবে? আত হয়ে গেল ঢের!

'যাই' বলল মুখে কিন্তু তখনও ঠিক যেন উঠতে ইচ্ছা হল না। বীণার মাও আর তেমন তাগাদা করল না। বরং খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে একটু উশখুশ করে আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল,—একটা কথা বলব দিদিবাবু, আগ করবে নি?

—কী কথা বীণার মা? অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে যেন বলে মানসী, কে জানে কেন একটা কিসের অজ্ঞাত আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে তার।

—জামাইবাবুকে আর তুমি শহরে যেতে দিওনি বাপু।

—কে—কেন বল্‌তো?

—তুমি আগ করবে হয়ত শুনলে, আমার জামাই বল্‌তেছেল যে, জামাইবাবুর স্বভাব-চরিত্তির নাকি খুব বিগড়ে গেছে, শহরে গিয়ে খারাপ মেয়ে-মানুষের ঘরে যায় নাকি!

—কোথায়—কোথায় যায় বললে বীণার মা? কথাগুলো যেন মাথায় ঢোকে না মানসীর, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঝিয়ের মুখের দিকে।

—কী করে বলি বাপু তোমাকে, তোমরা ওসব বুঝবে নি। খারাপ মানে নষ্ট মেয়ে-মানুষ সব গো, ঐ যে যারা শহরে বাজারের ধারে মুখে খড়ি মেখে দাঁইড়ে থাকে—তাদের ঘরে নাকি সেঁধোয় মধ্যে মধ্যে—

—মিথ্যে কথা। তোমার জামাই মিথ্যে কথা বলেছে। আর যে দোষ থাক—ও দোষ ওঁর নেই।

—সেকালেই তো বলেছিলুম দিদিবাবু, তুমি আগ করবে।...তবে এও বলি বাপু, য়্যাদ্দিন বলিনি, আমার খুকী বেণা এবাড়িতে আর আসতে চায় নি কেন—তা কোন দিন খোঁজ করেছ? একবার তোমার বরকে শুধিয়ে দেখো—। আমার সামনে শুধিও—দেখব কী জবাব দেয়। মুখ শুকিয়ে আম্‌সি যদি না হয়ে যায় তো ত্যাখন বোলো আমায়, আমার নামে কুকুর পুষো।

আর একটাও কথা কইতে পারে না মানসী, আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে।...

সেদিন সুবিমল আসে সকাল করেই—দশটার মধ্যেই বাড়ি পেঁছয়। বোধহয় সে

একটা প্রচণ্ড ঝড় আশা করেছিল। মনে মনে সেজন্য প্রস্তুতও হয়ে এসেছিল। কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। এ রকম সে কখনও দেখে নি এর আগে। ঝিয়ের কাছেই ভাত চেয়ে খায় সে, বাইরে অন্ধকারে বসে একটা বিড়ি খেয়ে চুপ-চাপ এসে শুয়ে পড়ে। মানসী যে সারারাতই সেই চেয়ারে বসে থাকে—তা জেনেও ঘরে শুতে আসতে বা খেয়ে নেবার কথা বলতে সাহস হয় না তার।...

এর দু'তিন দিন পরেই সেই ছোট্ট সংবাদটি বেরিয়েছিল : যা অনেকের চোখে পড়ে নি কিম্বা কোন বড় কাগজেও ছাপা হয় নি।

'রহস্যজনক নিরুদ্দেশ'। স্থানীয় ফকিরচাঁদ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। পরের দিন গ্রাম হইতে দুই মাইল আন্দাজ দূরে নদীর ধারে তাঁহার পরিধেয় শাড়িখানি পাড়ের কাছে জলজঘাসে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ ইহাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন, যদিও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় সংশ্লিষ্ট মহলে প্রকাশ, ভদ্রমহিলা কিছুদিন যাবৎ পারিবারিক কারণে যৎপরোনাস্তি অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে আত্মহত্যার অনুমানই সমর্থিত হয়।

কিন্তু আমরা যতদূর জানি--আত্মহত্যা করেনি মানসী। বুদ্ধিমতীর মতোই বিবাহ-বন্ধনের জেলখানা থেকে পলায়ন করেছে। কারও কারও কিছু বেশী বয়সে আক্কেল হয়--কারও বা কখনই হয় না। ওর সৌভাগ্যক্রমে মানসী প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানুষ। বিলম্বে হলেও তার চৈতন্য উদয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

একটি বাড়তি শাড়ি সঙ্গেই নিয়ে গিয়েছিল সে, সহজভাবেই বেড়াতে বেরিয়েছিল বলে কেউ লক্ষ্য করে নি। জায়গাটা জানা ছিল, বহুবার বেড়াতে গেছে। কাপড়টা ঘাসে আটকে রাখতে কোন অসুবিধা হয় নি। ওখান থেকে হেঁটে শহরে গিয়ে সেই রাত্রেই ট্রেন ধরে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে সকালের প্যাসেঞ্জার ধরে নাগপুর চলে গিয়েছিল। সেখানে ওর ছোট-ভগ্নিপতি অধ্যাপনা করেন, তিনি ওর মুখে সব শুনে এবং ওর অবস্থা দেখে—অনেক তদ্বিরতদারক করে একটা স্কলারশিপ যোগাড় করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সেখানে একটা চাকরিও যোগাড় করে নিয়েছে সে। মানসী সোম বলেই সেখানে সে পরিচিত। বিবাহের স্মৃতিটা পর্যন্ত ভোলবার জন্য এখন তপস্যা তার।

মানসীর একান্ত অনুনয়েই ওর বোন-ভগ্নিপতি কথাটা ওদের বাবা-মাকে পর্যন্ত জানায় নি—ভারত ত্যাগ করার আগে।

মধ্যাহ্ন সূর্য

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

চরিত্র

জুলিয়াস সীজার	প্রথম	সৈন্যাধ্যক্ষগণ
মারিয়াস	দ্বিতীয়	
মার্ক এন্টনী	তৃতীয়	

ডিরহাকিয়ামের রণক্ষেত্র। পম্পির সঙ্গে জুলিয়াস সীজারের যুদ্ধের শেষ দিন। যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরে পাহাড়ের ওপর জুলিয়াস সীজার পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

তাঁর মুখে গভীর চিন্তার রেখা। মুখের বাঁ দিকটা মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। এটা সীজারের মনের ভীতির চিহ্ন। দেহে রোমক সৈন্যাধ্যক্ষের সাজ। উর্ধাঙ্গে একটা বেগুনি রঙের জামা, হাতটা কব্জির কাছে এসে শেষ হয়েছে। সমস্ত জামাটাই ঢিলে। কোমরবন্ধটাও আলগার ওপর, ডান কাঁধ থেকে একটা টকটকে লাল ফিতে কোমরবন্ধটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করছে। কোমরে একদিকে ছোট রোমান তরবারি অন্যদিকে একটা ছোট ছোরা। কিছুদূরে ঈগল-লাঞ্ছিত বড় রোমান ঢাল। সীজারের সর্বাঙ্গ বর্মাচ্ছাদিত কিন্তু মাথা শূন্য। মাথার পেছনে টাক পড়েছে, চুলের সামনের দিকটা পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। কানের দু'পাশের চুল পাকতে সুরু করেছে। সীজারের বয়স এখন পঞ্চাশ কিন্তু শরীরের বাঁধন দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছরের যুবা। খৃষ্টপূর্ব ৫০ অব্দ।

সীজারের দেহরক্ষী মারিয়াস কিছুদূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পূর্ণ যোদ্ধৃবেশ। মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে বল্লম। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ৩০ বছরের কর্মঠ যুবা।

সীজার। মারিয়াস কিছু দেখতে পাচ্ছ?

মারিয়াস। না।

সীজার। ভাল করে দেখ।

মারিয়াস। ওরা নদী পার হবার কোন চেষ্টা করছে না।

সীজার। ভাবনা কোর না। ওরা এখুনি নদী পার হবে। তারপর—তারপর...

মারিয়াস। সীজার আপনি ভয় পেয়েছেন?

সীজার। হ্যাঁ পেয়েছি। দেখছ না আমার মুখের বাঁদিকটা কি রকম চমকে চমকে উঠছে।

মারিয়াস। আমরা শুনেছি ভয় কাকে বলে জুলিয়াস সীজার জানে না।

সীজার। সত্যি কথা শুনেছ। তোমাদের দলনেতা যে জুলিয়াস সীজার সে ভয় কাকে বলে জানে না। সৈন্যদলের পুরোভাগে থেকে সে যুদ্ধ করে। বিজয়লক্ষ্মী তার দাসী।

মারিয়াস। তবে?

সীজার। আর একটা সীজার আছে যে মানুষ। উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে সে কোন অন্যায় করতে দ্বিধা করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সে ভয় পায়, মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনায় সে কেঁপে ওঠে। দুটো লোকের মাঝে অনেক তফাৎ।

মারিয়াস। আমার মন বলছে সীজার, এবারও আমরা জয়ী হবো। আমার একটুও ভয় করছে না।

সীজার। তুমি বালক মারিয়াস। আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হোল। যেদিন রোমের একনায়ক খুল্লা আমাকে দেব জুপিটারের মন্দিরের পে　　থেকে তাড়িয়ে দিল সেদিন থেকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হয়েছি। আমি বুঝতে পারছি—আজকেই আমার জীবন শেষ।

মারিয়াস। কিন্তু এখনও ওরা নদী পার হতে আরম্ভ করেনি।

সীজার। তোমার চোখের সামনে করেনি—তোমার দৃষ্টির বাইরে পার হচ্ছে কিনা দেখবে কি করে। মনে রেখ পম্পি একজন বিচক্ষণ সেনাপতি।

মারিয়াস। কিন্তু তিনি তো সীজার নন।

সীজার। না, পম্পি—পম্পি। ভাব দেখি মারিয়াস কিভাবে পম্পি জুলিয়াস সীজারকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। আমাদের পেছনে পাহাড়—সামনে নদী—পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ। পম্পি যুদ্ধ করল না—ও আমাদের অবরোধ করল। যুদ্ধ করার পক্ষে যে জায়গা ছিল সব থেকে প্রশস্ত—অবরুদ্ধ হয়ে সেটাই হোল মৃত্যুগৃহ। আজ সাতদিন সাতরাত অনাহারে অনিদ্রায় আমাদের সমস্ত সৈন্য ক্লান্ত—শ্রান্ত, তাদের মনের জোর কমে আসছে। যতবার ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করেছি ততবার হার মানতে হয়েছে। এখন পম্পি নদী পার হলেই দেখবে দলে দলে সৈন্য মরবে, নয়তো আত্মসমর্পণ করবে।

মারিয়াস। আমরা যুদ্ধ করবো সীজার। আপনি আমাদের চালনা করলে আমরা জিতবই।

সীজার। মারিয়াস, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি আমি দুজনেই পরপারে যাত্রা করবো। কয়েকটি কথা বলি। তুমি কি মনে কর কেবল সাহস আর বুদ্ধি থাকলে যুদ্ধ জয় করা যায়?

মারিয়াস। মহান সীজার যে দলের নেতৃত্ব করেন সে দল কখনও যুদ্ধে হারে না।

সীজার। বালক। একটু পরেই দেখবে যখনই পম্পির সৈন্য নদী পার হতে আরম্ভ করেছে—সীজার, মানে মানুষ সীজার, তোমাদের দলপতি সীজার নয়, এই তরবারি তার বুকে আমূল বসিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ সীজার অপরাজেয়, কিন্তু পম্পির আক্রমণের আগে পর্যন্ত.........কি অমন করে কি দেখছ?

মারিয়াস। দেখছি সীজার আমাকে পরীক্ষা করছেন। আমি কিন্তু আপনার প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকবো, কিছুতেই আমাকে টলাতে পারবে না।

সীজার। সত্যই তুমি বোকা! তুমি তো একজন যোদ্ধা, তুমি কি বিশ্বাস কর সীজার সমস্ত যুদ্ধে আপনা থেকেই জয়ী হন।

মারিয়াস। আমরা সবাই বিশ্বাস করি সীজার অপরাজেয়।

সীজার। আঃ সেই এককথা বারবার। অপরাজেয়!! তুমি কি জানো প্রতি যুদ্ধের আগে কিভাবে সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে হয়—অঙ্কের মত একটা একটা করে সংখ্যা বসিয়ে—কিভাবে সৈন্যচালনা করলে জয় হবার সম্ভাবনা তা' স্থির করতে হয়। ওই বৃটনদের দেশ জয় করার আগে আমি গ্যালের সমুদ্রতীরে চার মাস কেন বসেছিলাম? স্বাস্থ্যান্বেষে নিশ্চয় নয়।

মারিয়াস। আমরা জানি আপনি দেব জুপিটারের আশীর্বাদ পেয়েছেন।

সীজার। থামলে কেন তারপর বল—আমি দেবী ভিনাসের বংশধর।

মারিয়াস। আমরা তাই বিশ্বাস করি সীজার।

সীজার। মারিয়াস, মারিয়াস, তুমি আমার দেহরক্ষী। আমাকে তুমি সব সময়ে দেখছ। আমায় ভীত অবস্থায় দেখেছ, ত্রস্ত দেখেছ—তবু তুমি ওই গল্পগুলো বিশ্বাস কর।

মারিয়াস। করি সীজার।

র। তুমি, তোমাকে কি করে বোঝাই! আচ্ছা এটাতো জান বির্থিনিয়ার রাজা আমার শয্যাসঙ্গী। রোমের সিনেটে সকলের সামনে অক্টোভিয়াস আমাকে বির্থিনিয়ার রাণী বলে সম্বোধন করেছিল।

মারিয়াস। আমরা জানি সীজারের অনেক শত্রু।

সীজার। এমন কি প্রাজ্ঞ সিসেরো পর্যন্ত সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—বির্থিনিয়ার রাজা তোমায় কি দিয়েছে আমরা জানতে চাই। সেদিন লজ্জায় মনে হয়েছিল মাটির সঙ্গে মিশে যাই।.........আচ্ছা এটা তো জান, চোখেও দেখেছ রাজকুমারী নিসা আর ইয়োনোর রাণী আমার শয্যাসঙ্গিণী হয়েছে, সর্বত্র কতো মেয়েকে আমি উপভোগ করেছি, গ্যলে, স্পেনে, বৃটনে এমনকি রোমেও আমার কামনার স্রোত থেকে কেউ মুক্তি পায় নি।

মারিয়াস। আপনি যে দেবী ভিনাসের বংশধর তাই প্রমাণ করে। আর আপনি সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমরা অনুকরণ করি।

সীজার। (চিৎকার করে ওঠে) আমি মানুষ। বুঝলে, ঠিক তোমার মতো, রক্তে-মাংসে গড়া, আশা আকাঙ্ক্ষায় দোলা-খাওয়া উচ্চাশার প্রত্যাশী। তোমাদের মতো, ঠিক তোমাদের মতো নারীসঙ্গ আমার ভাল লাগে। ক্ষমতা হাতে পেতে ভাল লাগে, তোমাদের কাছে দেবতা সাজতে ভাল লাগে।

মারিয়াস। (নতজানু হয়) সীজার তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

সীজার। ওঠ ওঠ। তোমায় আমি কি করে বোঝাব যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আমার মন সঙ্গী চাইছে। আমার ভেতরকার মানুষটা তার সারাজীবনের সব অপরাধের জন্য ক্ষমা পেতে চাইছে। বোঝাতে চাইছে সে অন্যায়ভাবে যা যা করেছে তা থেকেও ভাল হতে পারতো।

মারিয়াস। সীজার কখনও অন্যায় করেন না।

সীজার। কি বললে অন্যায় করে না? সেবার মিশর অভিযানে দ্বাদশ টলেমি কি করে এত সহজে সন্ধিস্থাপন করছিল জান? কারণ সে পম্পিকে আর আমাকে ২৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়েছিল। রোমের সিনেটে সন্ধির প্রস্তাব যাতে রদবদল না হয় সেজন্য আমাকে আরো ৩৮ মণ কাঁচা সোনা উপঢৌকন দিয়েছিল। সেই অর্থ দিয়ে আমি ভোট কিনেছি তারপর কন্সাল হয়েছি, স্পেনের শাসনকর্তা হয়েছি, গ্যলের প্রদেশপাল হয়েছি। মহাত্মা কেটো তাই বলেছিলেন 'সংবিধানকে যারা নষ্ট করতে

চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে একমাত্র সীজারের পানদোষ নাই।'

মারিয়াস। আমাদের দলপতি মদ্যপ নন কারণ তিনি সীজার।

সীজার। সীজার। জান মারিয়াস, আমি ফিরে যাওয়ামাত্র আমাকে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত করার জন্য আজ মহাত্মা কেটো প্রস্তুত হচ্ছেন। আর এও জেনো তিনি যা যা বলবেন তা শুধু অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় প্রমাণসিদ্ধ।

মারিয়াস। সেই জন্যে কি সীজার চিন্তিত?

সীজার। কেটোর জন্য? মোটেই না। আমি জানি সাধারণ নাগরিকদের কি ভাবে অভিভূত করতে হয়। আমি তাদের বলব সব দেশ সমস্ত ইউরোপ জয় করে এলাম তোমাদের জন্য—এসব তোমাদের। বার বার মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছি তোমাদের জন্যে—কেন না জুলিয়াস সীজার জনসাধারণের দাসানুদাস। ভাবতে পার তাদের মনে কি উৎসাহের বন্যা ডাকবে। রোমের প্রধান দরজায় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে—আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম। তার তলা দিয়ে আমি যাব যোদ্ধার সাজে নয়, রোমের সাধারণ নাগরিকের সাজে, যেন আমি তাদেরই একজন। তাদের জন্যে কোলোসিয়ামে মল্লযুদ্ধের ব্যবস্থা করে দেব। ওই কাফ্রী বন্দীদের সিংহের সঙ্গে লড়াই করাব। নকল যুদ্ধের অভিনয় করাব তাতে যুদ্ধের বিভীষিকা থাকবে না, থাকবে উত্তেজনা, থাকবে বীরত্ব মহত্ত্ব। যে সীজারের ভূমিকায় অভিনয় করবে তাকে দেখে সকলে মুগ্ধ হবে।

মারিয়াস। (নীরব)

সীজার। কি চুপ করে আছ যে। তারপর ক্যাপিটলের পাশে যে বিরাট জলাশয় আছে সেখানে নকল নৌযুদ্ধ করাব—এমন যুদ্ধ হবে যা কখনও কোথাও হয়নি—হবে না। সেখানেই শেষ নয়, তারপর সেই জলাশয় পাথর দিয়ে ভরাট করে গড়ে তুলবো বিরাট মন্দির—ধর যুদ্ধের দেবতা মার্সের মন্দির। আমার বিপক্ষীয়দের কাছ থেকে কর আদায় করব। যে যত বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার কাছ থেকে যুদ্ধের দাম তত আদায় করা হবে। তারপর একমাসের উৎসবের শেষ দিনে ইউরিপাইডিসের 'ফিনিসিয় মহিলা দল' অভিনয় হবে। অভিনয়ের আগে জুলিয়াস সীজার সকলের উদ্দেশে তার রাজা ইডিপাস সম্পর্কীয় প্রবন্ধ পাঠ করবে। এমনকি প্রাজ্ঞ সিসেরোকে স্বীকার করতে হবে—সীজার লেখক না হলেও বাগ্মী।

মারিয়াস। সীজার কি অসুস্থ।

সীজার। কি বললে? অসুস্থ। সাবধান মারিয়াস। ওই একটিমাত্র কটূক্তি ছাড়া সীজারের আর কিছুতে রাগ নেই। মনে রেখ আমার দেহ সুন্দর। দেহের অপমান আমার কাছে সীজারের অপমানের থেকে বেশী।

মারিয়াস। সীজার ক্ষমা করবেন। (নতজানু হয়)

সীজার। ওঠ। তুমি না জেনে অন্যায় করেছ।

মারিয়াস। সীজারের দয়া সৈন্যদের মধ্যে বিখ্যাত।

(হঠাৎ দূরে আওয়াজ হয়, মারিয়াস গিয়ে দেখে সতর্ক হয়)

সীজার। (চমকে ওঠে) কি?

মারিয়াস। কিছু না, নিচে সৈন্যরা গুঞ্জন করছে। পম্পি আক্রমণ করছে না দেখে ওরাও আশ্চর্য হয়েছে।

সীজার। হবারই কথা। আমাদের খাওয়ার অভাবে দুর্বল করে, বার বার খণ্ডযুদ্ধে হারিয়ে দেওয়ার পর, একটা বড় আক্রমণই স্বাভাবিক। এবং সেই আক্রমণে পম্পির সাড়ে তিন হাজার সৈন্যের চাপে আমার দু'শো সৈন্য নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আমিও বুঝতে পারছি না পম্পি অপেক্ষা করছে কেন।

মারিয়াস। সীজার, অল্প সৈন্য নিয়ে আমরা শত্রুর বেশীসংখ্যক সৈন্যদের বার বার হারিয়েছি। সেদিন বৃটনে—

সীজার। ও তুমি ভুলে যাচ্ছ যে বৃটনের একঝাঁক বুনো লোকের পাথরের অস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর রোমের শিক্ষিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এক নয়। গৃহযুদ্ধের এই হচ্ছে সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি আর পম্পির সৈন্য, একই স্কুলে যুদ্ধ শিখেছ। পম্পি আর আমি একসঙ্গে কন্সাল হয়েছি, একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি কতবার। আজ ভাগ্যের পরিহাসে আমরা প্রতিপক্ষ। সময় এসেছে স্থির করবার যে এই বিরাট রোম সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা কে হবে—সে না আমি।

মারিয়াস। রোমের ভাগ্যবিধাতা হবেন জুলিয়াস সীজার।

সীজার। তোমার ইচ্ছা এবার পূর্ণ হবে না মারিয়াস। তারায় তারায় ভবিষ্যতের বাণী দেখছি—আজই আমার জীবনের শেষ ক্ষণ। এই ডিরহাকিয়ামের রণক্ষেত্রে সীজারের সূর্য অস্ত যাবে।

মারিয়াস। সীজারের মৃত্যু নেই।

সীজার। বাঃ বেশ বললে কথাটা। বেঁচে থাকলে কাজে লাগাতাম। আজ সব থেকে হতাশ হয়েছি কারণ আমি যেমন পম্পির যুদ্ধ পরিচালনার ধরণ জানি, সেও তেমনি আমার পরিচালনার রীতিনীতি জানে। তার ওপর আমাদের পালাবার সব পথ রুদ্ধ।

মারিয়াস। সীজার—

সীজার। চুপ কর। অন্ধভক্তিতে তুমি এখনই বলবে সীজার শত্রুকে পিঠ দেখান না। উঃ তুমি নিজের মনকে কি যন্ত্রে বেঁধেছ জানি না। শোন, আজ স্বীকার কর, অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে যে সীজার মানুষ।

মারিয়াস। সীজার দেবতা।

সীজার। এই দেবতা যখন তোমার সামনে মরে পড়ে থাকবে, তখন তাকে মানুষ বলে বিশ্বাস হবে? দেবতা! দেবতা ছিল গ্রীক আলেকজাণ্ডার। পড়েছ তার কথা। যে বয়সে সে পৃথিবী জয় করে পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেল সে বয়সে আমি ভাল করে যুদ্ধ করতে পর্যন্ত শিখিনি। ভোটারদের ঘুষ দিয়ে, মাত্র নগররক্ষক নির্বাচিত হয়েছি। তারপর ক্যাডিজে যুদ্ধ করতে গিয়ে দেখলাম বীর দেবতা হেরাক্লেসের মন্দিরে আলেকজাণ্ডারের মূর্তি। নতজানু হয়ে তাকে আমার সম্মান জানালাম। বললাম, আমার

দেবতার জায়গায় তুমি বসেছ। তোমাকে অনুসরণ করে আমিও দেবতা হব। সেদিন থেকে আমি প্রচার করতে লাগলাম, সীজার দেবতা।...দেবত্ব কেবল বিশ্বাসে আসে না, কিছু অখাদ্যও চাই। তাই সৈন্যদলের মধ্যে ঘোষণা করলাম, আমার প্রত্যেক সৈন্য একটি করে ক্রীতদাস আর একটি ক্রীতদাসী রাখতে পারবে। বাড়ীতে তাদের দিলাম বিনামূল্যে ধান। বিদেশে দিলাম সোনা, আর যুদ্ধজয়ের পর সেই সহরকে যথেচ্ছ ধর্ষণ করার পূর্ণ অধিকার। তুমি তো জান এবার রোমে ফিরে গেলে প্রত্যেককে আমি কি দেব ঘোষণা করেছি?

মারিয়াস। প্রত্যেক সৈন্যকে তাদের নায্য বেতন ছাড়া আরও দেড়শো স্বর্ণমুদ্রা।

সীজার। আজকে আমি জয়ী হলে কি ঘোষণা করতাম জান?

মারিয়াস। কি?

সীজার। দেড়শো নয়, প্রত্যেক সৈন্য পুরস্কারস্বরূপ পাবে আড়াইশো স্বর্ণমুদ্রা। আর তা কেবল এই ছ'শো সৈন্য নয় রোমের পক্ষে যত সৈন্য যুদ্ধ করেছে প্রত্যেকে।

মারিয়াস। সীজার।

সীজার। সেটা স্বপ্নই রয়ে গেল মারিয়াস। ভেবেছিলাম সেনাপতির সম্মানী হিসাবে দু'শো স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে তোমাদের কাছ থেকে নেব মাত্র দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা, গ্যালের সৈন্যদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ, স্পেনের সৈন্যদের কাছ থেকে পঁচাত্তর, বৃটেনের সৈন্যদের কাছ থেকে একশো আর আমার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তাদের কাছ থেকে একশো পঞ্চাশটি করে স্বর্ণমুদ্রা। রোমের ষাটহাজার সৈন্যদের প্রাপ্য টাকার আমি কতটা পাবো হিসাব করতে পার মারিয়াস? অথচ আমার দানের মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। আমার এই উদারতাতে জনসাধারণ আমাকে সম্মান করবে, সৈন্যরা আমাকে পুজো করবে, সারা রোমে জুলিয়াস সীজারের সমকক্ষ কেউ থাকবে না। কেটো, সিসেরো ভয়ে নিস্তব্ধ হবে, খুলা সিনাকে টাকা দিয়ে কিনে নেব। দুহাতে অর্থ বিলিয়ে সমস্ত সিনেটকে আমি বশ করব। রোম আমার দাসী হবে--ওই পম্পির স্ত্রীর মতো।--পাগলের মতো কি বলছি মারিয়াস?

মারিয়াস। আপনি ভবিষ্যত বাণী করেছেন সীজার। তাই হবে। আমার সৌভাগ্য যে আজকের এই ঐতিহাসিক রাতে আমি আপনার দেহরক্ষী।

সীজার। আচ্ছা মারিয়াস কিছুতেই কি তুমি বিশ্বাস করবে না যে আমি যেখানে উঠেছি সেখানে উঠতে এমন অন্যায় কাজ নেই যা আমাকে করতে হয়নি।

মারিয়াস। যুদ্ধের সময় এমন বহুলোক মরে যাদের সঙ্গে যুদ্ধের কোন যোগ নেই। কিন্তু যুদ্ধ জয় করতে হলে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সীজার। আঃ, কিছু না জেনে চীৎকার কোর না। পেছনের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখ যে সামন্ততন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী যে দলই ক্ষমতায় সমাসীন হোক, আমার উন্নতি ঠিক হয়েছে। কি করে তা সম্ভব হোল জান? আমি অর্থ দিয়ে তাদের খুসী করেছি, চাটুকারিতা করে তাদের মন ভিজিয়েছি।

ঘুষ দিয়েছি যা তার একশ গুণ আদায় করেছি, কেবল নিজের উন্নতির জন্যে, নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে। কেন এই সব করলাম মারিয়াস, কেন এইভাবে নিজের বিবেককে গভীরতম গহ্বরে ছুড়ে ফেলে দিলাম, সেকি আজকের এই অন্ধকার রাত্রে লোকচক্ষের আড়ালে এইরকম কাপুরুষের মতো মরব বলে। উঃ বুকটা জ্বলে গেল। জীবনের সব ধিক্কার সমস্ত অপকীর্তি আমাকে তুষানলে আজ পুড়িয়ে মারছে! (কেঁদে ফেলেন)

মারিয়াস। (অবাক) সীজার আপনি কাঁদছেন।

সীজার। মারিয়াস আমায় কাঁদতে দাও। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আমার নিজের চোখের জলে পুণ্যস্নান করতে দাও।

মারিয়াস। সীজার আপনি মহান। সীজার আপনি দেবতার বরপুত্র, আপনি অমর।

সীজার। (ছোট ছেলের মতো কাঁদতে থাকেন) সারাজীবন বুকে হেটে চলেছি সরীসৃপের মত। যাদের উচ্ছিষ্ট খেয়েছি তারা কত হীন। আমি কেবল এক বিশ্বাসে চলেছি যে আমায় ক্ষমতা পেতে হবে। আজ আমি অন্তঃসারশূন্য কাঙ্গাল। বাইরের জগৎটা ভেঙ্গে পড়ল, আর ভেতরের জগতে এমন কিছু নেই যা অবলম্বন করে বেঁচে থাকবো। আমাকে দয়া কোরো মারিয়াস, করুণা কোরো।

মারিয়াস। সীজার, সীজার আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনি কেবল আমার দলপতি নন, আপনি আমার প্রভু। আমি সীজারের দেহরক্ষী, এ সম্মান আমার আমৃত্যু মনে থাকবে।

সীজার। (ক্লান্ত) মারিয়াস, তোমার কাছে আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই পম্পিকে আমি ভয় করি। সে আর আমি বহু অন্যায় একসাথে করেছি। তাকে তুষ্ট করার জন্যে আমার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার কুৎসিত মেয়ে পম্পিয়াকে বিবাহ করি, কিন্তু তাকে স্ত্রীর অধিকার দিতে পারি নি, সে বাধ্য হয়ে কোলোভিয়াসকে ভালবাসল, তখন তাকে ব্যভিচারিণী বলে ত্যাগ করলাম।

মারিয়াস। সীজারের স্ত্রী লোকোপবাদের ঊর্ধ্বে।

সীজার। (হাসে) আমি তখন কি করছিলাম জান—পম্পির দ্বিতীয় স্ত্রী মুশিয়ার প্রতি আসক্ত হয়েছিলাম। চেষ্টা করছিলাম যাতে পম্পি মুশিয়াকে ত্যাগ করে আমার প্রথম পক্ষের মেয়ে জুলিয়াকে বিয়ে করে। আজ জুলিয়া মুশিয়া দুজনাই পরস্পরের ডাক শুনেছে—পম্পি আসছে তাদের হয়ে প্রতিশোধ নেবে বলে।

(দূরে কোলাহল। সীজার চকিত। মারিয়াস দেখে)

মারিয়াস। নদী থেকে একজন লোক উঠে ছুটে আসছে।

সীজার। একজন? আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ মারিয়াস। (তলোয়ার খোলে) বিদায় মারিয়াস। ভবিষ্যতে যখন আমার কথা আলোচনা করবে—বলো আমি সম্ভবত খারাপ ছিলাম না, শুধু ক্ষমতার লোভ আমাকে পশু করেছিল। (আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়) আর একটি উপকার কোরো—(বুকের মধ্যে থেকে একছড়া বড় মুক্তোর মালা বার করেন) এই মুক্তোর মালাটা

কেটোর মেয়ে সেরভিলিয়াকে দিয়ে বলো জুলিয়াস নিজের হাতে এটা তার গলায় পড়াতে চেয়েছিল। সে বৃটনদের দেশ থেকে এটা বয়ে এনেছিল। আরও বলো যদি কখনও আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ হয়ে যায় কিন্তু ক্যাটালিন যদি তাকে ত্যাগ করেন, তাহলে কেবল ব্রুটাসের প্রয়োজনে যেন এটা বিক্রী করে। বলো, এটার মূল্য ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

মারিয়াস। সীজার পণ্ডিত, ক্যাটালিনের কন্যা--

সীজার। একমাত্র স্ত্রীলোক, যাকে আমি ভালবাসি—

মারিয়াস। আর মার্কাস ব্রুটাস—

সীজার। আমার ছেলে। আমার আত্মজ।

(আত্মহত্যা করতে যান। মারিয়াস বল্লম ফেলে দিয়ে তার হাত চেপে ধরে)

মারিয়াস। ক্ষমা করবেন সীজার, এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। আমি আপনার দেহরক্ষী। (দুজনে অল্প ধস্তাধস্তি হয়)

সীজার। আঃ ছেড়ে দাও বোকা ছেলে—পম্পি এখনই এসে যাবে।

(বাইরে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সীজার কোনদিকে? তারপরই খালি গায়ে খালি মাথায় একজন সৈন্য প্রবেশ করে, জলে আর ঘামে তার সর্বাঙ্গ সিক্ত। বহুদূর থেকে দৌড়ে আসার জন্য সে হাঁপাচ্ছে। অপূর্ব দেহধারী সুন্দর যুবক। এসে নতজানু হয়)

নূতন সৈনিক। সীজারের জয় হোক।

(সীজার উঠে দাঁড়ান। পোষাক ঝাড়েন)

সীজার। তুমি কে?

নূতন সৈনিক। আমি আপনার একজন অশ্বারোহী সৈন্য, নাম মার্ক এন্টনী।

সীজার। মার্ক এন্টনী। মার্ক এন্টনী, পাঁচদিন আগে আমি তোমাকে এবং আর পাঁচজন সৈন্যকে রসদ সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছিলাম তখন থেকে তুমি নিরুদ্দেশ।

এন্টনী। আমি রসদের খোঁজেই গিয়েছিলাম।

সীজার। কোথায়?

এন্টনী। নদীর অপর পারে।

সীজার। কি বলছ পাগলের মতো? নদীর ওপারে পম্পির তাঁবু।

এন্টনী। সেখানেই তো প্রচুর রসদ। সাড়ে তিনহাজার সৈন্যের খাবার সেখানে।

সীজার। কি বলছ, স্পষ্ট করে বল।

এন্টনী। আমি ভেবে দেখলাম রসদ পেলেও পম্পির সৈন্যবলের কাছে আমরা পিষ্ট হয়ে যাব। কাজেই এমন কিছু করতে হবে যা একাধারে আমাদের রসদ দেবে আর জয়ী করবে।

মারিয়াস। এন্টনী তুমি সীজারের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছ।

এন্টনী। না বিশ্বাস হারাইনি। তবে মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।—আর সীজার চিরকাল পম্পির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন, সেজন্য ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।

মারিয়াস। এন্টনী যুদ্ধক্ষেত্র না হলে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতাম। তোমার এত সাহস যে তুমি সীজার ভয় পেয়েছেন বলতে পারলে।

সীজার। তুমি অন্তত আমাকে মানুষ ভাব এন্টনী। যাক, তারপর কি করলে?

এন্টনী। অত্যন্ত সহজ। আমি পম্পির সৈন্যদের মধ্যে মিশে গেলাম। ক্রমে ক্রমে প্রচার করলাম সীজারের সৈন্যসংখ্যা ছয়শো নয় ছয় হাজার। তাড়াতাড়ি খবর দেবার সময় একটা শূন্য বাদ পড়েছে।

সীজার। তোমার কি পরিচয় দিলে।

এন্টনী। বললাম আমি হলাম সীজার যে শতশত স্ত্রীলোককে যুদ্ধক্ষেত্রে উপভোগ করেছেন তাদের একজনের সন্তান।

সীজার। নাম?

এন্টনী। সীজারের নাম পথের ধূলোয় নামাবার জন্যে মা আমার নাম দিয়েছে সীজারিয়ান।

মারিয়াস। না!

সীজার। সীজারিয়ান, তারপর?

এন্টনী। বললাম, চলো আক্রমণ করি, আমি তোমাদের পুরোভাগে থাকবো, সীজারের ছ'হাজার সৈন্য থাকল তো কি হয়েছে—সে কি দেবতা?

সীজার। তারপর?

এন্টনী। সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়ল। আমি বললাম আজ রাতে আক্রমণ কর নইলে কাল সকালে সীজারের বিরাট বাহিনীকে আটকাতে পারবে না। গুপ্তচরদের তিনজনকে ভাল চাকরীর লোভ দেখিয়েছি। তারা গত পরশু রোম চলে গেছে। পম্পির দু'জন সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যালভিনাম আর গাইয়াসকে বলেছি সীজার তাদের একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেবেন, যদি কাল নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সীজারের পক্ষে যোগ দেয়।—কিছুক্ষণ আগে পম্পি ভয় পেয়ে মাত্র পাঁচশো অশ্বারোহী নিয়ে রোমের দিকে ছুটেছে। আরও পাঁচশো আজ শেষরাতে যাত্রা করবে।

সীজার। মার্ক এন্টনী, তুমি অত্যন্ত ভয়ংকর খবর নিয়ে এসেছ। যদি সত্য হয় সীজারের সৌভাগ্য সূর্য রাহুমুক্ত হয়ে গেল।

এন্টনী। আমার খবর সত্য সীজার।

সীজার। মারিয়াস, পেছনের টিলাটায় উঠে দেখ কি দেখতে পাচ্ছ।

(মারিয়াসের প্রস্থান)

এন্টনী, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি?

এন্টনী। সম্পূর্ণভাবে।

সীজার। আচ্ছা তুমি কি সেই এন্টনী যে শিরস্ত্রাণ ছাড়া যুদ্ধ করে?

এন্টনী। হ্যাঁ। সীজার আমাকে মনে রেখেছেন।

সীজার। কেন?

এন্টনী। সীজারকে তো কখনও শিরস্ত্রাণ পড়তে দেখি না। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় সমস্তই তিনি খালি মাথায় বহন করেন। তাঁকে দেখেই আমি আমার জীবন গড়ে তুলেছি।

সীজার। কিন্তু তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এন্টনী, কি করে জানব যে তুমি পম্পির গুপ্তচর নও।

এন্টনী। আমার ওপর কোন কঠিন কাজের ভার দিন।
সীজার। কঠিন কাজ? কঠিন কাজ।

(মারিয়াসের প্রবেশ)

—কি?

মারিয়াস। দূরে ধূলো উড়ছে। পম্পির শিবিরে চাঞ্চল্য দেখলাম।
সীজার। এন্টনী মাত্র পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে তুমি পম্পির পেছনে ঘোড়া ছোটাও। মনে রেখ কখনও যুদ্ধ করবে না। দূর থেকে সে যেন বুঝতে না পারে তোমরা কতজন। তাকে রোমের দিকে যেতে দিও না। বরং টলেমির রাজত্ব মিশরে যেন যায়, লক্ষ্য রাখবে। রাজী?
এন্টনী। নিশ্চয় সীজার। এ অত্যন্ত তুচ্ছ কাজ।
সীজার। মনে রেখ এন্টনী, পম্পি একজন অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষ।
এন্টনী। জানি সীজার, কিন্তু আমি হলাম একজন সাধারণ সৈন্য, অধ্যক্ষপনা করে সংসারের খুঁটিতে খুঁটিতে নিজের জীবনের শিকড় জড়াইনি। আর—
মারিয়াস। মুখ সামলে কথা বল এন্টনী।
সীজার। আঃ মারিয়াস!
মারিয়াস। কিন্তু ওযে সব সৈন্যাধ্যক্ষদের হেয় করল।
সীজার। না ও পম্পিকে গাল দিচ্ছে।
মারিয়াস। কিন্তু তিনি রোমের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ।
সীজার। আর কি বলছিলে এন্টনী?
এন্টনী। বলছিলাম পম্পির বয়স ৫৫ আর আমার ২৫। যুদ্ধক্ষেত্রে ৩০ বছরের ব্যবধান অনেক।
সীজার। ঠিক বলেছ এন্টনী, যুদ্ধক্ষেত্রে ৩০ বছর অনেক। তুমি প্রস্তুত?
এন্টনী। এক্ষুনি।
র। দাঁড়াও, আজ্ঞাপত্র লিখে দি।

(লিখে দিল)

—মনে রেখ পম্পিকে মিশরে পাঠাতে হবে। তারপর আমার সঙ্গে স্যাগান্টুমে যোগ দেবে। যদি সাফল্য লাভ করতে পারো তবে স্যাগান্টুমেই তোমাকে আমি সৈন্যাধ্যক্ষ করে দেব। তুমি হবে সীজারের সব থেকে অল্পবয়সী সৈন্যাধ্যক্ষ।—যদি অসফল হও, মৃত্যুদণ্ড হবে।

এন্টনী। আমি সফল হব। বিদায়, এখনই যাত্রা করব।

(নতজানু হয়ে অভিবাদন করে।)

সীজারের জয় হোক।

সীজার। (এই চঞ্চল যুবকের ওপর মমতা যেন ঝরে পড়ছে) মনে রেখ মার্ক এন্টনী তুমি হলে সীজারিয়ান, সীজারের উত্তরাধিকারী।

(এন্টনীর প্রস্থান)

মারিয়াস। মার্ক এন্টনী সীজারের উত্তরাধিকারী?
সীজার। হ্যাঁ।
মারিয়াস। রোমান সৈন্যাধ্যক্ষদের টাকা দিয়ে যে বশ করে, সাধারণের মধ্যে মিথ্যা ভয়

লাগিয়ে যে যুদ্ধ জয় করে সেকি সীজারের উপযুক্ত?

সীজার। মারিয়াস, ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধ জয় হয়েছিল এই কথাই লেখা থাকবে, কি করে জয় হয়েছিল তা সবাই ভুলে যাবে।

মারিয়াস। কিন্তু হাতের মুঠোয় যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে পম্পি কেন পালিয়ে গেল, একথার কি খোঁজ করবে না কেউ?

সীজার। না। তারা পম্পির চরিত্রের মধ্যে এই হঠাৎ ভীরুতার কারণ খুঁজবে আর কারণ পেতে দেরী হবে না।

মারিয়াস। সীজার এই অন্যায়, এই অসত্যই কি জীবন? এই-ই কি জাগতিক নিয়মে স্বাভাবিক?

সীজার। হ্যাঁ মারিয়াস প্রতিদিনের জীবনে এই-ই স্বাভাবিক। সত্য, বিশ্বাস, ন্যায়, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের জন্যে। কিন্তু ক্ষমতা পাবার চিরকালের পথ অন্যায় আর অসত্যের মধ্যে দিয়ে। আমার সঙ্গে পম্পির তফাৎ কোথায় জান? পম্পি ক্ষমতা চাইছিল, কেবলমাত্র নিজের জন্য, আমি ক্ষমতা চাই নিজের আর দেশের ভাল করার জন্য।

মারিয়াস। ইচ্ছাপূরণের ক্রমবিকাশ যদি সত্যের মধ্যে দিয়ে না হয় তাহলে উদ্দেশ্য ভাল হলেও ব্যর্থ হয় নাকি?

সীজার। না দুটি ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি হোল ভিত্তিস্থাপন, দ্বিতীয়টি গঠন। ভিত্তিস্থাপনের সময় নানা আবর্জনা দিতে হয়, কিন্তু তার ওপরের ইমারৎ যদি সুন্দর হয় তাহলে কেউ দেখতে চাইবে না ভিত্তিস্থাপনে কতটুকু ময়লা আছে।

মারিয়াস। এই কি শ্বাশ্বত নিয়ম?

সীজার। এই রাষ্ট্রপরিচালনার নিয়ম।

মারিয়াস। তাহলে সীজার, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমার বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের যুদ্ধ আসবে না।

সীজার। আসবে কেবল যদি তুমি কোন দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ কর। ধর্মের অন্ধতায় পার্থিব জগতকে অস্বীকার কর।

মারিয়াস। আমার দেবতা জুলিয়াস সীজার। তাঁর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি। সীজার আমায় মুক্তি দিন।

সীজার। মুক্তি তোমাকে দিতেই হবে মারিয়াস। দেবতা সীজারের মানুষ রূপ দেখেও তোমার মনে তার আসন টলে নি। কিন্তু তুমি আজ যা জেনেছ আর দেখেছ তাতে মানুষ সীজার তোমাকে ভয় করতে সুরু করেছে। তোমার কাছে সে কখনও আর দেবতা হতে পারবে না। তুমি যা আজ জেনেছ তা অন্যে জানলে সীজারের দেবত্বের অভিনয়ও টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।

মারিয়াস। সীজার আজ্ঞা করুন।

(সীজার দ্বিধা করে)

—আমি সীজারের আজ্ঞাবহ।

সীজার। তোমাকে মৃত্যু-বরণ করতে হবে মারিয়াস।

মারিয়াস। আমি প্রস্তুত।

(শিরস্ত্রাণ, বল্লম রেখে, বুকের বর্ম সরিয়ে বসে)

সীজার। মারিয়াস তুমি কি পাগল?

মারিয়াস। আমি সীজারের আজ্ঞাবহ। সীজার কখনও অন্যায় করেন না, সীজার কখনও পরাজিত হন না।

সীজার। মারিয়াস আমি জানি, আমি পশু শক্তির উপাসক। কোন ন্যায় বা নিয়ম আমার উন্নতিকে ব্যাহত করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে আমার হাত উঠছে না।

মারিয়াস। (হঠাৎ অত্যন্ত ব্যবহারিক গলায়) সীজার আমায় হত্যা কর। তোমার সঙ্গে আমার আদর্শগত মিল ভেঙ্গে গেছে। আমার মধ্যে এক দেবতা জেগে উঠছে যে বলছে সত্য দিয়ে সত্যকে পেতে হবে। মানুষের জয়গানে মানুষকে বড় করতে হবে, পশুত্বকে ধ্বংস করতে হবে। এই রাত্রের পর বেঁচে থেকে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করব কি করে। আজকে যে তুমি আমাতে আশ্রয় নিয়েছিলে, আমার ভাবাদর্শে আত্মসমর্পণ করেছিলে,—তোমার বিরুদ্ধাচরণ করলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, তোমার পক্ষে থাকলে নিজের সঙ্গে মিথ্যাচার করা হবে। আমাকে এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দাও সীজার—

সীজার। মারিয়াস!

মারিয়াস। আমার দেবতা সীজারের হাতে আমার মৃত্যু হবে, এটা কি কম সৌভাগ্য। এস বন্ধু, আমি প্রস্তুত।

সীজার। তবে তাই হোক।

(কোষ থেকে তরবারি বার করে মারিয়াসের বুকের কাছে ধরে)

মারিয়াস, ভাই আমাকে ক্ষমা কর।

(বিদ্ধ করে)

মারিয়াস। সীজারের জয় হোক।

(মারিয়াসের দেহ লুটিয়ে পড়ে। তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ ঢুকল)

১ম, ২য়, ৩য়। সীজারের জয় হোক।

প্রথম। আমাদের গুপ্তচরেরা খবর এনেছে, পম্পি পলাতক। তার সৈন্যরা ভীত। কে একজন রাষ্ট্র করেছে যে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছয় হাজার।

দ্বিতীয়। মার্ক এন্টনিকে আপনার আদেশমত পঞ্চাশটি ঘোড়া আর পঞ্চাশজন সৈন্য দেওয়া হয়েছে সীজার।

সীজার। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আজ রাত্রেই আমরা পম্পির সৈন্যদের আক্রমণ করবো। কোন চিন্তা কোর না সীজার অপরাজেয়।

প্রথম। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কি করে এরকম হোল।

দেবতারা সহায় হলে সবই হয় সেনাপতি। তুমি ঘোষণা করে দাও যুদ্ধজয়ের পর রোমে ফিরে মার্সদেবের এক বিরাট মন্দির তৈরী করবো। যারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের ইহকাল পরকাল দুই যাবে।...আর শোন, পম্পির কোন সেনাপতি বা সৈন্য আমাদের দলে আসতে চাইলে

সাদরে তাদের গ্রহণ করবে। দেবতা জুপিটার সাক্ষী, আজ থেকে দশ দিনের মধ্যে আমরা সেগেন্টুমে পেঁছে উৎসব করবো। সীজার কখনও মিথ্যা বলে না।

১ম, ২য়, ৩য়। যে আদেশ।

সীজার। শোন মার্কস।

তৃতীয়। আজ্ঞা করুন।

সীজার। তোমার বাবা, আমার বন্ধু টিটুরিয়াসকে কি পাশবিকভাবে পম্পি হত্যা করেছিল তোমার স্মরণ আছে?

তৃতীয়। আছে সীজার।

সীজার। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মার্কস, তোমার পিতৃহন্তা পম্পি ভবিষ্যতে মিশরের টলেমির কাছে আশ্রয় নেবে। তুমি দশজন সৈন্য নিয়ে যাত্রা কর, টলেমি যেন পম্পিকে রাজপ্রাসাদে থাকতে না দেন। আমার পত্র নিয়ে যাবে।

তৃতীয়। শুধু কি ওই লেখা থাকবে? পম্পিকে হত্যার আদেশ দিন সীজার।

সীজার। বন্ধু টিটুরিয়াসের মৃত্যুরদিন আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যতদিন টিটুরিয়াসের ঘাতক জীবিত থাকবে ততদিন কোন উৎসব করব না। বহুদিন গত হয়ে গেছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের উৎসব আগতপ্রায়।

তৃতীয়। বুঝেছি সীজার। আমি প্রস্তুত হতে চললাম।

(প্রস্থান)

প্রথম। (হঠাৎ মারিয়াসের মৃতদেহ দেখে) এ কি?

সীজার। ও কিছু না, আমার একজন দেহরক্ষী, পম্পি আক্রমণ করবে বলে পালিয়ে যাচ্ছিল। বেচারার ভীষণ মৃত্যুভয় হয়েছিল। তার জন্যে হয়তো তাকে হত্যা করার প্রয়োজন হোত না কিন্তু হতভাগাটা আমার বহুমূল্য মুক্তোর মালাটা চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিল। সেইজন্যে বধ করতে বাধ্য হলাম।

দ্বিতীয়। এ যে মারিয়াস, সব থেকে সৎ আর কর্তব্যপরায়ণ বলে ওর খ্যাতি ছিল।

সীজার। যুদ্ধের সময় মৃত্যু-ভয় কাকে যে কি করে দেয় কেউ বলতে পারে না।

দ্বিতীয়। আপনি ওর কাছে দেবতা ছিলেন।

সীজার। তাই দেবতার মুক্তোর মালা অপহরণ করতে দ্বিধা করেনি, ভেবেছিল আমিও ওই মন্দিরের দেবতার মতো চুপ করে থাকবো।

(মারিয়াসের মৃতদেহের কাছে গেল, পা দিয়ে তার দেহটা উল্টে দিল। তারপর বুকের কাছ থেকে মুক্তোর মালাটা টেনে বার করল। মারিয়াসের রক্তে সেটা রাঙগা!)

১ম, ২য়। কি ভয়ঙ্কর!!

সীজার। (রক্তমাখা মালাটি তুলে ধরে) এমন অমূল্য সম্পদ দেখেছ কখনও। পৃথিবীতে এর আর জুড়ি নেই।

(মালাকে চুমা খায়)

—যাও প্রস্তুত হও।

(সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়ের প্রস্থান)

সীজার গিয়ে ধীরে মারিয়াসের দেহের কাছে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকে :

সীজার। মারিয়াস, তোমার মতো অন্ধ বিশ্বাস আমাকে সকলের কাছে পেতে হবে। রোম যখন আমার হবে তখন তোমার অনেক কথা আমার মনে পড়বে। সব থেকে বেশী স্মরণ করব তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কথাগুলো, 'সীজার অপরাজেয়, সীজার অমর, সীজার অন্যায় করেন না, সীজারের স্ত্রী লোকাপবাদের ঊর্ধ্বে।' যারা মনে প্রাণে একথাগুলো সত্য বলে মানবে না, তাদেরও মুখে এই কথাগুলো বলতে আমি বাধ্য করব।—বিদায় মারিয়াস, জগতের কোথাও দেবত্ব নেই, তাই তুমি থাকলে না, কিন্তু সীজার থাকল। তোমরা সর্বদা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সীজাররা চিরকালের, চিরকাল থাকবে।

(চোখে অশ্রু দুটি মুক্তোর মতো টলটল করে উঠল। সীজার চলে গেলেন।) *

আধুনিক সাহিত্য

কিছুকাল হ'ল "অজিত দত্তের কবিতা-সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়েছে। অজিত দত্তের সমসাময়িক, এমন কি বয়োকনিষ্ঠ, জনকয়েক কবিদের রচনা-সংগ্রহ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর নিজ কবিতা-সংগ্রহ সে-তুলনায় যে কিছু দেরিতে বেরল তার কারণ সম্ভবত তাঁর স্বাভাবিক প্রকাশকুণ্ঠা। সুলভ প্রচারব্যগ্র ত্রস্ত মুদ্রণপরায়ণ যুগে এই প্রকাশকুণ্ঠা অবশ্যই সাধু সংযম। সচরাচর রচনা-সংগ্রহ তখনই প্রকাশিত হয় যখন লেখক-জীবনে পরিপূর্ণতা লক্ষ্য-সাধ্য হয়। অবশ্য জনৈক ইংরেজ লেখক চব্বিশ বছর বয়সেই "ওয়র্ক্‌স্‌ অব্‌ ম্যাকস বিয়র-বম্‌" নামে নিজ রচনা-সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর কৌতুকী জীবনবীক্ষার সে-ও এক নিদর্শন। কখনো বা সমুচিত সময়ের পূর্বেই কোনো লেখকের রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবলী যখন সংগৃহীত হয়েছিল তখন না বয়োধর্মে না আত্মাভিব্যক্তির পূর্ণতায় কবিজীবনে কোনো সমাপ্তিরেখা টানা সম্ভব ছিল। তবুও রচনা-সংগ্রহে সমাপ্তি না হ'লেও অন্তত প্রবল ছেদ অবশ্যই সূচিত হয়। (যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাবলী প্রকাশের পরে তাঁর কাব্যের নব পর্যায় শুরু হয়েছিল।) অজিত দত্তের কবিতা-সংগ্রহ সর্বতোভাবে সময়োচিত হয়েছে কেন না বাংলা সাহিত্যপ্রবাহের যে-অংশে বয়োধর্মে তাঁর কবিজীবনের অভিযাত্রা, সে-অংশ আজ ইতিহাসের অন্তর্গত, সে-অংশ নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে এবং এখনো হচ্ছে, অন্তত একটি গবেষণা গ্রন্থও রচিত হয়েছে। অতএব এই কবিতা-সংগ্রহ অজিত দত্তের নিজ কবিজীবনে এবং বাংলা সাহিত্যের যুগজীবনে একটি পর্যায়-অবসানের নিদর্শন। অজিত দত্তের কবিজীবন প্রায় চল্লিশ বছর। যাঁদের বয়স চল্লিশের অর্ধেকও হয়নি তাঁদের দৃষ্টিতে সম্ভবত চল্লিশ বছর মনে হবে ধূসর দীর্ঘ কাল, ইতিহাসের পুরানো অধ্যায়, কিন্তু আজ এই কবিতা-সংগ্রহ হাতে পেয়ে কবির কোনো সমবয়সীর কল্পনায় যদি প্রসারিত বৎসরগুলি সহসা হ্রস্বীভূত হয়ে যায়, চল্লিশ বৎসর আগেকার ঘটনা যদি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে মনে হয় মাত্র সেদিনের ঘটনা, যদি মনে হয় এই তো মাত্র সেদিন সেকালে-অখ্যাত জনকয়েক সমহৃদয় তরুণের সাহিত্যচক্রে অজিত দত্তের সদ্যোরচিত কয়েকটি কবিতা পঠিত হ'ল, একাধিক বার পঠিত হ'ল, কারুর হয়তো বা মুখস্ত হয়েও গেল, তাহলে (আশা করি) বয়োকনিষ্ঠগণ প্রবীণের এই ক্ষণিক কল্পনাবিলাস ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখবেন এবং তাঁরা যদি অজিত দত্তের কাব্যের অনুরাগী হয়ে থাকেন (না হওয়া অসম্ভব মনে হয়) তাহলে বুঝবেন যে শিল্পানুভূতিতে কালের ব্যবধান মিলিয়ে যায়, চল্লিশ বছর আগেকার কবিকর্ম এবং আজকের সংবেদনা অনায়াসে সমীকৃত হয়।

২

এই সংগ্রহ গ্রন্থটি পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কবিতারই সংগ্রহ এমন নয়। কিছু নতুন কবিতা এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ভূমিকায় অজিত দত্ত বলছেন, '১৯৫৯ সালের

পরে যে-সব কবিতা লিখেছি তাতে আর একখানি বই হতে পারে, এবং সেগুলিকে এ-সংগ্রহ থেকে বাদ দেওয়াই আমার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু প্রকাশকের বিশেষ অনুরোধে এবং আমার কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনুরাগী ও কৌতূহলী পাঠককে একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে সে-কবিতাগুলির মধ্য থেকেও কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করলাম।' অন্য কবিতাগুলি, কবি বলছেন, তাঁর সাতখানি কবিতার বই থেকে সংগৃহীত।

এ বিষয়ে আমি কিছু সংশয় বোধ করছি। আমার নিজের কাছে দুর্ভাগ্যবশত অজিত দত্তের সব কয়টি আলাদা কাব্যগ্রন্থ নেই. কিন্তু যে কয়টি আছে তারই অবলম্বনে দেখতে পাচ্ছি যে আরো কিছু কবিতা আছে যেগুলি ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে (অথবা আদৌ) প্রকাশিত হয়নি। আলোচ্য সংগ্রহে 'কুসুমের মাস' শিরোনামার নিচে অন্যান্য কবিতার সংগে এই কয়েকটিও অন্তর্গত হয়েছে :—

বার্তা; কবিতা; ছায়াসঙ্গিনী; জরাস্বপ্ন; একটি মেয়ে; হিতোপদেশ।

আমার 'কুসুমের মাস' প্রথম সংস্করণ, প্রথম সংস্করণে এই কবিতা কয়টি নেই, দ্বিতীয় সংস্করণটি আমি দেখিনি, হতে পারে যে উপরোক্ত কবিতা কয়টি দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পেয়েছিল। অন্য কবিতাগুলি ঠিকই আছে মনে হয়। আমার কাছে অন্য যে তিনখানা কাব্য-গ্রন্থ আছে—'পাতাল কন্যা', 'নষ্টচাঁদ', 'ছায়ার আলপনা'—সেগুলির শিরোনামার অধীনে যে-সব কবিতা এই সংগ্রহে সংকলিত হয়েছে তার কোনোটিই আদি গ্রন্থের বহির্ভূত নয়।

কবিতাগুলির রচনাকাল নির্দেশ সম্বন্ধে কবি এই সংগ্রহে অবহিত হয়েছেন। হওয়াই স্বাভাবিক এবং উচিত, বিশেষত যে-ক্ষেত্রে কবি প্রবীণ বয়সে নিজ কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে চেতনাসম্পন্ন এবং definitive অর্থাৎ চূড়ান্ত সংস্করণ প্রস্তুত করছেন। অজিত দত্ত বলছেন, 'এই সংগ্রহে প্রথম সংস্করণের মূল রচনাটিই যথাযথ রক্ষা করেছি।' পরিবর্তন পরিবর্ধনাদি তিনি কমই করেছেন। এটাই সংগত। এ-বিষয়ে আমি কোনো সূক্ষ্ম বিচার করিনি কিন্তু রাণী—রানি, পাখী—পাখি গোছের আধুনিকীকৃত দুই চারিটি বানান এবং 'জ্যর্মণ কবি Arthur Fitger -এর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ থেকে'—এই নির্দেশিকার পরিবর্তে 'জর্মণ কবিতা থেকে'—এহেন অতি লঘু কিছু পরিবর্তন ছাড়া কোনো লক্ষ্যযোগ্য আঙ্গিকী পরিমার্জন দেখতে পাইনি। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা এবং আজকের সাহিত্য-রুচির মাঝখানে কবি কোনো আধুনিকী আঙ্গিকায়ণ দাঁড় করান নি, যেমন কোনো কোনো খ্যাতনামা কবি (যথা ইয়েটস) করেছেন। স্পষ্টতই কবি অজিত দত্ত স্বীয় কবিপ্রকৃতির সব পর্যায় সম্বন্ধেই প্রত্যয়সম্পন্ন এবং সম্ভবত সেই প্রত্যয়ের মূলে তাঁর বিশ্বাস যে অন্তিম বিচারে কাব্যের মর্যাদা আধুনিকতায় নয়, চিরন্তনতায়।

ভূমিকায় কবি বলছেন যে কবিতাগুলির রচনা-তারিখ নির্ধারণ করা দুরূহ বোধ করেছেন। কখনো কখনো আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অথবা প্রকাশকালের উপর নির্ভর করে আনুমানিক তারিখ দিতে হয়েছে।

সাহিত্যের আলোচনায় সন তারিখ পাঠান্তর প্রভৃতি আপাত-অশৈল্পিক তুচ্ছ গ্রন্থকীটকর্ম আসলে শিল্পপ্রাণসন্ধানের অপরিহার্য পন্থা। বিশেষত যেখানে কবি মনে করেন (যেমন অজিত দত্ত সদ্বিবেচকের মতোই মনে করেন) যে 'কবির কাব্যসাধনার সকল-গুলি স্তর পাঠক বা সমালোচকের কাছে উন্মুক্ত থাকাই বোধ হয় ভাল'। এই সংগ্রহের কবিতাগুলি কবির শিল্পসাধনার বহুস্তরী অভিব্যক্তি এই জ্ঞানে গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করতে

গিয়ে প্রথম দিককার কিছু কবিতার সন-তারিখ নির্দেশিকাগুলি সম্বন্ধে আমি সংশয়ী হয়েছি।

'পাশাবতী' (৩১ পৃঃ) : প্রথম ছত্র, 'যেখানে রুপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও'—এই কবিতাটি আদি 'পাতালকন্যা' গ্রন্থের প্রস্তাবনা কবিতা হিসাবে ছাপা হয়েছিল, তখন তার শিরোনামা কিছু ছিল না। আলোচ্য সংগ্রহে শিরোনামা দেওয়া হয়েছে এবং কবিতাটির নিচে তারিখ দেওয়া হয়েছে : '১৯৩৪?'—অর্থাৎ তারিখ সম্বন্ধে কবি স্বয়ং সংশয়ী। 'কুসুমের মাস' গ্রন্থের গোড়ায় যে-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাপা আছে তার তলায় দেখছি তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯.১০.৩০; বইখানা ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি এক কপি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, তাঁর দস্তখতের নিচে তারিখ দেওয়া আছে ১৪.১১.৩০। যেহেতু কবিতাটি 'কুসুমের মাস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেজন্য ধরে নিচ্ছি যে ১৯.১০.৩০-এর পূর্বে রচিতই হয়নি। তারিখ সম্বন্ধে আমার নিজের কাছেও কোনো 'পাথুরে' প্রমাণ নেই কিন্তু আমার স্মৃতিনির্ভর বিশ্বাস (কয়েকটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ আত্মজৈবনিক স্মৃতি) যে কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯৩০ এর পুজোর কিছু পরে, সম্ভবত পুজো ও বড়দিনের মাঝামাঝি। আমার প্রস্তাবিত রচনা-তারিখ হচ্ছে ডিসেম্বর ১৯৩০। কবি বলছেন ১৯৩৪, সেটা বোধহয় কবিতাটির পরিমার্জনা কালের তারিখ।

'হিব্রুর ছায়ানুসরণে' (৪৪-৪৫ পৃঃ) : প্রথম ছত্র, 'তোমার মুখের চুমা পাই যেন, হে মোর সুন্দর!'—তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯৩৮। আমার ধারণা রচনা-তারিখ দশ বছর পেছিয়ে যাবে। আমার বেশ স্মরণ হয় সেকালে অজিত দত্ত এবং আমরা আরো জনকয়েকে যে-কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের অনুরাগী ছিলাম তন্মধ্যে একখানা ছিল ওয়লটার স্কট পাব্লিশিং হাউস্ প্রকাশিত ছোট্ট ৫ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি সাইজের একখানা পকেট-বই, ইয়াঙ্কো লাভ্‌রিন্ সম্পাদিত আধুনিক জার্মান কবিতার সংকলন। অজিত দত্ত বইখানা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন—অনুবাদ নয়, ভাবানুসরণ বলাও যথার্থ হবে না, সমপ্রেরণা গোছের কথা ব্যবহার করলে কিছুটা সমীচীন হতে পারে—সেই দুটি কবিতাই প্রথমে 'পাতালকন্যা', পরে আলোচ্য সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটির ('সন্ধ্যার প্রার্থনা') তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৯২৮। প্রথম কবিতাটির ('হিব্রুর ছায়ানুসরণে') তারিখও একই হবে। আরো কয়টি কবিতার তারিখ যা দেওয়া হয়েছে সে-বিষয়ে আমি সংশয়ী (আত্ম-জৈবনিক ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতিনির্ভরে)। কবির দেওয়া তারিখগুলি সম্ভবত পরিমার্জনা কালের তারিখ, মূল রচনা-তারিখ পেছিয়ে যাবে, এই পেছনো তারিখেই কবিতাগুলি আমি প্রথম পড়েছি বলে স্মরণ হয়। কবিতা কয়টি :—'কালের পাখি', 'পুলিশ', 'মিস্—' 'এক-বার মনে হয়, দূরে বহুদূরে, শাল তাল', 'ন খলু ন খলু বাণঃ'। অজিত দত্তের প্রথম দুই গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনা-তারিখ বুদ্ধদেব বসুর স্মরণে থাকতে পারে। আমার কিছু স্মরণ আছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্মরণ-শক্তি ছিল যাঁর সেই পরিমল রায় আর ইহলোকে নেই।

৩

সন-তারিখের বিষয়টি মূল্যবান বলে সামান্য আলোচনা করলাম, মূল্যবান কেন না, আমার বিবেচনায়, অজিত দত্ত বিগত অর্ধশতাব্দীর বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অপরিহার্য

প্রধান কবি, এহেন কবির শিল্পজীবনের উন্মোচন এবং অভিব্যক্তি সযত্ন অধ্যয়নের বিষয়, আজ এবং আগামী কাল। তাছাড়া, সচরাচর লেখকদের প্রথম সাধনাকাল সম্বন্ধে তথ্যাদি পরবর্তীকালে লুপ্ত অথবা অনিশ্চিত হয়ে যায়। সে-কারণেই আলোচ্য সংগ্রহ থেকে একটি কবিতা অনুপস্থিত দেখতে পেয়ে আমি ক্ষুব্ধ বোধ করছি। কবিতাটি 'কুসুমের মাস' অন্তর্গত 'এমনি বাঁচিয়া র'বো'-শীর্ষক চারিটি চতুর্দশপদীর মালা। কবিতাটি নিজস্ব শিল্পসৌকর্যেই নির্বাচনযোগ্য ছিল।—

> আমার চরণ-নিম্নে জন্ম-মৃত্যু নিত্য মুরছায়—
> তবু জাগে ঊর্ধ্বশির সমুন্নত আমার জীবন।
> পলে-পলে প্রাণ জাগে—দণ্ডে-দণ্ডে মৃত্যু মৃত্যু লভে,
> বক্ষ-পট ভরি' ওঠে অনন্তের প্রীতির গৌরবে।

হয়তো মোহিতলালী সুরের দূরাগত রেশ পাওয়া যায় তবুও তরুণ বয়সেই ভাষা ও চিন্তার যে-অসাধারণ দার্ঢ্য ও সংহতি কবি অর্জন করেছিলেন তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় এসব ছত্রে। আরেকটি কারণেও কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটি এবং বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' গ্রন্থের 'কোনো বন্ধু-র প্রতি' কবিতাটি যুগ্মতায় সম্পর্কিত।

> তথাপি বাঁচিয়া র'বো, সঙ্গীহীন, দৃপ্ত, একরথ।
> জীবন ভুঞ্জিতে হবে মুক্তবক্ষ জলধির সাথে,
> পর্বতের শিলাজানু ভেদ করি' বিরচিয়া পথ
> একাকী পশিতে হবে প্রাণদম্ভী জ্যোতিষ্ক-সভাতে।
>
> (অজিত দত্ত)
>
> মানুষ দেখে না কভু যে-আকাশ, আমরা সেথায়
> রচিবো অদৃশ্য চক্র দীর্ঘপক্ষ করিয়া বিস্তার।
> পৃথিবীর মানচিত্রে যে-সমুদ্র কখনো লেখেনি,
> আমরা করিব নৃত্য তরঙ্গারোহণ করি' তার।
>
> (বুদ্ধদেব বসু)

অজিত দত্তের 'একাকী' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'আমরা', দুই বাক্‌প্রভেদ যেন দুই তরুণ কবির চারিত্রিক প্রভেদের প্রতীক, কিন্তু প্রেরণার উৎস দুই কবিতায় সমতুল্য। 'নারী—তুচ্ছ নারী ল'য়ে যাবে দিন?'—অজিত দত্তের প্রশ্ন। 'আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী আছে কি মরতে?—বুদ্ধদেব বসুর অনুরূপ প্রশ্ন। (দুটি কবিতার মধ্যে অজিত দত্তের কবিতাটিই প্রথমে রচিত হয়েছিল বলে আমার স্মরণ হয়, সম্ভবত ১৯২৯-৩০-এর শীতকালের শেষভাগে। আভ্যন্তরীণ প্রমাণেও আমার স্মৃতি সমর্থিত। 'গোরা'র সুচরিতার উল্লেখ করছেন অজিত দত্ত: 'একাকী গবাক্ষে বসি' সুচরিতা ভাবিবে উদাসী'। বুদ্ধদেব বসুর প্রশ্ন: 'সুচরিতা কভু জন্ম নেয় মররমণীর গর্ভে?' চারটি সনেটের ঠাসবুনট আয়তনে অজিত দত্ত নিজের নিঃসঙ্গ দৃপ্ত অভিমানী চিত্তের অভীপ্সা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু অমিত্রাক্ষর ও লিরিক স্তবকের সমাবেশে, 'প্রমিথিউস্ আন্‌বাউন্ড্'-এর অনুপ্রেরণায় ('যাহারে দেখেছি মোরা শেলির নয়নে') আপনার উত্তাল আদর্শবাদ প্রসারিত করেছেন। অজিত দত্তের কবিপ্রতিভা যাঁরাই প্রণিধান করতে চাইবেন তাঁদের পক্ষে 'এমনি বাঁচিয়া র'বো' অবশ্যপাঠ্য।

এ-উপলক্ষে বলা দরকার যে যদিও আলোচ্য সংগ্রহের ভূমিকায় কবি নিজের নিঃসঙ্গ-

তার উল্লেখ করেছেন—কিন্তু আজকের জগতে কোন্ শিল্পী বা ইন্‌টেলেক্‌চুয়ল নিঃসঙ্গ ন'ন? 'In the sea of life we are enisled'—তবুও তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে এবং 'নষ্টচাঁদ' পর্যন্ত তো নিশ্চয়, এমন কি 'পুনর্নবা' পর্যন্ত, সমকালীন কাব্য সম্বন্ধে সুক্ষ্মভাবেই সচেতন। কোনো কবিই নিতান্ত একাকী নন। কোনো কবি-কর্মই নিঃসঙ্গ কন্দরে সাধিত হয় না। এলিয়ট বলেছেন প্রত্যেক সার্থক কবির সৃজনী-চিত্তে ঐতিহ্যের ধারা মিশে যায়। আমার বিবেচনায় ঐতিহ্যিক শিল্পচেতনার চেয়েও অধিক বলবৎ সমকালীন শিল্পচেতনা। জনকয়েক কবির শিল্পভাবনা যখন সমকালত্বের ভাবনায় গড়ে ওঠে, যখন কোনো না কোনো কারণবশত তাঁরা যেন একই শিল্পপরিবারভুক্ত হন (যেমন হয়েছিলেন শেক্‌স্‌পিয়র ও তাঁর সমকালীন অনেক কবি ও নাট্যকার, ওয়র্ড-স্বোয়র্থ এবং কোল্‌রিজ্‌, শেলি কীট্‌স্‌ এবং বায়রণ। এলিয়ট ও পাউন্ড), তখন তাঁদের কবিতার মেজাজ, বিষয় ও শিল্পকারু অবশ্যই পরস্পরের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, কখনো হয়তো বা কবির অজ্ঞাতসারেই প্রবাহিত হয়। এই কারণেই এহেন কবিগোষ্ঠীর প্রথম দিককার কবিকর্ম প্রধানত যুগধর্মে অনুরঞ্জিত, সম্পূর্ণ স্বকীয়তা অর্জিত হতে কিছু সময়ের প্রয়োজন, যখন অর্জিত হয় তখন যুগধর্মের আবরণ কেটে যায়। এই সমকালীন কাব্যচেতনায় কোনো উত্তমর্ণ অধমর্ণের সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকের কাব্যেই অপর কারুর সুর শোনা যাবে, প্রত্যেকের সুর অপরের কাব্যে শোনা যাবে।

সমকালীন কাব্যের প্রতিধ্বনি অজিত দত্তেও পাওয়া যায়, কিন্তু আমার কাব্যপাঠে আমি দেখতে পাই অধিকাংশ সমকালীন কবির তুলনায় তাঁর কাব্যে প্রতিধ্বনি বিরল। দেবেন সেন ও মোহিতলাল উপস্থিত আছেন। কখনো কোনো ইংরেজ কবির রেশ শুনি। যথা 'কালের পাখি' : ইন্দ্রপ্রস্থ ভালো লাগে নাই বুঝি?|ভালো লাগিল না মগধ-কাঞ্চী-কাশী?—তুলনীয়, র‍্যাফ্‌ হজ্‌সন্‌, 'Time, you old Gipsy man' : Last week in Babylon,|Last night in Rome। অথবা কোনো সমসাময়িক বাঙালী কবির রেশ, যথা, 'তোমার শিয়রে শিহরি' শিহরি' যত শিখা হল ছাই'—স্মরণ করায় সে-যুগে অচিন্ত্যকুমারের অনুপ্রাসবহুল ছত্রগুলি। 'নষ্টচাঁদ-শীর্ষক কবিতাটির শুরু—

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত,
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত।

এই কবিতা রচনাকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ বয়স্কতর অনেক কবিকে মুগ্ধ করেছিল। আরেকটি প্রায় সমকালীন ইংরেজ কবির সঙ্গে অজিত দত্তের সমধর্মিতা কোনো বিচক্ষণ পাঠকের নজর এড়াবে না : ওয়ল্টার ডি লা মেয়ার। উভয় কবিতেই ইন্দ্রিয়াতীত জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আশ্চর্য দ্যোতনাময়, অপ্রত্যক্ষ এবং স্পর্শাতীত ভাবনা যেন একটা সাবয়বী মূর্তি লাভ করে। মনে পড়ে 'ছায়া' কবিতাটি :

কাল রাতে একলা আঁধার পথে সহরতলীতে
দেখলুম অদ্ভুত মেয়ে এক।

* * *

যদিও বাতাস নেই, তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
উড়ছে হাল্‌কা চুল, উড়ছে হাওয়ার মতো, আব্‌ছা।

যদিও জোছনা নেই, তবু যেন দেখলুম অদ্ভুত,
পাপড়ির মতো তার চোখের পলক নত, আবছা।

ইংরেজি কাব্য-পড়া পাঠকের মনে পড়বে কোলরিজের ছত্রগুলি :

There is not wind enough in the air
To move away the ringlet curl
From the lovely lady's cheek—
There is not wind enough to twirl
The one red leaf, the last of its clan,
That dances as often as dance it can.

(*Christabel,* Part I)

অপ্রাকৃতের চেতনা অজিতের কাব্যে একটি মুখ্য theme, শিল্পভাবনা; অবাস্তব মিশে যায় বাস্তবের সঙ্গে তাঁর কল্পনায় :

পরীতে বিশ্বাস কর? দেখেছ কি মানুষ যখন
আঁধারে একাকী চলে পিছনে সে নাহি চায় ফিরে?
পদশব্দ শোনে কার পিছে পিছে ছায়ার মতন?
জানো কে পিছনে চলে মানুষের সে ঘোর তিমিরে?

* * *

যদি তুমি কোনোদিন পাহাড়ের কিনারে কিনারে,
গভীর বনের পাশে, বিশাল মাঠের মাঝখানে
একা একা ঘুরে থাকো, তবে তুমি দেখিয়াছ তারে,
তাদের গলার স্বর তবে তুমি শুনিয়াছ কানে।
যদি তুমি সেথা গিয়ে বলে থাকো—'কে আছ এখানে?'
'কে আছ এখানে?' বলে তারা সব হেসেছে তখন,
তাদের হাসির শব্দে কেঁপেছে পাহাড় মাঠ বন। (পরী)

মনে পড়ে অনেকদিন আগে মধ্যভারতের একদা-রাজধানী মাণ্ডু নগরীর প্রাসাদের বাইরে এক প্রাচীর থেকে একশো হাত দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করেছিলাম, সেই চিৎকার ফিরে এলো, একবার নয়, তিনবার, যেন অজিতের কবিতার হেসে-কওয়া 'কে আছ এখানে' ফিরে এলো তিন দিক থেকে তিন অশরীরী নিশাচরী কৌতুকময়ীর কণ্ঠে। বাস্তব ও অবাস্তবের সীমানায় চির-গোধূলির অভেদ্য রহস্য, সে-রহস্য বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, বিশেষ সংবেদনায় শিহরিত। এই সংবেদনা অজিত দত্তের। তাই, 'বারবার ঘুরি সেথা, যদি দেখা পাই কোনো ক্ষণে', যেমন ঘুরত কীট্‌সের alone and palely loitering, মোহাবিষ্ট knight-at-arms। অজিতের কল্পিত অশরীরী কণ্ঠ ডেকেছে 'কে আছ এখানে' বলে। ডি লা মেয়ারের কবিতাতেও অনুরূপ প্রশ্ন, Is there anybody there? প্রশ্নকর্তা দরজায় আঘাত করেছিল। কিন্তু অজিতেরসমতুল্য অপ্রাকৃত চেতনাসম্পন্ন জীবনানন্দের ছত্রে দরজায় আঘাত হয় নি :

তবুও তোমার ঘুম ভেঙে যাবে একদিন চুপে অকস্মাৎ,
তুমি যে কড়ির মালা দিয়েছিলে—সে-হার ফিরায়ে দিয়ে দিতে
যখন কে এক ছায়া এসেছিল...দরজায় করেনি আঘাত।

(রূপসী বাংলা, ৫০ পৃ)

অপ্রাকৃত theme নিয়ে অজিত দত্ত অনেক কবিতা লেখেন নি—কোনো theme নিয়েই এই সুমিতভাষ কবি দীর্ঘায়িত রোমন্থনে লিপ্ত হন নি (তাঁর রচিত যাবতীয় কবিতার সংখ্যা পাঁচশতের অনেক কম, কবিতার ছত্রসংখ্যা হাজার পাঁচেকের বেশি বলে মনে হয় না)—তবুও এই theme-এর রূপায়ণে তাঁর তুল্য কবি যে-কোনো ভাষাতেই অধিক নয়। অপ্রাকৃত নিশাচরী সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের ambivalence ('জানি ওরা মৃত্যু আনে, তথাপি সে-মরণ মধুর') অধুনাবিখ্যাত la femme fatale-র চরিত্রসম্মত। এই অপ্রাকৃত theme মিশেছে খাঁটি বাঙালী রূপকথার theme-এর সঙ্গে। রূপালি ঢেউয়ে দোলে ময়ূরপঙ্খী নাও, সে দেশে আছে পাশাবতী কুমারী (জীবনানন্দের 'কেশবতী কন্যা'), সে-কুমারী অপরূপ রূপময়ী মায়াবিনী, সে-কন্যার দেহে হাজার ময়ূরকণ্ঠী সাপ, দশ লাখ লাল-কালো ডোরা-কাটা সাপেদের মাঝে শুয়ে থাকে কুমারী—এড্‌মন্ড্ ডুলাকের বর্ণাঢ্য মোহিনী চিত্রের কথা মনে পড়ে। আর এই কন্যার নিকটে যেতে হলে যেতে হবে গভীর সমুদ্রতলের প্রবাল দ্বীপের সীমা ছাড়িয়ে—হয় তো বা ম্যাথিউ আর্নল্ড বর্ণিত মৎস্যমানবের মানুষী বধূ যেখানে থাকত সেখানেই। আর এই রূপকথার জগতেই অজিত দত্তের মধ্যবয়সী সংসার-ব্যথিত মোহমুক্ত কল্পনা পেয়েছে রূপকের উপাদান। পাতালকন্যার প্রবালপুরী আজ হয়েছে পাথরপুরী ('জানালা')। মেঘবর্ণকেশী রাজকন্যা পাথরে পরিণত হয়ে একটা অনব-শেষ প্রতীক্ষাপরায়ণ বরফকঠিন দণ্ডায়মানতায় কবলিত হয়েছে। কোন্ যেন রাক্ষস এসে কি মন্ত্র পড়েছে, রাজা-প্রজা সবই আছে এ-রাজ্যে, শুধু তারা কেউ নেই বেঁচে।—যে-রাজ্যে ও সমাজে আজ কবি ও তাঁর পাঠকের দুর্গতি অবস্থান তারই সুতীক্ষ্ণ রূপক। পুরানো বাক্‌প্রতিমার নতুন ভাবার্থ।

৪

যে বাক্‌সুমিতি পরীজগৎ ও রূপকথার জগতে প্রেরণা পেয়েছে, তারই সংহত হীরকচ্ছটা অজিত দত্তের যাবতীয় কবিতায়। চিন্তা ও ভাষার এমন সম্পূর্ণ সাযুজ্য, প্রকাশের এমন পরিচ্ছন্নতা ঋজুতা ও সংযম সাহিত্যের যে-কোনো যুগে বিরল, বাংলা সাহিত্যের এ-যুগে বিস্ময়কর। কাব্যের ভাষা বলতে আমি তদ্ভব-তৎসম-দেশজ শব্দের প্রয়োগ বুঝি না। যে-বিষয়কে ইদানীং কিছু সমালোচনায় কথ্যভাষা, মুখের ভাষা, সজীব প্রাণবান ভাষা ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে; যে-তারতম্য জ্ঞানের ফলে 'মোর', 'তব', 'আঁধার', 'সনে', 'যবে' প্রভৃতি 'কাব্যিক' শব্দ এবং গাছ=তরু, ফুল=পুষ্প, পৃথিবী= ভুবন ইত্যাদিতে সংস্কৃত-সন্তান বাংলা ভাষার যে-প্রতিশব্দ-ঐশ্বর্য প্রকট সে-ঐশ্বর্য আধুনিক বাংলা কাব্যের এলাকা থেকে বর্জন করার প্রস্তাব হয়েছে, সে-বিষয় সম্বন্ধে কাব্য-পাঠক হিসাবে আমি খুব শ্রদ্ধাবান নই। কাব্যের তত্ত্বে এই তারতম্যের কোনো সর্ব-গ্রাহ্যতা নেই, কোনো সাহিত্যেই নেই। তত্ত্ব-উদাসীন কাব্যের অনুশীলনেও এ-বিষয়ে সর্বগ্রাহ্যতা নেই। কোনো বিশেষ কবির পক্ষে, কোনো বিশেষ যুগের পক্ষে, কোনো বিশেষ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে, কবিতার শব্দাবলী ভাষাতাত্ত্বিক আকরের এক অংশ অথবা অপর অংশ থেকে আহরিত হতে পারে, কোনো আকরই অপাংক্তেয় নয়। ইংরেজিতে বলা হয় চেখেই প্রমাণ পুডিং হয়েছে কি না। শব্দচয়ন সম্পর্কে অজিতের কোনো স্পর্শকাতরতা নেই। তিনি একই কবিতায় লিখতে পারেন

একেবারে রাখে না খবর—
কত ধানে কত চাল, কত চালে কতটা কাঁকর।

*   *   *

হাজার কি লক্ষ বছরের ইতিহাস ধরে এরা
—অলৌকিক, অবাঞ্ছিত, অনিকেত এ-সব প্রেতেরা
চেপে আছে সিন্দবাদ-পৃথিবীর ঘাড়ে।

(প্রেতচরিত)

শব্দের আকর নয়, শব্দ প্রয়োগের মেজাজ-ই আসল কথা কাব্যের ভাষায়। লিরিক কবিতার ভাষাপ্রয়োগে দু'টি প্রশস্ত মেজাজ সম্ভব: ঋজুতা ও জটিলতা, সংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, শাসন ও অবাধগতি। দুই মেজাজেই মহৎ কাব্যের সৃষ্টি সম্ভব, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে দুই মেজাজেরই স্বাক্ষর। যে-সংযম শাসন ঋজুতা বিগত একশো বছরের বাংলা লিরিকে প্রকৃষ্ট প্রকাশ পেয়েছে মাইকেল থেকে দেবেন সেন মোহিত মজুমদারে, তারই শ্রেষ্ঠ সমকালীন ধারক ও বাহক অজিত দত্ত। কবি অজিত দত্তের প্রকৃতিতে বাহুল্য নেই, ঐশ্বর্যের প্রগল্ভ বিস্তার নেই, সুমিতি তাঁর চরিত্রগত, প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর কাব্যে একই দৃঢ় অভ্রান্ত নিয়ত-নিপুণ বাক্‌সংহতি।

অথবা সেথায় চলো মোর সাথে—যেথায় অরোরা
বর্ণের আলিম্প আঁকে বিজন ভীষণ মেরু-শিরে,
অথবা বাদাম ফলে যেথা রক্ত-সাগরের তীরে,
ছায়ায় ঘুমায়ে থাকে চিক্কণ-চিত্রিতা বিষধরা
আর বিচিত্রিতা চিতা; ব্যর্থপ্রেমে যেথা তীক্ষ্ম ছোরা
প্রিয়ের বুকের রক্তে লাল হয়, সেথা চলো ফিরে।

(জীবনে বৈচিত্র্য নাই)

একটি শব্দও এখান থেকে ছাঁটা যায় না, একটি শব্দও স্থানচ্যুত হতে পারে না (শুধুই ছন্দের খাতিরে নয়, আবেগ-প্রকাশের অন্তর্নিহিত লজিকের দাবীতেই শব্দের বিন্যাস দৃঢ়নির্দিষ্ট হয়েছে), আর এই পরিপূর্ণ সংহতির ফলে ছত্রগুলিতে একটা আশ্চর্য controlled energyর আভাস, যেন একটা প্রচণ্ড শক্তি সুকৌশলে শাসিত হয়ে আছে, যদি শাসন শিথিল হয় তাহলে সে-শক্তি দুর্বার বিস্ফোরণে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে, ছত্রগুলিতে অভিধার দুটি স্তর বিদ্যমান: প্রকাশ্য ও সংগুপ্ত দুটি স্তর। শুধু আভিধানিক অর্থে যা বলা হয়েছে, তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি ভাবনার আভাস ঝলক দিচ্ছে। রোমান্স-জগতের অনন্ত আয়তন, রোমান্স-সামগ্রীর শত লক্ষ আকৃতি, সূচিত হয়েছে। না-বলার দ্যোতনা বলার অভিধার চেয়ে অনেক অধিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন।

যে-সংযম প্রথম দিককার কাব্যে, পরিণত পর্যায়ের কাব্যেও তার অব্যাহত প্রকাশ, বরং কখনো কখনো শব্দচয়নের সারল্যে সে-প্রকাশ গভীরতর হয়েছে। দুটি উদাহরণ তুলছি:

১। আমিও তো ছিলাম উদ্দাম মহানদী।
উদ্বেল প্রপাত থেকে অতলান্ত সমুদ্র অবধি
প্রসারে তৃপ্তিতে সুখে সম্পূর্ণ ছিলাম।
তারপর কী খেয়ালে একগুচ্ছ ফুল ফোটালাম
নতুন মাটিতে এক চর পেতে। সে চর কখন

দিগন্ত-বিস্তৃত হল, হল এক সীমাহীন বন।
সে অরণ্যে আজ আর নেই ফুলফল,
ঊর্মিহীন গতিহারা নদী আজ সংকীর্ণ পল্বল।

(পল্বল)

২। মানুষের মন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা,
মানুষের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত রুধিরাক্ত করা,
মানুষের জীবন হতাশায় নিরাশায় ক্লিষ্ট করা
কত সহজ যদি জানো,
তবে তুমি সুমহৎ ট্র্যাজেডির স্রষ্টা হতে পার,
তবে তুমি সেক্‌স্‌পীয়রের সমান হতে পার,
তবে তুমি ভগবানের সমান। (দুঃখ)

দুটি উধৃতিতেই অভিধা ও ব্যঞ্জনার সমান্তরাল প্রবাহ। প্রথম উধৃতিতে রূপকার্থ সংযোজিত হওয়ার ফলে ব্যঞ্জনাতেই আবার দুটি স্তর সূচিত হয়েছে। জীবনের গতির সঙ্গে নদীর গতির তুলনা বহু-প্রযুক্ত পুরানো তুলনা। ইংরেজি কাব্যপাঠকের অনায়াসেই স্মরণ হবে ম্যাথিউ আর্নল্ডের 'সোহ্‌রাব ও রুস্তম' কবিতার শেষ স্তবকটি যেখানে আক্‌সাস্‌ নদীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পাঠক যদি আর্নল্ডের ও অজিতের নদী-রূপক দুটির বিচার করেন শিল্পকৌশলের মাপকাঠিতে—আর্নল্ডও মুখ্যত সংযমী কবি ছিলেন—তাহলে, আশা করি, আমার মতো তাঁরও ধারণা হবে যে অজিতের বাক্‌সংযম অতুলনীয়। উদ্বেল প্রপাত পরিণত হল সংকীর্ণ পল্বলে—দুই কবিতার বিষয় একই কিন্তু যেক্ষেত্রে আর্নল্ড পরিশ্রম-সহকারে চৌদ্দ ছত্রব্যাপী বর্ণনা দিয়েছেন নদীপথের, অজিত তিন ছত্রেই সে-নদীপথের চিত্ররূপ সৃষ্টি করেছেন। বলা যেতে পারে যে অজিতের রূপকের পশ্চাতে আর্নল্ডের সুপরিচিত রূপকটি association of ideas-এর, ভাব-সংশ্লেষের, সাহায্য করেছে। সে কথা মানব, তবুও আমার মুখ্য ধারণা থেকে যায় যে অজিত দত্ত সংযমী কবি। যেক্ষেত্রে অনেক বাঙালী কবি মূল ভাবনাটিকে প্যারাফ্রেইস্‌ করে চৌদ্দ ছত্রকে একশো ছত্রে দীর্ঘায়িত করতেন, সেখানে অজিত দত্ত পাঠকের শিক্ষিত সহৃদয় সংবেদনার নির্ভরে ঠিক ততটুকুই বলেছেন যতখানিতে association of ideas মুক্তপ্রবাহ হয়ে যায়। এখানেই তাঁর controlled energy; উপরের স্তরে যা বলা হয়েছে, গভীর স্তরে তার সঞ্চিত লক্ষণা অনেক বেশি। কিন্তু কবি শুধুই পুরানো রূপকের আশ্রয় নেন নি (অথবা জেনে-শুনে আর্নল্ডের পুনরুক্তিও করেন নি, এই রূপক-সাদৃশ্য, আমার বিচারে, কাকতালীয় হওয়াই সম্ভব), বরং রূপকের মধ্যে রূপক নির্মাণ করেছেন: নতুন মাটিতে চর পেতে ফুলের চাষ, কালক্রমে সেই ফুলবাগানের অরণ্য-বিস্তৃতি।—এখানেই অজিত দত্তের সংযম এবং স্বকীয়তা। আর্নল্ডে যে নদী-প্রতিমা ছিল ভূগোলগ্রন্থ-উৎসারিত, অজিত দত্তে সেই প্রতিমায় বাংলার পদ্মার প্রত্যক্ষ রূপ।

দ্বিতীয় উধৃতিটিতেও নিটোল বাক্‌সংযম। প্রথম তিন ছত্রে বলা হয়েছে নিষ্ঠুর দুঃখের কথা, কিন্তু দুঃখের আধার প্রতি ছত্রে আলাদা—মানুষের মন, মানুষের হৃদয়, মানুষের জীবন। শেষ তিন ছত্রেও সুরের ক্রমিক উচ্চগ্রামে আরোহণ। তুমি ট্র্যাজেডির স্রষ্টা হতে পার, যে-ট্র্যাজেডি শিল্পের মহত্তম বিন্যাস। যে-কোনো ট্র্যাজেডি-রচক নয়, তুমি হতে পার শেক্‌স্‌পিয়রের সমান, অর্থাৎ মহত্তম শিল্পবিন্যাসের মহত্তম সিদ্ধিতে পৌঁছতে

পার। আর তা-ই যদি পার তাহলে তুমি সৃষ্টিক্রিয়ার উত্তুঙ্গতম শীর্ষে পৌঁছে গেলে, তোমার কৃতিত্ব হল পরমাসিদ্ধি, আত্যন্তিক কৈবল্য, অর্থাৎ তুমি হয়ে গেলে স্বয়ং ভগবান। —লিরিক সুরের উদারা মুদারা থেকে আমরা পৌঁছলাম তারায়। কবির অনুভূতিতে একটা প্রবল শক্তি, আর সেই শক্তি ন্যূনতম বাক্যের পূর্ণ সাযুজ্যে দ্বিগুণিত হয়েছে।

কবি তাঁর ভূমিকায় খেদ করেছেন যে তিনি নিঃসঙ্গ, বলেছেন তাঁর কবিতা আধুনিক ফ্যাশান-বহির্ভূত। আধুনিক বাংলা কবিতায় মাত্র একটি 'ফ্যাশান' চলিত বলে মনে হয় না, ফ্যাশান তো অন্তত গণ্ডা দুয়েক নজরে পড়ে। বস্তুত আধুনিক বাংলা কবিতায় বড়ই জটিল চক্র, নিশ্চয় প্রচুর প্রাণবত্তার বহুমুখী প্রকাশ-প্রয়াসে। কিন্তু সীমিতজীবন ফ্যাশানের বাইরেও অনেক শক্তিশালী কবিতা রচিত হচ্ছে, কোনো ভাঁটার টান লক্ষ্য করি না। আমার নিজ বিশ্বাস বাংলা কাব্যের এক অতীব উজ্জ্বল পর্যায় আমরা দেখছি। এত প্রতিভা, এত নিপুণতা একই কালে সমাবেশিত হয়েছে, এর তুলনা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয় নেই। শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র্যেও এই নিপুণতা উজ্জ্বল। অজিত দত্তের সমকালীন জ্যেষ্ঠ কবিদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা, অনন্যতা--জীবনবীক্ষায় যেমন, সে-বীক্ষার শিল্পায়ণেও তেমনি—কোনো ইতিহাসবিদের সুচতুর ফর্মুলায় বাঁধা পড়বে কি না সন্দেহ। 'আধুনিক' কথাটির ততগুলিই ডেফিনিশন্ হবে যতজন জ্যেষ্ঠ কবির আলোচনা হবে। এই জ্যেষ্ঠদের পরবর্তী (বয়সে এবং কবিকর্মের কালানুক্রমে) কবিদের মধ্যেও অন্তত তিনটি পর্যায়ের নিশ্চিত উন্মোচন হয়েছে এ-তাবৎ এবং এঁদেরও স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা নিঃসংশয়। আধুনিক বাংলা কাব্য আদৌ একই মার্কামারা নয়। সুতরাং অজিত দত্তের একাকীত্বে যুগলক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। তবুও আমি বলব যে কাব্যচিন্তার ও প্রকাশশৈলীর যে-সংযম দার্ঢ্য ও সুমিতির আলোচনা আমি এতক্ষণ করেছি, মধুসূদন-দেবেন সেন-মোহিতলালের সেই ধারার অবসান হয় নি অজিত দত্তের কাব্যে, সে-ধারা এখনো অপ্রতিহত। সমকালীন অন্য কোনো কোনো কবিও এই ধারার অংশীদার। এবং সাহিত্যের ইতিহাসের যদি কোনো মূল নিয়ম থেকে থাকে তাহলে এ-ধারা চিরকালই অব্যাহত থাকবে। ব্যক্তি হিসাবে অজিত দত্তের খেদে সারবত্তা থাকতে পারে কিন্তু ইতিহাস-অন্তর্গত কবি হিসাবে তাঁর একাকীত্বের ক্ষোভ অগ্রাহ্য।

৫

তাঁর কবিতার গতিপ্রকৃতির উল্লেখ করেছেন অজিত দত্ত ভূমিকায়। এই গতিপ্রকৃতির কতটা নিদর্শন তাঁর কাব্যকারুতে প্রকাশ পেয়েছে সে-আলোচনা করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু রিভিউ-প্রবন্ধে এ-বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব দেখছি না। অপর পক্ষে যে জীবনবীক্ষা তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আভাস এহেন প্রবন্ধে বরঞ্চ সম্ভব। অজিত দত্তের মানস-বিবর্তনে আমি তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করি, আদ্য, মধ্য, পরিণত। তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যে ছিল বিষাদ-পরায়ণতা, মৃত্যু-ভাবনা :—এ-জীবনে দুঃখের পার নেই; তাঁর বিদ্রূপ-প্রদীপ্ত চোখে ভালো লাগে অশ্রুর আস্বাদ; মহা-আকাশের বিশাল তুলোট/ আঁধার অক্ষরে লেখা মৃত্যুর ভীষণ রূপকথা; নয়নে ফোটে না তারা মেঘকৃষ্ণ বন্ধ্যা অন্ধকারে; এ-দেহ কুৎসিত হবে, আকুঞ্চিত কপাল কপোল,/ বিস্বাদ অধর ওষ্ঠ, ন্যুব্জ দেহ, তরল-তারকা,/ যৌবন ঝরিয়া যাবে; যেখানে গভীর অন্ধকারে ভয়াবহ নির্জনে ক্লান্ত জীবন নীরবে

খেলিছে পাশা কঠোর মৃত্যুসনে...সে-ভীষণ দেশে যখন ভ্রমিতে হবে / যেথা আমি যাব একা।
—এই দুঃখবাদের সঙ্গে মিশেছে একটা তুঙ্গ আত্মাভিমান :

আমি সেই অভিমানী, সঙ্গীরে যে দিয়াছে ফিরায়ে
মুহূর্তের অহঙ্কারে,—ঘৃণ্য কৃপা যে চাহেনি কভু।
সে আমি—হেলায় প্রাণ দিয়েছে যে আকাশে ছড়ায়ে,
মৃত্যু নীল ঊর্ধ্ব হ'তে আয়ুভিক্ষা করে নি যে তবু।
আমি সেই ব্যর্থ কবি, যারে শুধু শুনেছে দেবতা
নীরবে দিগন্তে বসি', আশা-বধূ যেথা অবনতা।

(ব্যর্থ কবি)

এই চিত্তপ্রকৃতির সঙ্গে খানিকটা মিল আছে ইংরেজ কবি ল্যান্ডরের :

I strove with none, for none was worth my strife;
Nature I loved, and next to Nature, Art;
I warmed both hands before the fire of life;
It sinks, and I am ready to depart.

'নষ্ট চাঁদ' থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। বস্তুত এ-গ্রন্থেই এ-পর্যায়ের পূর্ণতা, যদিও এ-পর্যায় উপ্‌ছে পড়েছে 'পুনর্ণবা' এবং ছায়ার আল্‌পনা' কাব্যগ্রন্থ দুটিতেও। কবি-চিত্ত এখন আত্মকেন্দ্রিকতার বাহিরে এসে দাঁড়িয়েছে। "এ-বইয়ের সবগুলি কবিতাই যুদ্ধের মধ্যে লেখা। পাঠককে একথা মনে রাখতে অনুরোধ করি।" গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ নভেম্বর ১৯৪৬, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তে। 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮) ও 'নষ্ট চাঁদ', এ-দুয়ের মধ্যে পৃথিবীতে ও বাংলাদেশে বিপর্যয় ঘটে গেছে : পশ্চিমে রাজনৈতিক ফেরেববাজি, পরে যুদ্ধের দাবানল; স্বদেশে আগস্ট বিপ্লব, বাংলাদেশের মন্বন্তর; যুদ্ধের তরঙ্গ স্পর্শ করল বাংলার পূর্বপ্রান্ত, কলকাতায় বোমা পড়ল, বাংলা দেশ 'অ্যালায়েড্‌' সেনানীর পদভরে কম্পিত হল; জীবনে ও মানবিক মূল্যে কালান্তর এলো সর্বনেশে। সেকালে রাজনীতি ও সমাজনীতির তীক্ষ্ম দীর্ণ চেতনা অবাধ অবশ্যম্ভাবিতায় প্রবেশ করল বাংলা সাহিত্যে। জনকয়েক কবির আবির্ভাব হল যাঁরা প্রথমাবধি রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রবক্তা। জন-কয়েক জ্যেষ্ঠ কবি কালধর্মে এই চেতনার শামিল হলেন। তিরিশের দশকে তদানীন্তন তরুণতম ইংরেজ কবিদের অনুরূপ চেতনা বাঙালী কবির চিন্তা-পরিবর্তনে সাহায্য করল। যুদ্ধের যুগে বাঙালী কবিদের রচনায় যেন একটা সর্বময় প্রশস্ত সমতা এসে গেল—জীবন-দর্শনে, শব্দচয়নে, বাক্যবন্ধে, ছন্দে, ব্যঙ্গপ্রধান তিক্ত ক্রুদ্ধ সুরে। যুদ্ধের পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেল। দেশে এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটল অনেক। কবিদের মধ্যেও দক্ষিণ বাম মধ্য তিন পন্থার ব্যবধান গড়ে উঠল। এবং সে-ব্যবধান আজকের দিনে সুস্পষ্ট, যদিও শক্তিশালী কবিদের কবিত্বে পন্থাটাই মহৎ লক্ষণ আর নেই, তাঁদের কবিত্ব পন্থা-নিরপেক্ষ নয় কিন্তু কবিত্বশক্তি পন্থানির্ভরও নয়।

এ-প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্রান্তিকালের বিশদ বর্ণনা বা বিশ্লেষণ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। আমার শুধু এ-কথাই বলা উদ্দেশ্য যে ক্রান্তিকালের ছাপ সে-কালীন সমগ্র বাংলা কাব্যে। এই সর্বময় প্রভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অজিত দত্ত। রাজনীতি সমাজনীতি অজিত দত্তের চরিত্রধর্ম নয়, না কবি হিসাবে, না মানুষ হিসাবে, না তাঁর তরুণ বয়সী কাব্যে, না পরিণত কাব্যে। এ হেন কবিও যে ক্রান্তিকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন—সে-প্রভাবের প্রমাণ

'নষ্ট চাঁদ'—তাতে একদিকে যেমন ক্রান্তিকালের অনতিক্রম্য আবেদন প্রমাণিত হয়, তেমনি সূচিত হয় অজিত দত্তের দরদী কবিপ্রাণ। যে-অভিমানী কবি একদা প্রাণ ছড়িয়েছিলেন আকাশে তিনি আজ 'কর্তব্যের জনারণ্যে লতাগুল্মে' 'আমার আমি-রে' মিশিয়ে দিতে চাইলেন। একদা যিনি বলেছিলেন, 'আমি একা জাগি র'বো ঊর্ধ্বলোকে, আরো ঊর্ধ্ব-লোকে', তিনি আজ হিমাদ্রির শুভ্রকেশ ছেড়ে 'যুগান্তরের সন্ধিতে' নেমে এলেন সমসাময়িক মর্ত্যলোকে, ভুখ-মিছিলে, সৈনিকব্রতী মৈনাকের, জাগ্রত অরণ্যের, দৃঢ়সংকল্প অগ্রগতিতে। কালধর্মের জয় হল। কবিজীবনের অভিব্যক্তিতে নূতন পর্যায় এলো। আদর্শলোকের বর্ণালী থেকে কবি নামলেন রূঢ় প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতায়।

'নষ্ট চাঁদে' কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতা আছে, অতীব শক্তিশালী। কিন্তু কবিজীবনের অভিব্যক্তি এই ক্রান্তিকালচেতনাতে যতি স্থাপন করল না দীর্ঘকাল। এহেন চেতনায়, এই প্রত্যক্ষের আবেগে একটা সীমাবদ্ধতা ছিল, শুধু এই চেতনায় কোনো সৎকবি দীর্ঘকাল পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন না, শুধু এই চেতনার প্রকাশ অল্পদিনেই একটা মনোটোন, একটা একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হয়। বস্তুত সেকালের যেসব কবি রাজনীতিনির্ভর সাহিত্য-সাধনার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিলেন, তাঁরাও আজ আপনাপন শিল্পবিবর্তনের স্রোতে অন্যত্র এগিয়েছেন। অজিত দত্ত দাঁড়িয়েছিলেন রাজনীতিনির্ভর সাহিত্যসাধনার কেন্দ্রে তো নয়ই, বৃত্তের স্পর্শরেখায় মাত্র। অতএব তাঁর পক্ষে অন্যত্র এগোনো স্বাভাবিক।

এই সঙ্গে, আমার বিবেচনায়, আরেকটি চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটল কবিচিত্তে। একটি মূল্যবান কবিতা আমি পাই 'ছায়ার আলপনায়', কবিতাটির শিরোনামা 'প্রেতচরিত'।

পৃথিবীর অন্ধকার আনাচে কানাচে,
হিজিবিজি চিন্তার বাঁকের কাছে কাছে,
প্রেতের মতন অশরীরী, অসহায়—
মণীষা ও প্রতিভার ভুতুড়ে ছায়ারা মিলে
ভয়ংকর জটলা জন্মায়।
অসম্ভব কথা সব বলে তারা, দুর্বোধ্য ভাষাতে
করে তারা কিচির-মিচির:
কল্পনার ভূতিনীরে চুলের মুঠোয় ধরে
নিয়ে এসে খেলাঘর পাতে,
অন্ধকারে অন্তরালে অশরীরী মস্তিষ্কেরা করে মহা ভিড়।

* * *

অতি সূক্ষ্ম চিন্তার তন্তুর বেড়াজালে
পৃথিবীর আনন্দের সবটুকু ছেঁকে নিতে চায়;
ভূতে-পাওয়া ডানা মেলে দুর্বার গতিতে ছুটে যায়
সাহিত্যের, শিল্পের ও বিজ্ঞানের মরু-অভিযানে।

কবিতাটি আমি মূল্যবান মনে করি কারণ বাংলা কাব্যে anti-intellectualism-এর, মনন-বিরোধিতার, সব চেয়ে শক্তিশালী দৃষ্টান্ত এইটি। কবি কোনো সমকালীন বাঙালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বুদ্ধিবাদ দ্বারা অতৃপ্ত হয়েছিলেন কি না আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁর মনন-বিরোধিতা গোষ্ঠীবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে অতৃপ্তির চেয়েও অনেক গভীরে তাঁর আপন ক্রমঘনায়িত জীবনদর্শনের উপাদান। অজিত দত্তের পরিণত

পর্যায়ে তিনি শুধু ইন্দ্রিয়বেদিতার কবি নন, রাজনীতি সমাজনীতির কবি নন, তাঁর জীবনাদর্শে বুদ্ধি শেষ কথা তো নয়ই, মস্ত কথাও নয়, সে-দর্শনে সহজ আবেগ, ঋজু মানবিক মূল্যবোধ (যাকে বলি হিউম্যানিজ্‌ম্‌), আপাতক্ষুদ্র অসংখ্য অভিজ্ঞতার অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য, এই সব মিশে একটি উজ্জ্বল আত্মসমাহিত জীবনবোধের সৃষ্টি হয়েছে। সংসারের নীচ কূট ষড়যন্ত্রগুলি তাঁর অজানা নয়, কবিতার পরে কবিতায় ('জানালা' গ্রন্থে এবং অপ্রকাশিত কাব্যাংশে) এই সব নীচতার প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে ('ছায়ার আল্‌পনা'তে কয়েকটি সনেট দ্রষ্টব্য, 'জানালা'তে 'পাথর-পুরী') কিন্তু সবার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়েছে একটি সদর্থক প্রত্যয়, জীবনে প্রত্যয়, সাধারণ মানুষে প্রত্যয়। অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'তবু ভালোবাসি এই পৃথিবীর বাঁ হাতের দান'। পশ্চাতের নিষ্ফল প্রান্তর দীর্ঘতর হয়ে আসে, সম্মুখে যাত্রার পথ আর কতটুকু? তবুও যখন বর্ষা আসে, 'মনের আকাশ ছেয়ে আবার রূপালি ডানা ভাসে।'

আমার খুশিতে আছে সকলেরি ঠাঁই।
যতটুকু পাই আর যা কিছু হারাই

এহেন মনোভাব মনন-বিরোধী হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

কিন্তু মনন-বিরোধিতার মানে নয় জীবন-জিজ্ঞাসার অভাব, অথবা চিন্তার স্থূলতা। বরং অজিতের মন এখন গভীর থেকে গভীরতর জিজ্ঞাসায় উদ্দ্বেজিত হচ্ছে :

কোনোখানে অজ্ঞাতের পরিচয় আছে,
হোক সে অনেক দূরে, হোক বা সে হৃদয়ের কাছে।
(পরিচয়)

জ্যোতির্ময় পৃথ্বী আর ক্ষীণ শিখা স্তিমিত হৃদয়—
কী কৌশলে উভয়ের সেতুবন্ধ হয়?
(সেতু)

জীবনের শেষরূপ চিনে নিতে চাই,
সকল মুখোশ খুলে জীবনেরে দেখে যেন যাই।
(চক্রবাল)

বৈকালের অস্পষ্ট ছায়ায়
নিরুত্তর প্রশ্ন জাগে—আয়ুতে কি জীবন ফুরায়?
(প্রশ্ন)

মানুষ কি আলো খোঁজে?
না, আলোই মানুষকে খুঁজে বেড়ায়?
(রাত্রির তপস্যা)

এই সব জীবনজিজ্ঞাসা আক্ষরিক অর্থে ফিলসফি—প্রজ্ঞাপ্রীতি—এবং দর্শন—প্রাচীন অর্থে সেই বিজ্ঞানময় চেতনা যার বলে দ্রষ্টার নেত্রপথে সত্যের উদ্ভাস হয়। এই 'দর্শন' লাভ বুদ্ধির পথে নয়, অনুভূতির বিশ্বাসী পথে। বহু সার্থক কবির মতো অজিত দত্ত আত্ম-অভিব্যক্তির এমন প্রগাঢ় পর্যায়ে পৌঁছেছেন যেখানে খাঁটি ও মেকির প্রভেদ আলোক ও অন্ধকারের মতোই, যেখানে জীবনের আভরণ ও মুখোশ অনাবশ্যক দুঃশীলতা, যেখানে প্রত্যক্ষেরও গভীরে বিদ্যমান কত রহস্য, কত অলক্ষ্য-উত্তর প্রশ্ন!

বাংলা কাব্যে অজিত দত্তের আসন ধ্রুব। কাব্যের পাঠকসংখ্যা দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষ

নির্ণীত হয় না, যদি হত তাহলে রবর্ট মন্ট্গোমারি এবং ফিলিপ জেইম্স্ বেইলি হতেন ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, যাঁদের নাম আজকাল সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসের বাইরে পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে এক জায়গায় ইংরেজ কবি ল্যান্ডরের নাম উল্লেখ করেছি। ল্যান্ডরের প্রিয় উক্তি ছিল মিল্টনের Fit audience though few, আর ল্যান্ডরের নাম উচ্চারিত হয়েছে ইয়েট্সের কবিতায় :

I know what wages beauty gives,
Yet praise the winters gone;
There is not a fool can call me friend,
And I may dine at journey's end
With Lander and with Donne.

এমন কথা অজিত দত্ত বলতে পারেন চল্লিশ বছরের নিরলস সংযমী কাব্যসাধনার পরে। শুধু, আশা করি তিনি নিজকে বন্ধুবিহীন বলবেন না। ইয়েটস্ ঐ ছত্রটি নিশ্চয় লিখে-ছিলেন পরের ছত্রের সুন্দর কথা journey's end-এর সঙ্গে মিল দেবার জন্য। নতুবা ইয়েটসের বন্ধুর অভাব ছিল না। অজিত দত্তের কাব্যের অনুরাগী পাঠকগণ সংখ্যায় ও যোগ্যতায় তুচ্ছ নন।*

অমলেন্দু বসু

*অজিত দত্তের কবিতা-সংগ্রহ। গুপ্ত ফ্রেন্ড্স্ এন্ড কোং। কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা

সমালোচনা

পুণ্যস্মৃতি—সীতা দেবী। প্রাপ্তিস্থান : জিজ্ঞাসা। কলিকাতা ২৯। মূল্য দশ টাকা।

পুরানো ডায়রি অবলম্বন করে লেখা একখানি বই। নিখুঁৎ অঙ্গসজ্জা, তবু পড়ে মন ওঠে না; লেখিকার সরল মধুর বুদ্ধিদীপ্ত সত্তাকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যায়, বিশ্বকবি কেবল প্রিয় অতিথির চোখে দেখা, ভক্তি-ভালোবাসার ধূপধুনো দিয়ে আবছায়া করা একটা বিরাট মূর্তিই থেকে যান, ধরাছোঁয়ার মধ্যে তেমন আসেন না।

বইখানির প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৪৯ সাল; রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের অনতিকাল পরেই। কবিকে হারানোর তীব্র শোকোচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে গিয়ে, গত বাইশ বছর ধরে তাঁকে লাভ করার অসীম সৌভাগ্য ও অপরিমেয় গৌরব দেশবাসীর চিত্তকে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করে রেখেছে। এই জন্য আজ কেমন করে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে—'দেশের নগ্নতা, দীনতা বিশ্বের নিকট উদ্‌ঘাটিত'? তিনি তো আমাদের অযোগ্যতা আবৃত করে গোপন রাখবার রত্নখচিত দোশালা মাত্র ছিলেন না, আমাদের শিরায় তিনি যে নতুন রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর তাঁর জন্য ব্যক্তিগত হতাশা শোভা পায় না। তাছাড়া কোনো মহাপুরুষকে কোনোদিন কি একান্ত আপনার করে চিন্তা করতে হয়? তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য আসেন, কেউ তাঁদের আয়ত্ত করতে পারে না, বাঁধতে পারে না। কবির বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি, কোনো পার্থিব মানুষের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি, স্ত্রীর কাছেও নয়, সন্তানদের কাছেও নয়। এই নিয়ে অনেক নিকট আত্মীয়কেও ব্যথা প্রকাশ করতে শুনেছি, কিন্তু মহাকবিরা পরিবারের গণ্ডীকে আপ্লুত করে চিরদিন অনন্তের দিকে ধাবিত হন। তাই নিয়ে ক্ষুব্ধ হওয়া শোভা পায় না; সব ব্যক্তিগত দাবি ছেড়ে দিতে হয়; ব্যথা যদি লাগে তাও অপ্রকাশ্য। মনে হয় এই সংস্করণ প্রকাশ করবার আগে কিছু সম্পাদকীয় কর্তব্য বাকি ছিল; বিশেষ করে এই কারণে যে যাঁরা এ বই পড়বেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই কবিকে চোখে দেখেন নি, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে নিতান্ত আপনার ধন বলে লাভ করেছেন।

কিন্তু এই ভক্তিময়ী, স্নেহশীলা, বিশেষ অতিথিটির দরদী চোখ দিয়ে দেখা অনেক মনোরম ঘটনার তথ্য পাঠকের মনকে অভিভূত করে। কবির নোবেল পুরস্কার লাভের পরবর্তী অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর নির্ভরযোগ্য বিবরণীর কথা, শান্তিনিকেতনের তৎকালীন বাঙ্গালসভার অনুষ্ঠানের অপূর্ব কথা সাধারণ পাঠকদের মধ্যে ক'জনাই বা জানেন।

রামানন্দ শতবার্ষিক উৎসব পালনের সময়টি বাস্তবিকই এই ধরনের বই প্রকাশের উপযুক্ত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ও শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতাতে যেখানে যখন রবীন্দ্রনাথ কোনো সভা অলঙ্কৃত করেছেন, শত অসুবিধা ও শারীরিক ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করে, অনলসভাবে যাওয়া-আসার বিবরণীর মধ্যে দিয়ে; শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিজের পারিবারিক জীবনের মনোরম একটি ছবি, লেখিকার নিজের অজ্ঞাতে ফুটে উঠেছে।

ডায়রির নিতান্ত অন্তরঙ্গ বিবরণীগুলি গ্রন্থের উপকরণ জুগিয়েছে। সেই কারণে

ব্যক্তিগত খ‍ুঁটিনাটি, গৌণ কথাবার্তা, কবির যে সব আত্মীয়াদের স্মরণযোগ্য অবদান খ‍ুঁজে পাওয়া যায়, তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা, পঞ্চাশ বছর পরের সাধারণ পাঠকের মনে না ধরলেও, রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট বলেই যে সেগ‍ুলি লেখিকার কাছে ম‍ূল্যবান, এ বিষয়ে পাঠকের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

এ ধরনের বই থেকে বেশি আশা করতে হয় না; তার যেট‍ুকু ক্ষেত্র, বিষয়বস্তু তারি মধ্যে আবন্ধ থাকে। এখানে সাধারণ যাঁর দেখা সচরাচর পেত না, এমন একটি রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়; গৃহিণীবিহীন গৃহস্বামী অতিথিবৎসল রবীন্দ্রনাকে, সভায় যাবার জন্য সেজেগ‍ুজে বাড়ি থেকে প্রস্থানোন্ম‍ুখ রবীন্দ্রনাথকে, সভান্তে বাড়ি ফেরার ম‍ুখে ও বাড়ি ফিরে একজন সামাজিক রবীন্দ্রনাথকে, এত কাছ থেকে দেখার ক'জনই বা স‍ুযোগ পেয়েছে? রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পাঠকবর্গের অদম্য কৌতূহল আছে বলেই যে সব কথা বইখানিতে বলা হয় নি, অথচ স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারত, তার অভাব মনকে ক্লিষ্ট করে। ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪১ সালের দীর্ঘ কাহিনী। এই একত্রিশ বছরের মধ্যে মধ্যবয়সী কবি মৃত্যুর তীরে এসে পেণছেছিলেন; ছোট একটি বিদ্যালয় থেকে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিশাল বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছিল। অথচ অপ‍ূর্ব ভাবময় কবির নিরন্তর নিরলস প্রয়াসের কথা, শান্তিনিকেতন আশ্রম গড়ে ওঠার ইতিহাসের সবচাইতে কর্মময় বছরগ‍ুলির কথা কিছ‍ুই বলা হয় নি।

কোথায় কবি কবে কাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কোন সভায় যাবার আসবার সময় কোন ভূমিকায় কে নেমেছিলেন ইত্যাদি. যতই দিন যাবে, পাত্রপাত্রীরা কালের কবলে যতই লোপ পাবেন, ততই এসবের তাৎপর্য কমে যেতে থাকবে। অভিযোগ শ‍ুধ‍ু এই যে লেখিকা আরো অমৃত পরিবেষণ করতে পারতেন কিন্তু করেন নি। তবে স‍ুখের বিষয়, এখনো করবার সময় চলে যায় নি।

লীলা মজ‍ুমদার

চারিদিকে পৃথিবী—সমরেন্দ্র সেনগ‍ুপ্ত। কৃত্তিবাস প্রকাশনী। ম‍ূল্য দ‍ুই টাকা।
মৃত শিশ‍ুদের জন্য টফি—অমিতাভ দাশগ‍ুপ্ত। সাহিত্য। ম‍ূল্য দ‍ুই টাকা।
পাখি জানে—মলয়শংকর দাশগ‍ুপ্ত। সাহিত্য। ম‍ূল্য তিন টাকা।
আমি অমল আঁধারে—মন‍ুজেশ মিত্র। সাহিত্য। ম‍ূল্য দ‍ুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
লোকায়ত অলৌকিক—রত্নেশ্বর হাজরা। গ্রন্থজগৎ। ম‍ূল্য দ‍ুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বনানীকে কবিতাগ‍ুচ্ছ—গণেশ বস‍ু। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। ম‍ূল্য দ‍ুই টাকা।

'কলকাতায় এখন শ‍ুধ‍ু নির‍ুদ্ধ বাতাস। সেই শ্বাসকষ্টের মধ্যে আমরা কিছ‍ু একটা খোঁজ করছি।' প্রায় বিবৃতিম‍ূলক এই কথাগ‍ুলি লিখেছেন সমরেন্দ্র সেনগ‍ুপ্ত তাঁর নতুন কবিতার বই "চারিদিকে পৃথিবী"র অন্তর্ভুক্ত 'আত্মবিবরণধর্মী' কবিতার এক জায়গায়; লিখেছেন, 'আজকাল একট‍ুতে ভীষণ ভয় হয়। কেউ জোরে হেসে উঠলে ভয় হয়। শিশ‍ুর সরল ম‍ুখে স‍ুর্যোদয় দেখলে ভয় হয়। ভিক্ষ‍ুক পয়সা চাইলে না দিতে পারলে মনে হয় তাকেও ঠকালাম। জন্মান্তরবাদের হিসাবে আমার আত্মার বয়স কত হল!' স‍ুদীর্ঘ ও

অপ্রতিরোধ্য, রক্তক্ষরণচিহ্নিত কবিতা এই 'আত্মবিবরণধর্মী'—যেমন এই বইয়ের অন্যান্য কবিতাগুলি; কিন্তু, শেষ পর্যন্ত ভাবতে হল, উদ্ধৃত অংশ নিছক বিবৃতি মাত্র। অন্তত তা এই কবিতাটির প্রয়োজনে নতুন কোন কাজে লাগে নি। আর, 'জন্মান্তরবাদের হিসাবে আমার আমার বয়স কত হল!' পংক্তিটি যে শুধু অতর্কিতে এসে পড়ে স্বাভাবিক চিন্তার মূলে আঘাত করে তা নয়, কিছুটা শঠতার মতো শোনায়।

হয়তো এর কারণ কালানুগামিতা। সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর সমসাময়িক, 'তীব্রতম আধুনিক' হিসেবে খ্যাত আরো কোন কোন কবির কবিতায় এই ধরনের আরোপিত স্মার্টনেস, শব্দ ও পংক্তির চতুর ব্যবহার আবিষ্কার করা দুরূহ নয়। এক হিসেবে, বলতে হয়, ইদানীংকার কবিতার সামান্য লক্ষণ এটি। গভীরতা থাক না থাক, বক্তব্য যতই পানসে হোক, সারল্য-সূচক কয়েকটি পংক্তি, যৌনজ কিছু উপমা, রিরংসু ভাবদ্যোতক কিছু বর্ণনা ইত্যাদি হয়তো সহজ হাততালি ও জনপ্রিয়তা ত্বরান্বিত করে।

দুঃখিত হয়ে ভাবতে হয়, সমরেন্দ্রর কবিতায় কেন এই ধরনের প্রলোভন-কাতরতার নজীর থাকবে! তাঁর আগের বই "যে-কোন নিঃশ্বাসে" এবং "চারিদিকে পৃথিবী"র মধ্যে ব্যবধান মাত্র বছর চারেকের: কিন্ত এই চারটি বছরে তিনি চিন্তা ও একাগ্রতায় এমন আশ্চর্য এক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন, শিল্প ও শব্দের ব্যবহারে এমন পরিমিতি ও প্রবীণোচিত প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন, যা তাঁকে অনিবার্য স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করবে। আমার সন্দেহ, তাঁর সমসাময়িক আর কোন কবি ইতিমধ্যে এতখানি পরিশীলিত ও শুদ্ধ হয়েছেন কিনা! প্রতি ছত্রে তাঁকে আলাদা করে চেনা যায়; শোকাহত ও বিমূঢ়, বিক্ষুব্ধ ও বিবেকবান— "চারিদিকে পৃথিবী" বস্তুত ক্ষমা, প্রেম, তিতিক্ষায় চিহ্নিত বিরাটবাহু মানবিকতায় শুরু এবং শেষ হয়েছে শুদ্ধ চেতনার অপমৃত্যুজনিত বোধে—আর, এ-সবই উদ্ভূত কবির শিল্প, সমাজ, রাজনীতি সম্পৃক্ত চিন্তায়, দ্বিধায় ও সংশয়ে; এক হিসেবে যে-কোন বড় কবির কবিতার বিষয়ই তো এই!—

> নেই দুহাতে জায়গা নেই তাই সমস্ত শরীর মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছি;
> এলে কেউ ফেরাব না, আমার সংগ্রহশালা খালি পড়ে আছে।' (পৃঃ ৪০)

'তাজমহল থেকে নিজের মহলে' কবিতার এই প্রাণবান প্রথম মুহূর্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সুনিশ্চিত ভ্রমণকে একসময় ক্লান্ত করে তোলে :

> আমার যৌবন থেকে ক্রমশ হরিৎ
> অর্থাৎ নিসর্গ অর্থে ব্যবহৃত ক্লান্ত অনুষঙ্গগুলি, সব
> প্রকৃত শহরবাসীর মতন কলমের সীমা থেকে দূরে
> সরিয়ে, একাকী বসে রয়েছি,... (পৃঃ ৪২)

ক্লান্ত, মহৎ ও ক্লান্ত, ক্লান্তির বিবিধ অনুষঙ্গ স্বপ্নতাড়িত, স্মৃতিতাড়িত ছায়ার মতো বার বার সমরেন্দ্রর কবিতায় নিঃসঙ্গ অর্থে ভ্রাম্যমান; ক্লান্তি সত্ত্বেও নিরন্তর এই ভ্রমণ।

> ...আমাকে যে বারবার আজও
> গানের, ঘ্রাণের দিকে এখনো ফিরিয়ে আনে, সে আমার নিজস্ব জন্মের
> অপরিবর্তনীয় আঁধার
> যার ঋণে মৃত্যুও যথেষ্ট নয়
> ভেবে, রমণীর কাছে নয়, পুনর্জন্ম ভিক্ষা করি

কবিতার কাছে... (পৃঃ ৪৩)

'এইভাবেই ক্রমশ' তাঁর, প্রায় একই দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা-নির্ভর, 'এ-জন্মের ভ্রমণ বেড়ে ওঠে।'—

আমি গত বছরের
প্রেস-ফোটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত
ছবিটি দেখেছি—এক শ্বেত পাদ্রী, গুলিতে আহত
নিগ্রোর দেহকে টেনে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে চাইছেন।
ক্যামেরার ও-রকম অবিস্মরণীয় উত্তরণ
দেখে সেই নিমন্ত্রিত ভিড়ের সন্ধ্যায়
আমি আফ্রিকার মতো একা, রুমালের অস্থির আড়ালে দুটি
দগ্ধ চোখ মুছে নিয়েছিলাম।
মনে হয়েছিল আরো একবার পৃথিবীকে নিঃশ্বাসের যোগ্য করে দিতে
সংবাদপত্রের যেন সঠিক ভূমিকা ছিল; আজো যাকে রোজ
সূর্যবরণের ছলে পাখির ডাকের সঙ্গে খুলে পাঠ করি
সে কি জন্মের বিরুদ্ধযাত্রা, শুধু কলামে-কলামে খোঁজা নিজের কবর?

(সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। পৃঃ ৩৫-৩৬)

অবশ্য, সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতায় এই আন্দোলিত বিষাদের ভাব ও স্পর্শাতুর চিত্রকল্পের ব্যবহার নতুন নয়। "যে-কোন নিঃশ্বাসে" গ্রন্থের 'অনাবিষ্কৃত' কবিতার এক জায়গায় উপরোক্ত উদ্ধৃতির অনুরূপ না হোক, সমধর্মী চিত্র সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত মেলে :

পাস্তেরনাক মারা গেলেন, কারা যেন খুব কুয়াসায়
শবাধার কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পৃথিবীর শুদ্ধতম বিশ্বাসের দিকে—

তীব্র ভাবাবেগসম্পন্ন, ঋজু কণ্ঠের মন্থর অথচ সাহসী উচ্চারণ 'চারিদিকে পৃথিবী'র কবিতাগুলিকে বিশেষ তাৎপর্যময় করে তুলেছে; যে-তাৎপর্যের অধিকার অর্জন নিঃসন্দেহে বহুদিবসের সৎ-নিরপেক্ষ অনুশীলনের ফল।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। কিন্তু, লক্ষণীয়, কবিতায় আত্মকণ্ঠ আবিষ্কারে তিনি সমকালীন অধিকাংশ তরুণ কবির মতো দীন নন; বরং, এ-ব্যাপারে—নিজস্ব ভাষা ব্যবহারে, তিনি বিশেষ রকম সাবলীল। 'মৃত শিশুদের জন্য টফি' কবিতাগ্রন্থটি উক্ত কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যয়হীনতার নানা স্তরে বিবিক্ত দিনযাপন তাঁর কবিতায় প্রায়ই আর্তি ও অভিমান স্পষ্ট করে তুললেও, গভীরতর চিন্তায় তিনি রোম্যান্টিক, এবং রোম্যান্টিক ভিন্ন আর কিছু নন—

শিশুদের টফির মতন
অজস্র কবিতা আমি বিলিয়েছি শহরের মাঠে,
মুখর মাইকে দর্প করেছি, গা-ভরা যুবতীরা
কেমন চঞ্চল করে, দুয়ারে দুয়ারে
মদের ভিক্ষায় রাত্রি ভেসে গেছে, সবই সেই প্রচণ্ড অলীক
শিল্প শিল্প করে।

(নারী নয় আকাশ দেখুক। পৃঃ ১৪)

রোমান্টিসিজমের অন্যতম শর্ত নিসর্গ চেতনা, অনিবার্যভাবে তাই অমিতাভ দাশগুপ্তর

কবিতায় সুরেশ্বরী গঙ্গা, গঞ্জের হাট, বনমোরগের ফুল ইত্যাদি কথা এসে পড়ে। কিন্তু, তাঁর বৈশিষ্ট্য এ-সবের পাশাপাশি শহুরে চিত্রকল্প ও উপমা ও শব্দ প্রয়োগে—

আমি জামা ছুঁড়ে দিই তোমাদের চেনা ঘাসে **ডিস্কাসের** মত (পৃঃ ১৪);
যেন পাগলা হয়ে যাব এত জোরে ঘণ্টাধ্বনি বুকের ভিতরে
একটানা **ফিউনর‍্যাল** যেন...(পৃঃ ৩২);
আবেগমথিত বুকে হীরে দুলেছিল, **ব্রেনে** ঘোড়ামাছি... (পৃঃ ৩৯);
স্ট্রেপটো-পেনিসিলিনের রবরবা, তাজা কার্তুজের মতো ক্যাপসুল
চিকেন-এসেন্স কমলা ডিম
দু এক **ব্যারেল টনিক**... (পৃঃ ৪২);
গ্ল্যাকসো-বাচ্চার মত স্বাস্থ্যবান... (পৃঃ ৪২)

কখনো কখনো মনে হয় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা-ভাবনার, বিশেষত ভাষার, অলক্ষে কবি জীবনানন্দ প্রভাবিত করেছেন। অমিতাভ দাশগুপ্তের মানসিকতা—যাকে 'রোম্যান্টিক' বলেছি, কোথাও কোথাও এত অস্থির ও আত্মভূক ও চীৎকারের পর্যায়ভুক্ত যে চমকিত হতে হয়—

দু পুরিয়া আর্সেনিক গিলে এই অন্তিম ভাবনা
সেঁকো বিষে বড্ড বুক জ্বলে...নার্স নার্স হাসপাতাল
নার্সদের স্তন নেই, দেওয়ালের মত ঊরু ঢাকা
গুমোট মার্কিন থানে...যুবাদের সমর্পিত প্রেম
বা বহতা গোলাপের রক্ত ধৌত অসহ নির্ঝরে।
(আর্সেনিকের গোলাপ। পৃঃ ২৮)

পক্ষান্তরে, সেই আপাত-রোম্যান্টিক কাব্যভাবনার অধিকারী হয়েও, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত অনেক বেশি সংযমী ও স্থিতধী, আত্মবিশ্বাসে স্থির। গ্রন্থ-পরিচয়ে তাঁকে 'সাম্প্রতিক কবিতার রক্তহীন চীৎকারে নিস্পৃহ কবি' হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এই অহঙ্কারে অসার কিছু দেখি না। নির্ভার, ছিমছাম অথচ স্পষ্ট অর্থবহ ঠিক-ঠিক শব্দ নির্বাচনে মলয়-শঙ্করের নৈপুণ্য সন্দেহাতীত, চিন্তার রূপ নির্মাণে তাঁর বিন্যাস-কৌশল কাজ করে প্রায় অঙ্কের নিয়মেঃ

বাইরে অবাধ মুক্তি
পাখি জানে
সে-পথের সবুজ ঠিকানা॥
দরোজা খোলো, দ্যাখো, অদূরে গিয়েছে বেঁকে
পায়ে চলা ছায়ানীল পথ, যত খুশি যেতে পারো
যত দূর ইচ্ছা বিপুল, কার্নিসে ঠেকবে না পা, দেয়ালে
সিঁড়িতে কিংবা উঠোনের শক্ত তপ্ত শান;
ওখানে পুড়বে না জানবে পা কিংবা মন কিংবা দেহ,
আশ্চর্য ধুলোয় সোনা; ঝুপসী বট, আমলকি বন
নীলকণ্ঠ পাখি জানে, পা বাড়ালে বলে দেবে
সে পথের সবুজ ঠিকানা। (পাখি জানে)

বস্তুত, কবিতা যখন শুধুই অস্থিরচিত্ততার প্রজনক, অন্তত যখন যুবতী রমণীর ঊরুর

বিভিন্ন আলোড়ন, প্রকম্পিত স্তন ইত্যাদির কামার্ত বর্ণনা মাত্র প্রেমিকার স্মৃতি রচিত হয় বলে অনেকানেক কবির ধারণা, তখন প্রেম, প্রণয়, জগৎ সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধির স্থিরতায় যে-কবি বিশ্বাস রাখতে পারেন, গৌণ হন বা অগৌণ, তাঁকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। মলয়শঙ্করের কবিতায় চেষ্টাকৃত ক্লেশের উচ্চারণ নেই বললেই হয়; এমনকি অন্ধকার—যে-শব্দের আক্ষরিকতার বাইরে প্রায় কেউই যেতে ইচ্ছুক নন—পর্যন্ত তাঁর কাছে সমাহিত মুহূর্তের প্রতীক :

অন্ধকারে বসে আছি। নিরুপমা অন্ধকার।
কোথাও ক্লান্তি নেই, ধূসরতা অথবা বিষাদ
কিংবা শোক, হাহাকার, শীর্ণ চাঁদ প্রেমের উচ্ছ্বাস;
কিছু নেই, কি মাটি কি বিশ্বজুড়ে এ মুহূর্ত আশ্চর্য প্রতিমা
যতদূর দৃষ্টি যায় নীলকান্ত অন্ধকার।...(চতুর্দিকের নির্জন রহস্যে। পৃঃ ৩৮)

উপরোক্ত তিন কবির অনেক পরে লিখতে শুরু করেছেন মনুজেশ মিত্র, রত্নেশ্বর হাজরা ও গণেশ বসু। স্বাভাবিক কারণে, অনন্য ভূমি নির্বাচন এখনো তাঁদের কাছে প্রতীক্ষার বিষয়। এ'দের মধ্যে রত্নেশ্বর হাজরাকে কিছুটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয়; ইতিমধ্যেই গভীরতর চিন্তার রাজ্যে তাঁর সহজ অনুপ্রবেশ ঘটেছে।—

জন্ম মানেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, মৃত্যু হয়তো জন্মের—
কখনো নাব্য কখনো সীমাহীন বন্য হাওয়ার চরম অসংগতি
দ্বীপের মতন স্রোতের ধারাকে কখনো দু'ধারে কখনো বহুধা ভাঙ্গে
তথাপি এমনি নাগরিকতার অধিকারে লোভাতুর
উল্কারা নামে, নেমেছে, নামবে—যেমন মানুষ লুব্ধক হতে চেয়েছে, চায়—
বুনো নেকড়ের পাশাপাশি ছোটো হরিণকে দ্যাখে, ময়ূরীকে দ্যাখে।'
(স্বগত। পৃঃ ২৫)

মনুজেশ মিত্র কবিতার শরীর গঠনে যতটা কুশলী, চিন্তার সম্প্রসারণে ততটা নন। তথাকথিত আধুনিকতার ক্লিশে বিমূঢ় স্বপ্নদর্শীর ভূমিকায় এখনো তাঁকে লক্ষ্যহীন অন্ধকারের স্তাবকতার বাইরে যেতে দেয় নি। ফলে, তাঁর কবিতায় পৌনঃপুনিকতার ত্রুটি এড়ানো সম্ভব হয় নি। গোটা বই জুড়ে প্রায় প্রতিটি কবিতায় 'অন্ধকার' শব্দের ক্লান্তিহীন ব্যবহার এ-ক্ষেত্রে নতুনতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অন্তরায়—

এখনি তো গর্ভিনী গোধূলি/সহসা প্রসব করবে মৃত অন্ধকার। (পৃঃ ৯)
সারাদিন ধরে রোদ মরে মরে অন্ধকার,...(পৃঃ ১০)
উচ্চস্বরে গান গাইতো দুরূহ শূন্যের/আলো আর অন্ধকারে। (পৃঃ ১১)
পৃথিবীর অন্ধকার ঘরে/তারও দুটি চোখ জ্বলেছিল। (পৃঃ ১২)
অন্ধকারে নেমে যাই, অন্ধকারে নিস্পৃহ সময়,...(পৃঃ ১৩)

সানন্দে লক্ষ করি, মনুজেশ মিত্রের ঘনিষ্ঠ সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও বিষাদভাবনাকে গণেশ বসু পরিশীলিত কাব্যভাবনায় রূপান্তরিত করেছেন। 'আমরণ যে রহিবে অশ্রুময় হৃদয়ে আমার', গ্রন্থের উৎসর্গপত্রের এই অস্ফুট উচ্চারণ কখনো স্মৃতি, কখনো আর্তিময় বিষন্নতা স্পর্শ করে শেষ পর্যন্ত স্থিরতা অর্জন করতে পেরেছে। এ-সবই প্রেমের কবিতা; এবং পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাববর্জিত নয়।

ভালোবাসা পেলে আর সম্রাটের কে চাহে গরিমা?

কুবেরের কামকুণ্ড—রাজ্য-পাট—সম্মান ইত্যাদি
অথবা প্রভূত যশ,...(পৃঃ ৩২)

ইত্যাদি পংক্তি মোটামুটিভাবে সহনীয় আবেগমণ্ডিত। নিছক প্রেমের কবিতা আজকাল আর লেখা হয় না; বা লেখা হলেও, সব প্রেমিকের অনুভবই যেন অনুরূপ হয়ে ওঠে! গণেশ বসুর উদ্ধৃত কবিতার পংক্তি অনিবার্যভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা স্মরণে আনে, 'ভালোবাসা পেলে আমি পায়েসান্ন কেন খেতে চাব' ইত্যাদি। প্রত্যক্ষভাবে কবিরা না হন, হয়তো এই সমীকরণের জন্য প্রেমিকের একচক্ষু প্রবণতাই দায়ী।

দিব্যেন্দু পালিত

অষ্টাবিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

চতুরঙ্গ

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

দক্ষিণ এবং উত্তরপূর্ব ভারতে আর্য-অভিযাত্রীদের বিজয় প্রধানতঃ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। দূরত্ব এবং নানা প্রাকৃতিক বাধার জন্য সেখানে সামরিক জয়লাভ সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যের ফলে আর্য এবং দ্রাবিড়ের মধ্যে মিলন এত গভীর হয়েছিল যে দ্রাবিড়দের অধিকাংশ তাঁদের মহৎ এবং আর্যসভ্যতার চেয়েও সুপ্রাচীন স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। দ্রাবিড়সভ্যতা যে আর্যসভ্যতার চেয়ে অনেক বেশী পুরোনো একথা যেমন দ্রাবিড়েরা ভুলে গেলেন, আর্যদের অধিকাংশের মনে ঠিক তেমনি দ্রাবিড়সভ্যতার প্রতি প্রাক্তন বিরাগ এবং দ্বেষের স্মৃতি একেবারে মুছে গেল। পরস্পরের সভ্যতাকে স্বীকার এবং গ্রহণ করবার মনোবৃত্তির ফলে নতুন যে সমাজ গড়ে উঠল, সেই সম্মিলিত সভ্যতা তাঁদের মিলনের নবপ্রতীক হয়ে দাঁড়াল। রামায়ণ এবং মহাভারতে আর্য-অনার্যের পূর্বেকার বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বিদ্বেষ মনোভাবের পরিচয় একেবারে মুছে যায় নি। কিন্তু আর্য এবং অনার্যের সংঘর্ষ এই দুই মহাকাব্যে এক নতুন রূপ পেয়েছে। অনার্যও যে সভ্য এবং বহু-বিষয়ে আর্যদের সমকক্ষ ও কোন-কোন ক্ষেত্রে আর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এ স্বীকৃতি রামায়ণে এবং আরো বিশদভাবে মহাভারতে মেলে। বস্তুতপক্ষে এই দুটি মহাকাব্যের মাধ্যমে আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয় দানা বাঁধতে সুরু করেছে এবং পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংস্কারপন্থী ধর্ম-আন্দোলনের সহায়তায় তা সমগ্র জনমানসে ছড়িয়ে পড়ল।

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নানা পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত ভারতবর্ষে কৃষকসমাজের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে গভীর ঐক্য অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ঐক্য গঠনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমাণ সাধুসন্ন্যাসীসন্তর প্রভাব গভীরভাবে সহায়তা করেছিল। ভারতবর্ষের নিরক্ষর সাধারণ গ্রামবাসী দুঃখবিপদে যে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন, অদৃষ্টের ঘাতপ্রতিঘাতকে যেভাবে স্থির দৃষ্টিতে গ্রহণ করে জীবনদর্শন দিয়ে বিচার করতে চান, তা দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। একথা সত্য যে কোন-কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের মনোবৃত্তি অদৃষ্টবাদ এবং নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকারেরই নামান্তর। জীবনীশক্তির বেগ কমে আসলে মানুষের মনেও অবসাদ

আসে, তখন যা ঘটে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করবার মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের সুখদুঃখকে সমদৃষ্টিতে দেখবার প্রয়াসকে কেবল জীবনীশক্তির অভাব মনে করলে ভুল হবে। ভারতবর্ষের অনুকূল আবহাওয়ায় জীবনসংগ্রাম ততটা তীব্র নয়, অল্প আয়াসেই নিত্যকার প্রয়োজন মেটানো যায় এবং আবহমানকাল থেকেই এদেশের কৃষকসমাজ খোরাক-পোষাকের সংস্থান অল্প চেষ্টায় করতে পেরেছেন। এ সব প্রয়োজনীয় দাবী মেটাবার পরে স্বভাবতই তাঁদের মনে জীবন নিয়ে নানা চিন্তা এসেছে, একটা সহজ জীবনদর্শন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ গ্রীষ্মের দিনে যখন হাতে কাজ থাকে না, তখন এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা স্বাভাবিক, তাই প্রকৃতি যে এ দেশে জীবনদর্শন গঠনে সাহায্য করেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ সমস্ত কথা স্বীকার করেও বলতে হয় যে সাধারণ মানুষ এ দেশে যেভাবে ভাগ্য এবং নিয়তি ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় মাতে, তা দেখে বিদেশাগত অনেকেরই বিস্ময় লাগে। নিরক্ষরতা সত্ত্বেও এ ধরনের চিন্তাধারা কিভাবে সমাজে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল, এ সমস্যা স্বভাবতই উঠে। যারা লিখতে পড়তে শেখেনি, কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তার এত ব্যাপক ও গভীর বিকাশ তাদের মধ্যে কিভাবে সম্ভব হ'ল?

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে যে কথকরীতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দূরদূরান্তর হতে আগত সাধুসন্ন্যাসীসন্ত যেভাবে ঘুরে বেড়াতেন, তাদের কথা স্মরণ রাখলে এ সমস্যার সমাধান মেলে। লোকগাথা এবং সহজ সরল উপাখ্যানের মধ্যদিয়ে তারা ধর্ম এবং নীতির মহত্তম আদর্শকেও সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন বলেই সমাজের সকল স্তরে এ সম্বন্ধে ধারণা-ভাবনার পরিচয় মেলে। এসব গল্প লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ত, তাই অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও দেশের সাধারণ নরনারী তাদের মাধ্যমে দর্শনের বড় বড় শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেতেন। কথকের মুখে কাহিনীর মধ্যে দর্শন রূপ পায়, ধর্মের মূলসূত্রগুলি মানুষের কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশিত হয়। উপাখ্যানের মাধ্যমে নীতি-শিক্ষা সহজেই জনমনকে প্রভাবান্বিত করে। বংশপরম্পরায় এ সমস্ত লোকগাথার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে এবং পুরুষানুক্রমের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বলে তাদের মধ্যদিয়ে নীতি-শিক্ষা সমাজজীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশের জ্ঞান শিক্ষিতের মানসে যেভাবে সঞ্চারিত হয়, নিরক্ষর গ্রামবাসীর ক্ষেত্রে এ সমস্ত লোকগাথা সেই জ্ঞান মুখে মুখে ছড়িয়ে অক্ষর শিক্ষার অভাব অনেকখানি পূরণ করেছে।

আধুনিককালের নাগরিক ভারতবর্ষে কথকতার শিল্পউৎকর্ষ লোপ পেতে বসেছে। প্রাচীনকালের বীর্য ও প্রেমের কাহিনী নিয়ে সংগীত রচনা করে যে সমস্ত চারণ এবং কবি এককালে দেশময় ঘুরে বেড়াতেন, আজকাল তাঁদের বড় একটা দেখা যায় না। গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত কথক ও গল্পরচয়িতা গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নীতিশিক্ষা দিতেন, তাঁরাও আজ অন্তর্হিত। তাঁদের অন্তর্ধানে যে অভাবসৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হবে না। গ্রামজীবনে তাঁরাই ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসকে সঞ্জীবিত করে রাখতেন, তাঁদের সংগীত ও গাথার মধ্যদিয়ে দেশের বিরাট ইতিহাস ও স্থানীয় বীরত্ব ও গুণপণার ইতিহাসের এক অপূর্ব সমন্বয় হত। যদি বলি যে তাঁরাই লোকসত্তার প্রকৃত ঐতিহাসিক, তাহলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, কারণ তাঁদের গাথার মধ্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথা এবং স্থানীয় অসাধারণ ঘটনা দুইই সাহিত্যিক অমরত্ব লাভ করেছে।

কথক বা গল্প রচয়িতা একাধারে ঐতিহাসিক ও কবি, এবং সঙ্গে সঙ্গে এককভাবে

নাটক বা যাত্রার পূর্বসূরী। সিনেমার তো তখন উদ্ভাবনই হয় নি, আজকাল যাকে নাটক বা রঙ্গমঞ্চ বলা হয় তাও সেদিন বিকাশলাভ করে নি। আজও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা সিনেমা গৃহ গ্রামে বড় বেশী দেখা যায় না, যদিও বিগত বিশ বৎসরে সিনেমা ছোট ছোট সহর এবং গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা যাই হোক না কেন, সমাজে অর্থের অনটন যতই বাড়ুক না কেন, তবু দলবেঁধে সহর গ্রামের জনসাধারণ এসব সিনেমা ঘরে ভিড় করে, রূপোলী পর্দায় বিলাসব্যসনের প্রকাশ দেখে নিজেদের জীবনের ব্যর্থতার কথা ভুলতে চায়। পৌরাণিক নানাধরনের কাহিনীও সিনেমার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের লৌকিক ধর্মপ্রবৃত্তির খোরাক যোগায়। তাদের কখনো ধর্ম নিয়ে মাতিয়ে তোলে, কখনো সংসারের পরাজয় ও দুঃখের গ্লানি ভোলাতে চেষ্টা করে। সিনেমার আগে গ্রামজীবনে 'যাত্রা'র মাধ্যমে এ প্রয়োজন খানিকটা মিটেছে কিন্তু যাত্রাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। যাত্রাদল যখন গড়ে উঠেনি, তখনও কথক তাঁর কাহিনী ও বর্ণনার মধ্যদিয়ে গ্রামবাসীর মনোরঞ্জন করেছেন, তাঁদের ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় রাজসভার দৃশ্য শ্রোতাদের কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত, অদেখা দেশ অজানা কালের নানা ছবি তাঁদের মনে স্পষ্টভাবে দেখা দিত। কথকের বর্ণনার গুণে বীরের বীরত্ব, সাধকের আত্মদান, সতীনারীর নিষ্ঠা তাঁদের মনে গভীর দাগ কাটত, দুঃখদ্বন্দ্বের শেষে সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মের বিজয় তাঁদের দ্বিধা-সন্দেহ দূর করে অন্তরের বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করে তুলত।

কথকের যে সব অবদানের কথা এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছি, তা ছাড়াও তাঁরা সমাজকে অন্য বহুভাবে সেবা করতেন। সেকালের কথককে ব্যক্তিবিশেষ ভাবলে তাঁর সম্যক পরিচয় মিলবে না—প্রতিষ্ঠান হিসাবেই তাঁর বিচার যুক্তিযুক্ত। বস্তুতপক্ষে সেকালের সমাজে কথক না থাকলে সমাজজীবন অনেকখানি শূন্য ও নিরর্থক হয়ে পড়ত। তাঁর বর্ণনার মধ্যদিয়ে পুরোনো ঘটনা জীবন্ত হয়ে উঠত বলে তিনি একাই রঙ্গমঞ্চের বহু অভিনেতার অংশ পূরণ করতেন, কিন্তু তা ছাড়াও সমাজজীবনের কেন্দ্র হিসাবে তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। কথকের কাহিনী শুনতে গ্রামের নারীপুরুষ বালকবৃদ্ধ সবাই একত্রিত হ'ত, এবং সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে স্বভাবতই সেখানে নানা কথা হ'ত। যে কারণেই হোক বহু মানুষ কোথাও একত্রিত হলে সেখানে সমাজজীবনের কেন্দ্র গড়ে উঠে এবং নানা বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়। ইয়োরোপে যেমন ক্লাব বা সরাইখানার পরিচয় মেলে, জাতিভেদপ্রথার প্রাধান্যের দরুন ভারতবর্ষে সেরকম সবাই মিলে একত্র খানাপিনার কেন্দ্র গড়ে উঠেনি, কিন্তু কথকের আসরে কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে নানা সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়েছে।

গ্রামবাসীদের খুসী করেই কথকের সার্থকতা, তাই সেকালের কথক গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারতেন না। কল্পনার রাজ্যে তাঁর গতি যতই অবাধ হোক না কেন, সর্বদাই তাঁকে স্মরণ রাখতে হত যে শ্রোতাদের ডিঙিয়ে গেলে চলবে না। গ্রামবাসীর বোধাতীত বা অগ্রাহ্য কাহিনী বললে কথকের টিকে থাকাই মুস্কিল। তাই তাঁর বর্ণনা ঘুরে ফিরে গ্রামজীবনের শাশ্বত কথায় ফিরে আসত। বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে শ্রোতাদের মন উদ্বেল হয়ে উঠত কিন্তু সমস্ত বর্ণনার মধ্যেই গ্রামজীবনের বাস্তব স্বাদ দিয়ে তাদের সর্বজনগ্রাহ্য না করতে পারলে কথকের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেত।

ধর্মের কথা বললে ভারতবর্ষে অনেকের মনেই সন্ন্যাস ও দেহনিপীড়নের ছবি ভেসে উঠে, আবার কেউ কেউ ভাবেন যে ভক্তির প্লাবনে পরিচিত সংসারের সমস্ত বাধাবন্ধন ভাসিয়ে দেওয়াই ধর্ম। ধর্মের এই অসামাজিক রূপ ভারতবর্ষে রয়েছে একথা যেমন অস্বীকার করা

চলে না, তেমনি কেবলমাত্র এই অসামাজিক রূপকে ধর্ম ভাবলেও ভুল হবে। দৈনন্দিন জীবনের যে ছোটবড় কর্তব্য শরীরযন্ত্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মতনই প্রতিদিনকার নিত্যকর্মের অপরিহার্য অঙ্গ, তাদের ভুললে ভারতীয় জীবনের একটা বিরাট অংশ অজানা থেকে যাবে। জীবনের এই প্রতিদিনকার রূপকে কথক কোনদিন ভোলেন নি। তাই জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর কাহিনী রচনা করেছেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে তিনি লঙ্ঘন করেন নি, তাকে স্বীকার করে নিয়ে পরিচিত এবং সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ নরনারীকে কেন্দ্র করে নীতি কথা এবং ধর্মকাহিনী রচনা করেছেন।

যে ঐক্য এবং ধারাবাহিকতাকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলসূত্র বলেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মের বিকাশেও তার পরিচয় মেলে। হিন্দু ধর্মচিন্তায় বিভিন্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে এক সঙ্গে স্থান দেওয়ায় ভারতীয় ধর্মদৃষ্টিতে যে বিরাট বৈচিত্র্য তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। আর্যরা যখন এ দেশে আসেন, তাঁরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করতেন এবং সেই সমস্ত শক্তিকে নানা স্তোত্র এবং কল্পকথায় রূপ দিয়েছেন। ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাসের অল্পদিনের মধ্যেই এ সমস্ত বৈদিক দেবদেবীর আরাধনা লোপ পেতে সুরু করল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হিন্দু পুরাণের এ ত্রয়ী পৌরাণিক যুগেই বৈদিক দেবদেবীর স্থান অধিকার করেছিল কিন্তু তাদের মধ্যেও ব্রহ্মা বেশীদিন টিকল না, ব্রহ্মার স্থান ধীরে ধীরে স্ত্রীরূপিনী শক্তি দখল করে নিল। বৈদিক সাহিত্যে শক্তি বা এ ধরনের কোন দেবীর কোন পরিচয়ই মেলে না, এমনকি বিষ্ণু অথবা শিব সম্বন্ধেও বৈদিক মন্ত্রগুলির বিশেষ কোন আগ্রহ নেই।

অনেকের মতে ত্রিশূলধারী শিব মহেঞ্জোদারোর দেবতাদের অন্যতম। শিবের কল্পনায় লিঙ্গপূজার যে স্বীকৃতি, তা দেখেও অনেকে বলেন যে শিব একান্তভাবে অনার্য দেবতা। এ বিষয়ে নানা বাদবিসম্বাদ সত্বেও অধিকাংশ পন্ডিতের মত এই যে বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে প্রাক আর্য কোন এক দেবতার সংমিশ্রণের ফলেই প্রচলিত হিন্দুধর্মে শিব পূজার উদ্ভব। দক্ষযজ্ঞে যে শিবকে আমন্ত্রণ করা হয় নি, তা থেকেও তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুধর্মের স্বীকৃত দেবদেবীর মধ্যে শিবের স্থান ছিল না। বর্ণ সম্বন্ধে আর্যদের তীব্র অভিমান বেদে বারবার প্রকাশ পেয়েছে, তা দেখে শ্যামবর্ণ বিষ্ণুর পরিকল্পনা থেকেও মনে হয় যে বিষ্ণু আর্যদেবতা নন। ভারতবিজয়ের পরে বিজয়ী আর্যদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালী কোন নায়ক বিজিত অনার্যদের হৃদয়জয়ের জন্য তাদের কোন একটি প্রধান দেবতাকে আর্যদেবদেবীর সামিল করেছিলেন এবং তারই ফলে বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ হিন্দুধর্মে প্রাধান্য পেলেন একথা বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। অনেকে মনে করেন যে উদ্ভিদ জগতের দেবী হিসাবে শক্তির আবির্ভাব এবং তাই প্রথম দিকে বসন্ত ঋতুতেই শক্তিপূজা হত। ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মচিন্তায় শক্তির প্রভাব বাড়তে লাগল এবং রামচন্দ্রের অকালবোধনের মাধ্যমে বসন্তের বদলে শরতে শক্তিপূজার প্রচলন হল।

দ্রাবিড় এবং অন্যান্য প্রাক আর্য জাতির দেবদেবীকে আর্যসমাজ আপন করে নিল কিন্তু তাদের গ্রহণ করবার সময় তাদের স্বরূপ, প্রকৃতি এবং পূজাপদ্ধতিতে আর্যধারা অনুসারে অনেকভাবে বদলাল। অনার্যেরা এ পরিবর্তনের বিরোধ করে নি এবং ফলে আর্য অনার্য সমাজের সকল মানুষই নতুন দেবদেবী ও তাদের উপাসনাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। বিভিন্ন জাতি বা ধর্মের দেবদেবীর এভাবে একসূত্রে গাঁথার নিদর্শন ভারতবর্ষের বাইরে

অন্য দেশেও মেলে কিন্তু ভারতবর্ষে যেরকম ব্যাপকভাবে বহুদেবদেবীর একত্রীকরণ হয়েছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বেশী নেই। ভারতবর্ষের ভূগোল এবং ইতিহাসের যুগ্ম-প্রভাবে এদেশে যে বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন ধর্ম একই সময়ে বিকাশলাভ করেছে, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তার ফলে ভারতবর্ষের দার্শনিকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে পরম সত্তা এক এবং ঐক্যবদ্ধ হলেও বিভিন্ন স্তরের সভ্যতায় বিভিন্ন মানুষের কাছে তার প্রকাশ বিচিত্র হতে বাধ্য। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের আর্য ধর্মনায়কেরা তাই স্বীকার করলেন যে সমস্ত ধর্মের মধ্যেই সত্যের কণা নিহিত আছে, কারণ বিভিন্ন স্তরের মানুষ একই সত্যের সাধনায় বিভিন্ন যুগে বা বিভিন্ন অবস্থায় যা উপলব্ধি করেছে, সে যুগে তাই তার কাছে ধর্ম বলে প্রতিভাত হয়েছে।

যে দার্শনিক ভাবনার উপর ভারতীয় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত, তা রূপ এবং আত্মা, বাহির এবং অন্তর দুইয়েরই মর্যাদা স্বীকার করে। বেদে আর্যজাতির ধর্মীয় অভিজ্ঞতার যে প্রকাশ, তা বাহিরের রূপ বা আনুষ্ঠানিক প্রকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেয় নি। প্রাকৃতিক শক্তিকে পরব্রহ্মের প্রকাশ মনে করে তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেই সেদিন আর্যদের ধর্মান্বেষা তৃপ্ত হয়েছে। আর্যেরা যেদিন ভারতবর্ষে অভিযাত্রী হিসাবে এলেন, তখন তাঁদের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হলেও পূজারি সম্প্রদায়ের সূচনা হয়েছে। ঋগ্বেদ রচনার কালেই এই পূজারি সম্প্রদায় অন্যান্য আর্যশ্রেণী হতে পৃথক হয়ে ব্রাহ্মণজাতির পত্তন করেছিল। শ্রেণীহিসাবে ব্রাহ্মণজাতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিক বাড়তে লাগল। যাগযজ্ঞ হোম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আচার অনুষ্ঠান ক্রমে এত বেড়ে গেল যে তার ফলে ধর্মের গূঢ় অন্তর্নিহিত মর্মের কথা মানুষ ভুলতে বসল।

বেদ যেভাবে চতুর্ভাগে বিভক্ত হল, তার মধ্যেও অনুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান জটিলতার পরিচয় মেলে। শ্রম বিভাগ থেকে বর্ণ বিভাগ শুরু হয়েছিল কিন্তু সেই স্বাভাবিক বিভাগ যখন জাতিভেদে রূপান্তরিত হল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও অবনতি ঘটল। মানুষের আত্ম-সাধনাই ধর্মের মূলকথা কিন্তু ধর্মাচরণ যখন শ্রেণীবিশেষের জাতব্যবসায়ে রূপান্তরিত হল তখন তার প্রকৃতিও বদলে গেল, বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির জীবিকাহিসাবেই তা সমাজে স্থান পেল। ধর্মের আবেদন কিন্তু এভাবে মেটে না। অপরে খেলে যেমন নিজের ক্ষুধা দূর হয় না, অন্যে ধর্মাচরণ করলে তেমনি নিজের মনের ধর্মান্বেষা মেটে না। যাঁদের ধর্ম-চেতনা প্রবল, বাহিরের অনুষ্ঠান এবং ধর্মের রীতিনীতি দিয়ে তাঁদের মন ভরে না, বরং তাঁদের মনে এ সমস্ত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জমে ওঠে। প্রাচীন ভারতে অনুষ্ঠান ও আচারের দিকে ঝোঁক যত বাড়তে লাগল, ধর্মসংস্কারের আন্দোলনও তত প্রবল হয়ে উঠতে সুরু করল। বুদ্ধের শিক্ষায় তার চরম পরিণতির পরিচয় মেলে। জড়বাদী আচারনিষ্ঠা প্রবল হয়ে উঠেছিল বলে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও সমান প্রবল হয়ে দেখা দিল। বুদ্ধ সমস্ত আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে উপাসনা পর্যন্ত বাদ দিলেন। তাঁর মতে আত্মনিগ্রহ বা পরমাত্মার সন্ধানে সংসার ত্যাগ করলে মোক্ষ মিলবে না, আত্মসংযম ও নৈতিক জীবন-যাপন করলেই সন্ন্যাসী না হয়েও মানুষ মুক্তির সন্ধান পাবে।

মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই বুদ্ধ যুক্তি এবং বিচারের তীব্র আলোকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর সেই নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধিবাদী সমাধান সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নয়। তাই অল্পদিনের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ও আচার অনুষ্ঠান জর্জরিত হয়ে উঠল। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে জড়বাদী আচার অনুষ্ঠানকে বুদ্ধ সবলে বর্জন করে-

ছিলেন, বৌদ্ধমতবাদের আশ্রয়ে তার চেয়েও বেশী জড়বাদী আচার অনুষ্ঠান দেখা দিল। গৌতমবুদ্ধ ক্ষণিকবাদের ভিত্তিতে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে অনেকে বলতে সুরু করলেন যে সংসারে সবকিছুই যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন আমাদের ক্রিয়াকর্ম এবং তাদের ফলাফলও ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। কর্ম এবং কর্মফল যদি অলিক হয়, তবে মানুষের নীতিবোধের ভিত্তি ভেঙ্গে যায়। সমস্ত পৃথিবীই যদি মায়া হয়, তবে কৃতকর্মের জন্য ফলভোগও মায়া, ফলে পাপপুণ্যের বোধ শিথিল হয়ে পড়ে। এ ধরনের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই বৌদ্ধপরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজে নীতিবোধ শোচনীয়ভাবে ভেঙে গিয়েছিল, মানুষের ব্যবহারে এবং ক্রিয়াকর্মে সকলপ্রকারের অনাচার দেখা দেয়। সংসারবিমুখ এবং সন্ন্যাসধর্মী যে মনোভাবের ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে বারবার বিপর্যয় এসেছে, তারও ভিত্তি এই অলিকবাদের মধ্যে মেলে। এ জীবনে নিশ্চেষ্টতা এবং পরলোকমুখাপেক্ষিতা অনেকের মতে ভারতীয় মানসের বৈশিষ্ট্য কিন্তু যাঁরা একথা বলেন তাঁরা ভুলে যান যে এ ধরনের নৈতিবাচক মনোবৃত্তির পরিচয় ভারতের প্রাচীন ইতিাসে বহুক্ষেত্রে মিলবে না। রামায়ণ মহাভারতের যুগে, এমনকি বৌদ্ধধর্ম প্রসারের যুগেও ভারতীয় ইতিহাস পার্থিব সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ইতিহাস। সমুদ্রপারে ভারতবাসী যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, বৃহত্তর ভারতে যেসব সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, সন্ন্যাসধর্মী ইহলোকবিমুখ জাতির পক্ষে সে ধরনের উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যস্থাপন সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষে ধর্মের অভিজ্ঞতায় যে রূপ এবং আত্মা, বাহিরের অনুষ্ঠান ও অন্তরের বাণী দুয়েরই স্বীকৃতি ছিল, ইতিহাসে তার আরো সাক্ষী মেলে। প্রতি মানুষের জীবনে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের পরিকল্পনা একান্তভাবে ভারতীয়। এই পরিকল্পনায় জড়বাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা, পার্থিব সাফল্যের সঙ্গে আত্মার পরিপূর্ণতার এক অপূর্ব সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে। চতুরাশ্রমের স্বীকৃতির ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথম জীবনে শিক্ষা ও প্রস্তুতি, দ্বিতীয় স্তরে সংসারধর্মপালন, তৃতীয় স্তরে জীবনের দৈনন্দিন কর্তব্য হতে অবসর এবং অবশেষে সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির সাধনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন বলে প্রত্যেকেই জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদের অধিকারী হতেন। এ পরিকল্পনায় মানুষের কোন সংকল্প বা বাসনাকেই অস্বীকার করা হয় নি, তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের সমস্ত দাবী এবং আকাঙ্ক্ষাকে মেটাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উৎকর্ষে মানুষের সাধনা পূর্ণ হবে না, সমাজজীবনেও সে উৎকর্ষের পরিচয় দিতে হবে। ব্যক্তির সম্মুখে যে চতুরাদর্শ স্থাপিত হয়েছে, তাতেও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের দাবী স্বীকৃত। কেবলমাত্র আত্মার সাধনায় সিদ্ধি নেই, পার্থিব এবং পারলৌকিক উভয় জীবনের দাবী মিটিয়েই মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ভারতীয় জীবনাদর্শে তাই কাম, অর্থ, ধর্ম এবং মোক্ষের সমান স্বীকৃতির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজজীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্যের স্থান রয়েছে। জীবনের সমস্ত দাবীকে স্বীকার করে নিয়েছিল বলেই ভারতীয় ধর্মচিন্তা নিরন্তর পরিবর্তন ও নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও আজো এত জীবন্ত ও শক্তিশালী।

সমস্ত আলোচনার ফলে এই সত্যই উদ্ভাসিত হয় যে নিবিড় এক জীবনদর্শনের প্রভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের পরিচয় মেলে। দেশের বিপুল

বিস্তার, ভৌগলিক বৈষম্য এবং জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য, মানুষের বিশ্বাস ও আচারের পার্থক্য, বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক সংগঠনে ও সংস্কৃতির বিকাশে স্তরভেদ—এই সমস্ত কারণে এদেশের মানুষের মনে বিভিন্নকে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি স্বভাবতই গড়ে উঠেছে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা তার ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্বীকৃতির দার্শনিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাকে যুক্তিবাদী রূপ দিতে পেরেছিলেন, এ দেশাগত অভিযাত্রী আর্যদের এ এক মহৎ কীর্তি। এই ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিজেদের ছাপ রেখে গিয়েছেন এবং তার ফলে জীবনের প্রায় প্রত্যেক প্রকাশে অনন্ত বৈচিত্র্য দেখা দিলেও ভারতীয় দর্শনচিন্তা ও জীবনদৃষ্টিতে যে গভীর ঐক্যবোধ, তা স্বদেশী-বিদেশী সমস্ত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে।

ভারতবর্ষে দর্শন কেবলমাত্র বুদ্ধির বিচারে আবদ্ধ থাকে নি, মানুষের সমগ্র প্রকৃতির স্বরূপ খুঁজে নতুন জীবনদৃষ্টি নির্দেশ করতে চেয়েছে। ভারতীয় দর্শনের তাই সর্বদাই একটা ব্যবহারিক দিক ছিল। তার ফলে বুদ্ধিবিলাসে অবাধ সঞ্চরণ হয়তো খানিকটা সীমিত হয়েছে কিন্তু জীবনের প্রকাশে যে অনন্ত বৈচিত্র্য তার মধ্যে ঐক্য সন্ধান সম্ভব হয়ে উঠেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গী একান্তভাবে সংসারকেন্দ্রিক নয়, সংসারবিমুখও নয়, তাই দুইয়ের সমন্বয়ে এক রচনাত্মক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য বিশ্বলীলায় সক্রিয়, সেই একই গভীর সত্যের নানা বিশ্বাস ও মতবাদের মধ্যে বিচিত্র অভিব্যক্তির নাম ধর্ম। বহুর মধ্যে ঐক্যের মূলসূত্রটিই তাই সত্য এবং বাস্তবের মধ্যে বারবার আত্মপ্রকাশ করে। প্রাচীন ভারতের এই উদার, রচনাত্মক পরমতসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী জাতির জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, সমাজের সমস্ত স্তরে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির নতুনকে গ্রহণ করবার যে শক্তি, সেই শক্তিই বহু পরিবর্তন এবং নিত্য নবনব আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও প্রাণধর্মকে অটুট রেখেছে।

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এ ঐক্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক সংগঠনে, সামাজিক আচার ব্যবহার ও সাধারণ মানুষের জীবনধারায়, ভাষা এবং সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকাশে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। শিল্প এবং স্থাপত্যে, দর্শনে এবং ধর্মেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রেই সে দৃষ্টিভঙ্গী আজো সক্রিয়। দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই আদিকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন উপাদান এসে এক নতুন সমগ্ররূপ পেয়েছে। অতি প্রাচীন কালেই আর্য এবং অনার্য ধারার সমন্বয়ে সংস্কৃতির যে ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং সেই ভিত্তির উপর যুগ যুগ ধরে যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল, আজ সহস্র বৎসর পরেও তার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। সংস্কৃতির এই অবিচ্ছেদ ধারাবাহিকতা থেকেই বোঝা যায় যে আদিযুগের এ সমন্বয়ে আর্য এবং অনার্য ধারা কি গভীরভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পত্তন করেছিল। নতুনকে গ্রহণ করবার শক্তির ফলে সেই সংস্কৃতি পরবর্তী যুগে অনেক দেশের অনেক নতুন উপাদানকে গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে সংস্কৃতির স্বরূপ এবং প্রকাশেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। সমস্ত পরিবর্তনই কিন্তু সেই পুরাতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার যে বিশেষ ধর্ম, তা কখনো বদলায় নি। রামায়ণ মহাভারতের যুগে এ দেশে যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, সেই সভ্যতার পরিণতি হিসাবেই পরবর্তী সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে। সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ কেবলমাত্র

ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ভারতবর্ষে কিন্তু শত পরিবর্তন সত্বেও আজো সেই পুরোতন সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত। শত পরিবর্তন সত্ত্বেও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় যে দু হাজার বছরেও কোন ছেদ ঘটে নি, ভারতীয় সভ্যতায় প্রাণশক্তি ও নমনীয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ ইতিহাসের মধ্যেই মেলে।

[ক্রমশঃ]
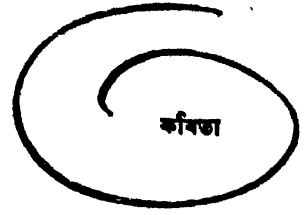
রুশ কবি অসিপ ম্যান্ডেলস্ট্যাম। ত্রিশের দশকে যখন স্ট্যালিনের শোণিত শোধনের বিভীষিকা চলছে তখন শেষ যে কটি কবিতা তিনি লেখেন তার চারটি এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হল। সেই ত্রিশের দশক থেকে তাঁর কবিতা রাশিয়ায় বহুদিন আর ছাপা হয় নি। তিনি নিজে বন্দী হন ১৯৩৪-এ। বন্দী-অবস্থায় সাইবেরিয়ায় তিনি মারা যান। তারপর বহুদিন বাদে গত বছরে মে মাসে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলিয়া এরেনবুর্গের সভাপতিত্বে তাঁর কবিতা-পাঠের একটি সমাবেশ হয়। রুশ ভাষায় তাঁর একটি কবিতা-সংগ্রহও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য এ অনুবাদগুলি আক্ষরিক ত নয়ই ভাষান্তরও দু-হাত ফেরতা। অনুবাদে ম্যান্ডেলস্ট্যামের মূল সুরটি ও তাঁর চিত্রকল্পগুলি যথাসাধ্য বজায় রেখে স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চারটি কবিতা

আসিপ ম্যান্ডেলস্ট্যাম

এই যে দেহ,
আর মাটির কাছে যা কিছু আমার দেনা,
সব মাটিতেই ফিরে যাক্ আমি চাই না,
চাই না আমি ময়দা-সাদা একটা প্রজাপতি হ'তে।

কত ভাবনায় আঁচড়কাটা আর ঝলসানো
এই যে আমার দেহ
তা যেন রাস্তা হয়, হয় মাঠ—
মেরুদণ্ডের হাড় ছিল তার মধ্যে
নিজের সীমা তা জানত।

হাওয়ায় আর্ত-রোল-তোলা
পাইনের গাঢ় সবুজ সব পত্রশলাকা
দেখাচ্ছে যেন জলে ভাসানো শেষকৃত্যের মালা...
আমাদের জীবনের আনন্দ আর সাধনা
কেমন ধুইয়ে দিয়েছিল বার করে!

ক্রীতদাস মাল্লার মত যখন বসে থাকতাম
হাড়ভাঙা হয়রানির বেঞ্চিগুলোয়—
সবুজ পাইন-শাখার পশ্চাৎপটে
বিছানো সব দেহ,
বাচ্চাদের রঙীন অ আ ক খ-এর মত
লাল নিশান জড়ানো।

শেষ বাহিনীর বন্ধুরা ওই আগুয়ান,
কথা নেই মুখে,
কাঁধে তাদের শুধু বন্দুকের বিস্ময়-চিহ্ন।
ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে হাজারো কামান
বাদামী চোখ, নীল চোখ, এলোমেলো পা ফেলা
—মানুষ, মানুষ মানুষ!

কে যাবে ওদের পরে?

তুমি আর আমি হেঁসেলে খানিক বসব।
গন্ধটা মিষ্টি সাদা কেরাসিনের।

ধারালো ছুরিটা, একটা পাঁউরুটি।
তেলের স্টোভটা পাম্প করো না কেন কষে?

কটা দড়ির টুকরো যোগাড় করে'
ভোরের আগেই চুবড়িটা নিতে পারো বেঁধে,

তারপর পালিয়ে যাব রেলস্টেশনে,
কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।

না, আমি লুকোব না এই আপদ থেকে
মস্‌কোর কোচোয়ানের পিঠের পেছনে;

আমি ঝুলছি ভয়ঙ্কর সময়ের গায়ে
　　—একটা চলন্ত 'বাস'।
কেন যে বাঁচি তা জানি না।

তুমি আর আমি যাব অ আ মার্কা সড়কে,
আর দেখব কে মরে আগে—
ওই মস্কো, সে ভয়ে কাতর চড়ুইএর মত
　　কোথাও থাকে কুঁকড়ে,
কোথাও আবার ফোলে
　　ফাঁপানো কেকের মত।

রাস্তার বাঁক ঘুরে
　　শাসাবার সময়টুকু শুধু তার আছে।
যা খুশি তোমার করো, আমি ডরাই না—
কার দস্তানার মধ্যে তাপ আছে
　　লাগাম ধরবার মত,
আর ঘুরে বেড়াবার মত
　　মস্কোর বীথিবর্ত্মের সব ফিতে ধরে?

তোমার ওই ছোট্ট কাঁধের ওপরই সব ভার :
বিবেকের ওই অপাঙ্গ দৃষ্টি,
আমাদের বিপদ-ডাকা বন্য সরলতা—
ডুবে-যাওয়া নারীর মত ভাষা আমার স্তব্ধ।

ডানা চমকায়, লাল ফুল্কো নড়ে পাখার মত,
অবাক মুখগুলো নীরব কাতর আক্ষেপে বৃত্তায়িত,
　　মাছের ডানা ইতস্ততঃ ছড়ানো।
নাও এসব, খাওয়াও তাদের
　　আধ সেঁকা রুটির মত তোমার শরীর।

কিন্তু আমরা ত' কাঁচের গোলকে সাঁতার-কাটা
　　সোনালী মাছ নই,
যে বুদ্বুদ ছাড়ি শৈবালের ধারে অভিসারে;
আমাদের শরীরে উষ্ণ রক্তের তাপ,

ইচ্ছাস্থির মত আমাদের পাঁজরার সব হাড়,
চোখের তারায় দৃপ্ত সজল ঝিলিক।

তোমার ভুরুর বিপদ-ভরা প্রান্তরে
আমি তুলে ফিরছি আফিমের ফুল,
মাছের ফুলকোর মত কাঁপানো
তোমার ছোট্ট দুটি ঠোঁট আমি ভালবাসি,
তুর্কী সেপাই যেমন বাসে তার ছোট্ট বাঁকা চাঁদের ফালি।

প্রাণের তুর্কী মেয়ে
রাগ কোরো না আমার ওপর,
আমাদের দুজনকে শক্ত ছালায় পুরে বেঁধে
কৃষ্ণসমুদ্রে দেওয়া হবে ফেলে।
আমি নিজেই তা করব,
তোমার কথা, সেই কথার কালো জলের ধারা
পান করতে করতে—
মরতেই যাদের হবে,
তাদের সান্ত্বনা দাও মারিয়া;
মৃত্যুকে তাড়াতে হবে ভয় দেখিয়ে,
পাড়াতে হবে ঘুম।
সমুদ্রের কিনারে খাড়া চূড়োয় আমি দাঁড়িয়ে।
সরো আমার কাছ থেকে
দূরে গিয়ে দাঁড়াও—আর এক মিনিট!

অনুবাদ : **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

নগ্ন যীশু

চাণক্য সেন

থলথল চৌকো মুখ, তিনভাঁজ চিবুক, মোটা কাঁচের চশমা। ঠাস ক'রে চড় মারলে বোমা ফাটত নিশ্চয়, দুনিয়া যেতো উল্টে, দুনিয়ার নাম দিল্লী, অথবা ভারত। লোকটা ইয়া-মোটা, বাবা বলেন, দশজনের একজন। হাত আমার পাথর, গরম জ্বলন্ত পাথর, মাথায় রক্ত, কিন্তু, হে বিধাতা, তুমি ছেলেমানুষ, যেমন ছেলেমানুষ সব মানুষ, সব কালের সব মানুষ।

"তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না এসব জটিল সমস্যা।" বলতে পারল চৌকো মুখ, তিনভাঁজ চিবুক। "তোমার উচিত, বড়োদের কথা মেনে নেওয়া।" বড় মানে, পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট আশি বছরের ছেলেমানুষ। "আফ্‌টার অল, ইউ আর জাষ্ট্ অ' বয়।" ব্যঙ্গ-হাসি, তুচ্ছ-হাসি, আস্পর্ধা-হাসি থলথল মাংসকে ভেঙ্গে চুরে চিবুকের ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে পড়ল। আমার দাঁতে দাঁত লাগল, কিন্তু হাত হল পাহাড়ের মতো ভারী।

অনেক কিছু নৈসর্গিক কাব্যধারা প্রবাহিত হল, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-সদ্‌পদেশের প্রাচীন মনুমেন্ট থেকে, অনেক কথা, অনেক-বার-বলা কথা; আমি তাকিয়ে রইলাম পুরু-কাঁচ চশমার দিকে, দেখতে পেলাম, এই বিরাট ছেলেমানুষ দেখল না যে আমি দেখছি সাতান্ন বছরের উঁই-ঢিবি, পোকা কিলবিল করছে।

"হাসচো যে?"

তাই তো! হাসলাম যে! হাসা তো মানা মনুমেন্টের পাদদেশে।

"আই ডোন্ট থিংক আই সেড্ এনিথিং ভেরী ফানি!"

না। আমি তোমার কথা শুনে হাসি নি।

"জীবনের কতোটুকু জানো তুমি? সবে তো জীবন শুরু করছ! ইউ আর জাষ্ট অ' বয়।"

জানি না। কিছুই জানি না। তবু জানি তোমার এই এতো বড় মাংসস্তূপের পাশে, নতুন আমদানী—আইন ফাঁকি দিয়ে আমদানী—শেভ্ ইম্প্‌পালার তুলতুল সীটে কি কর, কালই তুমি কাকে নিয়ে জিম্‌খানা ক্লাবে লাঞ্চের পর বিলিয়র্ড রুমে কি করছিলে, আমিও ছিলাম কাছাকাছি কম্‌লা নাগরাজকে নিয়ে; জানি, তুমি বাবার সঙ্গে চুপিচুপি কি সব আলোচনা করো; লুকিয়ে অনেকবার আমি শুনেছি তোমাদের কথা; জানি উইক-এন্ডে মাঝে মাঝে তোমরা দুজনে মিলে কোথাও যাও, কি সৎ-শুভ-সুন্দর কাজে কাটে তোমাদের ছুটির অবসর, জানি তুমি কতো বিপদে পড়েছিলে তিনবছর আগে, পুলিশ কিসের দুর্গন্ধ পেয়ে তোমার পেছনে লেগেছিল, তুমি রোজ ছুটে আসতে বাবার কাছে, বন্ধ-দুয়ার পড়ার ঘরে চলতো তোমাদের পালাবার পথ-খোঁজা, তারপর

বাবা বললেন, "মনে রেখো, যাঁর কথা তুমি শুনছো তিনি সাধারণ লোক নন, দশজনের একজন"

নিশ্চয়। তাও কি জানি নে? তুমি দশজনের একজন, বাবা দশজনের একজন, তোমরা সবাই দশজনের একজন। কেবল আমরা

জাষ্ট্ অ' বয়।

"আমি তোমার প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছি। কলেজে তোমাকে ফেরৎ নেবে। শুধু তোমাকে একটা ফরম্যাল এ্যাপলজি দিতে হবে।"

দেব না। কলেজে যাবো না। ক্যাবলাকান্ত প্রিন্সির সামনে দাঁড়িয়ে মাপ আমি চাইবো না। বসবো না ঘেমো ক্লাসের নড়বড়ে বেঞ্চে, তাকিয়ে থাকবো না লেকচারারদের মুখে, যাদের একটা কথাও আমার কানে পৌঁছয় না, যারা পুরানো কথা অনর্গল হাজার বার বলে বলে অতিশয় ক্লান্ত, আর আমিও ক্লান্ত কফি হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঢক বেমক্কা বসে বসে, পেয়ালার পর পেয়ালা কফি পান করে আর সিগারেটের পর সিগারেট আর মেয়ে-গুলির সঙ্গে গা-সুরসুরি ইয়ার্কি, রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেঞ্চিতে বসে থেকে, বকবকানি, নারীদেহের অন্ধকারে সরল উত্তেজনার তরল সন্ধান আমি

"হাই তুলছ কেন? রাত্রে ঘুমোও নি?"

"চুপ ক'রে আছ কেন? কাল যাবে তো কলেজে?"

স্কুলই শেষ হচ্চিল না। শেষ হতে কেটে গেল এক যুগ, বুড়ো ক'রে দিলে শালা মাস্টাররা। তারপর কলেজ। হা-মুখো, পান-চিবানো পণ্ডিতদের হাতে ধারাবাহিক লাঞ্ছনা। সবার সেরা গদাই লস্কর প্রিন্সি। ছবি দেখে রেগে আগুন! ভাল্‌গার! অব্‌সীন!! ইনডিসেন্ট!!! ডার্টি! ইউ হ্যাভ্‌ এ ডার্টি মাইন্ড! হ্যাঁ, আই ডু হ্যাভ্‌ অ' ডার্টি মাইন্ড। আমি নোংরা। তোমরা সত্য, শিব, সুন্দর। শিব হচ্চেন ইনি, এই তিন-তলা চিবুক, আর সত্য প্রিন্সি মোহনসিং সত্যপাল! নোংরা কেবল পৃথিবী নয়, তোমাদের-তৈরী মাদার ইন্ডিয়া নয়, কেবল আমি

"চুপ ক'রে আছ কেন? হোয়াই ডোণ্টিউ স্পীক?"

আমি তো বলছি। তোমরা শুনতে পাচ্ছ না। তোমরা বলছ, আমি শুনছি না। কোটি কোটি পুরাতন একঘেয়ে বার-বার চালান রেকর্ড লক্ষ কোটি বার বার পুরান কথার ভাঙ্গা রেকর্ড একসঙ্গে

চুপ ক'রে থাকো, একসময় রেকর্ড থামবে। এখনও, এই মুহূর্তেও, জানলার বাইরে আকাশ, আকাশের পানে উলঙ্গ আবহাওয়ায় হাত-বাড়ান নতুন নিমগাছ; বাগান পেরিয়ে রেস কোর্স রোড, তার পরে ঘন সবুজ ঘাস আর সারি সারি গাছ, তিনটে রেসের ঘোড়া, একটা হটাৎ ডাক দিয়ে লাফিয়ে উঠল, ছুট্‌ লাগাল, সেই পুরানো ব্যাপার, সেই অনেক আগের অনেক পুরানো ব্যাপার ঘটে ঘটে অনেকবার ঘটেও রোজ লক্ষ কোটি বার ঘটছে আরও কোটি কোটি বার

"কি দেখছ?"

রমণ। ভাগ্যিস মানুষ মিথ্যে বলতে পারে অথবা চেষ্টা করে চুপ থাকতে পারে। তাই বুঝি পৃথিবী টিকে আছে, মানুষ বেঁচে, তাই বুঝি

"আচ্ছা, তুমি আজ ভেবে দেখো। কাল কলেজে যাবে।"

হুকুম। কেবল, তুমি জানো না বাবা, পিতা-মহাশয়, একটু লেট হয়ে গেল। হুকুম আর মানব না। অনেক মানুষ একত্র হয়ে ঘোড়ার রমণক্রিয়া দেখছে। মানুষের বেলায় যত লুকোচুরি আর যত রকমের যাবতীয় চুরি আর

"ওকে একবার আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। রত্না ওকে বুঝিয়ে বাগে আনবে। শী ইজ ভেরী ফন্ড অব্‌ হিম।"

ভেরী। রত্না আন্টি ভেরী। ভেরী গুড, পিওর, সেন্টলী ভেরী, লুকোচুরি লুকিয়ে

লুকিয়ে ভেরী। তুমি বললেই আমি যাবো ভাবছো। যাবো না। যদি বলি কেন যাব না তাহলে রত্না আন্টি ভেরী তোমরা সবাই ভেরী আমি ভেরী ডার্টি

"আজ এসো ডিনার খেতে আমাদের ওখানে। তুমি একাই এসো।"

নো থ্যাংক'উ। তুমি ফিরবে দশটার পর, জিমখানা ক্লাব থেকে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রত্না আন্টি আর আমি। নো থ্যাংক'উ। শী ইজ ভেরী ফন্ড অব মি।

"আসছো তো?"

"আজ নয়।"

"কেন? আজ নয় কেন?"

শুধু আজ নয়, নয়। কোনও দিন নয়।

"কাজ আছে।"

"কাজ না হাতি। হয় মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়াবে, নয় নোংরা ছবি আঁকবে।"

পুত্রের অধঃপতনে পিতার প্রাচীন আক্ষেপ। না, বাবা, আজ ছবি আঁকবো না। মোহন, রাকেশ, হর্ষ আর আমি গাড়ী নিয়ে বেরুবো। হর্ষ'র বাবা গেছে ট্যুরে। একশ মাইল স্পীডে গাড়ী চালাবো। দেখি এ্যাক্সিডেন্ট করা যায় কিনা? গাড়ীতে আগুন লাগবে কি? আটকা প'ড়ে পুড়ে মরা যাবে কি? যদি দেখতে পাই ও যাচ্ছে রাস্তার ওপর হেঁটে হেঁটে, কোমর নাচিয়ে নাচিয়ে, চাপা দিয়ে পিষে মারলে দারুণ মজা হবে। রাস্তায় এক তাল রক্তের মধ্যে লুটিয়ে থাকবে নরম সাদা শরীর, আমার মার মতো মনে হয়েছিল মুখের আদল, ঠোঁটের হাসি, রক্তে লুটিয়ে পরবে ন্যাংটো শরীর অনেক রাত জেগে ছবি আঁকবার

"আচ্ছা, আজ না হয়, কাল দুপুরে লাঞ্চ খেতে এসো।"

সভ্যতার মস্ত গুণ সে ছাড়ে না। লেগে থাকে। সভ্য মানুষ আর অসভ্য হ'তে পারে না যতোই সে মারুক আর মরুক। সব কিছু তার সভ্য

"দেখবো"

দেখবো না, যাবো না। কাল, আজকের পরে কাল অনেক দূরে, কালের পর, আবার কাল, আবার, আবার, আবার। ব্লাডি এন্ডলেস্ টাইম। এখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে, এখুনি সন্ধ্যা নামবে। হর্ষ আসবে গাড়ী নিয়ে, নতুন ফিয়াট; তুলবো রাকেশ আর মোহনকে। তারপর তারপর তারপর হতে-হতে-কিছু-না-হতে-না-হতে রাত্রি গভীর হবে, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়বে, সকলে ঘুমকে চুমু খাবে, আমি আঁকবো, ডার্টি ছবি, ঘোড়ার রমণের ছবি নিয়ে হাজির হব প্রিন্সি মোহন সিং সত্যপালের সামনে, রেগে ফেটে পড়বে আর চিকচিক চোখ বার বার চুরি-তাকাবে ছবির দিকে, বাবা আর এই দশজনের-একজন বেশি মদ্যপান করবে, মার স্যাতসেতে চোখে আরও ঝরবে জল, আহা ঝরণা, আর তুমি, হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি, তুমি, যদি সত্যি গাড়ীর চাকায় চ্যাপ্টা-ন্যাংটো হয়ে না গিয়ে থাকো, একদিন ছবি দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে, ভ্রূ তুলে শব্দ করবে হুঁম্, হুঁমমম্, হুঁম্ম্ম্ম্, হিংসায় তোমার চোখ জ্বলবে।

অনেক রকম অনেক শব্দ করতে তুমি, হুঁঙ্? অনেক রকম অনেক কিছু অনেক রকম বাবা থেকে গেছেন। দু গালের গর্তে বিষাদ। দু চোখের কোটরে বিবর্ণ মেঘ। বেঁচে থাকবার দাম। চড়া মাশুল। আমার করুণা হচ্ছে না। বিওয়েয়ার অব্ পিটি। করুণা করো তো মরবে। সবকিছু গ্রীষ্মকালের বরফের মতো গলে যাবে। বিগলিতকরুণা-জাহ্নবীযমুনাবিগলিতজীবনেরদুর্গন্ধনমুনা। করুণা করবো তো চলে যাব কলেজে, গলায়

গামছা দিয়ে দাঁড়াব প্রিন্স সত্যপালের সামনে, কবুল করব 'ডার্টি' ছবি আর আঁকবো না, পড়ব যা চাইনে, পারিনে, ঘেন্না ক'রে, পারিনে, চাইনে পড়তে; বসব পরীক্ষায় পাশ করব কে না পাশ করে, করুণায় আই.এ.এস. ইস্তিহান দেব, হতচ্ছাড়াদের ওপর গুলি চালাবার হুকুম দেব ফাইল বগলে জয়েন্ট সেক্রেটারীর ঘরে তিন হাজার বার রোজ দৌড়াব আর ভারত-ইতিহাসের মতো লম্বা স্বার্থক শাশ্বত শুভ্র জীবনে, কি দারুণ ব্যাপার ব্লাডি বল্‌স্‌

টেলিফোন বাজলে এ বাড়ীতে তখুনি ধরবার নিয়ম নেই। বাবা কখনও ধরে না, মা তো ধরতে পারেই না, অডারলি হেলেদুলে এগিয়ে আসবার আগেই অনেকবার আমি ফোন ধরে ফেলি এবং এমনি ফোন ধরতে গিয়েই তো প্রথম টের পেলাম বাবা কার সঙ্গে কারবার চালাচ্ছে, আমার আর বাবার গলার স্বর একেবারে হুবহু এক, অর্থাৎ আমি ওনারই ঔরস-জাত সুকুমার-সন্তান, তাই অনেকের মতো ভুল ক'রে মেয়েমানুষটা 'হ্যালো' শুনেই একেবারে ম'রে যাচ্ছিল, বুঝি জ্বালায়, জ্বালায় বলে ফেলল 'কাল সন্ধ্যায় এলে না যে, ডারলিং', আমি তক্ষুনি চিনে নিলাম তিনি কিনি, একবার কারুর গলার স্বর শুনলে আমার ভুল হয় না, আর লোকে জানেও না টেলিফোনে গলা কি ভাবে নিজেকে ধরা দেয়, চিনে ফেললাম, মাথাটা মুহূর্তের জন্যে গরম হয়ে উঠল, তারপরে হাসলাম, নিশ্চয় হাসলাম, বললাম, 'দুঃখিত, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলে?' বেহায়া-গরম জবাব এলো, 'কি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলো তুমি মাঝে মাঝে,' আর আমি বললাম, 'মাপ করবেন, আপনি বুঝি আমার বাবাকে চান, ডেকে দিচ্ছি,' আর ওস্তাদ চালাক ব্লাডি বিচ্‌, তক্ষুনি জিভ-কাটল, 'এটা কি সিক্স ডব্‌ল্‌ ওয়ান টু সিক্স ওয়ান?' হেসে বললুম, অন্‌ সেকেন্ড থট, রং নাম্বার, তার কাটল, সেই পুরানো অনেক কালের সব কালের আগের কালের আগামী কালের পুরানো যাব শেষ নেই

অতএব। আমরা মেয়েদের সঙ্গে মিশলে এ'দের ঠোঁট টাটায়, বুক টনটন করে, মেজাজ চড়ে যায়, যতো সব জোচ্চোর ন্যাকার দল, যতো সব তলেতলেতলিয়ে-খাবার দল, এক একটি ন্যায়-সত্য-শিব-সুন্দরের মুখোস পরে বসে আছে, মুখে ভালো আঁটছে না তাও জানে না, লজিকের মাস্টার গোরা মিত্রের মতো, চুলে কলপ দিতে গিয়ে গোঁফের সাদা ঢাকতে ভুলে যায়, এরা সবাই একরকম, যতো শাসন উপদেশ ন্যায় নীতি অন্যের বেলা, ছোটদের বেলা, কারণ ছোটরা বড়ো হয় আর এরা হয় বুড়ো, ছোটরা যা পায় তাতে এদের মৃত্যুহীন লোভ, ছোটদের বড়ো হওয়া দেখে এদের প্রাণ যায় শুকিয়ে

"হ্যালো। হর্ষ! হ্যাই! তোর জন্যে বসে আছি, ইয়ার! এক্ষুনি চলে আয়। পেট্রোল ভরা নেই? রাস্তায় ভ'রে নিস। না ইয়ার, ট্যাংক ফুল। টাকা? তুই পেট্রোলের দাম দিয়ে দে, ইয়ার, বাকী খরচ আমার। তোমার পয়সা নেই, বাবা! বল্‌স্‌। ড্যামম ইয়র ফাদার, ড্যাম অল ফাদার্স। দুনিয়ার পুত্রকন্যারা এক হও। হ্যাঁ ইয়ার, অনেক লেকচার শুনতে হল। নট্‌ ওনলি হি, উনিও ছিলেন। কাকুল্ড। হাসছিস্‌ কেন ইয়ার, কে কাকুল্ড আর কে নয়, বোঝা মুস্কিল। আই ওন্ট রুল আউট এনি ওয়ান। দ্যাটস্‌ রাইট্‌। সত্যি? কবে, কাল? কাল রাত্রে? হাউ ডিড্‌ ইট গো? আমার ভালো লাগে না। সিনেমায় বসে প্রেম ভালো লাগে না। সত্যি বলছি। আই হেট এনিথিং স্যুপারফিসিয়াল। হাসছিস যে? ওয়েস্ট্‌ অব ভাইটালিটি। ডিসিপেশন। দ্যাট বীচ্‌। কি বলল? হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা। দাঁড়া ইয়ার, হেসে নি, বড্ড হাসি পাচ্ছে হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা তুই বোকা বনে গেলি তো? হা হা হা হা ক্লেভার বীচ্‌ হা হা হা হা ঘেমে উঠলি? হা হা হা হা হা হা হা হা হা হা তুই এতো ক্যাবলাকান্ত ইয়ার হা হা হা অ্যাঁ কি

বললি? ওরে বাবা হা হা হা হা দারুণ দেখছি হা হা হা হা দ্যাটস্ অ ভেরী গুড ওয়ান, না ছাড়িস নে, হা হা হা হা আমি? বোর্‌ড্ না। কলেজে আর নয়। বলছে প্রিন্সির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হবে। না ইয়ার, ও-নাম আর নয়। কেন? নিশ্চয়! দেখাবি, ইয়ার, একদিন কি ছবিটাই না আঁকবো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডার্টি। বলতে দে, ইয়ার, লেট দেম গ্যাস্ টু দেয়র অ্যাসেস্ কনটেন্ট। হা হা হা। সেক্স ইজ নট্ ডার্টি, নট্, নট্, নট্ ডার্টি। আমাদের মন নোংরা। দেহ সুন্দর, কুৎসিৎ হলেও সুন্দর। জানিস্, ইয়ার, কাল একটা কথা মনে হল : প্রোফাউন্ড থট। নোট বই-এ লিখে রাখ ইয়ার, কাজে লাগতে পারে। বলবো! 'মানুষের যদি মন না থাকতো তাহলে কোনও সমস্যা থাকতো না।' লেট দেয়র বি অ ক্রুজেড্ এগেইনস্ট্ দ' মাইন্ড। না, না, ইয়ার, রবোট নয়। রবোট ছবি আঁকবে কি করে? কিসের ক্রুজেড? কেন? দ' ডার্টি হিউম্যান মাইন্ড হ্যাস্ টু বি ক্লী—ই—ন্‌ড্। হাউ টু! বলছি, ইয়ার, শোন্। না, না, ছবি এঁকে নয়, ছবি কজন আঁকে? আঁকতে হলে অবশ্য হাতে তুলিই উঠবে না মন নোংরা থাকলে, অ্যাঁ, কি বলছিস্? নিশ্চয়। একশ বার। অল্ মাই সেক্স পেইন্টিংস্ আর এ্যাব্‌সলিউটলি ক্লীন। গঙ্গার চেয়েও পবিত্র। একশ' বার। নিশ্চয়। তুই যে ছবিটার কথা বলছিস ওটা তো সবচেয়ে পবিত্র, বলতে পারিস, উসমে গঙ্গা বহ্‌তী হ্যায়, একেবারে না, আঁকবার সময় আমার একটুও সেক্স ফিলিং ছিল না। সত্যি বলছি। না, মডেল কোথা পাবো—হা হা হা হা মডেল পেলে বেড়ে হত? না, বাস্টার্ড, সে মডেল আর কোথায়? না,অনেকদিন দেখি নি। দেখতে চাইও না। না, ইয়ার, সত্যি। তুই আসছিস বল? জলদি চলে আয়। হোয়াট? তাড়াতাড়ি চলে আয়।

নো, আই ডিড নট ফীল। আমার কিছু অন্য অনুভূতি ছিল না। রঙ আর তুলি আর ক্যানভাস আর পুরুষ আর নারী আর আমার সবটুকু কি-যেন-বলে। আর পাগলা ঝর আর উন্মত্ত বেতাল পৃথিবী আর পাতাল-আঁধার ধারাল জীবন। পুরুষ ও নারীর দৈহিক মিলন নিয়ে ছবি আঁকলে কলেজ থেকে তাড়া খেয়ে পড়া ছাড়তে হল, পড়ায় আমার মন নেই, ভালো লাগে না। শালা হর্ষ আধঘণ্টা কাটিয়ে দিল টেলিফোনে বকবক ক'রে, গাড়ী নিয়ে আসবে কখন কে জানে?

ইতিমধ্যে কিছু টাকা চাই মা জননী। মানুষের সঙ্গে বিধাতার চরম রসিকতা: মুদ্রা। মুদ্রা আবিষ্কার ক'রে মানুষ সবকিছুর, নিজেরও, মূল্য যাচাই-এর সহজ ও শেষ উপায় খুঁজে পেল। একথা পরম সত্য যে ছবি আঁকতে টাকা লাগে, ছবি বিক্রী ক'রে টাকা পাওয়া যায় না। অতএব ছবি আঁকা যায় না বিনা টাকায়। একটা সন্ধ্যা এন্‌জয় করা যায় না বিনা টাকায়। পেট্রোল কিনে হর্ষ বিমর্ষ হবে, পকেট ফাঁক। সাধুও হওয়া যায় না বিনা টাকায়। রাজেসকে ঝাড়লেও দশটাকা বেরুবে না।

শেষ অবধি সেই ঘর। চাইনে, চাই নে, চাইনে ঢুকতে ও ঘরে। যতক্ষণ বাড়ী থাকি এড়িয়ে চলতে চাই ও ঘরটা। ওঘরে টাটকা তাজা বাসি ফুলের গন্ধ, চন্দন-ধুপের গন্ধ, ম্যাক্স-ফ্যাক্টর প্রসাধনের গন্ধ, বিদেশী সেন্টের গন্ধ, নোটিশ লাগিয়ে প্রতিদিন এগিয়ে-আসা মৃত্যুর সৌরভ।

আমি চাইনে ও চোখ আমার দিকে তাকাক। আমি চাইনে দেখতে এই শীর্ণ অসহায় ক্লান্ত নালিশ, ঠোঁটের প্রান্তে মুমূর্ষু হাসির মুখোসে হঠাৎ উধাও।

"ও, তুমি? তুমি আছো বাড়ীতে এখন?"

না নেই

"কদিন পরে এ ঘরে এলে জানো?"

জানি না

"মাকে কি মনেও পড়ে না একবার?"

না পড়ে না। না। নানানানানা—আ

"আয়, বোস এসে আমার কাছে। এখানটায় আয়।"

না

"আয় না!"

না

"এত দূরে বসলি কেন? কাছে আয়।"

আসবো না আসবো না না না না কিছুতেই আসবো না তুমি মরবে এই কদিন কমাস পরেই তুমি মরবে তোমার কাছে আমি আসবো না তোমার দেহে মৃত্যু কিলবিল করছে আমি আসব

"না।"

"ভয় ক'রে আমার কাছে আসতে তোর?"

করে

"না।"

"তবে আসিস না কেন? বলবি না? আমি জানি"

"না।"

"কি না?"

জান না তোমরা কেউ কিচ্ছু কোনও কিচ্ছু একেবারে কিচ্ছু জান না তোমরা সবাই অন্ধ বোকা নিজেদের ঠকিয়ে ভাবছ দুনিয়া ঠকল তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না জানলেও জান না যে জান তোমরা কেউ কিচ্ছু

"কিছু না।"

"তুই নাকি কলেজ ছেড়ে দিয়েছিস?"

"তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"ওসব নোংরা ছবি কলেজে না দেখালে হত না?"

"ওরা ছবি চেয়েছিল।"

"অন্য ছবি ছিল না?"

"না।"

আই গেভ্ মাই বেস্ট। দোজ্ এস-ও-বি'স

"কলেজ ছেড়ে কি করবি?"

কিছু না কেবল

"ছবি আঁকব।"

"মানুষ হ'তে হবে না?"

না মানুষ হতে হবে না না মানুষ কেউ হয় না কেউ মানুষ না হতে হবে না

"বাবাকে এত কষ্ট দিচ্ছিস কেন?"

কে কাকে কষ্ট না দেয় তুমি বলতে পারো? বাবা তোমাকে এতো কষ্ট দিচ্ছে কেন, তুমি কেন বাবাকে সারা জীবন কষ্ট দিলে? কি মজার আবদার! বেঁচেও থাকব, কষ্টও

দেব না, পাবও না। যে যতো কাছের মানুষ সে ততো মারে, মার খায়। তুমি আমায় মারছ কেন এমনি করে, কেন মারছি তোমায় আমি তোমার ছেলে যাকে জন্ম দিতে তুমি কষ্টে প্রায় মরে গিয়েছিলে, জন্মাবার যন্ত্রণায় যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল, যাকে তুমি বুকে চেপে চেপে কেবল কষ্ট দিয়েছ, যে তোমায় কষ্ট দিয়েছে দেবে দিচ্ছে আরও দেবে কেননা তুমি বাঁচতে পারলে না, তুমি মরছ, তুমি বেঁচে থাকলে না কেন কি দরকার ছিল তোমার মরবার তুমি তোমার শরীরে মৃত্যুর সাপ-সাপ গন্ধ

"উঠলি যে?"

"হর্ষ আসবে গাড়ী নিয়ে।"

"হুল্লোড় করতে বেরুবি বুঝি?"

"কিছু টাকা দাও না।"

"টাকা! আমার কাছে তোর কেবল একটি দরকার। টাকা। কেন, টাকা কেন?"

"পকেট সাফ্।"

"গত মাসে তো দুশো টাকা নিয়েছিস।"

"ফুরিয়ে গেছে।"

"কি করেছিস?"

"মনে নেই। রঙ"

"রঙ কিনতে আর টাকা দেব না। ছবি আঁকা তোর সর্বনাশ করল।"

দেবে তুমি জানি না দিয়ে পারবে না তুমি দেবার জন্যে সারা জীবন তৈরি ব্যগ্র কাতর হ'য়ে রইলে বৃষ্টি কি পারে জল না দিয়ে এখন তোমার দেবার সময় আর বেশি নেই তুমি দেবে না দিয়ে তোমার উপায় নেই তুমি

"চললি যে! রাগ হ'য়ে গেল!"

যেমন সবাই সবাইকে সব সময় অনায়াসে ঠকায় তেমনি তোমাকে।

"কতো চাই।"

"একুশ।"

"ব্যাগে আছে। নিয়ে যা। শোন। চলে যাস না। একটু বোস এসে কাছে আমার। তোকে তো দেখতেই পাই নে। তাড়া কিসের? কোথায় যাচ্ছিস? গাড়ী কে চালাবে? তুই চালাস নে। চালালেও আস্তে চালাস। বড় ভয় তোকে নিয়ে। মানুষ"

মানুষ দেখে দেখে পচে গেলাম। মানুষ হয়ে কাজ নেই আর। তার চেয়ে

"তোর আন্টি ফোন করেছিল। তোকে যেতে বলেছে।"

আন্টি না হাতি বাবার বন্ধুর স্ত্রী আন্টি

"কাল যাস একবার। তোকে খুব ভালোবাসে"

দারুন। নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। অসহ্য লাগে। মাথায় খুন চেপে যায়। মুখোস, দেখতে বেশ। দারুন অন্ধকার। সব কিছু, সবাই ন্যাংটো। মুখোস পরে মুখোমুখি বসে আছে, দুনিয়া চলছে আরামে, সত্য, শিব, সুন্দর। আন্টি। দশ-জনের-এক-জনের বৌ। পুজা, গীতাপাঠ, রামকৃষ্ণমিশন, তীর্থযাত্রা, মুখোস। যা জানি তোমরা তা' জান না। মানুষ হওয়া বুঝি সহজ? সহজ বুঝি বড় হ'য়ে ওঠা? কঠিন জঘন্য কুৎসিৎ। বড় হ'তে হ'তে বড়দের অনেক কিছু দেখে ফেললাম আর বড়রা হয়ে গেল অনেক অনেক ছোট আর ছোটরা হ'তে পারল না বড়। তুমিই তো পাঠিয়েছিলে আংকল্ ট্যুরে গেলে, আন্টির বাড়ীতে

ঘুমুতে আর আন্টি আমায় খুব ভালোবেসেছিল এখনও একা পেলেই আবার খুব ভালোবাসবে পুজো গীতাপাঠ তীর্থযাত্রা রামকৃষ্ণমিশন ভালোবাসা

"হ্যালো! কে? ও ইউ বাস্টার্ড। আরে, ইয়ার, পনের মিনিট হ'য়ে গেল হর্ষ ফোন করেছিল। এখনও দ্যাট পিগ্ গাড়ী নিয়ে আসছে! শোন্, রাকেস, ইয়ার, তুই বেরিয়ে যাস না যেন। হর্ষ আসবে এখুনি। আমরা আসছি। কে? ওয়াও!! সত্যি বলছিস! খুব ভালো হবে। না, অনেকদিন দেখি নি। বাজে বকিস নে, সী ইজ্ নট মাই এনিথিং। না ইয়ার, কোন মতলব আমার নেই; আমরা ফিরেও তাকাবো না। প্রমিজ। কি বললি? দিস্ ব্লাডি লাইন! খটখট আওয়াজ হচ্ছে কেন রে? কেউ ট্যাপ্ করছে না কি ফোন? কি বললি? কোথায়? কবে? পর্শু বিকেলে? না, কিছু নয়। গলাটা খুস খুস করছে। কোথায় পার্টি ছিল? হোমাদের বাড়ী? কি বললি? না কিছু না, গলাটা কেমন করছে। মাই গড্। সী ওয়াজ হোয়াট? ড্রাঙ্ক? গড্ অলমাইটি! সত্যি বলছিস্?

হর্ষ এসে গেছে। গাড়ীর হর্ণ। এবার পালাব গহ্বর থেকে, কি প্রকাণ্ড গহ্বর, কি কালো কি কুৎসিৎ, তবু এখনও আছে রাস্তা, রাস্তায় মুক্তি। সারা দুনিয়াটা কেন হল না শুধু পথ, পথ, পথ। বাড়ী নেই ঘর নেই শহর নেই বন্দর নেই ফ্রনন্টিয়ার নেই, মানুষ কোথাও দাঁড়াবে না, চলবে, চলবে, দিল্লী থেকে পথ চলবে প্যারিস, লন্ডন, হেলিসিঙ্কি, আবার পথ চলবে, লেনিনগ্রাড্, ব্লাডিভষ্টক, আলাস্কা, মিয়ামি, বুনস্ আয়ার্স, অকল্যান্ড। জিওগ্রাফিটা ঠিক হচ্চে না। এমন কেন হল না যে পৃথিবীর জিওগ্রাফি নেই, মানুষের ইতিহাস নেই, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নেই। এমন কেন হল না যে মানুষের স্মৃতি নেই, কিছুই মনে পড়ে না, কাউকে না, কোন ঘটনাকে না, কখনও কাউকে কোনও কিছুকে না। কি সুন্দর লেগেছিল প্রথম দেখে, মাইরি। কোঁকড়া কোঁকড়া বব ছাঁট চুল, টাইট্ সালোয়ার-কামিজে দেহ ফেটে বেরিয়ে আসছে। মা বলল আমার ছেলে এবার আঠার শেষ হ'য়ে উনিশ, তোমার চেয়ে বছর আটেকের ছোট। আমার কেমন চাইতে লজ্জা করছিল, চাইলাম তো চোখ পড়ল বুকের ওপর, গা ঘেমে উঠলো। মা বলল, ছবি আঁকে। বলে উঠল, তাই নাকি? দেখতে হবে তো! মা বলল, তোর মাসি, আমার বোন, তোকে দেখাশোনা করবে, আমি তো কিছুই করতে পারি না তাই ওকে কিছুদিন কাটাতে বলেছি এখানে তোর মাসি কেন যে মানুষের এত কিছু মনে পড়ে কেন যে

"এত দেরী হল যে তোর! ভাবলাম বুঝি এলিই না।"

"হটাৎ মা বললে দোকানে যেতে।"

"পেট্রোল নিয়েছিস?"

"ট্যাংক ফুল। টাকা নিয়েছিস?"

"কিছু।"

"চলে আয়।"

"এক মিনিট ইয়ার। জামাটা বদলে আসছি।"

মাথার মধ্যে পোকাগুলি কেবল কিলবিল করছিল। দরজা বন্ধ করে ছবি আঁকছিলাম। কতো পোকা কতো রঙ ধরল টেরও পাইনি। দরজায় টক টক। দরজায় ধাক্কা। এতো রাত্রে কি করছ? কিচ্ছু না। দিদি তোমায় শুতে বলছে। দেরী আছে। কি করছো? কিচ্ছু না। দিদি তোমায়। তুমি মার কে হও? বোন। কি রকম বোন! এতদিন তোমায় দেখি নি কেন? এখন কেন এসেছ? বাঃ আসবো না। হঠাৎ দেখলাম। আবার দেখলাম।

ড্রেসিং গাউনের আড়ালে, খুব আড়ালে নয়। ছবি আঁকছ? না। দেখি, দেখি, তোমার ছবি। না। কি দেখছ? তোমার ছবি। কিছু বলছো না কেন? কার কাছে শিখেছো? কারুর কাছে নয়। তুলিটা কোথায়? কেন, কি করবে? দাও না তুলিটা। এমনি করে, এখানটা এমনি করে, বুঝলে? না। অমনি করে নয়। আমি জানি তোমার অনেক নাম। তোমার ছবির অনেক নাম, অনেক দাম। কিন্তু এ ছবি আমার, এ ছবি-আঁকা আমার, আমি কারুর কাছে শিখি নি, শিখব না। ছবি-আঁকা আমায় শেখাতে এসো না। তুমি আঁকতে জানো না। না শিখলে কোনওদিন আঁকতে পারবে না। আলবৎ পারবো। আর কিছু পারব না, এটা পারব। কারুর কাছে শিখবো না। তুমি যাও। ছবি আঁকার সময় আমার ঘরে কেউ আসে না। আসলে কি করো? ঠিক নেই। কি করো? রেগে যাই। রাগলে আমার মেজাজ বড় খারাপ। তুমি যাও। আচ্ছা যাচ্ছি। বেশি রাত জেগো না। তোমাকে দেখা-শোনার ভার আমার, আমার ভার অনেক কঠিন তুমি তা জান না তুমি কিচ্ছু জান না

"এ সার্টটা কোথায় পেলি ইয়ার?"

"কিনেছি। আর, কোথা পাবো?"

"কত দাম রে?"

"ভুলে গেছি। আমি চালাই?"

"প্রথম আমি।"

"চল। রাকেশকে তুলতে হবে আগে। তারপর হোমা ভাণ্ডারী।"

"ওয়াও।"

মার মতোই দেখতে অনেকটা। মা যদি রোগা পটকা পাংশুটে না হত, মার গা যদি এমন নরম সুন্দর হত, আমি কি মাকে এত দূরে দূরে রাখতাম? মার মতো মুখের গড়ন, হাসির ধরণ, গালে টোল, গলায় ভাঁজ। মার মতো গলার স্বর। মার মতন সরু সরু সাদা আঙ্গুল মাথায় কপালে লাগল, তখন আমার জ্বর। মার মতন নরম মিষ্টি দেহ আমার গায়ে লাগল তখন আমার জ্বর। মার মতন হাত বুলাল পুড়ে যাওয়া কপালে তখন আমার জ্বর। মার মতন

"চুপ করে আছিস কেন?"

"কৈ?"

"এত ভাবিস কি তুই, ইয়ার?"

"কৈ?"

"হোমা যাবে আমাদের সঙ্গে?"

"হুঁম।"

"লাকি বাগার রাকেশ। না?"

"উঁহু।"

"লাকি বাগার।"

"হুঁম।"

"এই ব্লাডি ফুল!"

"হোয়াট?"

"দেখছিস না? এক্ষুনি চাপা পড়ছিল। বাস্টার্ড।"

"চাপা"

মার মত মনে হয়েছিল। জ্বরের পরে ঝড় আর কি দারুন নিদারুণ নেশা, মায়ের নেশা। মার মতোই তারপর একদিন আবার অনেক রাত্রে ঘরে এসেছিল। মার মতোই মার মতোই মনে হয়েছিল সমুদ্র সবগুলি ঢেউ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সূর্য সব তাপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পৃথিবী থর থর প্রথম প্রথম। মার মতোই কাছে টেনে নিয়েছিল। তারপর গলা টিপে সন্তানকে হত্যা। আমার চোখের সামনে নয়কোটি রডডেনড্রন একসঙ্গে জ্বলে উঠল আর আমাকে মেরে ফেলতে ফেলতে বার বার জ্বলে উঠে বলেছিল. ইউ লুক লাইক অ' নেকেড ক্রাইস্ট। আমি বলেছিলাম ইউ লুক লাইক

"এই শালা, ইয়ার, একে গাড়ী চালানো বলে? তার চেয়ে ঠেলা গাড়ী চালাস নে কেন? ব্লাডি বাষ্টার্ড। দে, দে, আমাকে দে। যা, স'রে বোস

বলেছিল ইউ লুক লাইক অ' নেকেড ক্রাইস্ট্, আমি বলেছিলাম তোমাকে দেখাচ্ছে, তুমি, তোমাকে

"না না, মরবি না। ভয় পাচ্ছিস কেন?"

বিউটিফুল ডার্টি ছবি। জীবনটা শালা এতো ডার্টি যে ছবি না এঁকে রেহাই নেই। দ' অনলি রিফিউজ। বুঝলি? বুঝলি না? পর্শু হোমাদের বাড়ী পার্টিতে সী ওয়াজ ড্রাঙ্ক! না, ইডিয়ট, হোমা নয়, সী—ই-ই-ই। সী ওয়াজ ড্রাঙ্ক্। . আমার নাম বলছিল বার বার। ডার্টি বীচ। মায়ের মত মনে হয়েছিল। হা হা হা। অনেক আগুন জ্বলেছিল জানিস। অনেক ছবি। মডেল পেয়েছিলাম। বাবা-মা ক্ষেপে গিয়েছিল। ছেলের সতীত্ব বাঁচাবার জন্যে বাড়ী থেকে বার করে দিল। নরকে আরও আগুন লাগল। আমিও গেলাম বেরিয়ে। ছবি ছবি ছবি আগুন আগুন আগুন

"দাঁড়া না! মাত্র তো আশি মাইল।"

সব আগুন একদিন নিবল। রূপ হল দাপট, প্রেম হল শাসন। হুকুম, আমার কাছে ছবি আঁকা শেখ। ছবি আঁকা কারুর কাছে আমি শিখব না। আঁকতে তুমি জানো না। কি বললে? তোমার আঁকা শেষ হয়ে গেছে। আমার সবে শুরু। কি বললে? তুমি এখন একই ছবি বার বার আঁকছ? কি বললে? তুমি এখন আমায় নকল করছ। গালটা পুড়ে গেল। দারুন লেগেছিল মাইরী। উল্টে আমিও চড় বসিয়েছিলাম নরম গালে। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝড়ল লাল টুকটুকে আসল রক্ত

"তুই যা। রাকেশকে ডেকে আন।"

"তুই-ও আয় না।"

"আমি বসছি।"

পর্শু হোমা ভান্ডারীদের পার্টিতে সী ওয়াজ ড্রাঙ্ক্। মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে চীৎকার করেছে, কাম, ডু হোয়াটাভার......তারপর বমি।

হা হা হা হা হা

"কিরে একা একা হাসছিস যে?"

"হাসবো না আমি কে জানিস?"

"তুই—

"আই এ্যাম্ অ' নেকেড্ ক্রাইস্ট।"

"নেকেড হোয়াট?"

"অন্তত একদিন ছিলাম। বলেছিল, জানিস, বলেছিল

দার্শনিক তেইয়ের দ্য শারদাঁ

দিলীপ মালাকার

ফরাসী সাহিত্যের প্রতিটি অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একালের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই এক্সিসটেনশিয়ালইজম দার্শনিক মতবাদ ফরাসী চিন্তাশীল মহলে ছড়িয়ে পড়ে। এক্সিসটেনশিয়ালইজম্ এর সবচেয়ে বেশী প্রভাব দেখা যায় ফরাসী সাহিত্যিকদের ওপর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রায় এক যুগ সর্বত্র এর প্রভাব দেখা যায়। ফরাসী সাহিত্যে-শিল্পে তার তখন রাজত্ব। প্যারিস থেকে লন্ডন, বার্লিন, নিউইয়র্ক এবং রোমে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে তোকিও এবং কলকাতার সাহিত্যিক মহলে। এক্সিসটেনশিয়ালইজম্ দার্শনিক মতবাদ দশ-বিশ বছরের পুরোনো নয়। এর সৃষ্টি কর্তা কিয়েরকেগার্ড ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই নিয়ে সামান্য আলোড়ন তোলেন। কিন্তু সমগ্র ইউরোপের চিন্তাশীল মহলে এবং পরে সাহিত্যের মাধ্যমে ছড়াতে থাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে। তারপর যুদ্ধের পরে হয় তার ব্যাপক বিস্তৃতি।

ফরাসী সাহিত্যে এক্সিসটেনশিয়ালইজম্ এর সবচেয়ে বড় সমর্থক ও প্রচারক হলেন জঁ পল সার্ত্যর্। তাঁর সাথী অনেকেই ছিলেন তবে খ্যাতনামাদের মধ্যে আলবেয়ার কামুর নাম করা যেতে পারে। এককালে এ'দের দল প্যারিসের চিন্তাশীল মহল দাবিয়ে রেখেছিল। তাদের আমি দেখেছি প্যারিসের স্কুল-কলেজ, লেখক-শিল্পী ও প্রকাশকদের পাড়া স্যাঁ-জারমা দেপ্রেতে। তাদের সমর্থক গায়ক ও চিত্রকরেরা ওই পাড়ার কাফে রেস্তোঁরায় দিনরাত গুলজার করত। এখন তাদের যুগ গেছে।

কয়েক বছর ধরে ফরাসী চিন্তাশীল মহলে নতুন একটি দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই মতবাদ এখনও চিন্তাশীল মহলে খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, এ নিয়ে নানা দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন দার্শনিক মতবাদের স্রষ্টা পিয়ের তেইয়ের দ্য শারদাঁ। এ'র মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালে। যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন কিন্তু এ'র দার্শনিক মতবাদ নিয়ে তেমন আলোচনা হয় নি। কারণ তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয় নি। মৃত্যুর পর সেগুলো বিভিন্নাকারে ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে। তেইয়ের দ্য শারদাঁর দার্শনিক মতবাদ নিয়ে ভ্যাটিকান বছর পাঁচেক ধরে প্রচুর সমালোচনা করেছে। আর ১৯৬২ সালের জুন মাসে ভ্যাটিকান এক সরকারি নির্দেশ নামায় তেইয়ের দ্য শারদাঁর দার্শনিক মতবাদ ও যাবতীয় গ্রন্থ ক্যাথলিক-গির্জা-বিরোধী বলে ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, ভ্যাটিকানের আদেশে তেইয়ের দ্য শারদাঁর বই ক্যাথলিক এবং বিশেষ করে নাবালকদের কাছে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। প্রথমত, ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম-যাজকদের প্রধান পরিচালনা কেন্দ্র ভ্যাটিকান দার্শনিক মতবাদ ও গ্রন্থ নিষিদ্ধ করে আদেশ দেন, এবং দ্বিতীয়ত পিয়ের তেইয়ের দ্য শারদাঁ শুধুমাত্র ক্যাথলিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অন্যতম জেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারক। ক্যাথলিক গীর্জার কেন্দ্র ভ্যাটিকানই যখন এহেন ক্যাথলিক ধর্মযাজকের বিরোধী তখন সেই দার্শনিকের মতবাদ নিয়ে ইউরোপের চিন্তাশীল মহলে সাড়া পড়বে তাতে বিচিত্র কি? গত কয়েক

বছরে ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ডে ও জার্মানীতে গোটা দশেক তেইয়ের দ্য শারদাঁ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ প্রাণীবিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলে, দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ও ঐতিহাসিক আরলন্ড টয়েনবি তেইয়ের দ্য শারদাঁ দার্শনিক মতবাদেরও সমর্থক। ফরাসীদের তো কথাই নেই। ফ্রান্সের অনেক ধর্মযাজক, বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক আদ্রেঁ ম্যালিরো এবং সেনেগালের রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক-কবি সেংঘর হচ্ছেন তেইয়ের দ্য শারদাঁ প্রচারক। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকালে তেইয়ের দ্য শারদাঁর কিছু কিছু মতবাদ গ্রহণ করা হয়। কয়েক বছর ধরে দেখছি প্রতিমাসে তেইয়ের দ্য শারদাঁর দার্শনিক মতবাদ নিয়ে নানান ধরনের বই প্রকাশিত হচ্ছে। তেইয়ের দ্য শারদাঁ সমর্থকদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি তাদের দলেরও। ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সের ভেজলে শহরে তেইয়ের দ্য শারদাঁ বান্ধব সমিতি স্থাপিত হয়। গোড়ার দিকে ওই সমিতির অধিবেশন চলত গোপনে। সমর্থক সংখ্যাও ছিল খুবই অল্প। কেবলমাত্র ১৯৬২ সালে তার উন্মুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য সংখ্যাও বেড়েছে চারগুণ।

রোম্যা রোলাঁ বেঁচে থাকতে পিয়ের তেইয়ের দ্য শারদাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন, তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। স্বাধীন মতবাদের জন্য রোম্যাঁ রোলাঁকে একরকম প্রায় বিদেশেই (সুইৎজারল্যান্ডে) নির্বাসিতভাবে থাকতে হয়। জীবিত অবস্থায় পিয়ের তেইয়ের দ্য শারদাঁও তাঁর মতবাদের জন্য কম নিপীড়ন সহ্য করেন নি। তাই রোম্যাঁ রোলাঁর বিধবা স্ত্রী মাদাম রোম্যাঁ রোলাঁ প্রতিষ্ঠিত 'সন্ত্র্ জঁ ক্রিস্তফ' (জঁ ক্রিস্তফ পরিষদ) প্রতিষ্ঠান ভেজলে শহরে শিক্ষাশিবির গড়ে তুলেছেন। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে 'সন্তর জঁ ক্রিস্তফ' দেশ-বিদেশের তরুণ-তরুণীদের শারদাঁ দর্শন শেখাবার ব্যবস্থা করেছে। দেশ-বিদেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই দর্শন যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয় তার প্রচেষ্টা চলেছে।

তেইয়ের দ্য শারদাঁর দার্শনিক মতবাদ অল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। তিনি সবশুদ্ধ ত্রিশটি বই আর পঁচিশটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সমস্যা সম্পর্কে একালের মনুষ্যসমাজ বেশ সজাগ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যসমাজের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় ঈশ্বর সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। তাছাড়া আমরা যুক্ত প্রচেষ্টায় সমাধানের পথে পৌঁছতে পারি। ঈশ্বরকে জানার প্রচেষ্টা যেমন তিনি মানুষের মনে জাগিয়েছেন, তেমনি আবার ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে যাতে বৃদ্ধিলাভ করে তারও ব্যবস্থা তিনিই করেছেন।

'ভবিষ্যতে মনুষ্যজাতি দুইদলে বিভক্ত হবে। একদল ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী, আরেক দল নাস্তিক। তারা নিজেরা বেছে নেবে তাদের মত ও পথ। তার ওপর নির্ভর করবে দার্শনিক প্রগতি। আমি কিন্তু বেছে নেব সত্যধর্মী প্রগতিবাদের পথ। আমার সমস্ত বিশ্বাস ও ক্ষমতা দিয়ে সেই মতবাদকে রক্ষা করব প্রতিটি নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে (ধর্মীয় বা অধর্মীয়)?'

বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'পৃথিবী নিজেই তার সব রহস্য এখনও প্রকাশ করেনি। কত যে তার রহস্য, কত যে তার সমস্যা তার বিশ্লেষণ করতে বসলে সেগুলো বৃহৎ হতে বৃহত্তর হতে থাকে। সে সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র উপায়ে এবং সে হল তাঁর (ঈশ্বরের) প্রতি একান্ত বিশ্বাস।'

তেইয়ের দ্য শারদাঁ ছিলেন আশাবাদী। আশাবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'আমি নিজে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি আমার আভ্যন্তরীণ জীবন ('সত্তা'?), দুইটি শক্তিদ্বারা

পরিচালিত। একটি হচ্ছে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, যিনি এই জগতের স্রষ্টা আর অপরটি হচ্ছে মানুষের জগৎ—যে জগৎ ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। 'আমি ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। যদিও অনেকে অন্ধ গোঁড়া ও প্রগতিবাদের বিরোধী। যারা প্রগতি ও পদার্থবাদকে নিয়ে গুলিয়ে ফেলে, যারা মানুষের উদারনৈতিক ও প্রকৃতিপন্থী স্বাভাবিক গতিকে মানে না, আমি তাদের বিরোধী। আমার স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাস অটল থাকবে ভবিষ্যতের সেই জগতের কাছে যেমনি থাকবে যুক্তিপূর্ণ জীবনের চিহ্ন।'

তেইয়ের দ্য শারদাঁ বিরোধীরা যা নিয়ে এত হৈচৈ করেছেন সেটা হল তেইয়ের দ্য শারদাঁর প্রধান মতবাদকে নিয়ে। অল্পকথায় শারদাঁ বলেছেন বিবর্তনবাদ, আত্মা ও পরমাত্মার প্রতি আস্থা। যার প্রতি রোম্যাঁ রোলাঁর ছিল বিশ্বাস। হিন্দু দর্শনের কাছে যা অপরিচিত নয়। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্ম তা মানে না। ক্যাথলিকদের মতে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, তার মৃত্যুতেই তার শেষ। তারপর আর কিছু নেই। আত্মাতে বিশ্বাস নেই ক্যাথলিকদের।

এর পরেও তেইয়ের দ্য শারদাঁ বলেছেন যে, অনুপরমাণু হতে জীবের বিকাশ। সেখান থেকে জীব যাবে বৃহৎ হতে বৃহত্তর শক্তির কাছে। সে বিলীন হবে ঈশ্বরের কাছে। এই বৃহত্তরের সংজ্ঞাকে বলেছেন তিনি 'ওমেগা'। এর কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে হিন্দু দর্শনের উপনিষদ ও সাংখ্য দর্শনে। যার শুরু অনুপরমাণুতে ও শেষ 'ওঁ'এ। তেইয়ের দ্য শারদাঁর 'ওমেগা' কি 'ওঁ'এর মত প্রতীক চিহ্ন? দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিকেরা বরং তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন।

তেইয়ের দ্য শারদাঁ ছিলেন আসলে বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানীসুলভ সংজ্ঞায় তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন। বীজগণিতের আকার-ইঙ্গিতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার সহজ ব্যাখ্যা আমরা এখানে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন যে, মনুষ্যসমাজের প্রথম বিকাশের (অষ্ট্রালোপেথিক) পরবর্তী ধারা প্যারাসাপিয়েন (পিথেকানথ্রোবাইড, নিয়েন-ডার্থালোয়েড) সমাজ। এই দুই ধাপের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় শ্রেণীবিভাগ। তারপর তারা চলেছে বিবর্তনের পথে। তারা গিয়ে পেঁছিবে মহামিলনের পথে। তেইয়ের দ্য শারদাঁ যার সংজ্ঞা দিয়েছেন 'ওমেগা'। হিন্দু দর্শনে যাকে বলা হয়েছে 'ওঁ'।

এই মতবাদ সম্বন্ধে ক্যাথলিকরা গোঁড়া ও অন্ধ। তারা এই মতবাদ বিশ্বাস করে না। তেইয়ের দ্য শারদাঁর আগে গত একশ বছরে ইউরোপের অনেক দার্শনিক এর হদিশ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো ক্যাথলিক ধর্মযাজক জোর গলায় একথা বলতে সাহস করেন নি। এখানেই তেইয়ের দ্য শারদাঁর বিশেষত্ব। তাই তেইয়ের দ্য শারদাঁ বিদ্রোহী দার্শনিক।

তেইয়ের দ্য শারদাঁর মতে জগৎ ও প্রাণীর সৃষ্টি অনুপরমাণু হতে। অনুপরমাণু থেকেই আত্মা। আত্মার মত অনুপরমাণু হচ্ছে জটিল প্রশ্ন। সেই জটিলতা থেকেই প্রাণের বিকাশ। তা থেকেই ধর্মের। শুধু বিবর্তনবাদেই শেষ নয়। তারপর হবে মানুষের সমষ্টিতে বন্ধ হবার প্রচেষ্টা। সেই থেকেই হবে নতুন মানুষের সৃষ্টি। সব জগতের মানুষের মহামিলনে হবে একটি মানবজাতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পিয়ের তেইয়ের দ্য শারদাঁ যখন সৈনিক, তখন তিনি অসম-সাহসিকতার সঙ্গে রণাঙ্গনে তাঁর কর্তব্য করে যেতেন। তাঁর কোনো ভয় ডর ছিল না বলে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে সাবধান হতে বলতেন। তার উত্তরে তিনি বলতেন যে, "আমি যদি মরি তাহলে আমার শরীরের কাঠামোটাই বদলাবে।" অর্থাৎ আত্মা ঠিকই থাকবে শুধু বদলাবে

কাঠামো। যা বলে হিন্দু দর্শন। এখানেই ক্যাথলিকদের সাথে তাঁর বিরোধ। ক্যাথলিকরা যা বিশ্বাস করে না। তাই তিনি বলেছেন একটি পরমাণুতে লাখ লাখ লোক (আত্মা) গরম-ঠান্ডায় বদলায় না এবং তা সহজ করে পৌঁছতে পারে পরমার্থের পথে।

বৈজ্ঞানিক হিসেবে তিনি ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, চিরাচরিত প্রথায় ধর্মে অন্ধ বিশ্বাস ও ভগবান যীশু খৃষ্টের প্রতি ভক্তি এক জিনিষ নয়। পদার্থকে তিনি বলেছেন ঈশ্বরের দান সুতরাং ভগবানের অংশ 'সাধু পদার্থ।' বিবর্তনবাদ বা পুনর্জন্মবাদ কোনো ধর্মীয় আইনে নয় বরং প্রকৃতির নিয়ম। অলৌকিক কিছু অথবা শক্তি তাঁর কাছে কৌতূহল নয় বরং সত্যকারের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বিশেষ। জাগতিক নিয়ম-কানুন। মহাশক্তি (ওঁ বা ওমেগা)তে তার মহামিলন।

তেইয়ের দ্য শারদাঁ যদি সাধারণ পুরোহিত হতেন বা কোনো ক্ষুদ্র গ্রামের ক্যাথলিক গীর্জার ধর্মযাজক তাহলে বোধ হয় তাঁর মতবাদ নিয়ে এত হৈচৈ হত না। ভ্যাটিকানও তাঁকে এক ধমকে ঠান্ডা করে রাখত। তা হতে পারেনি কয়েকটি কারণে, তেইয়ের দ্য শারদাঁ প্রথমত উচ্চশিক্ষিত, শুধু প্যারিস নয়, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েরও সর্বোচ্চ ডিগ্রী ছিল তাঁর। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওলজির ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত যাঁরাই নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁরাই তাঁর নাম জানেন। 'সিনোথ্রোপ' বা 'পিকিংম্যান'-এর আবিষ্কর্তা তিনি। চীনে তিনি বছর দশেক কাটিয়েছেন। সেখানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করার সময়ে তিন লাখ বছরের পুরোনো নৃতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, চীনে তিন লাখ বছর আগেও মানুষের সমাজ ও গোষ্ঠী ছিল। একটি পরিবার জীবিত অবস্থায় চাপা পড়ে। তারা সে সময়ে যেভাবে বাস করত ঠিক তেমনি ভাবেই তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায়। তারা পাথর কেটে অস্ত্র বানাতে জানত। সিনোথ্রোপের সন্ধান পেয়ে তাঁর মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে নতুন চিন্তার আভাষ মনে উদয় হয়। তারপর নৃতত্ত্বের কাজ করতে গিয়ে তিনি জাভা, ইথিওপিয়া ও ভারতে সন্ধান পান উচ্চতর সভ্যতার ও দর্শনের। এইসব মিলে তাঁর চিন্তায় পরিবর্তন আসে। অনেক পশ্চিমী দার্শনিক বলেন যে, তেইয়ের দ্য শারদাঁ প্রাচ্য দর্শন কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

তেইয়ের দ্য শারদাঁ দর্শনে প্রগতিবাদী ও উদারনৈতিক। অন্ধ ও গোঁড়া ক্যাথলিক গীর্জার একমুখো দার্শনিক চিন্তা যেমন তিনি সহ্য করতে পারেন নি তেমনি পারেন নি বর্তমান মার্কসবাদীদের চরমপন্থী মতবাদ। তাই ইউরোপে আজকাল উদারপন্থী প্রগতি-বাদীরা তেইয়ের দ্য শারদাঁকেই তাদের চিন্তা জগতের নেতা বলে মেনে নিয়েছে।

তেইয়ের দ্য শারদাঁ এসেছেন ফ্রান্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে। কাউন্টি বা ডিউকের পরিবারের সন্তান। তাঁর মা এসেছেন ভলতেয়ার এর পরিবার থেকে। তাই তিনি পেয়েছেন ভলতেয়ারের বিদ্রোহী গুণগুলো। তেইয়ের দ্য শারদাঁর জন্ম হয় ফ্রান্সের ওভ্যার্ণ জেলার সারসনা গ্রামে ১লা মে ১৮৮১ সালে। সে সময়ে তাঁর নাম রাখা হয় মারী জোসেফ-পিয়ের তেইয়ের দ্য শারদাঁ। এবং মৃত্যু হয় নিউইয়র্কে ১০ই এপ্রিল ১৯৫৫ সালে। বেঁচে থাকতে তেইয়ের দ্য শারদাঁ বলতেন তাঁর যেন মৃত্যু হয় যিশুখৃষ্টের মৃত্যুর দিন। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে ঈষ্টার উৎসব হয়। ওই দিন যিশুখৃষ্টের মৃত্যু হয়। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের ঠিক সেই দিনটিই ছিল ঈষ্টার উৎসব, যেদিন তেইয়ের দ্য শারদাঁ পরলোকগমন করেন। যারা তাঁকে নাস্তিক বলে আখ্যা দিয়েছিল তারাও শেষ পর্যন্ত মত বদলাতে বাধ্য হয়। কারণ ওটা তো সাধারণ ঘটনা নয়। বরং তাঁর হয় ইচ্ছামৃত্যু। ওই দিনটিতেই তিনি মৃত্যু

চেয়েছিলেন।

তেইয়ের দ্য শারদাঁর সব লেখা এখনও প্রকাশিত হয় নি। তবে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে দুখানি বই, (১) ল্য মিলিও ডিভিন (দি ডিভাইন মিলিও) যার লাখ খানেক কপি বিক্রি হয়ে গেছে। এই বইখানিতে রয়েছে তাঁর দার্শনিক মতবাদ। (২) ফেনোমেন হ্যুম্যাঁ (দি হিউম্যান ফেনোমেন)—এই বইখানিতে রয়েছে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এই বই দুইখানিই ভ্যাটিকান কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত।

তেইয়ের দ্য শারদাঁ বেঁচে থাকতেই তার লেখা প্রকাশের জন্য সাবকমিটি গঠন করে তাদের হাতে সবসম্পত্তি ছেড়ে দেন। এই কমিটিতে সদস্য ছিলেন ছ'জন। ছজনের মধ্যে তিনজন নাস্তিক আর তিনজন ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী। এদের মধ্যে রয়েছেন ঐতিহাসিক মঁ গ্রুশে ও সাহিত্যিক পল রিভ্। বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানী লুই দ্য ব্রই ও ল্য প্র্যাসঁ-রিঙ্গে। ভ্যাটিকানের বিরোধীতা সত্ত্বেও ছজন ফরাসী ধর্মযাজক কার্ডিনাল ফেলতা ও কোনিগ তেইয়ের দ্য শারদাঁকে সমর্থন করেছেন। শোনা যায় স্বর্গীয় পোপ ২৩তম জন নাকি গোপনে তেইয়ের দ্য শারদাঁকে সমর্থন করতেন। যদিও তাঁর দপ্তর, ভ্যাটিকান তাঁর বই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে।

তেইয়ের দ্য শারদাঁর সব পান্ডুলিপি যার জিম্মায় রয়েছে, তিনি এককালে শারদাঁর সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর নাম শ্রীমতী মরতিয়ের। তিনি মাঝে মাঝে এক একখানা পান্ডু-লিপি বের করে যখন প্রকাশ করেন তখন সেগুলো বোমার মতন বিস্ফোরিত হয়। ভ্যাটিকান তাঁকে ভয় দেখিয়েছে এবং তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে ক্যাথলিক সমাজচ্যুত করা হবে। তাকে ধর্মবিরোধী বলে ঘোষণা করা হবে। শ্রীমতী মরতিয়ের তার উত্তরে বলেছেন যে, ভ্যাটিকানকে তিনি থোড়াই ভয় করেন। তাঁকে সমাজচ্যুত করা হলে তিনি তাতে ভীত নন। বরং তেইয়ের দ্য শারদাঁর গ্রন্থ মুদ্রিত করে তার চিন্তা প্রচার করতে পেলে তিনি মানবাত্মার সেবাই করবেন। তাতেই তাঁর সুখ।

আত্মা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ডাইনে বাঁয়ে স্তূপীকৃত ফাইল। ভিতরে দৃষ্টি আকর্ষক লালনীল রঙের ফ্লাগ। শৈলেন কোন ফাইলে চোখ বুজে সই করছিল কোন ফাইলে বা একটু চোখ বুলিয়ে দেখছিল, টেবিলের ফোনটা বেজে উঠল।

আগে ছিল বিদেশী এখন দেশী শিল্পপতির সওদাগরী অফিস। আমদানি-রপ্তানির কারবার। পদস্থ অফিসারের ঘরে ফোন ঘনঘনই আসে।

একটু বিরক্ত হয়েই রিসিভারটা তুলে নিয়ে শৈলেন বলল,—গুপ্ত স্পিকিং।

নারীকণ্ঠে অন্তরঙ্গস্বরে নিজের নামটি উচ্চারিত হতে শুনে শৈলেন বলল,—হ্যাঁ, কথা বলছি।

—কথা তো বলছ, আমি কে বলতো?

চেনা চেনা গলা। কিন্তু এমন অনেক চেনা গলাইতো কানে আসে শৈলেনের। তাই সে চট করে ধরা দিল না। কার নাম বলতে কার নাম বলে বসবে। সেই ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি।

শৈলেন বলল,—দেখ অমন করে যদি সনাক্ত করতে বল তা হলে ঘাবড়ে যাব। তোমাদের চেনা কি অত সহজ?

—তার মানে তুমি একেবারেই আমাকে চিনতে পার নি।

নিজের জালে নিজেই ধরা পড়েছে শৈলেন।

আমতা আমতা করে বলল,—তা ঠিক নয়। মানে—

—মানে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি চিনতে পার নি। এতক্ষণ ধরে এত কথা বলার পরেও তুমি আমার নাম মনে আনতে পারছ না। অবশ্য মনের আর দোষ কি। সপ্তাহে সপ্তাহে যদি বান্ধবী বদলায়—

শৈলেন হেসে বলল,—সপ্তাহে সপ্তাহে! রত্না, তুমি সেই একইরকম আছ। একটুও বদলাও নি।

—তা নয় শৈলেন। আমি অনেক বদলে গেছি। আমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি যাচ্ছি এক্ষুণি যাচ্ছি।

—কোথায়?

—কেন তোমার অফিসে?

—না না এখানে নয়।

—তবে কোথায় বলো? তুমি যেখানে বলবে—

—না না এখন নয়। আমি বড্ড ব্যস্ত রত্না। পরে তোমাকে আমি জানাব।

—তুমি আর জানিয়েছ। শোন তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটু দরকার আছে। বেশি সময় লাগবে না। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে। থেকো কিন্তু। কোন অছিলা অজুহাতে আবার বেরিয়ে যেয়ো না যেন।

ফোন ছেড়ে দিল রত্না। তার বন্ধু শৈলেন গুপ্তের মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

এক আচ্ছা নাছোড়বান্দী মেয়ের হাতে পড়েছে সে। রত্নার যে কী দরকার তা বুঝতে শৈলেনের কোন অসুবিধা হয় নি। টাকা। নিশ্চয়ই টাকার দরকার পড়েছে রত্নার। টাকা ছাড়া শৈলেনকে এখন আর তার মনে পড়ে না। মনে পড়ুক তা চায়ও না শৈলেন। এই মেয়েটি সম্বন্ধে তার অনেকদিন মোহভঙ্গ হয়েছে। আরো অনেকের সম্বন্ধেই হয়েছে। শৈলেনের সম্বন্ধেই বা কার কতটুকু মোহ এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে? মোহ যে জন্মে তা শুধু ভঙ্গ হবার জন্যেই। যে কোন কিছুর উৎপত্তিরই বিলয় আছে। তাই নিয়ম। সম্পর্কের বেলায়ও একথা সমপরিমাণে সত্য। এ সত্য যখন দুজনেই বুঝতে পারে তখন আর কোন গোলমাল থাকে না। কিন্তু যখন একজন বোঝে আর একজন বোঝে না একজন ছেড়ে চলে আসবার পরেও আর একজন জোর জবরদস্তি চালাতে থাকে তখনই হয় মুস্কিল। অথচ রত্নার দিক থেকে এই জবরদস্তির কোন মানেই হয় ন। শৈলেনের সম্বন্ধে রত্নার মন কোনদিনই খুব গভীর আবেগে আপ্লুত হয়েছে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। প্রণয়, ভালোবাসা দূরে থাকুক শৈলেনের প্রতি কোন আকর্ষণই কি রত্নার মনে কখনো ছিল? শৈলেনের সন্দেহ হত। তবে কিসের সম্পর্ক? শুধু আলাপ পরিচয়ের খাতিরে এত বেশি দাবি করবার অধিকার কি রত্নার আছে?

আর শৈলেন? সে কি নিজে এমন কিছু সুযোগ সুবিধা ওর কাছ থেকে আদায় করেছে যাতে কোন নৈতিক দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়তে পারে? না তেমন কোন সুযোগই সে নেয় নি। রত্না যদি তার ওপর অহেতুক অপবাদ না চাপায় তা হলে সেও স্বীকার করতে বাধ্য শৈলেন এদিক থেকে নির্দোষ। তাই শৈলেনের কোন দায় দায়িত্ব রত্নার সম্বন্ধে নেই।

রত্না কি সে কথা জানে না? জানলেও সে কথা মানা অবশ্য তার পক্ষে শক্ত। মেয়েদের স্বভাবই এই। দরকার পড়লে তারা যাকে সামনে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরতে পারে। বিশেষ করে যে মেয়ের নির্ভর করবার মত কেউ নেই। বাপ নেই ভাই নেই স্বামী নেই এমন কি প্রণয়ীও নেই। তার মত মেয়ের পক্ষে পূর্ব পরিচয়ের সাধারণ সম্পর্কের শরণ নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুধু মেয়ে কেন? পুরুষও তো তাই। দরকার পড়লে সাধারণ তৃণ গাছটিকেও আঁকড়ে ধরে। মানুষের এই সাধারণ দুর্বলতার কথা শৈলেন জানে। সে নিজেও তো এর বাইরে নয়। তবু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। রত্না সেই সীমা মানে না। দরকার পড়লেই কেবল দেহি দেহি করে হাত বাড়ায়। কই অন্য কোন সময় তো সে আসে না, অন্য কোন উপলক্ষে সে তো শৈলেনকে ডাকে না আজকাল।

প্রেম প্রীতি বন্ধুত্ব সম্বন্ধে গোড়া থেকেই কি রত্না রায় সংশয়ী ছিল না? সংশয় বললে একটু নরম করে বলা হয়, আসলে কিছুতেই যেন তার বিশ্বাস ছিল না। অন্তত অবিশ্বাসের একটি ভঙ্গি সে তার চলনে বলনে ফুটিয়ে তুলতে ভালোবাসত। হতে পারে এই ভঙ্গিতেই শৈলেন তখন ভুলেছিল। চেহারার মধ্যেও আকর্ষণীয়তা ছিল অবশ্য। তেইশ চব্বিশ বছর তখন রত্নার বয়স। দীর্ঘাঙ্গী। শামলা রঙ। লম্বাটে মুখ। চুলের রাশকে কাঁধ ছাড়াতে দেয় নি। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ওর সুগঠিত দাঁত আর সুকৃষ্ণ ভ্রূযুগ।

কিছুদিন আলাপ পরিচয়ের পর শৈলেন ওকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার ভ্রূ দুটি কি আঁকা?

রত্না হেসে মাথা নেড়েছিল,—না। আমার সবই কৃত্রিম। শুধু ভ্রূ দুটি এখনো খাঁটি আছে।

শৈলেনের আসঙ্গবাসনা উদ্রিক্ত করার পক্ষে নারীর যে কোন একটি সুন্দর প্রত্যঙ্গই

যথেষ্ট। এমন কি প্রচলিত অর্থে সুন্দর না হলেও চলে। শুধু সৌন্দর্যের বিভ্রম জাগাতে পারলেই সে প্রমত্ত হতে পারে। এই মাদক রস তার নিজের মধ্যেই আছে। শুধু বাইরে থেকে একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। শৈলেন সেই খোঁচার উপলক্ষ খুঁজে বেড়ায়।

বিকৃতি শুধু শৈলেনের নিজের মধ্যে নয়, রত্নার মধ্যেও আছে। অল্প আলাপেই সে তা টের পেয়েছিল। হয়তো তাদের মধ্যে যে মিলটুকু হয়েছিল সে ওই বিকৃতিরই মিল।

রত্না তার কাছে কিছু গোপন করে নি। নগ্নতাই ছিল যেন তার বাহাদুরি। সে বলেছিল,—আর যাই করো প্রেমালাপ ট্রেমালাপ আমার সঙ্গে চালিয়ো না যেন। আমি হাসি সামলাতে পারব না।

শৈলেন বলেছিল,—কেন?

রত্না হেসে বলেছিল,—ভেবে দেখ, চোদ্দ বছর বয়স থেকে যে মেয়ে গুরুজনদের বাসনার বস্তু হয়েছে, বিয়ের দু বছরের মধ্যে পতি পরমগুরুকে ত্যাগ করে এসেছে, তারপর আর কাউকেই পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে নি, তার কি প্রেম সম্পর্কে কোন মোহ থাকে? একটু চুপ করে থেকে শৈলেনের দিকে তাকিয়ে রত্না ফের বলেছিল,—শুধু প্রেম নয়, ও ধরনের যে কোন সম্পর্কে আমার অরুচি এসে গেছে। যদি রুচি কোন দিন ফিরে আসে, কি কেউ ফিরিয়ে আনতে পারে তবে—

শৈলেন জিজ্ঞাসা করেছে,—তবে কী?

রত্না মৃদু হেসে বলেছে,—তবে আবার সব হবে।

এ কি আশ্বাস না আশ্বাসের ছলনা? প্রেমে সত্যিই কি ওর অরুচি এসেছে—শৈলেন মাঝে মাঝে ভাবত। না কি এও ওর ভঙ্গি আর ভান? দর বাড়াবার কৌশল মাত্র।

এসব ব্যাপারে মেয়েদের যাচাই করে দেখবার মত কৌতূহল আর আগ্রহ শৈলেনের বহুদিনের অর্জিত। তার অফিস আছে, পরিবার পালনের দায়িত্ব আছে, তবু তার সম্বন্ধে একটি নারীর যথার্থ মনোবাসনার সন্ধান নিতে তার সময়ের অভাব হয় নি। এ তার নেশা। নেশাকে নেশা বলে গাল দিলেই সে ছেড়ে পালায় না। স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে। আর কে না জানে অভ্যাসই মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি।

নিশ্চয়ই রত্নারও তখন হাতে কোন কাজ ছিল না,—কাজ অল্পস্বল্প কার না থাকে—কিন্তু এমন কাজ নয় যার মধ্যে মানুষ মগ্ন হয়ে যায়, যার সাহাত্ম্যে অন্য সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায় তেমন কার্যযোগ রত্না রায়ের জীবনে কখনোই আসে নি। শৈলেন গুপ্তের জীবনে এলেও আসতে পারত, কিন্তু এল কই? শৈলেন তেমন কর্মযোগী হতে পারল কই?

হয়তো কাজের মত কাজ ছিল না, পাশে বন্ধু ছিল না সে সময় রত্নার জীবনে অনেকখানি জায়গা ফাঁকা পড়ে ছিল। তারই খানিকটা পাদ পূরণের জন্যে ডাক পড়েছিল শৈলেনের।

তাই শৈলেন দু-চার দিন অনুপস্থিত থাকলে ফোন আসত,—কী হল তোমার? হঠাৎ এমন ডুমুরের ফুল হয়ে পড়লে যে? না কি আমার জায়গায় আর কাউকে ডেকে এনেছ?

শৈলেন বলেছে,—তোমার জায়গা তোমারই আছে কিন্তু তুমি তোমার আছ কিনা তার জবাব দাও।

রত্না বলেছে,—আমার তো মনে হয় তুমিও তোমার নও আমিও আমার নই। সেই জন্যেই আমরা কেউ কারো হতে পারি নে। কেউ কাউকে কিছু দিতে পারি নে, কেউ কারো কাছ থেকে কিছু নিতেও পারি নে।

মাঝে মাঝে এ ধরণের তত্ত্ব কথা রত্না বলত। শৈলেনের সন্দেহ হত এই সুভাষিতাবলীর বেশিরভাগই ওর মুখস্ত করা। হয় বই থেকে না হয় অন্য কোন পুরুষ বন্ধুর মুখ থেকে। শুধু অন্যের অর্থ নয়, অন্যের চিন্তা আর বাক্যকেও আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা মেয়েটির ছিল। ওর বলবার ভঙ্গি দেখে মনে হত যা বলছে তার সবই যেন ওর জীবনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি-জাত সত্য।

শৈলেন আমন্ত্রণ পেলেও যেত না পেলেও যেত। ওদের রিচি রোডের বাড়িতে তেতালার ছাদের ওপর অনেক বিকাল আর সন্ধ্যা শৈলেন ওর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে। বড়লোকের বাড়ি। বাপ ডাক্তার। রত্নার মা দাদা বোন সবই আছে। মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ দেখাত শৈলেন। কিন্তু রত্নার তাতে পরম অনিচ্ছা ছিল। রত্না বিরক্ত হয়ে বলত,—কী হবে ওদের সঙ্গে মাখামাখি করে। ওরা যখন আমারই কেউ না, ওরা তোমারও কেউ না।

রত্না নিজের আত্মীয় স্বজনকে সহ্য করতে পারত না। অন্য কোন মেয়ের প্রসঙ্গ ওর কাছে নিতান্ত অসহ্য ছিল। মেয়ে মাত্রেই অসুয়ার আধার। তবু এমন প্রকট অসুয়াবতী মেয়েকে খুব কমই দেখেছে শৈলেন।

তেতলার উপরে খান দুয়েক ঘর রত্নার জন্যে বরাদ্দ ছিল। আর ছাদ। সেই ছাদে সে কাউকে উঠতে দিত না। অন্তত সে যতক্ষণ থাকত কেউ উঠত না। সবাই যেন ওর ছায়া মাড়াতে ভয় পেত।

একদিন ওর অসাক্ষাতে ওর মা শৈলেনকে বরেছিলেন,—ওকে বেশি প্রশ্রয় দেবেন না। ও কিন্তু পাগল।

শৈলেন স্তম্ভিত হয়েছিল,—পাগল।

ওর মা মৃদু হেসে বলেছিলেন,—হ্যাঁ। ওর কাজের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। আর উত্তেজিত হলে ও যে কোন কান্ড করে বসতে পারে। ওর তখন আর কোন জ্ঞান থাকে না।

শৈলেন ভয়ে ভয়ে বলেছিল,—ভায়োলেন্ট হয়?

ওর মা বিষণ্ণ সুরে বলেছিলেন,—তাও হয়।

—তবে ওকে অ্যাসাইলামে পাঠান নি কেন?

তিনি মৃদুস্বরে বলেছিলেন,—সবাইকে কি আর তা পাঠানো যায়? বাড়িতে রেখেই ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি।

শুনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়েছিল শৈলেনের। যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সে কথা বলেছে, যার সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়েছে, রেস্টুরেন্টে বসে খেয়েছে, লেকে গার্ডেনে গঙ্গার ধারে বসে বসে গল্প করেছে সেই মেয়েটির মাথার ঠিক নেই, সে যে কোন মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিতে পারে এ কল্পনা পরম অস্বস্তিকর লেগেছিল শৈলেনের কাছে।

তবু সে যাচাই করে দেখতে ছাড়ে নি। এ কথার প্রতিক্রিয়ায় রত্নার মন কি ভাবে আলোড়িত হয়, তার চালচলনে কী পরিবর্তনের সূচনা করে শৈলেন তা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল।

শুনে প্রথমে মুখখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল রত্নার। সেই মুহূর্তে সত্যিই ভয় হয়েছিল শৈলেনের। হয়তো সে নিজেই এখন রত্নার আক্রোশের লক্ষ্য হবে।

কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল রত্না।

হেসে বলেছিল,—আমাকে তো ওরা পাগল বলবেই। আমাকে পাগল প্রমাণ করতে পারলে ওদের লাভ। ওদের কি ভয় জানো? পাছে পারিবারিক কেলেঙ্কারির কথা আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। নার্সদের নিয়ে কেলেঙ্কারি, লেডী ডাক্তারদের নিয়ে কেলেঙ্কারি, মার কখনো আত্মঘাতিনী কখনো বা স্বামীঘাতিনী হবার উদ্যোগ সবই আমি জানি কিনা। তাই আমাকে পাগল বলে না চালিয়ে আর উপায় কি? কিন্তু সবচেয়ে বড় বিদ্বেষটা আমার ওপর কিসের জন্যে জানো?

—কিসের জন্যে?

—বিষয় আশয়ের। আমি বাবাকে ভুলিয়ে টুলিয়ে সামান্য কিছু নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আমার মা আর বোনের, দাদা আর বউদির রাগ সেই জন্যে। এখন বাবার মনেও অনুতাপ। সেই দুর্বল মুহূর্তের জন্যে অনুতাপ। কিন্তু বাবার দুর্বলতা সাধারণ স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল না। এখন সেই দুর্বলতা স্থানান্তরিত। আমার জায়গায় এসেছে আমার বোন।

রত্নার অসুস্থতা সম্বন্ধে শৈলেন নিঃসংশয় হয়েছিল। রত্নাকে আর বেশি ঘাটাতে সাহস করে নি।

রত্না নিজের মনে বিড় বিড় করে বলে চলেছিল,—পাগল। আমাকে এখন পাগল বলা হচ্ছে। পাগল কে নয় শুনি? তারপর শৈলেনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিল,—তুমি পাগল নও?

শৈলেন সভয়ে বলেছিল,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পাগল বই কি। আমিও পাগল।

রত্না হেসে শৈলেনের হাতখানা ধরে ফেলেছিল,—পথে এসো বন্ধু, ঘরের পাগল এবার পথে বেরোও। তুমি ভয় পেয়েছিলে তাই না? এই মুহূর্তে আমি তোমাকে দিয়েও যা খুশি তাই লিখিয়ে নিতে পারতাম।

শৈলেন বলেছিল,—আমার কী আছে যে লিখিয়ে নেবে?

রত্না হেসে বলেছিল—অতটা দিগম্বর সন্ন্যাসী তুমি নও। তোমারও যথেষ্ট বাটপাড়ের ভয় আছে। পারিবারিক সুখশান্তি সামাজিক সুনাম। পাবার লোভ, হারাবার ভয়, কী নেই তোমার? আচ্ছা যে পাগল তারও কি ভয় থাকে?

শৈলেন বলেছিল,—যতক্ষণ পাগল থাকে ততক্ষণ তার আর ভয় ডর কিছু থাকে না। পাগলামির মধ্যে এইটুকুই যা বর।

রত্না বলেছিল,—কিন্তু প্রেমের মত পাগলামিও যার অস্থায়ী? তার কি দশা? গারদ থেকে বেরিয়ে আসবার ফের সেই লজ্জা ঘৃণা ভয় আর দুঃখ। তখন ফের সব এসে ঘিরে ধরে যে।

এসব তত্ত্বের কথা তারা প্রায়ই বলত। মদের সঙ্গে যেমন চাটের দরকার তেমনি সভ্য ভদ্র নাগরিকের যৌনতার ও সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের আশ্রয় আর আড়ালের প্রয়োজন হয়।

তাই তারা দুজনে মিলে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখত, থিয়েটার দেখত, আর্ট একজিবিশনে যেত। সময়টা ভালোই কাটত। মাঝে মাঝে শৈলেন ভাবত এসব কি যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক এই সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি? আসঙ্গ লিপ্সারই অনুষঙ্গ? না কি এরাও স্বকীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ? মানুষের আকাঙ্ক্ষা তো একরকমের নয়। তার হাজার বাসনা হাজার রকমের চরিতার্থতা খোঁজে। তাকে একটি সাধারণ সূত্র দিয়ে বাঁধতে যাওয়া ভুল।

জীবন একটি বা কয়েকটি সাধারণ সংজ্ঞা আর সিদ্ধান্তের সমষ্টী নয়। শৈলেন মাঝে মাঝে ভাবত।

ওই অস্থিরমতি যুবতীর কাছে শৈলেন একবার লজ্জা পেয়েছিল। রেষ্টুরেন্টের পুরু পর্দা ঢাকা কেবিনে আহারাদি শেষ করবার পর শৈলেন এক মেঘলা সন্ধ্যায় বান্ধবীর দিকে চেয়ে বলেছিল,—তোমার ঠোঁট দুটির রঙ বেশি চকচক করছে। একটু মুছে দেব?

রত্না হঠাৎ শক্ত হয়ে বলেছিল,—না। আমার ঠোঁট মুছে নেওয়ার জন্যে আমার নিজের রুমাল আছে। অন্য কেউ আছে। ও রোল তোমার নয়।

লজ্জায়, অপমানে মুহূর্তের জন্যে কাঠ হয়ে গিয়েছিল শৈলেন। চট করে কোন কথা বলতে পারে নি।

রত্নাই তার দিকে চেয়ে অনুকম্পার সুরে বলেছিল,—তুমি যদি না থাকতে পার, নিজেকে ধরে রাখা তোমার পক্ষে যদি খুবই কঠিন হয়, তাহলে আমি নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যা খুশি তাই করতে পার। ধুতেও পার, মুছতেও পার।

কিন্তু ও কথার পর শৈলেন আর কিছুই করতে পারে নি। কেই বা পারে? একটি নারীর মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করতে না পারার লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে অনুশোচনায় শৈলেন তারপর আরও কয়েকটি মুহূর্ত দগ্ধ হয়েছিল।

অথচ সেক্স সম্বন্ধে রত্নার কোন সংস্কার ছিল না। সে কথা সে নিজের মুখেই বলেছে। নিজের বহু যৌন সম্পর্ক আর অভিজ্ঞতার বর্ণনাও দিয়েছে। তাই তার এ ধরনের শুচিবায়ুতার কোন কারণ খুঁজে পায় নি শৈলেন। হয়তো রত্নার এও এক ধরনের পাগলামি। আচরণগত অসংগতি। তার পরেও সম্পর্ক কিছুদিন ছিল। দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হত। দূরে গেলে অল্পস্বল্প চিঠিপত্রও চলত। তারও পরে রত্না একদিন বলল,—ওহে আমি আবার ভাগ্য-পরীক্ষায় নেমেছি।

—তার মানে?

—বিয়ে করছি ফের।

—বেশ তো।

—কাকে বিয়ে করছি জিজ্ঞেস করলে না যে।

—কোন পুরুষকে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ পুরুষের মত পুরুষ। তোমাদের চেয়ে অনেক ম্যানলি।

—কিসে! দাড়ি গোঁফে?

রত্না হেসে উঠেছিল,—কী করে টের পেলে বলতো? আজকাল কি জ্যোতিষ চর্চা করছ নাকি? দাড়ি-গোঁফ অবশ্য তার আছে। পাঞ্জাবী শিখ। পাগড়ির শাসনে বাঁধা লম্বা চুলও রয়েছে। কিন্তু তাই সব নয়। লম্বায় চওড়ায়, শৌর্যে বীর্যে, উত্তাপে প্রতাপে—সব ব্যাপারেই সে পুরুষ। রত্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এমন পুরুষ প্রবরের ঘরও বেশিদিন করতে পারেনি রত্না। মাস ছয়েক যেতে না যেতেই বিচ্ছেদের খবর এসে পৌঁছেছিল। কে জানে কার দোষ। শৈলেনের যতদূর ধারণা রত্নার দোষই বেশি। যে নিষ্ঠার অভাব শৈলেন নিজের মধ্যে অনুভব করে তারই চড়া মাত্রা সে রত্নার মধ্যে দেখেছে। লেখাপড়া ছাড়াও গান-বাজনা, অভিনয় সবকিছুরই চর্চা ও করে দেখেছে। কিন্তু কোনটাতেই লেগে থাকতে পারেনি। চাকরিবাকরি কাজকর্মের ব্যাপারেও তাই। তার অশাসিত প্রবৃত্তি কোন বৃত্তিতেই তাকে টিঁকে থাকতে দেয়নি কোন সম্পর্ককেই

বর্ধিত বিকশিত হতে দেয় নি। রত্না কেবল গড়েছে আর ভেঙেছে। শৈলেন নিজেও কি তাই করেনি? কারো ভাঙাগড়ার লীলা প্রকট কারো বা প্রচ্ছন্ন।

তার পরে ওর আরো দুর্দশার খবর পেয়েছে শৈলেন। বিবাদ-বিরোধের ফলে পিতৃ-পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কারো কোন সম্পত্তির অংশই পায় নি। না বাপের না স্বামীর। নিজেও যে কিছু অর্জন করতে পেরেছে, সঞ্চয় করতে পেরেছে তা মনে হয় না। ধার-দেনাই এখন একমাত্র সম্বল। পূর্ব-পরিচয়ের সুবাদে রত্না শৈলেনের কাছেও মাঝেমাঝে হাত পেতেছে। শৈলেন দিয়েছে, কিন্তু প্রসন্ন মনে দেয় নি। বান্ধবীকে টুকিটাকি উপহার দেওয়া যায়, কিন্তু থোক টাকা ধরে দেওয়ার মত সঙ্গতি কোথায় শৈলেনের?

শেষ যেবার দেখা হয়েছিল রত্নার সঙ্গে সেবারও ও টাকার জন্যেই এসেছিল। দেখতে কী মোটাই না হয়েছে। ট্যাকসির মধ্যে যেন আর ধরতে চায় না। শৈলেন হিসাব করে দেখেছিল তাদের প্রথম পরিচয়ের পর দশ বছর কেটে গেছে। এই কালক্রম রত্নার অনেক কিছুই ছেঁটে দিয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহায়-সম্পদ। বাড়িয়েছে শুধু মেদ। শৈলেন সেই বিপুলা মেদবতীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল,—এখন আর ভাবাই যায় না ওকে দেখে আমি একদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম, লুব্ধ হয়েছিলাম। যতই বলিনে কেন আমাদের লোভ রক্তমাংসে। সেই মেদের পরিমাণ যেই মাত্রা ছাড়ায় অমনি আমাদের বাসনার আগুন নিবে জল হয়ে যায়।

সাহায্য রত্না অবশ্য ভিখারিণীর মত চায় নি। হাত পেতে শৈলেনকেই যেন সে ধন্য করেছে এমনি ভঙ্গিতেই চেয়েছিল। ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেও ভোলে নি। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

যা দিয়েছে তা আর ফেরৎ চায় না শৈলেন। কিন্তু আবার কত দিতে হবে? কদিনের সেই সামান্য পরিচয়ের জের জীবনভরই সে টেনে চলবে নাকি?

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে সইকরা ফাইলগুলি ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিল শৈলেন। পায়ে পায়ে আর এক বেয়ারা ঘরে ঢুকল। তারাপদ হাঁপাচ্ছে।

শৈলেন বলল—কী ব্যাপার।

—এক ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এয়েছেন।

শৈলেন ভ্রূ কুঁচকে বলল,—এসেছেন তো কী হয়েছে। নিয়ে এসো।

তারাপদ বলল,—আজ্ঞে তিনি ওপরে উঠতে পারছেন না। নিচে গাড়িতে আছেন।

শৈলেনের মন ঘোর অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। মানে তাকেই নিচে নামতে হবে। ফাইলপত্র সরিয়ে রেখে উঠে পড়ল শৈলেন। লিফটের কাছে এসে দেখল যন্ত্র বিকল। মেরামতের কাজ চলছে। মেজাজ আরো বিগড়ে গেল।

চারতলা থেকে একতলায় নামল শৈলেন। আশ্চর্য সিঁড়িও নির্জন নয়। সিঁড়িতেও জনে জনে সামাজিকতা, নমস্কার আর কুশলপ্রশ্নের বিনিময়। অহৈতুক কৌতূহল, —কোথায় যাচ্ছেন?

—এই আসছি একটু।

অফিসের সামনে কয়েকটি গাড়ি আর মাল বোঝাই লরি দাঁড়িয়েছে। রত্নার ট্যাকসিটা আরো একটু দূরে। সরু গলিটার মুখে অপেক্ষা করছে।

শৈলেন এসে সামনে দাঁড়াল।

ট্যাকসির দরজা খুলে রত্না নিজেই বেরিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য ওকে চেনাই যায় না।

সেই স্থূলাঙ্গী বপুষ্মতী আর নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে। পরণে সস্তা সাধারণ একখানা সাদা খোলের শাড়ি। কালো পাড়। গায়ে এক চিলতেও গয়না-টয়না নেই। ব্যাপার কি। ওর তো স্বামী ছিল না যে তার মৃত্যুতে ও বৈধব্য নেবে। মাথাটা ন্যাড়া। তাতে অতি কুরূপা হয়েছে দেখতে।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করল,—কী হয়েছিল তোমার।

রত্না বলল,—অসুখ করেছিল।

—কী অসুখ।

রত্না একটু হাসল,—সে একটা বিদ্ঘুটে নাম। হাসপাতাল থেকে আজই বেরিয়েছি। কিন্তু সব কথা পরে বলব। তুমি আগে ট্যাকসির ভাড়াটা মিটিয়ে দাও তো। আমার হাতে একটি পয়সাও নেই।

—কত ভাড়া?

রত্না বলল,—টাকা পনের হবে বোধ হয়। কেত্না ভাড়া সর্দারজী?

পাকা দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন মাথায় হলদে রঙের পাগড়ি জড়ানো বুড়ো পাঞ্জাবী ড্রাইভার বলল,—পন্দের—বিশ মাঈজী।

রত্না বলল,—ওরে বাবা। এরই মধ্যে বিশ পয়সা বাড়িয়ে ফেললে।

শৈলেন ড্রাইভারের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বলল,—কোনসা হাসপাতাল সে তুম আ রহে হো। মিশন রো তক আতে আতে পন্দের রূপেয়া ভাড়া হো গিয়া?

ড্রাইভার বলল,—ম্যায়তো হাসপাতালসে হি নেহি আরহাহু। সারি কলকাতা ভর চক্কর মারা।

রত্না বলল,—দু মাস হাসপাতালে বন্দী ছিলাম। ছাড়া পেয়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিলাম। দিয়ে দাও, সর্দারজীর ভাড়াটা দিয়ে দাও। ভাড়া যে আদায় হবে এমন আশা সর্দারজী ছেড়েই দিয়েছিল। জানো, আমি ওপরে গিয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। কিন্তু পাছে সর্দারজী ভাবে আমি ওর টাকাটা মেরে দিচ্ছি—

বুড়ো ড্রাইভার একটু হেসে বলল,—না মাইজী।

রত্না বলল,—এখন তোমার মুখে হাসি ফুটেছে বাবা। খানিক আগেও তোমার মুখ একেবারে চূণ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলে হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয় আমি মাতাল হয়েছি।

হঠাৎ শৈলেন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলল,—আমারও তাই ধারণা। এভাবে কেউ আসে? সবাই কি ভাবছে বল দেখি।

রত্না তার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মাসের শেষ। ব্যাগে বেশি টাকা ছিল না শৈলেনের। সংসার খরচের সাপলিমেন্টারী বিল মেটাতে হচ্ছে দুদিন ধরে। তাই নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়ে গেছে এক পশলা। ভাগ্য ভালো কারো কাছে ধার করতে হল না। গুণে গেথে টাকা ষোলর মতই হল। টাকাটা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিল শৈলেন। চেঞ্জটা পকেটে রাখতে যাচ্ছিল রত্না হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলল,—ওই পয়সা কয়েক আনাও দিয়ে দাও আমাকে। দানের পর দক্ষিণা।

—কী করবে?

—একটা রিকসা নেব।

রত্না যেন সম্মোহনী বিদ্যা জানে। ব্যালেনসটা সত্যি-সত্যিই ওর হাতে তুলে দিল

শৈলেন। রত্না এগিয়ে গিয়ে একটা রিকসায় উঠে বসল। তারপর শৈলেনের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে একটু হেসে বলল,—থ্যাঙ্কস।

রিকসাটা চলে গেল। শৈলেন নিশ্চল আর নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেই মুহূর্তে নিষ্কপর্দক শৈলেনের মনে হল, বাঁচা গেল। ওই অসুস্থ অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটা আরো কী দাবি করে বসত কে জানে। আমাকে যার তার কাছে ধার করতে ছুটতে হত। না দিতে পারলে মান থাকত না। হয়তো হৈ চৈ করত। আশেপাশে লোক জড়ো হত। ষোল টাকা খরচ করে সেই কেলিঙ্কারির হাত থেকে আজকের মত বেঁচে গেছে শৈলেন।

ঘণ্টা খানেক বাদে নিজের ঘরে বসে লাঞ্চ খেতে খেতে তার অন্য কথা মনে হচ্ছিল। অফিস ক্যান্টিনে আজ মাংস হয়েছে। মাংস, পাঁউরুটির স্লাইস আর চা দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করছিল শৈলেন। নটায় নাকে মুখে গুঁজে বেরোতে হয়। একটা দেড়টায় ভারি ক্ষিদে পায়। আজকের ক্ষুধার অন্নটা সে সহকর্মী বন্ধু শিশির হালদারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। ধার নিয়েছে একখানি দশ টাকার নোট।

শিশির হেসে বলেছে,—ব্যাপার কি? পকেট মারা গেছে নাকি? না কি পকেটের টাকা গৃহিনীর আঁচলে উঠেছে?

শৈলেন সব কথা ভাঙে নি। হেসে জবাব দিয়েছে,—প্রায় ওই রকমই ব্যাপার।

খেতে খেতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসা একটি রুগ্ন নিঃসম্বল মেয়ের কথা শৈলেনের মনে পড়ছিল। কতদিন হোটেলে রেষ্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে তারা খেয়েছে। খেতে খেতে গল্প করেছে। কোন কোন দিন রত্না নিজেই জোর করে বিল মিটিয়ে দিয়েছে। তখন ও চাকরি করত। পড়াত একটা কনভেন্ট স্কুলে।

আশ্চর্য, শৈলেনের একবার মনে হল না ওকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করে। নিশ্চয়ই ও কিছু খেয়ে বেরোয় নি। ওর মুখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে টাকার জন্যে ও দোরে দোরে ফিরেছে। শৈলেনের কাছে আসবার আগে ও অন্য স্বজন বন্ধুর কাছে হাত পেতেছে। হয়তো দেখা পায় নি। দেখা পেলেও দাক্ষিণ্য পায় নি। ওর বাবা মা মারা গেছেন তা শৈলেন জানে। আর কে আছে না আছে তাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে কি নেই তা জানে না। না থাকাই সম্ভব। সংসারে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা, তাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা বড় কঠিন। উচ্ছৃংখল, আধা উন্মাদ মেয়েটি যে কিছু রাখতে পেরেছে তা মনে হয় না। শৈলেনেরও যা স্বভাব তাতে ওর মত দশা হতে পারত। পুরুষ বলে খানিকটা রক্ষা পেয়েছে, আগে থেকেই কিছুটা সুবিধা সুযোগ ছিল বলে দাঁড়াতে পেরেছে। পুরুষকারের যত বড়াইই করুক, যেটুকু যা করেছে, যেটুকু যা হয়েছে, যেটুকু যা পেয়েছে তার সব কৃতিত্ব তার নয়।

—পুরুষের মত পুরুষ কাউকে দেখলাম না। রত্না মাঝে মাঝে বলত।

আর যাই হোক একটি মেয়ের কাছে শৈলেন আজ পৌরুষের পরিচয় দিতে পারে নি। সে হেরে গেছে।

ও কি আর কখনো আসবে? কোনদিনই আসবে?

খাওয়া শেষ করার আগে হঠাৎ একটি বিষম খেল শৈলেন। কাঁচের গ্লাসে জল ছিল। তাড়াতাড়ি জল খেয়ে নিল। তারপর নিজের মনেই একটু হাসল, 'মেয়েরা বলে খেতে বসে বিষম খেলে বুঝতে হবে কেউ তোমার কথা মনে করছে।'

এই মুহূর্তে শৈলেনের কথা কে কিভাবে মনে করছে কে জানে?

গল্প ও কবিতা : সম্পর্ক নির্ণয়

গল্প ও কবিতা সাহিত্যের এই দুটি ধারা অনিবার্যভাবে বড় কাছাকাছি এসে গেছে। এ সম্পর্কে নানা কথা বলবার আছে। চারজন তরুন গল্পকারের চিন্তাধারায় চারটি পর্যায়ে তারই আলোচনা হয়েছে এই নিবন্ধে।

কিছুদিন আগে সোরগোল উঠেছিল গল্প আর কবিতা খুব কাছাকাছি এসে গেছে, যাচ্ছে, —এতো কাছাকাছি যে তাদের আলাদা অস্তিত্ব বুঝি আর থাকে না। আমার কাছে ব্যাপারটা প্রথম থেকেই গোলমেলে ঠেকেছে। এ-কথা ঠিক যে সাহিত্যের কর্ম একটা সনাতন ব্যাপার নয়। তার ধরণ-ধারণ পাল্টায়, তার সাজপোশাকের বদল ঘটে। কখনো বা কোনোটির একেবারে অবলুপ্তি ঘটে। কখনো পুনর্জন্ম। সুতরাং গল্প আর কবিতা আর আলাদা-আলাদা থাকতে পারছে না—এটা ইতিহাসের দিক থেকে সম্ভাব্য। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল খুব কি সম্ভাব্যও। সাহিত্যের সুরুতে হয়তো একটা আঙ্গিকের মধ্যে আর-একটা আঙ্গিক লালিত-পালিত হয়ে অবশেষে একদিন ছিটকে বেরিয়ে যায়—যেমন মহাকাব্য থেকে নাটক। কিন্তু এটা সুরুতে সম্ভব। সাহিত্যের বয়স নিদেনপক্ষে দুই-আড়াই হাজার বছর। এতোদিনে সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে, তারা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে, এতোটাই স্বতন্ত্র যে তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হতে কোনো দুর্বলতা বোধ করে না বা ভয় পায় না। এমন অবস্থায় কি একটা আঙ্গিক একেবারে ভেঙে যেতে পারে বা আর একটি আঙ্গিকের সঙ্গে মিশে যেতে? পরিবেশের অবিশ্যি খুব বদল ঘটেছে। রেডিও-তে নাটক অভিনয়ের ফলে কি নাট্যসংলাপের স্বভাব পালটায় নি। সেটা কি আরো পাল্টাবে না ভারত সরকারের পরিকল্পিত টেলিভিশন আমদানী হলে?

এই পরিবেশের পরিবর্তনটাই বোধহয় আসল কথা। পরিবর্তনের ফলে (১) কতকগুলি আবেগের কাছে পৌঁছুবার পুরানো পথ হয়তো কোনো একটা আঙ্গিকের পক্ষে আর সুবিধেজনক নেই, তখন নতুন পথ খুঁজতে হয়। খুঁজে যে-পথ বেরোয় তার সঙ্গে হয়তো আর কোনো একটি আঙ্গিকের মিল বেশি। (২) আবার এমনও হতে পারে গল্পের ক্ষেত্রে হয়তো এমন কিছু কিছু আবেগকে আমরা আজকাল ছোঁবার চেষ্টা করছি, ইতিপূর্বে যে-গুলো কবিতার একচেটিয়া ছিল। এ-ক্ষেত্রে অবিশ্যি কবিতার সঙ্গে গল্পের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। (৩) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গল্পে আমরা হয়তো কবিতার বাঙ্-রীতি ব্যবহার করি, তাতে আপাতদৃষ্টিতে হয়তো কবিতা-কবিতা শোনায় কিন্তু মূল তাৎপর্যের ক্ষেত্রে গল্পের সুরটিই অক্ষুণ্ণ থাকে।

দু-একটা গল্পের উদাহরণ দিলে আমার প্রতিপাদ্য স্পষ্ট হবে। বহুদিন আগে ননী ভৌমিক গল্পে কবিতার বাগ্‌বিধি ব্যবহার করা সুরু করেন : 'আর তখন ঘরের মধ্যে একটা ভ্রমর আসে গুনগুনিয়ে। কি মায়া লাগল চোখে। আহা, মায়া লাগুক, মোহ। সুর লাগুক ততখানি, যতখানি ও নিজে সুন্দর। ও রূপসী নয় তবু অপরূপ এই কথা জানাতে চেয়েছি আমি। ও শোভা নয়, সুরভি। আস্তে করে বলেছি শোনো, কি বলেছি সেটা কিছু নয়, কি সুর লাগছে।' গল্পটার নাম 'পূর্বক্ষণ'। এ-গল্পটিতে কাহিনীহীন আবেগের যে নির্যাসকে গভীর নাটকীয়তায় বিধৃত করা হয়েছে তা গল্পের সীমাভুক্ত এর আগে ছিল না। অর্থাৎ গল্প বলার পদ্ধতির মধ্যে কবিতার পরোক্ষতা সংক্রামিত হয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী।' তাঁদের কাছেই গল্পটা দুরূহ মনে হবে, বা অবান্তর,

যাঁরা ঐ অতকথার ভাবুক যুবকটির ভেতরের আবেগকে দেখতে পাবে না,—লেখকও দেখতে দেবেন না। প্রাসঙ্গিক আবেগকে প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পে, সংলাপে, আখ্যানে, লুকিয়ে ফেলে ভেতর থেকে তার দ্যুতিটুকুকে দেখাবো—এটাও আধুনিক কবিতার কৌশল। এমন ধরনের গল্পের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ দীপেন্দ্রনাথের 'মৃতশহর : বসন্ত।'

কমলকুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের মূলবিষয় ক্ষুধা—একেবারে জৈব ক্ষুধা। কিন্তু কমলকুমারের ভাবনায় প্রি-র‍্যাফাএলীয় স্বভাবে সেই ক্ষুধা আরো পাঁচ-রকমের আবেগ অনুভূতিতে ঘেরা। তাই পাখির ছোলা চুরি করে খাওয়ার স্থূল ঘটনাটির বর্ণনায় এমন অব্যর্থ কবিতার ভাষা ব্যবহার করা হয়। বালিকার উদ্ভিন্নযৌবন তার প্রৌঢ় ক্ষুধার সঙ্গে অন্বিত হয়ে এক অনবদ্য পরিবেশ রচনা করে। আর-একজন গল্প লেখকের রচনায় এমন আপাত-অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে বিষয়টিকে বহুমুখী করার চেষ্টা দেখা যায়। তাঁর একটি গল্পে তিনি কবিতা করার কৌশল ব্যবহার করেছেন এক অত্যন্ত শ্লেষাত্মক অবস্থা বর্ণনা করতে, অথচ সেই শ্লেষে তিনি একই সঙ্গে দুটি বিষয়—গাছবোনা আর ভুখ মিছিল জুড়ে দিয়েছেন : 'কৃষ্ণচূড়া আমলকী বট অশ্বত্থ ও চাঁপা তরুশিশু রোপনের প্রাক্কালে যখনই হেঁট হচ্ছিল সে--হাঁটুর পাশ দিয়ে এই দেয়ালটার নিম্নাংশ তার লক্ষ্যগোচর হয়েছিল—চলমান এই দেয়াল তাকে সর্বত্র অনুসরণ করেছে—সে বুঝতে পারছিল না 'অরণ্য দীর্ঘজীবী হোক্' বা 'বনস্পতি জিন্দাবাদ' ধ্বনি এই দেয়ালের শীর্ষে বারবার পোলট্রি সাহেবের পোস্টারটির ন্যায় ঠেলে তুলে দেয়া হয়েছিল কী কৌশলে।'—এমন প্যাঁচালো ব্যাপারের মধ্যে গল্পকে আগে যেতে হতো না, একই সঙ্গে বণমহোৎসব, চারাবোনা, সরকারি আমলার হঠাৎ কবিত্ব আর ভুখা মানুষের ধ্রুবসত্য।

এগুলো থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে গল্প-কবিতা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হতে-হতে একেবারে মিশে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। কবিতাও গল্পের কাছ থেকে অনেক ভঙ্গি নিয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটু অন্য রকমের একটা ব্যাপার আছে। বাংলা সাহিত্যে কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি গল্পের ভাষা ও ভঙ্গির চাইতে অনেক পরিণত, ভার-বহনক্ষম, ও তৎপর। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে গল্পের আধুনিক লেখককে কবিতার কাছ থেকে অনেক কিছু নিতে হতে পারে।

দেবেশ রায়

আমাদের সভ্যতা বড় বেশী ভাষা-নির্ভর। আর সেই ভাষারও অধিক অংশ গদ্যের, বা অঙ্কের, বা জ্যামিতির, কিছুটা বা কথোপকথনের। চতুর্দিকে ভাষার এই যে বিপুল ব্যবহার—যে ভাষা ব্যবসায়ীর, ফড়ের, ট্রাম-বাসের কন্ডাক্টরের, পাড়ার আওরা ছেলেদের, রিসেপশনিস্ট বা রাজনীতিজ্ঞের তার মধ্যে কবিতার ভাষা কতটুকু? কিংবা এও একরকম প্রশ্ন সর্বজনের ব্যবহারের যে ভাষা তার থেকে কবিতার ভাষা আলাদা কিনা। ব্যবহারিক ভাষা যদি কবির অস্পৃশ্য হয়ে থাকে তবে কোন ভাষায় কবি লিখবেন? কিংবা আলাদা এক-

ধরণের ভাষা আছে কি যাকে নিতান্তই কবিতার কিংবা কবির ভাষা বলা যায়। যাঁরা কবিতা পড়েন তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর কবিদের কাছ থেকে না পেলেও অনুভব করবেন যে এ রকম একটা ভাষা রয়েছে। বলা বাহুল্য শব্দভাণ্ডার আয়ত্তাধীন হলেই এই ভাষার ওপর কর্তৃত্ব আসে না। কারণ এ ভাষার বৈশিষ্ট্য তো নতুন শব্দ নির্মাণ বা শব্দ আবিষ্কারের ওপর নির্ভরশীল নয়! পদসংস্থানের বৈচিত্র্যেই এ ভাষার নিজস্বতা। আর এই সংস্থানের ফলেই চেনা শব্দও অচেনার ঘেরাটোপ পরে বসে থাকে। যেমন সকলেই কবি নয়, তেমনই সকলেই কবিতার সহৃদয় পাঠক বা বোদ্ধা নয়। এ ব্যাপারে আধুনিক কবিদের মাঝে মাঝে সরব হতে শোনা গেছে যে কবিতা সকলের জন্য নয়, যেমন নয় মার্গ সঙ্গীত বা চিত্রকলা। শিল্প রস-পিপাসুর শ্রবণ, দর্শন কিংবা পাঠ সব কিছুতেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

কিন্তু এক কালে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ শোনা গেছে তা—আশ্চর্যের বিষয়—আজকাল আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। বরং বাংলাদেশে আর আর অনেক জিনিষের অভাব থাকলেও কবিতার অভাব নেই, কবির সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। সম্ভবত কবিতার কৌশল আজকাল অনেকেরই আয়ত্বাধীন, এবং এই আকস্মিক সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে অনায়াসে বলা যায় যে শিল্প-মাধ্যম হিসেবে কবিতা এখন জনপ্রিয়। অপরপক্ষে কবিতার ভূত এসে গল্পের ঘাড়ে ভর করেছে—সেখানে নূনতর দুর্বোধ্যতার অভিযোগ শুনছি। কোথায় গেল সেই 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' কিংবা 'অভাগীর স্বর্গ'! ধরে নেয়া যেতে পারে কি যে এ অভিযোগেরও মূল কারণ ঐ ভাষা ব্যবহারের নিজস্বতা, কিংবা গদ্যে বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ, কিংবা গল্পের ফলশ্রুতিতে ভাবানুভূতির (ইম্‌প্রেশনিজম্‌!) প্রাধান্য! এমনও শোনা যায় যে চেতনাপ্রবাহের সম্মোহনে আধুনিক গল্পের ভাষা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ফলে সেই ভাষার অস্বচ্ছ দর্পণে পারিপার্শ্বিকের একটা ভূতুরে চেহারা দেখা যাচ্ছে। আবার বাহবা দিয়ে অনেকে বলেন—এ ঠিক কবিতার ভাষা যেন, গল্পের ভবিতব্য তো এমনই হবে বলে আশা করা গিয়েছিল!

গল্প কিংবা কবিতার ভবিতব্য সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো কথা বলে দেওয়ার চেষ্টা বিপজ্জনক। তবে খানিকটা দ্বিধা রেখে এ কথা বলা যায় যে সম্ভবত পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথ ও রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে আসবার বেপরোয়া এবং আপ্রাণ চেষ্টায় সাহিত্যের এ দুটি মাধ্যম একটা অনিশ্চিত সময়কে দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের চেহারায় এবং পোষাক পরিচ্ছদে কিছু উদ্ভটত্ব দেখা দিচ্ছে। এ আলোচনা যেহেতু ভাষাভিত্তিক সেই হেতু বিষয়বস্তুর অবতারণা না করাই ভাল, এবং তা না করেও দেখানো যায় যে ভাষাকে নিয়েই নতুন একধরনের আধুনিকতা সৃষ্টি হচ্ছে। এই আধুনিকতার বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে গেলে আমরা কি ভবিষ্যতে আমাদের অভিধানে কবি ও গল্পকার এ দুটি শব্দকে একার্থক বলে উল্লেখ করব? অর্থাৎ গল্প ও কবিতা কি পরস্পরের অধিকার ও অস্তিত্বকে গ্রাস করতে চাইছে! সহাবস্থান নীতিতে তাদের কোনো অনীহা দেখা দিচ্ছে কি!

ভাষার দিক থেকে দেখতে গেলে এখনও কবিতা এবং ছোটগল্পের ভাষা খুব জোরালো এবং স্পষ্টভাবেই আলাদা। তাছাড়া কবিতাকল্প গদ্য লেখার অনুশীলনও আজকের নতুন নয়, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা অনেকেই তা লিখেছেন, এবং আজ যাঁরা গদ্য লিখছেন তাঁরাও পূর্বসূরী গদ্যলেখকদের কাছ থেকেই তার পাঠ নিয়েছেন। কবির কাছ থেকে নয়। কাজেই গদ্য ও কবিতার ভাষা কাছাকাছি এসে গেছে এরকমটা এখনই মনে করবার কোনো হেতু দেখা দেয়নি। আর ছোটগল্পে

যে গদ্য ব্যবহৃত হচ্ছে আমার ধারণায় তা ক্রমশই পূর্বসূরীদের রোম্যান্টিক মেজাজ কাটিয়ে উঠে বেশ ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে এবং আরও যাবে। এ লক্ষণ আধুনিক গল্পকারদের অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। তবু কবিতার মেজাজ গল্পের ভিতরে এবং গল্পের ঠাট কবিতার ভিতরে যে কিছুই অনুপ্রবেশ করেনি এমন নয়। আধুনিক লিখিয়েরা প্রখরভাবে শব্দ-সচেতন বলেও অনেক সময় কবিতা ও গল্পের বর্ণনাভঙ্গী পরষ্পর সহোদরা বলে মনে হতে পারে। একই সচেতনতা থেকে শব্দচয়ন ও সংস্থাপন করলে এটা হয়। তাছাড়া অনেক কবিই গল্পকার, এবং অনেক গল্পকারও কবি। এই সব্যসাচীত্বও অনেক সময় দুইকে এক লক্ষণাক্রান্ত করে তাৎক্ষণিক ভ্রমের সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ একেবারে হাল আমলে যাঁরা দুটিই লেখেন তাঁরা জানেন যে কবির হাতে গল্প এবং গল্পকারের হাতে কবিতা তেমন উৎরোয় না। কারণ আধুনিক গল্প বা আধুনিক কবিতা এই দুইয়েরই এখন highly specialised form. সুতরাং অনুপ্রবেশ সবসময়ে প্রীতিপ্রদ সম্ভাষণ লাভ করে না। রবীন্দ্রযুগ অলক্ষ্যে অবসিত হয়েছে।

গল্প কবিতা আধুনিকযুগে বসে লেখা অনেক শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ অতিরিক্ত সচেতনতা না থাকলে, শব্দ ব্যবহারের বিধি না জানলে এ যুগে লেখা নিরর্থক। স্বতঃস্ফূর্ততা যদিও এখনো একটা গুণ বলে মনে করা যায়, তবু শুধুমাত্র ঐটুকুর জোরেই লেখক বা কবি হওয়া যায় না, আগের দিনে যেমন হত। সুতরাং এই অতিসচেতনতার যুগে ক্ষমতাবান লেখকের হাতে সাহিত্যের এক মাধ্যম তার বিশিষ্টতা হারিয়ে আর এক মাধ্যমের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠবে এ বিশ্বাসযোগ্য নয়। গল্প ও কবিতার মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা এক কথায় বলে দেওয়া যদিও শক্ত ব্যাপার, তবু পার্থক্য কোথায় তা এক কথায় বলে দেওয়া যদিও শক্ত ব্যাপার, তবু পার্থক্য যে আছে এবং দূরত্ব যে দুরপণেয় একথা যারা লেখেন তাঁরা অন্তত অনুভব করবেন। কবিতাকে গল্প করে তোলা বা গল্পকে কবিতার মতো করে বলা শিল্পী-সত্তার একধরনের বিচিত্র ভ্রমণ—হয়ত ঐভাবে তাঁরা শব্দের শক্তি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে নেন। কিন্তু বস্তুত যেকোনো সৎ শিল্পী—যিনি এই দুইয়ের মৌল পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত আছেন—তাঁর এটা নিশ্চিত জানা আছে একে অন্যের মতো হয়েও সবসময়ে আলাদা অস্তিত্ব বিসর্জন দেয় না। যেমন আজকাল নাট্যকাব্য বা গদ্যকবিতা—এই দুইয়ের ভিতরে নাটকের বা গদ্যের লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু কবিরা তা বলে কখনো দাবী করেন না যে কবিতা নাটক হয়ে যাচ্ছে বা গদ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। কারণ কবি জানেন তিনি নাটক বা গদ্য লিখছেন না, কবিতারই নতুন পরীক্ষানীরিক্ষা করছেন মাত্র। কিংবা প্রাচীনকালে যে সব কাহিনীকাব্য লেখা হত তার ভিতরে গল্প বা কাহিনীর প্রচুর উপাদান থাকা সত্ত্বেও তার কাহিনীকাব্য নামটি ঘোচেনি। এই নামই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে ওটি ঠিক গল্পও নয় আবার যথার্থ কাব্যও নয়, এর মাঝামাঝি একটা কিছু যা গল্পের থেকে আলাদা, আবার কবিতার চেয়েও আলাদা। অর্থাৎ সাহিত্যের ওটি একটি আলাদা মাধ্যম। কালক্রমে এই মাধ্যমটির উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে এবং গীতিকবিতা ও কাহিনী বা গল্পের ধারা বিভিন্নখাতে বয়ে গিয়ে নিজেদের বিশিষ্ট রূপগুলির ভিতরে মুক্তিলাভ করেছে। এখন নতুন করে এই দুই বিষয়ে অমাদের অদ্বৈতবাদী হয়ে ওঠার কোনো স্পষ্ট কারণ নেই।

সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে আজকাল অনুভূতির প্রাধান্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। নানা ধরনের বিচিত্র অনুভূতির ফসল হিসেবে আমরা এযুগের সাহিত্যকে বিচার করছি। এখন এইসব অনুভূতি যেমন কবিতা তেমন গল্পেরও জন্ম দিচ্ছে। মূল অনুপ্রেরণা অনুভূতিজাত

হওয়ায় বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গল্প ও কবিতার খুব একটা পার্থক্য করতে যাওয়া বৃথা। তদুপরি আজকালকার গল্প ও কবিতা বুদ্ধিজাত রচনা। কাজেই বিষয়বস্তুর কথা সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছি। কেননা বিষয়বস্তুতে যে যুগলক্ষণ প্রকাশ পায় তা যুগপৎ একই সময়ের সাহিত্যে ও শিল্পে প্রকটিত হয়। অর্থাৎ কবিতা বা গল্প ইত্যাদির অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় একটি বিশেষ সময়ের পারিপার্শ্বিক। সেই পারিপার্শ্বিক ও সময় কবিকে ভাবায় কবিতায়, গল্পকারকে গল্পে। কেউ কারো সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ না করে, মূল অনুপ্রেরণা এক থাকা সত্ত্বেও বিচিত্র এবং বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গিমাকে গ্রহণ করবে—এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যকর্মের ভিতরেও অর্থনীতির শ্রমবিভাজন নীতি কার্যকরী রয়েছে, আর রয়েছে বিভিন্ন কারিগরী দক্ষতার পার্থক্য। কাজেই একের হাতে আর হয় না, হওয়া উচিতও নয়।

গল্প ও কবিতার ভবিতব্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হবে, বর্তমান নিবন্ধকারের এটাই বিশ্বাস।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছোট গল্প বা কবিতা বা সাহিত্যের অন্যান্য যে কোন শাখার দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন মনে হয় তেলহীন প্রদীপে সলতে টেনে টেনে তার দীপ্তি ধরার চেষ্টা চলছে। যদিও জানি এধরনের উক্তিতে ইষ্টক বৃষ্টির মধ্যেই পড়তে হবে তবু উক্তিটির গুরুত্ব কখনোই মলিন হয় না। কবিতার কথাই ধরা যাক। সংখ্যাগরিষ্ঠ কবিকুলকে (?) ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য বোধ করি আজ টিয়ার গ্যাসেরও নেই! পাঠক তো কোন ছাড়। অথচ ঠেকিয়ে রাখার বা ধাতস্থ হতে দেবার প্রয়োজন এই কারণে যে কবিতা আর যাই হোক আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব নয়। কল্লোল যুগের আন্দোলনকারী কবিরা নিছক আন্দোলনই করেছিলেন। আসলে কবিতা ব্যক্তি চেতনারই ফলশ্রুতি। আন্দোলনের দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু কিছু মিরাক্যল বা ম্যাজিক ঘটান সম্ভব হতে পারে, সাময়িকভাবে পাঠককুলকে বিভ্রান্ত বা বিমূঢ় করা চলতে পারে, কিন্তু মিরাক্যল যে কবিতা নয় একথা কবিরাও অস্বীকার করতে পারেন না। দেখা যাচ্ছে একালে কবিরা সংখ্যায় অগণ্য হয়ে (মুষ্টিমেয় দু'একজন বাদে) একটা ডামাডোল রচনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ফলে জাত কবিরা ভীড়ের মাঝে কখনো বা হারিয়ে যাচ্ছেন। আশার কথা জাত কবি বলতে যাদের কথা এই মুহূর্তে স্মরণে আসছে তারা সংখ্যায় অল্প হলেও আছেন, এবং কখনো বা তাদের শিল্পকর্মে কবিতার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা যাচ্ছে।

আবার ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে আগাছার আধিক্য দেখা যাচ্ছে। সদৃশ্য মোরকে ঢেকে নূতন রীতির ট্রেডমার্ক দিয়ে যাই কিছু চালান হচ্ছে তা গল্প নয়। তবে গল্প লেখকরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় কবিদের কাব্য আন্দোলনের মত এখনো এরা গল্প-সম্মেলন ইত্যাদি করে বিষয়টাকে তুঙ্গি করে তুলতে পারেন নি। গল্প লেখকদের দায়িত্ব বোধ এই দিক থেকে কবিদের তুলনায় অনেক বেশি বলে মনে হওয়াও অযৌক্তিক নয়।

দায়িত্ববোধের কথা এই জন্য আসে যে স্বাধীনতার পরবর্তী মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হতে চলেছে। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র বহির্জগতের পরিবর্তন নয়, আমাদের অন্তর্জগতও দ্রুত পুরানো ধ্যান-ধারণা-বোধ ইত্যাদি বর্জন করে নবতর সাজসজ্জায় সজ্জিত হতে চলেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের সাহিত্যের মধ্যে অবশ্যই পড়বে সন্দেহ নেই। ফলে একদিকে আন্দোলনের নামে অসংলগ্নতা যেমন অবশ্যম্ভাবী অপর দিকে তেমনি সৎ এবং সুস্থ প্রচেষ্টারও ইঙ্গিত বহন করছে কেউ কেউ। গল্পলেখক হিসেবে এ কথা বলতে পারি পরিবর্তনের চিহ্নগুলি কবিদের মধ্যে যত না বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছে ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে তার তুলনায় অনেক বেশি প্রবল। আবার একথাও ঠিক ছোট-গল্পের এই পরিবর্তন অনেক বেশি কাব্য ঘেষা। অর্থাৎ গল্প আজ অধিকমাত্রায় কাব্যগুণ-সম্পন্ন হয়ে উঠবার জন্য উন্মুখ। ছোটগল্প আজ তার যান্ত্রিকতা মুক্ত হবার জন্য মোটা ও ভারী কথার কৌলিন্য ছেড়ে সূক্ষ্মতার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত।

ইতিহাসের বিচারে কবিতা ছোটগল্পেরও বহু পূর্বেকার আবিষ্কার। মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে চিরস্থায়ী করার মাধ্যম হিসেবে কবিতা রচনায় হাত দেয়। পরবর্তী কালে গদ্য এসে কবিতার যান্ত্রিক বন্ধনগুলো ভেঙে ফেলতে শুরু করে। ফলে গল্প এবং কবিতা দুই মোরকের সামগ্রী হয়ে ওঠে। আমরা জানি এই সেদিনও রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখলেন কবিতার মাধ্যমে আবার কবিতাও লিখলেন গল্পের মাধ্যমে। সত্যেন দত্তের পাল্কির গান গল্প না কবিতা? কবিতা বলতেই অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু গল্প করলেই বা ক্ষতি কি? —একটা পাল্কি চলেছে, ছয় চেহারায় তাদের প্রাণ স্পন্দন দিয়ে বয়ে চলে চলেছে, পথের অভিজ্ঞতা তাদের সঞ্চয়, তারা চলতে চলতে গগনতলে যখন সূর্য ঢলল তখন শ্রান্ত ক্লান্ত, তাদের সামনে তখন শূন্য ছাড়া কিছুই নেই। হ্যাঁ গল্প বৈ কি!

কিন্তু এমন ধরনের কবিতা লেখার রেওয়াজ রবীন্দ্র-যুগেই উঠে যেতে শুরু করেছিল। স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন হল না কবিতার। কবিতা এই হিসেবে ছোটগল্পের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত শিল্প। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী কালের কবিদের যদিও বা কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে তা এতই নগণ্য মনে হয় যে চোখে পড়ার কথা নয়। গল্পকারদের গল্পের পরিবর্তনটাই বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে কবিতার যা পরিবর্তন তা রবীন্দ্রনাথের পর থেকে ধীরে ধীরে ঘটে আসছে। কবিতায় এখন কাহিনী বর্ণনা রীতি কল্পনাই করা দুরূহ, কবিতা এখন কেবলমাত্র ছন্দোবন্ধ পদ্যের মধ্যেও সীমাবন্ধ নেই, ছন্দোবন্ধ গদ্যকেও আশ্রয় করে তার অনুভূতি এখন পাঠকের কাছে মন্ত্রের স্পর্শ আনবার চেষ্টা করছে। এপ্রসঙ্গে বিমল করের উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'প্রকৃতপক্ষে কবিতা এক ধরনের মন্ত্র উক্তিই। কারণ কবিতায় যে আত্মস্থতা, শক্তি, আকর্ষণ, মায়ামণ্ডল; কাব্যে যে সত্য ও গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ মন্ত্রেও সেই গুণাবলীই দেখা যায়।'

নিঃসন্দেহে কবিতা এখন অন্তর্মুখী, ফলে অনুভূতি প্রধান। এখন কবিতার অনুভূতি 'জলের কম্পনের মত' বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে ছড়িয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ কবিতা এখন সূক্ষ্ম ও শুদ্ধতার দ্বারা সিক্ত। এবং আজকে এই শুদ্ধাচারী কবির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হলেও এরা যোগ্য উত্তরসূরী সন্দেহ নেই।

কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের পরিবর্তনটা অবশ্যই বিস্ময়কর। গল্পখোড়রা হতাশ হবেন সন্দেহ কি! গল্পখোড়দের জন্য গল্প না লেখার দুঃসাহস

একালের ছোটগল্পকারদের বলিষ্ঠ বিদ্রোহ। আজ ছোটগল্প চরিত্রগত ভাবেই কবিতার মত অন্তর্মুখী, একজাতীয় আত্মজিজ্ঞাসার নামান্তর। আজকের গল্পের নিয়মাবলী পাল্টে গিয়ে অনেক বেশি সাবজেকটিভ হয়ে উঠেছে। যেন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল। আজ প্রধানত গল্পের বিষয়, নিঃসঙ্গতা, নিরালম্বনতা, ব্যক্তি চরিত্রের হতাশা, ঈশ্বর প্রকৃতি বা নিয়তির ব্যাখ্যা রচনা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলির কিছু কিছু ভিন্নতর যুগেও গল্পকারদের নাড়া দিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এবং ভিন্নতর এমন ভঙ্গিতে ইতিপূর্বে যে হয় নি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই বিষয়গুলির সমস্যাই হচ্ছে এই যে লেখককে অধিকমাত্রায় কাব্যপ্রবণ হয়ে উঠতে হবেই। কবিতার মতই তিনিও এক বিশেষ চেতনায় পেঁছিতে পারলে খুশি হবেন। ফলে, তেমন গল্পে বা তেমন কবিতায় আজ বড় একটা তফাৎ থাকার কথা নয়।

অর্থাৎ কোনটা ছোটগল্প হয়ে উঠছে কোনটা কবিতা তা নির্ভর করছে গল্পলেখকরা বা কবিরা কোন বিষয় নিয়ে শিল্পকর্ম করতে বসেছেন। যদি দেখা যায় মানুষের বিশেষ এক অনুভূতির কথাই প্রধান তা হলে কবিরা তা যে ভাষাতেই লিখবার চেষ্টা করুন না কেন তা এমন এক জায়গায় এসে পেঁছিতে চাইছেন।

অর্থাৎ কবিরা যেমন আজকের দিনে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতার দিকে যাবার জন্য ব্যস্ত গল্পলেখকরাও তাদের গল্পের মালমশলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই সূক্ষ্ম বিন্দুর দিকেই অগ্রসর হবার জন্য। সূক্ষ্মতায় যিনি পেঁছিতে পারছেন তার শিল্পকর্মকে গল্প বা কবিতা বলে পৃথক করা দুষ্কর হয়ে পড়বেই। সমস্ত সার্থক শিল্পকর্মেরই বোধ হয় এই এক চমক—ছোট ছোট গণ্ডির আগল ভেঙে সে নতুন কিছু হয়ে উঠতে চায়। তাই কোন ছোটগল্প যদি তার চেহারার গণ্ডি ভেঙে কখনো বা কবিতার স্বাদ বহন করে বা কবিতা কোন ছোটগল্পের তা হলে আমাদের হতাশ হবার কিছু মাত্র কারণ দেখি না।

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেবারের শীতে আমরা ব্যানার্জিবাবুকে পেয়ে গেলুম, একটা মেয়েছেলে যোগাড় করে দিন না, ব্যানার্জিবাবু? বিকেলে ব্যানার্জিবাবু আমাদের ছেড়ে এগিয়ে যান স্টেশন-ইয়ার্ডের দিকে যেখানে কিছু কুলিকামিন কাঠ-চেরাইএর কাজ করছিল।

সর্দারকে ব্যানার্জিবাবু,—আচ্ছা এখানে মজুর পাওয়া যায়?

সর্দার,—কাম কুথা হোবেক বাবু?

ব্যানার্জিবাবু, হাত তুলে,—ঐ ডাকবাংলোয় কাম হবে।

সর্দার,—কুলি দেড় রুপিয়া বাবু।

ব্যানার্জিবাবু গলা খাটো করে,—আর কামিন?

সর্দার,—কামিন এক রুপিয়া বাবু।

ব্যানার্জিবাবু,—এক রুপিয়া? একটু ভেবে,—ঠিক আছে! কামিনই রাখব।

সর্দার,—কী কাম করতে হোবেক বাবু?

একেবারে অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ বিষম রেগে গেলেন ব্যানার্জিবাবু, যেন ফেটে পড়লেন রাগে।

ব্যানার্জিবাবু, কেঁপে উঠে,—সব কাম করতে হবে, চিৎকার করে,—হাঁ, সব কাম! মাটিতে স্টিক ঠুকে,—সব, সব কাম!!

তাঁর চড়া গলা শুনে সর্দার চমকে ওঠে, আমরা হাসি চাপি ও উপস্থিত সাঁওতাল রমণীরা মুখ তুলে তাকায়।

ব্যানার্জিবাবু,—কাল চলে যাচ্ছেন শুনলুম?

—হ্যাঁ, কাল।

—ভোরের গাড়িতে?

—হ্যাঁ, ভোরের গাড়িতে। কিন্তু, আমরা জানাই,—আজ রাতটা আছি। .

ব্যানর্জিবাবু, টেবল থেকে একটা গ্লাস ছোঁ মেরে তুলে ধ'রে,—দ্য নাইট ইজ ইয়াং!

—দ্য নাইট ইজ ইয়াং, দ্য নাইট ইজ ইয়াং...সমস্বরে বলতে বলতে সোনার নদীর মত আমরা ভেসে যাই ব্যানার্জিবাবুর দিকে, সহাস্যে, চুমুক দিতে দিতে।

ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি, সঙ্গে ব্যানার্জিবাবু। পথে পড়ে ভাটিখানা। সেটা ছেড়ে আরো কিছুটা এগিয়ে আমরা একদল উজ্জ্বল মাতাল আগে আগে যাচ্ছে দেখতে পাই।

সহসা, ব্যানার্জিবাবু,—কুতা তেন হিজুতানা, হেএই!

তোদের গাঁ কোথায় রে।

তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা তাদের কাছাকাছি পেঁাছে যাই। তারা যাবে বুরুডি। আমরা কদ্দুর?

আমরাও যেতে পারি বুরুডি, ব্যানার্জিবাবু তাদের বলেন। যেতে যেতে আর একটা ভাটিখানা পড়ে। সেখানে আমরা সবাই বসি।

সেখানে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

আমরা আবার বুরুডির পথ ধরি।

ব্যানার্জিবাবু, একজনকে,—তা তোদের গাঁয়ে যে যাচ্ছি, ওখানে মুর্গি পাওয়া যাবে?

—হাঁ! কেনো যাবেক নাই বাবু?

—বটে! আর মদ? দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে অবিশ্বাসীর মৃদু হাসি হাসতে থাকেন ব্যানার্জিবাবু।

মদ পাওয়া যাবে।

—আর মেয়এ ছেলে? হৈ হৈ করে হেসে ওঠেন ব্যানার্জিবাবু, 'মেয়েছেলে, অ্যাঁ, মেয়েছেলেও পাওয়া যায় নাকি,' দম ফেটে টুকরো হয়ে যেতে যেতে,—মেয়েঃ, মেয়েঃ, মেয়ে-ছেলেও পাওয়া যায় নাকি বাবা তোদের গায়ে? এরে সমারু, একজনের পেটে স্টিকের খোঁচা মেরে,—মেয়েছেলেও পাওয়া যায়? ওওওওহোঃহোঃহোঃহোঃহোঃহোঃ।

যেতে যেতে বুরুডির পথ জুড়ে বিশাল চাঁদ উঠতে থাকে, অন্ধকার থেকে চকচকিয়ে উঠতে থাকে, তাঁর, ব্যানার্জিবাবুর দাঁতের সোনা।

ছোটগল্প ও কবিতা কাছাকাছি চলে আসছে নাকি? আমি খবর রাখি না। স্টেটস্-

ম্যান পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিজনের রক্তমাংস থেকে আমি কোনো গল্প লিখিনি। অনেকেরই লেখা পড়েছি কিন্তু আমি কারো, কোনো, কখনো, গল্প পড়িনি। একদিন ভোরবেলা বেসিনে রক্তবমি করছি দেখে ২।১ দিনের মধ্যেই আমি বিজনের রক্তমাংস লিখতে বসে যাই, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী লিখি একটা মেয়েকে নিয়ে, পুরীতেই চেনা হয়েছিল, তার নামও ছিল মায়া। হুবহু ঐ-রকম ঘটেছিল, ঐ ভাষায়। আমার পিশতুতো দাদার নাম ছিল বিশ্বনাথ, মীরাবাঈ-এর বিশেদা, একদিন জালের ধারে ওদের ঐ অবস্থায় দেখেছিলুম। একবার একটা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম, সেই নিয়ে লিখেছিলুম দশ বছর পরে একদিন, বদ্যিবাটিকে শ্রীরামপুর ও শকুন্তলাকে মনিমালা করার অপরাধে ওটা যদি গল্প হয়ে গিয়ে থাকে, মনে করি কিছুটা হয়েছেও, তাহলে ওরকম আর কখনো করব না।

অতএব, আমার লেখা, যা আদৌ গল্প নয়, তা কেন ও কী-উপায়ে তার কাছাকাছি চলে যাবে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যা কবিতা?

তা ছাড়া কোনটা গদ্য কোনটা পদ্য, বুঝব কী করে, এ কি সম্ভব নাকি বোঝা কোনটা কী! ছেলেবেলা থেকে রূপনারায়ণের কুলে আমি প্রোজ হিশেবে পড়ে আসছি, জীবনানন্দের সুদীর্ঘ কবিতাগুলো আমাদের সকলেরই মনে হয় উপন্যাস, সমুদ্র ও বাতাসের বিরুদ্ধে লাল বলের ওপর এক-পা তুলে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে টাড্‌জিউ—"এর চেয়ে বেশি কবিতা কখনো পড়িনি", এ-কথা আমাকে এক কবির বাবা বলেছিলেন।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক সাহিত্য

বাঙালী সাহিত্যসেবকদের এক স্থায়ী দায়িত্ব রবীন্দ্রকাব্যের প্রচার এবং ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবধান পেরিয়ে তা পৌঁছিয়ে দেওয়া সমস্ত পৃথিবীর সুধী সমাজে। আর তার প্রকৃষ্ট উপায় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ। ইংরাজীতে অনুবাদই অবশ্য প্রথম ও সবচেয়ে গুরুপূর্ণ ধাপ। সুখের বিষয় অনেক কাব্যপ্রাণ উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ইংরাজিদক্ষতার শীর্ষে পৌঁছাবার যে ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাতে এ ক্ষেত্রে যে তাঁরা স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হতে পারবেন এমন আশা করা অন্যায় নয়।

সব রকমের কাব্যানুবাদই শক্ত, নানা সমস্যায় পূর্ণ। সে সব কথা অনেক আলোচিত, অনেকেই জানেন—তার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান স্প্যানিশ কাব্য-সংকলন পৃথিবীর বাজারে চলেছে গদ্য অনুবাদ ভিত্তি করে, ছন্দোবন্ধের দায়িত্ব এড়িয়ে প্রধানতঃ নিখুঁত অর্থব্যঞ্জনার উপর নির্ভর করে আবার কখনো কখনো কোনো কোনো কবিকে তাঁর মূল ভাবস্পন্দ ছন্দঝঙ্কার ব্যক্তিগত রীতি মেজাজসমেত বিশ্বের দরবারে হাজির করবার চেষ্টাও যে হয় নি তা নয়। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়াই যায় যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ হয়েছে অনেক কম। মনে পড়ছে একদা ম্যালার্মের ইংরাজি অনুবাদের এক সঙ্কলন দেখেছিলুম। মনে হয়েছিল তা' মূল কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা স্থাপন করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদ আরো সমস্যাজটিল। কোনো এক আধটি কবিতা বা কোনো এক বিশেষ ধরনের কবিতা হলেও কথা ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্য যদি হয় সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রকাব্যের একটা আস্বাদ হাজির করা—তাহলে সেই দায়িত্বের গুরুত্ব অনেক অনুবাদককে নিরুৎসাহ করবে। বৈচিত্র্যের যতরকম উৎস আছে সবই মিলেছে রবীন্দ্রনাথে। কাব্যশিল্পের যত রকমের শাখা বা প্রকরণ আছে সবক্ষেত্রেই তাঁর সফল হস্তক্ষেপ ঘটেছে। নানা ধরনের হ্রস্ব-দীর্ঘ লিরিক, ওড্ এলিজি সনেট, দীর্ঘ আত্মজীবনীমূলক বা স্মৃতিচারী কবিতা, সাময়িক এবং তত্ত্বভাবনাময় দার্শনিক কবিতা ত' আছেই, তা ছাড়া অভিজ্ঞতার মেজাজ বা স্তর হিসাবেও কত বৈচিত্র্য! একই সময় বিভিন্ন স্তরে তাঁর বিচরণ, আবার জীবনের কালগত পরিণামেও তাঁর অভিজ্ঞতার বিচিত্র বিবর্তন। লঘু গুরু ঘরোয়া আধুনিক সামাজিক বাস্তবপর্শী ঊর্ধ্বগগনবিহারী উচ্চচিন্তাউজ্জ্বল ঋষিকণ্ঠগম্ভীর এমন কত যে আলাদা চেষ্টা ও সিদ্ধির ছাপ পড়েছে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে তার তালিকা তৈরী করা প্রচুর পরিশ্রমের কাজ। তাছাড়া লিখেছেন কাহিনী, কাব্যনাট্য। ভাষাব্যবহারে, ছন্দ ব্যবহারের রকমারিই বা কত। এই অসংখ্য ভেদবৈচিত্র্যের মধ্যেও পাঠকের দাবী হবে এই যে মূল কবিসত্তা, কবিকণ্ঠ, কবিচরিত্র যেন চিনে নেওয়া যায়। চিনে নেওয়া যে যায় তা বাঙালী রসিক পাঠকরা জানেন! রবীন্দ্রকাব্য পাঠে সেই তাঁদের অবিসম্বাদিত প্রথম বোধাস্বাদ। এই সব প্রত্যাশা ও দায়িত্বের কথা চিন্তা করে অতি যোগ্য অনুবাদকরাও যদি হাত গুটোন বা শুধু যথার্থ (অর্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে) ভাষান্তরেরই পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন তবে দোষ দেওয়া যায় না।

আবার অপরপক্ষে এই কাজের দুরূহতাকেই নেওয়া যায় একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে।

এ শুধু একটা আন্তর্ভাষিক কর্তব্যসাধন নয়, এ এমন এক ধরনের কাব্যতত্ত্বচর্চার সুযোগ যার বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি বিশেষ কবিতার রস মেজাজ আবেগকম্পন চলনকৌশল ঠিক কেমন, কোথায় কতটুকু তার মিল স্বদেশী বিদেশী অন্যান্য কবির সঙ্গে অথচ তা একেবারে অবিসম্বাদিতভাবে রাবীন্দ্রিক—তা দেখিয়ে দেওয়ার এই এক্সপেরিমেন্ট। অন্ততঃ তাই হ'তে পারে। সমালোচনার অনেক বিশ্লেষণে ও ভাষাচিত্রণে যা বোঝানো যায় না অনেক সময় তা এই ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে ফোটানো যায়। সবটা না পারলেও খানিকটা আদল আনা যায় এবং তখন যা ফোটানো গেল না তার উপর দৃষ্টি পড়ে, সৃষ্টির সেই বৈশিষ্ট্য আরো ভালো ক'রে অনুধাবন করবার সুযোগ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমের, হৃদয়নিবেদনের, আস্পৃহার, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সংবেদনের কবিতা যে শেলির মত, কীট্সের মত হ'য়েও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁর সনেটের মধ্যে সত্যার্থ আবিষ্কার ও ঘোষণা যে মিলটন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অনুরূপ সনেটের সঙ্গে তুলনীয় হয়েও কত আলাদা, তাঁর দার্শনিক চিন্তনের কবিতাগুলিতেও যে একটা বিশেষ স্তরের চেতনার রঙ সেগুলিকে সাহিত্যিক ধ্রুবত্ব দিয়েছে—এইসব ফুটিয়ে তোলবার একটা (হয়তো অসম্ভব) উচ্চাশা অনুবাদককে দীর্ঘ সাধনায় নিযুক্ত ক'রে রাখতে পারে, বিশেষত যদি অনুবাদকের নিজের সত্যকার রবীন্দ্র-অন্তর্গামিতা থাকে, এবং ইংরাজি কবিতা রচনা চেষ্টার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জ্ঞান ও কলানৈপুণ্যে অধিকার থাকে।

একথা স্বীকার করতে হবে যে সম্প্রতি হুমায়ুন কবিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত *One Hundred and One* গ্রন্থে কতকগুলি বিশেষ সুযোগসুবিধার সংযোগ ঘটেছে। এর আগে Tagore Commemorative Volume Societyর পৃষ্ঠপোষকতায় ও অধ্যাপক কবিরের সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সঙ্কলন *Towards Universal Man* প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কাজে যে আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তার সমস্তটা ব্যয় হয় নি। সেই অর্থেই এই কাব্যসঙ্কলন প্রচেষ্টা। এই একশো এক কবিতায় রবীন্দ্র-কাব্যসম্ভারের একটা সর্বাবয়ব আভাসন যে অসম্ভব তা সম্পাদক জানেন, আর যে সব অনুবাদককে অনুবাদের ভার দেওয়া হয়েছিল দায়িত্বসীমা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা স্বভাবতই বিভিন্ন, আক্ষরিক অর্থসঞ্চারণ থেকে উচ্চ সূক্ষ্ম আকৃতির নবরূপায়ণ চেষ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্পাদক এই বিভিন্ন ধারণাকে অনেকটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, তা স্বীকারই করেছেন। এর ফলে হ'তে পারতো একটা অবাঞ্ছিত রকমারি ও চাকচিক্য—যা মেলার প্রদর্শনীতে দেখা যায়। তা না হ'য়ে এই সঙ্কলনের একটি উচ্চকৃতিত্বমান যে রক্ষিত হয়েছে তার কারণ অনুবাদক নির্বাচন। যাঁরা এই কাজ করতে আহূত হয়েছেন তাঁদের সকলেরই ইংরাজি ভাষা ভাব কাব্যছন্দের উপর যথেষ্ট অধিকার আছে এবং আছে রবীন্দ্রকাব্যে সহজ-বিচরণ ও গভীরপ্রবেশের ক্ষমতা।

বয়স হিসাবে বা প্রকাশকাল হিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে শেষলেখা পর্যন্ত কবিতার নমুনা গ্রহণ করা হ'য়েছে। প্রতি পর্যায়ে কোন কবিতা শ্রেষ্ঠ তা নির্ধারণ করা অসম্ভব, কিন্তু কোন কবিতা রসবৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবেশনযোগ্য সেইদিক থেকেই মনে হয় বিচার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পুনশ্চ কাব্যের নানা ধরনের কাহিনী কিম্বা মুক্ত জনজীবন প্রকৃতি-জীবনের আলেখ্য থেকে কিছু না নিয়ে বরং যা পুনশ্চের ভাবপরিবেশে অনেকটা অসঙ্গ (শ্যামলীতে বরং মানাতো)—সেই রূপক ধরনের কবিতা 'চিররূপের বাণী'র নির্বাচন—যার অনুবাদ করা হ'য়েছে The Voice of Eternal Form এই নামে।

এই নির্বাচন সম্বন্ধে মতবিরোধ সম্ভব এবং প্রত্যাশিত। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে এমন অনেক ধরনের কবিতা উপস্থিত করা হয়েছে যা বিদেশী পাঠকমহলে অজানা ছিল। যেমন ধরা যাক শিশুদের জন্য লেখা কবিতা, হালকারসের কবিতা, ব্যঙ্গ ও উদ্ভট-রসের কবিতা। এই ধরনের কিছু কবিতা অতি নিপুণভাবে ভাষান্তরিত হয়েছে। যথা The Hero (বীরপুরুষ), Sunday (রবিবার), A Strange Dream (একদিন রাতে আমি) The Wise One, The Invention of Shoes (জুতা আবিষ্কার) ইত্যাদি। আবার ক্ষণিকা থেকে The Right Place (যথাস্থান), False Alarm (বিদায়রীতি), Krishnakali (কৃষ্ণকলি), শেষ সপ্তক থেকে The Casual (আমার ফুলবাগানের) প্রভৃতি কবিতা। এই কবিতাগুলিতে শুধু অর্থ নয়, কবির সকৌতুক অথচ সুস্থ শুদ্ধ বুদ্ধি-উজ্জ্বল সহজ-হৃদ্য সৌজন্যমধুর কণ্ঠের আভাসও কিছুটা যেন উত্তীর্ণ হ'য়েছে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্য ও কাব্যনাটিকার আস্বাদ পৌঁছে দেওয়াও একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলি—যা সাহিত্যে অতুলনীয়, অন্তত ঐ ধরনের কোনো কবিতার চেয়েই মর্যাদায় কম নয়, তার কি পরিচয় পেয়েছে অন্য ভাষাভাষীরা? এই কবিতাগুলির ধাবমান ছন্দঃপ্রবাহের ইন্দ্রজাল দুর্বলতা তো নয়ই, বরং তা এক অনন্য কীর্তি। নাটকীয় পরিস্থিতি, উৎক্ষেপ, ভাবপরিবর্তনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর ও তাল বদল স্বীকার ক'রে তা প্রথম থেকে শেষ এমন অভঙ্গ উদ্যমে অগ্রসর হ'য়ে এক গাঢ়মুহূর্তে শেষ হয় যে তার কৌশল (যদি কৌশলই বলি) মনে হয় কোনো দিব্যপ্রভাবজাত। কাজেই অনুবাদকদের উৎসাহ এদিকে তেমন অগ্রসর হয় নি। আর পলাতকা পুনশ্চ শ্যামলীতে গদ্যছন্দে যে সব কাহিনীকাব্য রচিত হয়েছে তার ভাবমার্জনা ও চিন্তার শোধন এত সূক্ষ্ম যে তাও হয়তো সেইজন্যেই অনুবাদকদের আকৃষ্ট করে নি। অথচ এ রাজ্যেও রবীন্দ্রনাথের দান—ক্রমশই তা সর্বত্রই স্বীকৃত হবে—ব্রাউনিং-এর শিল্প-রাজ্য থেকে কত অগ্রসর! অপ্রতিযোগ মহিমায় তা বিরাজ করছে।

এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে কথা ও কাহিনীর ব্রাহ্মণ, যার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আগেই রবীন্দ্রনাথ নিজে করেছিলেন এবং ভালোই হয়েছিল; দেবতার গ্রাস; নরকবাস নাটিকা; কর্ণকুন্তী নাটিকা যার অতি চমৎকার ইংরাজিরূপ রবীন্দ্রনাথ আগেই দিয়েছিলেন; তা ছাড়া পলাতকার ফাঁকি; পুনশ্চ থেকে প্রথম পূজা।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদে কবিতাটির ভাবনির্যাস সঞ্চিত হয়েছে কিন্তু তার সমস্ত অবয়বের প্রতিফলন হয় নি। হীরেন মুখোপাধ্যায় সেই চেষ্টা করেছেন, এবং আমার মনে হয়, এক এক জায়গায় ভাবগম্ভীরতার মাপে একটু কম পড়লেও, এই চেষ্টা অনেক পরিমাণে মূলানুগামী এবং সার্থক হ'য়েছে।

বাক্‌সংযম ও মনন অনুভবনের সূক্ষ্মতা বজায় রেখে সোমনাথ মৈত্র কৃত পুনশ্চর প্রথম পূজার অনুবাদ The First Worshipকেও একটা বিশিষ্ট কৃতিত্ব হিসাবে স্বীকার করতে হয়। মণিকা বর্মা কৃত ফাঁকির অনুবাদ The Deception প্রশংসাযোগ্য। শুধু এতে একটি বিপত্তি চোখে পড়ল, আশা করি তা ছাপারই ভুল। বাংলায় যেখানে আছে 'সেই দু'মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি', এবং যে বাকির কথাই 'ফাঁকি' নাম জুগিয়েছে কবিতাটিকে, সেই-খানে ইংরাজিতে দেখছি 'there was no great got', 'no' না 'a'? সম্পাদক পরবর্তী সংস্করণে আশা করি বিদেশীর কাছে বিভ্রান্তিজনক এই ভুল দূর করবেন।

রবীন্দ্রনাথের আবেগতরঙ্গায়িত কাহিনী বা নাটকের একটা বিশেষত্ব এই যে এর

উচ্ছ্বাস চারিত্র ও তাৎক্ষণিক অনুভূতির নিছক সত্যতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বাস অর্জন করে ও উপযুক্ত মাত্রামান নিয়ে আবির্ভূত হয়। কি নাটকীয় উচ্চারণে কি লিরিক আকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার রচনা কখনো তাঁর অন্তরের ঘটনাকে ছাড়িয়ে শুধু বাগ্মিতার আকাশে অসহায় পাখীর পাখাঝটপটানি তোলে না। কোনোরকমের কল্পনার ফিকে কুয়াশাব্যাপ্তি, অনুভবের এলিয়ে যাওয়া কর্দমগলন, অযথা ভাবাবেগ স্ফীতি—ইত্যাদি যে সব দোষ ভিক্টোরীয় কাব্যকে আক্রমণ করে রুগ্ন করে তুলেছিল—তার কিছু রবীন্দ্রকাব্যে নেই। এক সময়ে কোনো কোনো বাঙালী সমালোচক রবীন্দ্রনাথে অলঙ্কারবহুলতা, অতিবাচন ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। অতি প্রবল ও দূরাভিসারী ভাবস্পন্দের মধ্যেও এক তীক্ষ্ন সদাজাগ্রত সত্যচেতনার অনলস বিদ্যুৎ-প্রবাহ কেমন করে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘতম মেঘযাত্রাকেও লুটিয়ে পড়া ফিকে হ'য়ে যাওয়া ঘুমিয়ে পড়া থেকে জাগ্রত রেখে দেয় তা তাঁদের লক্ষ্য করতে বলি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব কবিরই এই heaven ও home, উচ্চগগন ও কঠিন ভূতলের বাস্তবতার মিলনসাধনের ক্ষমতা দেখা গিয়েছে। উদাহরণ হোমর, মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। রবীন্দ্রনাথের এই শক্তির বিশেষ প্রকাশ কাহিনীকাব্যে ও কাব্য-নাট্যে। সেইটে না বুঝলে এই ধরনের লেখা ইংরাজিতে অনুবাদ করতে যাওয়া ব্যর্থশ্রম হত।

সুখের বিষয় বর্তমান অনুবাদকরা এ বিষয়ে সচেতন। হীরেন মুখোপাধ্যায়ের The Lord's Debt (দেবতার গ্রাস), ভবানী ভট্টাচার্যের A Sojourn in Hell (নরকবাস) ও হুমায়ুন কবিরের Karna and Kunti এই হিসাবে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কর্ণকুন্তীর বর্তমান অনুবাদ রবীন্দ্র-অনুবাদের চেয়ে অনেক বেশী মূলানুবর্তী, অথচ এর নাট্য ও কাব্যগুণ কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের নানা রসের কবিতা ও গানের একটি পসরা বর্তমান আয়োজকরা উপস্থিত করেছেন। এ বিষয়েও এঁরা যা শক্ত তা বর্জন না ক'রে বরং তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। এই পর্যায়ে অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্বের নিদর্শন এক আধটি বাদে প্রায় সবগুলিকেই বলা যায়। তার মধ্যেও বিশেষ উল্লেখের দাবী করে এইগুলি : অনন্ত প্রেম (Infinitive Love)—বুদ্ধদেব বসু, নিরুদ্দেশ যাত্রা (Destination Unknown)—হুমায়ুন কবির, জীবনদেবতা (Lord of my Life)—অমিয় চক্রবর্তী, রাত্রে ও প্রভাতে (Last Night and This Morning)—চিদানন্দ দাশগুপ্ত, শেষ বসন্ত (The Last Spring)—সমর সেন, বর্ষার দিনে (On a Rainy Day)—চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হৃদয়যমুনা (My Heart is like a River)—চিদানন্দ দাশগুপ্ত, শুভক্ষণ (Golden Moment)—ক্ষিতিশ রায়, উর্বশী—জে. সি. ঘোষ, দুঃসময় (Bad Times)—হীরেন মুখোপাধ্যায়, আবর্তন (The Eternal Cycle)—ভবানী ভট্টাচার্য, বৈশাখ (Summer)—হুমায়ুন কবির, তব দক্ষিণ হাতের পরশ (All that Remains) ও এসেছিলে তবু আসো নাই (Of Two Minds) —আবু সয়ীদ আইয়ুব।

চিদানন্দ দাশগুপ্তের সূক্ষ্ম cadence সৃষ্টির ক্ষমতা ও ক্ষিতীশ রায়, হীরেন মুখোপাধ্যায় ও ভবানী ভট্টাচার্যের মূল ছন্দের অনুরূপ ছন্দস্পন্দ সৃষ্টির ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা না করে পারছি না। জে. সি. ঘোষকে মনে হয় একটু ক্লাসিক্যাল মেজাজের লোক; নিষ্ফল কামনা (Vain Desire) কবিতাটির নাটকীয় উগ্রতা (উগ্রতা বলেই মনে হয়েছে) একটু মোলায়েম করে নিয়েছেন সামনাসামনি প্রেয়সীকে সম্বোধনের পরিবর্তে অধম পুরুষের ব্যবহার করে। উর্বশী কবিতারও আবেগ উচ্ছ্বলতা খানিকটা সংযত কাঠিন্যের মধ্যে বন্দী

ক'রেছেন তিনি তাঁর ইংরাজি ছন্দে। কিন্তু মেজাজের এই তফাৎ সত্ত্বেও দুটি কবিতাই বিদেশী পাঠককে তৃপ্ত করবে মনে হয়।

সমান প্রশংসা করা যায় আরো কয়েকটি দীর্ঘ দুরূহ ও প্রসিদ্ধ কবিতার অনুবাদকে, যথা আফ্রিকা—চিদানন্দ দাশগুপ্ত, ওরা কাজ করে—হীরেন মুখোপাধ্যায়, ঐকতান—অমলেন্দু দাশগুপ্ত, তুমি কি কেবলি ছবি—অমিয় চক্রবর্তী, শাজাহান—ক্ষিতীশ রায়, আমি (This I) —মণিকা বর্মা। তালিকা করে অন্যান্য কবিতাও বর্ণনা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একশো একটি কবিতার বিশ্লেষণের স্থান এ প্রবন্ধে নেই। তবে কয়েকটি বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা—যা রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের এক একটা দিক্ উন্মোচন করেছে এবং তাঁর কাব্যজীবন বিবর্তনের এক একটা স্থায়ী নিদর্শন ব'লে যেগুলিকে মনে করা হয়—তাদের কথা বলতেই হবে। এইগুলিকে অনুবাদ করবার সাহস সঞ্চয় করাই তো একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এই কবিতাগুলি হ'ল মেঘদূত (The Cloud Messenger)—অমলেন্দু বসু, যেতে নাহি দিব (I Will Not Let You Go)—হুমায়ুন কবির, এবার ফিরাও মোরে (Call Me to Work)—হুমায়ুন কবির, পৃথিবী (The Earth)—তারক সেন। এর মধ্যে মেঘদূত ও পৃথিবী সম্বন্ধে বলা যায় যে অর্থব্যঞ্জনা চমৎকার ফুটেছে অনুবাদে, মূল ছন্দ ও ভাব পরিবেশের একটা মোটামুটি দোলাও পোঁছেছে। কিন্তু ভাবও ত আবেগের বদল, উত্থানপতন, সূক্ষ্ম nuanceগুলির প্রতিফলনের চেষ্টা অনুবাদকরা করেন নি। আর এই দিক থেকে দেখলে বলতে হবে—যেতে নাহি দিব আর এবার ফিরাও মোরে—এই দুটি কবিতার জীবন্ত রূপান্তরণের কাজে হুমায়ুন কবির অসাধ্যসাধন করেছেন। এই দুটির মধ্য দিয়ে শুধু অর্থ ও ছন্দের আভাস নয়। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রেরণার অনেক বেশী ইসারা পোঁচেছে।

প্রান্তিক থেকে একেবারে শেষের দিকের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার একটা নূতন রূপ দেখা যায়। নিরাসক্তির বিস্তার একটা অশাসিত সমুদ্রের মত নিজের অস্তিত্ব-আন্দোলন নিয়ে উপস্থিত, একটা নৈর্ব্যক্তিক অনন্তের মধ্যে সদ্যোজাতের চিৎস্পন্দন নিয়ে উপস্থিত দেখা যায় যেন কেন্দ্রস্থ কবিসত্তাকে। বহুদিন আগে পরিত্যক্ত 'করিয়াছি' 'দেখিয়াছি' ক্রিয়ারূপ বিনা কৈফিয়ৎএ ভাবগাম্ভীর্যের অনুবর্তী হ'য়ে এসে উপস্থিত। কবিতার এক একটি লাইন যেন আত্মার এক একটি অপ্রতিরোধ্য সম্পূর্ণ নিঃশ্বসনের মত বেরিয়ে এসেছে। তারই অনুগত শব্দযোজনা বুদ্ধির অতীতকে বাজিয়ে তুলতে চাইছে, প্রতিটি শব্দের ধ্বনি-আঘাত নিজেকে ঘিরে উর্মথিত করে তুলছে নৈঃশব্দের বেষ্টনী, তাতেই তার বিশেষ সার্থকতা। এরই ফলে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ অবাধ অর্থপ্রসার লাভ করেছে। সত্যকার মন্ত্রেরও এই ধরনেরই প্রেরণা। কিন্তু বুদ্ধিগত অর্থের দিক থেকে দেখা যাবে কতকগুলি বিকল্প সম্ভাবনা। মানে বোঝবার ইচ্ছা করলে কবিতায় সঙ্গত মতান্তরের সুযোগ দেওয়াই ভালো, কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়। কোন অর্থ সঙ্গত আর কোনটা নয় তা নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছা হয়। কারণ মনে হয় যে ঠিক ব্যঞ্জনাকে নিরূপিত করা কবিতার পক্ষে দরকার। যেমন 'প্রথম দিনের সূর্য', যার অনুবাদ করেছেন হুমায়ুন কবির The Unanswered Question নাম দিয়ে। এতে 'দিবসের শেষ সূর্য'কে করেছেন 'the day's last sun', তার মানে কি বোঝা শক্ত। বরং হয়তো বলা যেত the day's last sun, প্রথম দিনের সঙ্গে সর্বদিনের শেষ দিনটির contrast.

এর আগে প্রান্তিকের একটি কবিতার (যাবার সময় হ'ল বিহঙ্গের) অনুবাদে একটা ভুল নিশ্চয় অনবধানজাত। 'যাব উড়ে রজনীপ্রভাতে'—হয়েছে 'I shall be swept away

at the day's end'. না day-break? আর 'উড়ে যাব'র স্বাধীন নির্বাচন 'shall be swept away'র অসহায়তায় পরিণত করলে তা আত্মার পক্ষে মনে হয় অসমীচীন।

আর একটি কবিতা 'অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়'। এর শেষে আছে 'হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল, এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ।' শিশিরকুমার ঘোষ অনুবাদ করছেন 'Thou hast withdrawn thy rays but reveal again thy light'. ঐ butটা ভুল। রবীন্দ্রনাথের 'এবার' কে and now বললেই চলত। ঈশোপনিষদের যে শ্লোকের ব্যবহার করেছেন কবি এখানে তাতে আছে ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ—তেজো যত্তে রূপংকল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি—অর্থাৎ তোমার সব রশ্মিগুলিকে একত্রিত করো যাতে সেই সংহতির মধ্য দিয়ে তোমার কল্যাণতম রূপটিকে দেখতে পাই।

রূপনারাণের কূলেও অনুবাদ করেছেন হুমায়ুন কবির। এতে 'সত্যের দারুণ মূল্য'কে করেছেন 'the ultimate value of truth'. ঠিক কি করলে ঐ 'দারুণ'-এর ভাবটা ফোটে, বোঝা যায় সত্যের মধ্যে মিলেছে নবজন্মের স্ফুটনের সঙ্গে মৃত্যুর ক্রন্দন? গদ্য হলে বলতুম to gain the dire exchange-value of truth. কিন্তু ultimate ব্যবহার করবো কোন ইঙ্গিতে নির্ভর করে? 'আর মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে নিতে'-এর 'সকল'-এর জোরটুকু to pay back all debts in final death-এর final কথায় দিতে গেলে প্রশ্ন জাগে death-এর আবার final কি? যদি বা final-এর একটা অর্থ বার করি বৌদ্ধ নির্বাণতন্ত্র অনুযায়ী—আত্মার পক্ষে তেমন পরিণতি কি কবির অভিপ্রেত এখানে?

'দুঃখের আঁধার রাত্রি' ও 'তোমার সৃষ্টির পথ' অনুবাদ করেছেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রথমটিতে 'মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে'—হয়েছে death's consummate art in scattered gloom', এখন gloomটা scattered, না শিল্প? পরের কবিতাতে প্রথম লাইনে কবি বলছেন 'রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে।' দুজায়গাতেই ছড়িয়ে রাখা হয়েছে ছলনার শিল্প বা জাল। Scattered gloom ইংরাজিতে শুনতে ভালো। কিন্তু তা যে ছবি ফোটায় তা এখানে অনুপযোগী। রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের এই কবিতাগুলির রসবৈশিষ্ট্য অনুবাদকদের নিপুণ অনুবাদে অনেক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়েছে।

ইংরাজী ভাষা ভাষী পাঠক, এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে যা পাবেন সেইটাই হবে এই গ্রন্থের সত্যকার দানের হিসাব। আপাতত নিজের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার দ্বারা এইটুকু বলতে পারি যে এই গ্রন্থ অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে এবং এর অনেক কবিতা ইংরাজি অনুবাদ সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করবে।

সুনীলচন্দ্র সরকার

---

* One Hundred And One Poems by Rabindranath Tagore. Edited by Humayun Kabir. Asia Publishing House. Bombay Rs. 24·00.

স মা লো চ না

The Blue Mutiny: the Indig Disturbances in Bengal 1859-1862. *By* Blair B. Kling. University of Pennsylvania Press. $ 6·00.

নীলবিদ্রোহের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের মনে পড়ে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণে"র কথা আর সেই সঙ্গে লঙ্ সাহেবের লাঞ্ছনার কাহিনী। তার বাইরে নীলবিদ্রোহের যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে সে সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতের ইতিহাসের কোনো কোনো সুপরিচিত পাঠ্যপুস্তকে নীলবিদ্রোহের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তার কথা আলোচিত হয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে,—"নীলদর্পণে"র পটভূমি হিসাবে। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙলার ইতিহাস নীলবিদ্রোহের উপযুক্ত সমীক্ষা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না।

১৮৫৯—'৬২ সালের নীলবিদ্রোহের পূর্বেও বাঙলার কৃষকরা নীলচাষের বিরোধিতা করেছে। এই বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল ফরাজি আন্দোলন (১৮৩০-'৪০) ও সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫-'৫৭) সময়। এই দু'টি আন্দোলনের কোনটিরই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য নীলকররা ছিল না। কিন্তু জমিদারদের মতো এরাও ছিল অত্যাচারী; তাই জমিদারদের সঙ্গে এরাও লাঞ্ছিত হয়েছে। ১৮৫৭ বিপ্লবের প্রভাবও নীলবিদ্রোহ ত্বরান্বিত করেছে। সেই বিপ্লবের সময় মফঃস্বলবাসী নীলকর সাহেবরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠায় সরকার এদের হাতে অস্ত্র দিলেন আর আত্মরক্ষার অজুহাতে দিলেন কতকগুলি আইনগত সুবিধা। এই সুবিধার অপব্যবহার করেছে এরা নীলের চাষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে। তার ফলে রায়তদের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধটা তীব্রতর হল, সৃষ্টি হল বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের পরিবেশ।

বাঙলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলেও নীলের চাষ হত। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে অন্যত্র নীল এমন বিষ ছড়ায় নি। সেখানে চাষীরা মোটামুটি ন্যায্য দাম পেত। এখানকার নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের বঞ্চিত করে নিজেদের লাভের অঙ্ক ফাঁপিয়ে তোলা।

বাঙলা দেশে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নীলচাষ করবার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৪৩। নীলকর সাহেবের সংখ্যা ছিল শ' পাঁচেক। বাঙলার নীল ছিল গুণের দিক থেকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ব্রিটেন যত নীল আমদানী করত তার অর্ধেকও যেত বাঙলা থেকে। আবার বাঙলা দেশের মোট উৎপাদনের অধিকাংশই নদীয়া ও যশোহর থেকে পাওয়া যেত।

নীলকুঠির ম্যানেজারদের বেতন ছিল চারশ' টাকা, তাছাড়া লাভের উপর পাঁচ শতাংশ কমিশন। কমিশনের লোভে চাষীদের উপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়ত। অল্প দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করা, শাদা স্ট্যাম্প কাগজে টিপ সই আদায় করে আইনের ভয় দেখানো, লাঠিয়ালদের পাঠিয়ে মারপিট করানো, এবং আরও নানা ধরনের অত্যাচারের বাস্তব বিবরণ দীনবন্ধু মিত্র আমাদের জন্য রেখে গেছেন। কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা কিছুই

করতেন না অত্যাচার বন্ধ করতে স্বজাতির স্বার্থের খাতিরে। এ'দের অনেকের প্রকৃতই বিশ্বাস ছিল যে নীলচাষ বাঙলার আর্থিক উন্নতির একটি আবশ্যিক অঙ্গ। আসলে আর্থিক লাভটা পড়ত নীলকরদের ভাগে। নীল-কমিশনের তদন্তে দেখা গেছে নীলচাষের ফলে রায়তের বিঘা প্রতি বছরে লোকসান হত সাত টাকা। আয় বাড়লে কিছু পরিমাণ অত্যাচার ও জবরদস্তি সহ্য করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যখন কৃষক নিশ্চিতরূপে জানে নীলের বদলে জমিতে অন্য শস্য চাষ করলে আয় বাড়বে তখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য লোকসানের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দিলে সে স্বভাবতই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এই বিদ্রোহের পূর্বাভাস পাওয়া যায় ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাঙলার লাট নিযুক্ত হবার পর প্রথম নদীয়া জেলা পরিদর্শনে এসেছেন। স্থানীয় জমিদার, আইনজীবী এবং অন্যান্য নাগরিক নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য তাঁর কাছে আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু ছোটলাট এর উপর কোনো গুরুত্বই আরোপ করলেন না; আবেদনে উল্লিখিত অভিযোগগুলির অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হলো না। বরং বছর তিনেক পরে তিনি বহু নীলকরকে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিশেষ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এর ফলে জনসাধারণের মনে সরকারের প্রতি আর আস্থা রইলো না। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদেরই দেওয়া হলো অধিকতর ক্ষমতা। সুতরাং বিচারপ্রার্থী কৃষকরা মুখে মুখে গান করে ভগবানের কাছে নালিশ জানাল : 'যে রক্ষক, সে ভক্ষক।' হ্যালিডের ধারণা ছিল বাঙলা দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ বণিকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। এই বিশ্বাসের এবং স্ব-জাতি প্রীতির জন্য তিনি সর্বদাই নীলকরদের সমর্থন করেছেন।

অবশ্য এমন কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও ছিলেন যাঁদের ছিল রায়তদের প্রতি সহানুভূতি। এ'দের মধ্যে আব্দুল লতিফ, হেমচন্দ্র কর, ম্যাংগল্‌স্‌, ইডেন প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হ্যালিডের পর জন পিটার গ্রান্ট ছোটলাটের পদে নিযুক্ত হলেন ১৮৫৯ সালের ১লা মে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার, মানবিকতাবোধ ছিল গভীর। সত্য ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করে নীল সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন তিনি। অধিকাংশ ইংরেজ বণিক ও ইংরেজ কর্মচারী অন্ধভাবে নীলকরদের সমর্থন করতেন। গ্রান্ট দেখলেন রায়তদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার সবচেয়ে বড় বাধা মফঃস্বলের ইংরেজ রাজ-কর্মচারীরা। বিশেষ করে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর একই ব্যক্তি হবার ফলে সরকারের বিচার বিভাগ অপেক্ষা প্রশাসন বিভাগটা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কঠোর হস্তে ম্যাজিস্ট্রেটের শাসন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে হয়ত কার্যকর হতে পারে। গ্রান্টের অভিমত ছিল যে,—'In Bengal, as in all other wealthy and highly civilized countries. . . .the people look to the Judge.'

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কয়েক দশক যাবৎ চলে আসবার প্রধান কারণ সরকারের সমর্থন। ক্ষুব্ধ হয়েও তাই রায়তরা ছোটখাটো প্রতিবাদ ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। কারণ তারা ভালো করেই জানত যে বিদ্রোহ শুধু নীলকরদের বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে। কিন্তু যখন ছোটলাট গ্রান্টের মনোভাব রায়তরা জানতে পারল তখন নীলকুঠির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ভরসা পেল। গভর্নমেন্ট নীলকরদের পেছনে নেই, এই বিশ্বাসে রায়তরা বলীয়ান হয়ে উঠল।

জমিতে নীল চাষ হবে কি-না তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে রায়তের ইচ্ছার উপরে। নীলকুঠির সাহেব জোর করে নীল চাষ করাতে চাইলে বাধা দেবার জন্য সংঘবদ্ধ হল রায়তরা। প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিল বারাসতে, তারপর ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ল বাঙলা দেশের সর্বত্র। কি ভাবে রায়তরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায় ছোটলাটের তদন্তকারী অফিসার উডের রিপোর্ট থেকে : 'A regular league was now formed against indigo cultivation, oaths were subscribed to by both Hindoos and Musulmans, Ryots of one village were called upon, by beat of drum, to assist those of another, if molested by the planter's servants, etc., and if pressed to cultivate indigo by such servants they were to resist; signals were made and given, subscriptions raised; villagers turned out by the beat of drum and proceeded in large bodies armed to any alleged threatned spot; in fact they had it all their own way, the police were afraid and had been bough over by the Ryots.'

গ্র্যান্ট যখন সরজমিনে তদন্ত করবার জন্য নদীপথে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ যাত্রা করলেন তখন নদীর দুই তীরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার নরনারী তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ জনতার আন্তরিক আবেদনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এমন চমৎকার সংঘবদ্ধ আন্দোলন ভারতে এর পূর্বে হয় নি। নিরস্ত্র কৃষকরা তাদের দাবীর নৈতিক ভিত্তি থেকেই শক্তি পেয়েছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন : 'Bengal might well be proud of its peasantry....Wanting power, wealth, political knowledge and even ledership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other country...With the Government against them, law against them, the tribunals against them, the Press against them, they have achieved a success...And all this they have done by sheer force of virtue, by patience, perseverance and fortitude, without committing a single crime,—almost a single act of violence.'

ছোটলাটও বলেছেন যে, বাঙলা দেশের ইতিহাসে এমন একতাবোধ পূর্বে দেখা যায় নি। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে সংগ্রাম করেছে। রায়তদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কেউ নীলকঠির চাকরি করলে তাকে একঘরে করা হত। নীল কমিশনের রিপোর্ট বের হল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। এই রিপোর্ট থেকে রায়তদের অভিযোগেরই সমর্থন পাওয়া গেল। এদেশে এবং ব্রিটেনে সত্য উদ্ঘাটনের ফলে নীলকরদের একাধিপত্য আর রইলো না। তাছাড়া সকল ব্যবসায়েই একটা সাধারণ নিয়ম আছে যে অংশীদাররা সকলেই লাভের কমবেশি ভাগ পাবে। কিন্তু একমাত্র নীলের ব্যবসায়ে চাষীর ভাগে শুধুই শূন্য। নীতিবিরুদ্ধ এই ব্যবসা স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন বাঙলা থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

নীলবিদ্রোহ যে শুধু রায়তদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে তা-ই নয়। পল্লী অঞ্চলের রায়ত এবং শহরের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপন করেছে। শিক্ষিত বাঙালী এর পূর্বে গ্রামের চাষীদের সমস্যা নিয়ে এমন করে ভাবে নি। "হিন্দু পেট্রিয়ট", "ইন্ডিয়ান

ফীল্ড", "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি কাগজে সেদিনকার বুদ্ধিজীবী বাঙালী তাঁদের ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। স্থায়ী নিদর্শন অবশ্য "নীলদর্পণ"। "নীলদর্পণে"র সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এর একটি বিশেষ দানকে এখনও যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় নি। "নীলদর্পণ" প্রকাশের পর একে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তা থেকেই বাঙালী সর্বপ্রথম তার সাহিত্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিল। রাজদরবারে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাষার মর্যাদা ছিল না সেই ভাষায় লেখা একটি বই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকেও ভাবিয়ে তুলতে পেরেছিল।

"নীলদর্পণে"র প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রেভারেন্ড লঙ্। এই নাটকের বিষয়বস্তু ইংরেজ কর্মচারীদের ওয়াকিবহাল হওয়া আবশ্যক মনে করে ছোটলাট "নীলদর্পণ" ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলেন। শোনা যায় লঙ্ মধুসূদনকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। তারপর গভর্নমেন্টের খরচে পাঁচশ' কপি অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। গ্র্যান্টের অজ্ঞাতে সেটন-কার কতকগুলি কপি বিতরণ করেন। এই নিয়ে ব্রিটিশ নাগরিক-দের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়; "ইংলিশম্যান" ছোটলাট এবং তাঁর দপ্তরকে তীব্র ভাষায় দিনের পর দিন আক্রমণ করে লিখতে লাগল। যে বই ইংরেজ জাতির মুখে কালি মেখেছে সে বই গভর্নমেন্ট নিজের পয়সায় ছাপিয়ে বিতরণ করছে,—এ কী নির্বুদ্ধিতা? আত্মরক্ষার জন্য বাঙলা সরকারকে লঙের বিরুদ্ধে মামলা আনতে হল; সেই মামলার ফলাফল সকলেরই জানা আছে। এই মামলায় সরকারের কাপুরুষতার যে পরিচয় পাওয়া গেল তার তুলনা আর কোথাও আছে কিনা জানি না। সরকারই যে অনুবাদ করিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করেছেন এবং লঙ্ যে শুধু সহযোগিতা করেছেন—আদালতে এ কথা স্বীকার করবার সাহস তাঁদের হয় নি। লঙ্ স্বেচ্ছায় নিজে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে কাপুরুষ কর্মচারীদের রক্ষা করলেন।

লঙের বিচার করেছিলেন স্যার মোরডন্ট ওয়েল্স্। তাঁকে এদেশ থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কলকাতার নাগরিকরা গোপনে একটি আবেদনপত্র ছাপিয়ে এক মাসে কুড়ি হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল। "ইংলিশম্যান" ও "হরকারু" খবর পেয়ে আবেদনপত্রের একটি কপির জন্য পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত দেবার লোভ দেখায়। কিন্তু তখন বাঙালীদের মধ্যে এমনই একতা ছিল যে একটি কপিও তারা সংগ্রহ করতে পারে নি।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ডঃ ক্লিঙ নীলবিদ্রোহের যে প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ইতিহাস লিখেছেন তা সকলের নিকট বিশেষ করে বাঙালী পাঠকের নিকট সমাদৃত হবে। ইতিহাসে এই একটি ঘটনাই পাওয়া যায় যখন বাঙালী ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছিল, প্রমাণ করতে পেরেছিল তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা। জয়লাভ করেছিল। পুরানো ইতিহাস যদি আমাদের নতুন কোনো প্রেরণা দিতে পারে তাহলে আলোচ্য বইটি তার সহায়ক হবে। লেখক বহু অপ্রকাশিত দলিলপত্র ব্যবহার করলেও তাঁর রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয় নি। বইটি সুখপাঠ্য এবং তথ্যাভিত্তিক ও অব্জেক্টিভ।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীনাথ বিচিত্রা—সতীনাথ ভাদুড়ী। প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ১১। মূল্য ৮·৫০ প।

বাংলার গদ্য সাহিত্যে কোনো সময়েই নতুন প্রবাহের অভাব ঘটেনি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শুভ সূচনায় সীমিত। তবু অনেক সময় এমন লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যিনি প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করেছেন। এই অতিক্রমন অবশ্যই সর্বত্র আঙ্গিক ও বিন্যাসে নিমগ্ন থাকেনি। নতুন উপাদানের সমাবেশও তাঁদের লেখায় ঘটেছে। তাঁরা পাঠকের সামনে এক নতুন জগতের সন্ধান যেন হঠাৎ এনে দিলেন, যে-জগৎ আমাদের জানা—কিন্তু গভীর প্রত্যয়ে চেনা নয়। সে জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতাকে যদিও পরিপুষ্ট করেনি, অথচ আমাদের দৃশ্যলোকে স্বতই উপস্থিত। অথচ বলতে বাধা নেই, এতো ভিন্নতা সত্ত্বেও এমনই এক জগতের অসমসাত্বিক উপাদানের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়ে দিয়ে যে-লেখক অবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষের ব্যবধান মোচন করেছেন, তিনি সতীনাথ ভাদুড়ী।

সতীনাথের লেখার যে উপাদান অনায়াসেই পাঠক মনকে আকর্ষণ করে, তা তার পরিচ্ছন্ন এবং সাবলীল ভঙ্গীমা। যে নিবিড় আন্তরীকতায় তাঁরই কোনো কোনো পূর্বসূরী প্রকৃতিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তেমনই এক ঘনিষ্ঠ আন্তরীকতার আভাস পাওয়া যায় সতীনাথের মানুষ ও তাঁর পরিবেশ সম্পর্কিত লেখাগুলিতে। যদিও তিনি কোথাও বিভোর হয়ে পড়েন নি। যেটুকু তিনি দেখেছেন, তার মধ্যে সরসতার সন্ধান করেছেন সত্যি, কিন্তু নিজের একান্ত বিশ্বাসপ্রবণ মনকে দর্শক নিরপেক্ষ বস্তুর ওপর আরোপ করেন নি।

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করেছিল, তাঁরই উপন্যাস জাগরী। জাগরীর পটভূমি যেমন বিচিত্র, তেমনই বিস্ময়কর। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনের সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই উপন্যাস যেন তদানীন্তন বাংলার বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে এক নতুন চেতনা। রচনার গুনে, চরিত্র নির্বাচনের নিপুণতায় তা ছিল আশ্চর্য। বস্তুত বিশ্বাস হতে চায় না, সে-সময় একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর দলগত আনুগত্য কোথাও তাঁকে বিভ্রান্ত করে নি।

এই সংযম, বিষয়ের প্রতি এই নিষ্ঠা অচিরেই তাঁকে এক বিশিষ্ট আসনে স্থান করে দিয়েছিল। এবং এই গুণই তাঁকে গল্প লেখাতেও সার্থক করে তুলেছিল। সতীনাথ বিচিত্রা, যদিও একত্রে গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার সংকলন, এই বক্তব্যেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এক্ষেত্রে গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গল্পের এক একটি চরিত্র তাঁর নিপুণ উপস্থাপনার গুণে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। উদাহরণ: ছকু বেচনলাল।

কিন্তু তাঁর গভীর সাহিত্য চিন্তায় সরস রচনারও যে যথার্থই একটি স্থান রয়েছে, তা তাঁর হাসির গল্পগুলি না পড়লে বোঝা যায় না। এক্ষেত্রেও তিনি এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর বাকচাতুর্যে, বিদগ্ধ রসরসিতায়, জ্বালাবিহীন তীক্ষ্ণতায় তিনি তাঁর ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অথচ লঘুরচনা সত্ত্বেও লঘুচিত্তের প্রকাশ করেন নি কোথাও। এক সুসংস্কৃত মানসিকতার চিহ্ন তাঁর লেখার সর্বত্র সুপরিস্ফুট।

এবং প্রায় সেই এক সুরের গভীরতা তাঁর প্রবন্ধগুলিকেও সার্থক করে তুলেছে। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অভিজ্ঞতার গভীরতা, তাঁর প্রবন্ধ এবং রম্যরচনাকে উপভোগ্য করেছে।

কিন্তু কবিতায় তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে তেমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। মোটা-মুটিভাবে সেগুলি সহজ সাধারণ ভাবনায় চিহ্নিত। এদের পক্ষে একমাত্র বলা যায় যে,

কবিতাগুলি ভাদুড়ী মহাশয়ের মননের আন্তরীক রূপায়ন। তবে বহু জায়গায় তিনি অস্বাভাবিক রকমের রোম্যান্টিক, যা অনেক সময়ে মনে হতে পারে, ঠিক বয়সোচিত নয়। যেমন মোহনপুরের ছবি।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। বস্তুর প্রতি সতীনাথের নিষ্ঠা, বস্তুকে শুধু বাইরের জগতের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা কি তাঁর জীবনের পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক অনীহার অনিবার্য ফল নয়? এবং এ কারণেই এতো সরসতা, এতো নৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কোনো দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই সঙ্গে মনে হয় মানুষের আরো যে জীবন, যা শরীর নির্ভর, তাকে বহু আয়াসের সঙ্গে লেখা থেকে দূরে রাখার মধ্যে বোধ করি সাহিত্য ধর্মের অনুশাসনগুলিকে পরিহারই করা হয়েছে। আর তাই প্রত্যেকটি ধাপে তিনি পিছিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আশ্রয় করেছেন এক পলায়নী মানসিকতায়। যা শুধুমাত্র অরাজনৈতিকই নয়।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

মার্টিন ব্যুবর

শিশিরকুমার ঘোষ

ইকজিসটেনসিয়ালিস্ট সম্প্রদায়ের নানা শাখা, ধর্মীয়-অধর্মীয়. মার্কসবাদী-নৈরাজ্যবাদী, প্রাচীন-অর্বাচীন। আধুনিক কালে এর হিব্রুশাখার অন্যতম প্রবক্তা ও আচার্য হলেন মার্টিন ব্যুবর (১৮৭৮—১৯৬৫)। শেষ জীবনে স্বেচ্ছায় লোকজীবনের অন্তরালে জেরুজালেমে থাকাকালীন সভ্যজগতে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করেছে, তাঁকে মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছে। অল্পকাল আগে ইহুদি-বিদ্বেষী নাৎসি আইখমানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করার স্বপক্ষে অভিমত দিয়ে তিনি শেষ বারের মত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে অভিন্ন তাঁর ব্যবহার। ভারতীয় মতে অহিংস না হলেও—গান্ধীজির প্রতি তাঁর প্রতিবাদপত্র স্মরণীয়, যাতে গান্ধীজির শহীদ হওয়া সম্পর্কে এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ব্যুবর—প্রতিহিংসায় তাঁর কোনো আস্থা ছিল না।

এই দর্শনের স্বরূপ কি, যার প্রভাবে তিনি জাতির ঘৃণ্য শত্রুকেও ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? এই মনীষীর জীবনের প্রধান বক্তব্য সংহত হয়েছিল একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে : 'আই এ্যাণ্ড দাউ'। এর ফলে আধুনিক পরিভাষায় দু'টি নূতন শব্দ সংযোজিত হয়েছে : 'আই-ইট্'. 'আই-দাউ'। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে, ইকজিসটেনসিয়া-লিজমের'র আদি ও অকৃত্রিম মাধ্যমে, জর্মন ভাষায়। অল্পকালের মধ্যেই বইটি ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সকলেই জানেন বেলজিয়ান কঙ্গোতে রহস্যজনকভাবে নিহত হবার কালে রাষ্ট্রসংঘের অধিকর্তা ড্যাগ হ্যামারশল্ড গ্রন্থটি অনুবাদ করছিলেন। এর নানা গুণের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য : দীর্ঘকাল পরে হিব্রু মানসিকতা, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় যার অবদান বিস্মৃত হওয়া চলে না—গত এক শ' বছরের মধ্যে মার্কস, ফ্রয়েড ও আইনস্টাইন যার নিদর্শন—আধুনিক কালে নিজ গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে; দ্বিতীয়ত তত্ত্বজ্ঞানের (theology) অবহেলিত দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন ব্যুবর। এবং, আশ্চর্যের বিষয়, এর প্রভাব হিব্রু শাস্ত্রবিদদের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, বরং নব্য প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে, যথা পল টিলিখ, আশ্চর্যরকম কার্যকরী হয়েছে। অনেকে এমন কথাও বলেছেন যে চরমপন্থী প্রটেস্ট্যান্ট দলের সঙ্গে বহু ধর্মযাজকদের চাইতে

ব্যুবরের অধিক সাদৃশ্য দেখা যাবে। গুরুতর ব্যাপার সন্দেহ নেই।

ব্যুবরের চিন্তাধারায় হিব্রু মানসিকতা কতখানি প্রতিফলিত বা সমর্থিত হয়েছে? প্রাচীনপন্থীদের দৃষ্টিতে তিনি বিদ্রোহী প্রতিপন্ন হয়েছেন, তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি জন্ম-দোষে ইহুদি, বিশ্বাসের দিক দিয়ে অস্তিত্ববাদী বা ইকজিসটেনসিয়ালিস্ট। নিন্দুকের বর্ণনা হয়তো প্রশংসার নামান্তর, কেননা ব্যুবরের বৈশিষ্ট্য হোলো যে হিব্রু ঐতিহ্যের অধুনালুপ্ত কয়েকটি স্বকীয়তাকে তিনি আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে নূতন রূপে উপস্থাপিত করেছেন, যার ফলে সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের তীব্র স্বজাতি প্রীতিতে কিছুটা ঔদার্যের স্পর্শ লেগেছে। প্রাচীনপন্থীদের আক্রোশের কারণ বোঝা কঠিন নয়।

মুখ্যত দার্শনিক হিসাবে পরিচিত হলেও, হিব্রু-অস্তিত্ববাদী ভূমিকার ফলে, ব্যুবরের রচনায় বিচারবিতর্কের দিক ছাড়াও আবেদনের বা কাব্যিক অংশ কম নয়। প্রচলিত অর্থে তিনি মরমীবাদী নন, অথচ তাঁর বিভিন্ন রচনায় মরমীবাদী সুর শোনা যায়। 'আই এ্যান্ড দাউ' প্রচলিত দার্শনিক রীতিতে নির্ভেজাল সিদ্ধান্তের ইমারত খাড়া করে নি, বইটিকে অনেকেই ধর্মীয়-দার্শনিক কাব্যের পর্যায়ে ফেলেছেন অর্থাৎ এর পিছনকার প্রেরণা অনুভব-সাপেক্ষ। বইটির মূল বক্তব্য সহজ : আধুনিককালে শিক্ষিত অজ্ঞতার ফলে মানব সম্পর্কের 'চিরন্তন বিষয়টিকে' (eternal subject) অগ্রাহ্য করার জন্য আজ আমাদের এই দুর্দশা। সাম্প্রতিক কালের নিপ্রেম নিরর্থক মানবতাবর্জিত বণিক সভ্যতার টীকা বইটির ছত্রে ছত্রে। নৈর্ব্যক্তিক পৃথিবীতে, যার অস্তিত্বের কোনো প্রয়োজন বা সার্থকতা নেই, তিনি ঘোষণা করেছেন ব্যক্তিত্বের হারানো অধিকার। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর প্রধান ও একমাত্র ব্যক্তব্য : আবার তোরা মানুহ হ'। মানুষ হবার দায় অনেক। অবাক হবার কিছু নেই যে আমরা যাকে মানবেতিহাস বলে জেনে এসেছি তার বেশির ভাগ স্বার্থান্ধ কীটপতঙ্গের ক্লান্তিকর কলংকিত কাহিনী। 'আই-ইট'-এর কাছে 'আই-দাউ'-এর লজ্জাকর পরাভবের কাহিনী।

উত্তরাধিকারী হিসাবে ব্যুবর হিব্রু জীবন, মনন ও ভক্তি, ঈশ্বর-নির্ভরতার দিকটি লাভ করেছিলেন। পরে ইউরোপীয় দর্শন, বিশেষ করে কান্ট ও নীটশের সঙ্গে পরিচিত হবার কালে তাঁকে এক মানসিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে তখনকার মত তিনি উত্তর-মধ্যযুগীয় খৃস্টীয় মরমীবাদে আশ্রয় নেন। কিন্তু নিঃসঙ্গতাবোধ হতে মুক্তি পান নি। পরবর্তী জীবনে দেশজ জায়নইজম তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছে, তার আক্রমণাত্মক ও আদর্শ রাষ্ট্রকল্পনার দিক ততটা নয়, যতটা তার আত্মিক পুনরুজ্জীবনের দিকটি। এই সময়ে হাসিদইজম, অষ্টাদশ শতকে পোল্যান্ডে প্রবর্তিত সেই সম্প্রদায়টি, তাঁকে যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছিল। পাঁচ বছরকাল তিনি এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ধ্যানধারণায় অতিবাহিত হয়েছিল প্রস্তুতির এই পর্ব। তবে এ নয় সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রসাধন বরং, যেমন তিনি হাসিদইজমের প্রবর্তকের সম্বন্ধে বলেছিলেন, এ হোলো বাস্তববাদী সক্রিয় অধ্যাত্মবোধ।

নির্জন মননের অবসরে তিনি কীর্কেগার্ডের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। কীর্কে-গার্ড বর্ণিত সজ্ঞানে জড়িত (involved) হবার দশা ও ব্যাখ্যা, সত্যকে অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই করে নেওয়ার ব্যক্তিগত দায়ের কথা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কালক্রমে তিনি ব্যক্তিগত নির্বাচনের দায় এবং স্বজাতির সমষ্টিগত ভাব ও ঈশ্বরনির্ভরতার মধ্যে একটি আপোষ বা সামঞ্জস্যবিধানে সমর্থ হন। তাঁর এই ধর্ম বা ধর্মভাব সম্পূর্ণ ঐহিক, ভক্ত-হৃদয়ের ইতিহাসবিমুখ আত্মবিলুপ্তির সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য।

এই ধর্মবোধ বা তত্ত্বজ্ঞানের ভিৎ নিঃসন্দেহে মানব অভিজ্ঞতায়। অথচ বিশুদ্ধ

বিচারের পথ বেয়ে এ সত্য আসে নি। বিচার বা ন্যায় শাস্ত্রের প্রয়োজন ও পরিধি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎকে নিয়ে, প্রাকৃত বা বস্তুর রাজ্যেই তার অপ্রতিহত প্রভাব। ব্যক্তিজীবনের নিবিড়তম সত্য সম্পর্কের এই মৌলিক ও বিপ্লবাত্মক অভিজ্ঞতা বিচার বা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। আদতে এ স্বতঃসিদ্ধ, এ না হয়ে উপায় নেই। নুনের পুতুলের সামর্থ্য ঈশ্বর-ভক্তের অজানা নয়। এ অভিজ্ঞতার—বিচার বলতে বাধা নেই—নজির অতীতে, ও সর্বকালে, পওয়া যাবে। পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যে প্লেটো (*noesis*) ও প্রাচ্যদেশে যোগসাধনার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য, যদিও বুবের কোনোটির উল্লেখ করেন নি।

ইক্জিসটেনসিয়ালিস্ট রীতি অনুসারে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যার সাহায্যে তিনি নিজ সিদ্ধান্ত, কতকটা নব্য ত্রিনীতি (trinity) উপস্থাপিত করেছেন: 'আই ইট্ দাউ' (আমি—হই—তুমি)। মানুষের দ্বিবিধ দৃষ্টির ফলে পৃথিবীর দু'টি রূপ। (শুধু দু'টি?) সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমাদের পৃথিবীতে ও অভিজ্ঞতায় উপকরণবোধ ও মূল্যবোধ দুইই আছে। বুবের বলবেন অহংবাদী (subjective) মূল্যবোধের সাহায্যে আমরা নৈর্ব্যক্তিকতার অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি। এর জন্য 'I—It'-কে 'I—Thou'-এ রূপান্তরিত করা দরকার। বলা বাহুল্য 'I—It'-এর জগৎ বিজ্ঞানের, জড়ত্বের জগৎ। ক্রমবর্ধমান প্রকাশ। আশংকার কারণ এই যে, নাস্তিক মনোভাব সমগ্র বিশ্বকে ও বিশ্বসত্যকে গ্রাস করতে বসেছে। তাই এ আধুনিক ওয়েস্ট ল্যান্ড, বিবর্ণ আজ বনবাণী। শান্তিনিকেতনের কবিকে বলতে শোনা গিয়েছিল—

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীত
সার্থক হোক পুন।

প্রয়োজনের পৃথিবীই কি সব? রবীন্দ্রনাথ 'অপ্রয়োজনের' মানুষেব কথা বলতেন।

প্রকৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ('I—Thou') স্বীকার করা সহজ, শিল্পের ক্ষেত্রে তো অপরিহার্য। গাছের উপমা দিয়ে বুবের ব্যাপারটি বোঝাতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দু'টি মনোভঙ্গী কাজ করে থাকে: একটি বৈজ্ঞানিক ('I—It'), অপরটি সংবেদনশীল মনের অভিঘাত ('I—Thou') অথচ নৈর্ব্যক্তিক ব্যাবহারিক জ্ঞানকে নস্যাৎ বা অস্বীকার করে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ('I—Thou') জীবন্ত অভিজ্ঞতা, তার একটি নিজস্ব পূর্ণতা ও শাশ্বত সমসাময়িকতা আছে। কিন্তু বুবেরের মতে—এর জন্য আত্মা বা বিষয়—বিষয়ীর একাত্মবোধ কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। এটি তাঁর (জাতিগত) অভিজ্ঞতার দুর্বলতা হতে পারে।

বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁর অন্যান্য উদাহরণ তিনি শিল্পের ক্ষেত্র হতে নিয়েছেন। সেখানে ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট এবং প্রতিক্রিয়াও ব্যক্তিগত না হয়ে উপায় নেই। যেমন, সঙ্গীত। এর রাগরূপ, ধ্বনি, শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের শিল্পগত আলোচনা করা সম্ভব এবং তা আমরা করেও থাকি। কিন্তু শিল্পঅভিজ্ঞতার একটি সামগ্রিক রূপও আছে। শিল্পব্যাপারে একটি বহিরঙ্গ রূপ প্রকাশের দাবী জানায়। অথচ এই রূপ শিল্পীর স্বরূপ বা তার সঙ্গে এক নয়। এর সঙ্গে জড়িত আছে বুবেরের ধারণা যে ঈশ্বর, সর্বস্রষ্টা, আমাদের অতিরিক্ত এক সত্তা ('over against us')। বেদান্তী হিসাবে আমাদের পক্ষে সেকথা মেনে নেওয়া কঠিন।

সে যাই হোক, এই "আই দাউ" (আমি-তুমি) সম্পর্কটি আমাদের কর্মজীবনে একেবারে অপরিচিত নয়। এবং আমাদের ব্যবহারিক সত্তা, এমনকি ('I—It')-কে (আমি ও অন্য-

সব-কিছু) রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে উপকরণের, বস্তুপুঞ্জের অনামা নৈর্ব্যক্তিকতা সব সময়েই ব্যক্তিসত্তার দ্বারা চালিত হতে পারে। মানবধর্ম বা সাধনার প্রধান কথাই তাই, পৃথিবীকে মানবসত্যে উন্নীত করা, to humanise the world and ourselves। সে দিক দিয়ে আধুনিক সভ্যতা বর্বরতার আর এক নাম—সেখানে কেবল ঈশ্বর নিখোঁজ (*dues abscondites*) বা মৃত ('God is dead') নন, মানুষকেও সেখানে 'খুঁজেও পাবে না তারে'। সত্তার সঙ্গে নূতন করে মুখোমুখি হওয়া মানববাদী অস্তিত্ব-দর্শনের প্রধান লক্ষণ ও বক্তব্য, বুবরের জীবনদর্শনের সেই এক কথা। মানব সম্পর্কের প্রাধান্য ও পূর্ববর্তিতা এই দর্শনের উপজীব্য। পরস্পরনির্ভরতা, বিশ্বাস বাদ দিয়ে সে কাজ হতে পারে না : 'All real living is meeting'। রামকৃষ্ণদেব হয়তো বলতেন নর-নারায়ণের লীলা। কিন্তু সেকথা বুবর কি করে বলবেন? তাহলে তো তিনি খৃস্টান ধর্মের অনুরূপ কথা বলার অপরাধে অভিযুক্ত হবেন? যদিও সেকাজও তিনি করেছেন এবং যথেষ্ট সাহস ও ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এই 'চিরকালের তুমি' (central thou)-কে, সত্তার সেই আদি প্রকরণকে কিভাবে বর্ণনা করবো? মানব জীবনের কোন অভিজ্ঞতাটি তার নিকটতম? 'প্রেম', বুবর সেই প্রাচীন শব্দ ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে ইতস্তত করেন নি। এবং, লক্ষ্য করার বিষয়, এই তত্ত্বকে "প্রমাণ" করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান নি, হয়তো এ সত্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ হবার ভয় নেই বলেই। একে একটি তাত্ত্বিক ঘটনা বা আদর্শবাদী মনস্তত্ত্বের ব্যাপার বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন—সেই ঘটনা যাকে আমরা এ যুগে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি বা বিস্মৃত হবার ভাণ করছি। অন্যত্র এই ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বুবর স্পষ্টত খৃস্টান ও অন্যান্য ঈশ্বরপন্থী ভক্তিবাদের কাজে এসেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেমের অর্থই হোলো তৎস্বরূপ "তুমি"-র প্রতি "আমি"-র দায়িত্ববোধ। এর মধ্যেই আছে সকল জীবের স্বাজাত্য, অণু হতে অণীয়ান মহৎ হতে মহীয়াণ, সেই সব অসামান্যভাবে সুরক্ষিত অহংকারের বেড়াজালে বন্দী মানুষের দল থেকে আরম্ভ করে সেই সব মহাপ্রাণ যাদের আজীবন বিদ্ধ হতে হয়েছে সংসাররূপী ক্রুশে, এবং যাদের চৈতন্য আশ্রয় করেছে জীবনের সেই সংকটসংকুল বিন্দুতে—সর্বজীবে প্রেমের দায় যারা স্বীকার করে নিয়েছেন।

এই প্রেম ও তজ্জনিত নম্রতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব ও উচিত—তার আছে ব্যক্তিসত্তার বাইরের আর সব-কিছুকে আত্মসাৎ করবার সামর্থ্য ও অধিকার। শিশুদের জীবনে এ সত্য সকল সময়েই লক্ষ্য করা যায়, শিশুর কাছে সমগ্র বিশ্বসংসার 'আই—দাউ'-এর বিরাট পটভূমিকা। ব্যক্তিত্ব ও মানবতা বোধে উজ্জ্বল তার সমগ্র অভিজ্ঞতা, তার জীবন। অবশ্য শিক্ষা, সভ্যতা ও পরিবেশের কল্যাণে এই সরল পবিত্রতা নষ্ট হতে, ব্যক্তি সম্পর্কের আনন্দিত জীবন "আই—ইউ"-এ পরিণত হতে বড় বেশি সময় লাগে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাকে বুবরের পরিভাষায় বলতে পারি "আই—ইউ"-এর কারাগারে বন্দী শিশুমন। কিন্তু মানবহৃদয়ের সেই আদিসত্তা, হৃদিস্থিত পুরুষ তিনি চির জাগরূক, প্রবলতম অস্বীকৃতির কালেও সেই চিরকালের তিনি জেগে থাকেন। সেই নিঃসঙ্গ, অমোঘ সম্ভাবনা কখনই একেবারে মুছে যায় না। বুবরের জীবনদর্শনে মানবিক সম্পর্কে (intrahuman relations) নিয়ে আশাবাদী সুর ইকজিসটেনসিয়ালিস্টদের দুঃখবাদী আখ্যা থেকে নিষ্কৃতি দেবে। মানব অভিজ্ঞতায় যখন যেখানে সার্থকতার স্বাদ পাওয়া গিয়েছে, ব্যর্থ মনে হয় নি দেহধারণের যন্ত্রণা সেখানে সেই পুরুষোত্তম, "চিরকালের তুমি" প্রকাশ হয়েছেন।

আজকের যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের সে আশা কি নিরর্থক হবে? ১৯৫২ সালে নিউ ইয়র্কে ব্যুবরকে বলতে শোনা গিয়েছিল : 'আজকের এই মুহূর্তে মানুষে মানুষে সংলাপের প্রয়োজনকে সক্রিয় করে তুলতে পারাই আমাদের একমাত্র আশা ও কর্তব্য।...একবারটিও যদি আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে পারি 'তুমি (আছ)' তা হ'লে দীর্ঘ নীরবতা ও বহু অর্ধস্ফুট ভাষের অবসানে, আমরা অন্তঃপুরুষকে আহ্বান করতে সক্ষম হবো।' এর অর্থ নয় যে বিশ্বসংসার ও জগৎ বিলুপ্ত হবে—শেষের ব্যাপারটি তো অনেকের কাছে বিভীষিকা। এর আসল অর্থ হোলো মানবজীবনকে কেন্দ্রের সঙ্গে, বিশ্বসত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। অর্থাৎ স্বীকার করতে হবে প্রেম ও প্রেমস্বরূপকে। একথা কি বলার কোনো প্রয়োজন আছে যে আমাদের যুগে এ সমাজে এই সত্য সম্পূর্ণ অবহেলিত, যার ফলশ্রুতি ব্যর্থতা ও নিরর্থকতার এই অশান্ত মিছিল, 'the panorama of contemporary futility and frustration'?

'আই—দাউ'-এর নীতিগত দিকটি স্পষ্ট এবং ব্যুবর নিঃসংকোচে সেকথা ব্যক্ত করেছেন : অস্তিত্ববোধের ফলে মানুষ 'সেই সত্যের অনুবর্তী হবে যা তার বুদ্ধির অতিরিক্ত অথচ যা তার বুদ্ধিকে আহত করে না।...আর সমাজজীবনে সে তো ঠিক তাই করছে, যা তৎস্বরূপকে উপলব্ধি করতে অসমর্থ অথচ প্রাত্যহিকতার মলিন পরিবেশে সকলেই করে থাকে, অর্থাৎ যা উচিত, যা ভদ্র তাই তো আমরা করতে চাই, এবং নূতন করে আবিষ্কার করি অহং এবং বৃহতের সীমারেখা।' এই ধরনের জীবনে আমরা একাধারে দেখতে পাই ত্যাগ ও মহত্ত্বের দীপ্তি। কারণ তৎস্বরূপের উপলব্ধির মধ্যে আছে সত্যের আপন ধর্ম, পবিত্রতার পাবকস্পর্শ। দার্শনিকের পরিভাষায় বলতে পারি কান্টের সিদ্ধান্তকে ব্যুবর এগিয়ে দিয়েছেন ধর্মের দিকে, কার্যকারণের সূত্র হতে অহং-মুক্তির দিকে। নূতন পরিবেশে নূতন ভাষায় এ বাণী চিরকালের।

আজকের আমরা—ফাঁপা মানুষের দল, বিজ্ঞান, ব্যবসাদারী, রাজনীতি, মৌন ইত্যাদি নিয়ে বিভ্রান্ত—চিরন্তন thou-কে স্বীকার না করে নিতে পারলে আমাদের জীবন পূর্ণতা ও সার্থকতার প্রকাশ হতে বঞ্চিত থাকবে। এই তো জীবনের আশ্রয়, ব্যুবরের জীবনদর্শনও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। 'আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।' এ সত্য যা অনুভব বাদবিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এর উৎস জীবনের, আত্মদর্শনের মূলে। যে কেউ সাধ্য থাকলে বা ইচ্ছা করলে নিজের জীবনে এর সত্য পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। "আমি-তুমি"-র ভিত্তিতে রচিত এই সত্য পরস্পরনির্ভর শুধু তাঁকে আমাদের প্রয়োজন তাই নয়, আমাদের বাদ দিয়ে তাঁরও চলে না। এ হোলো সংলাপের দর্শন, 'philosophy of dialogue'।

আমাদের মধ্যে তাঁর এই হয়ে-ওঠা (the becoming of God in us) এই হয়তো শেষ কথা বা উত্তম রহস্য। এই 'তুমি'-র, যা আবার আমার আমি, প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলে তবেই আসবে নূতন প্রভাত, ঘটবে নূতন জন্ম। স্বেচ্ছায় বরণ করে নেবো তাঁকে, না, প্রয়োজন হবে আরো কিছু বেলসেন, হিরোসিমা, দক্ষিণ ভিয়েটনাম? ব্যুবরের নিজের কথাই শোনা যাক : 'মানুষ ও মানব দ্বেষীদের অবিনাশী সংগ্রাম এখনো থামে নি, প্রতিটি জাগ্রত চিত্তে শোনা যাবে তাঁর রণহুংকার।' কে জানে, দিব্য কৌশলী হয়তো আপাত পরাজয়ের আড়ালে তাঁর গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছেন। জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে বলতে পারি নির্বাচনের দায় আমাদের সংক্রান্তির, সভ্যতার সংকটের আরেক নাম। কবি অডেন একদা অতি-পুরাতন সত্যটি পুনরুদ্ধারণ করেছিলেন : We must love each other

or die.

"বিটউইন ম্যান এ্যান্ড ম্যান" গ্রন্থে ব্যুবর বলেছিলেন অস্তিত্ববাদী বুদ্ধিজীবী জীবনের বিনিময়ে তাঁর চিন্তার যাচাই করে থাকেন। বাঁচতে হলে, মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে হলে আমাদেরও তাই করতে হবে। বেছে নিতে হবে দুয়ের একটিকে—পুনর্জন্ম বা মহতী বিনষ্টি। নান্য পন্থাঃ।
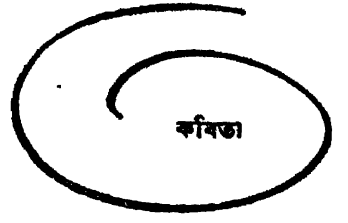
শূন্য

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

'কে বাঁচে? কয়েক লক্ষ মৃত্যু দেখি যখন যেখানে
বেঁচে আছে মানুষের মতো,
কে বাঁচে? হৃদয় হৃদ্য মানবতা বুদ্ধির পশ্চিমে
যখন ক্রমশ অস্তগত?'

বিষণ্ণ-প্রত্যয় বন্ধু শতাব্দীর শব্দমূর্তি হ'লে--
'অসুস্থ মর্বিড তুমি' তাকে বললাম,
তবু তার কথা ঝরে, ধ্বনি ফেরে মন্ত্রের মতন
মনের গহনে অবিরাম।

কালিন্দীর জলে আর কৃষ্ণ নেই, দিয়ে গেছে জলে
কে যে ঢেউ, তাই ভেবে ভেবে
অস্তে গেলা রাধিকার দিনমণি, আইলা গোধূলি,
শূন্য নামে বারংবার তার মানসাঙ্কের হিসেবে॥

মধ্যপথে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

না আমার জন্য নয়, ভয় তোমার জন্যই, তুমি
পথে না ফুরিয়ে যাও; যেমন সন্ধ্যায়
ব্রীজের ওপারে সূর্য দগদগে লাল আর দ্বিগুণ নিটোল গোল হয়ে
আকাশ ঘোষণা করে; আমি বহুকাল তোমার দুচোখ থেকে
চোখ সরাইনি বলে আজ যৌবন তেমনি বিশাল অথচ
রক্তচাপহীন হয়ে উঠেছে। সমাপ্তি কি সাধ্যের?
অথবা লৌকিক ফিটফাট কবিতার?
যাকে বারবার ভুল ফুলে লিখে
তবু আত্মজীবনীর কাছে ভ্রমরের মতো সুপ্তবিষে শেষ ফিরে আসা!
তুমি পথে আছো তবু পথিক হলেনা তাই পদচিহ্ন কেন
এখনো জানোনা, জানোনা যখন দুপায়েই গতি
তখন ভালবাসার ডাকেও উত্তর দিতে নেই;
দিলেই থামতে হয়
মনে হয় পিপাসা এমন বেড়ে গেছে যে জল না পেলে আর
চলবে না; কিন্তু সূর্য যে দ্বিগুণ গোল
যার আধিপত্যহীন আলোর দ্রষ্টব্যে অনিমেষ
চেয়ে থেকে বোঝা যায় কেন দুপুরের
সূর্যে চোখ পুড়েছিল, ত্বকে তাপ ঢুকে গেলে
রক্ত কেন কোলাহল করে!

একা তাই ব্রীজের ওপর দুই শূন্যতার ঠিক
মধ্যপথে দাঁড়িয়ে রয়েছি, শুধু তোমার জন্যই
ভয়; পাছে দীর্ঘ হয়ে গেলে তুমি যদি আর চিনতে না পারো।

অনেক দূরে থেকে দেখা : আমার জনক

জিয়া হায়দার

সমস্ত জীবন যার দুঃখ শোক দুশ্চিন্তায় এবং বিষাদে
আচ্ছন্ন সর্বদা—এই এখনো-সূর্য-না-ওঠা ভোরে
তিনি, আমার জনক, হয়তো কোনো দুঃস্বপ্নের আঘাতে অথবা
অকারণে জেগে উঠে পূবের জানলায়
ক্লান্ত চোখ রাখবেন; এবং শান্ত স্থির অচঞ্চল
পুকুরের জলে পাতাপড়া শব্দ শুনবেন, পাখির
সহর্ষ কাকলি;

হয়তো ফিরে তাকাবেন ঘুমন্ত সে মহিলার মুখে,
কখনো জীবনে যার সামান্য শান্তির স্নিগ্ধ আতর সুরভি
শত প্রয়াসেও দিতে পারেন নি; অথচ
যে কিনা সকল ক্ষণে স্নেহময়ী আঁচলের ছায়া
বিছিয়ে রেখেছে তার চতুর্দিকে—দিনের ক্লান্তিতে
দেহ অবসন্ন হলে যার ঘন কালো চুল
এখনো ফাল্গুন, রাতে ঘুমোনোর আগে
এখনো কল্যাণী—

অথবা এ জীবনের কণ্টকে আকীর্ণ দীর্ণ বিছানায় শুয়ে
তিনি কি স্বগত সুরে সমাহিত সমর্পিত সুরা ফাতেহার
পবিত্র শ্লোকের ব্যঞ্জনায়;
চাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে তার উচ্চারিত হবে—

মানুষকে ঘৃণা করা পাপ,
আর এই পৃথিবী, জীবন
সমস্ত আঘাত আর দুঃখ শোক নিয়ে,
তার সকল ইত্যাদি নিয়েও নিশ্চয়
সুন্দর, সুন্দরতর।—

অতএব হে আমার সন্তান-সন্ততি
জীবনকে আলিঙ্গন করো,
কেবল জীবনই পারে জীবনেরে অভিজ্ঞতা দিতে;
মানুষেরে ভালোবাসো তুমি তার ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি;
এবং কখনো তুমি সত্যকে রেখোনা সঙ্গোপনে,
নিজ বিবেকের কাছে অপরাধী হবে।

হয়তো প্রার্থনার শেষে অতি পরিচিত
ফুলের বাগানে তার পা রাখছেন সঙ্গীহীন সময়ের একমাত্র প্রিয়
ও বিশ্বাসী লাঠির আশ্রয়ে,
এবং একান্ত কণ্ঠে আমার সকল ক্লান্তি ক্ষমা করো প্রভু,
অথবা বুলবুলি তুই ফুলের শাখাতে দোল দিসনে এখন

হয়তো ফিরে তাকাবেন পেছনের দৃশ্যাবলী আর
উত্থান পতনে স্ফীত ঘটনা প্রবাহে—

তুমি জনক আমার,
এখনো কি স্বপ্ন দ্যাখো সমুদ্রের; যার
রূপকল্পে মৃত্যু আর সৌভাগ্যের রূঢ় আলিঙ্গন?
এখনো কি চোখের প্রদীপ
থরো থরো কেঁপে ওঠে সূর্যের আলোর আকাঙ্ক্ষায়?

ইজারাদারের দাবি

তারাপদ রায়

আমি সাত সমুদ্র তোমাদের ছেড়ে দিয়েছি।
তোমরা মাছ ধরো, সাঁতার কাটো,
জাহাজ বা নিঃসঙ্গ নৌকায় দুঃসাহসী পাড়ি দাও;
আমি কোনোদিন তীরেও দাঁড়াতে যাবো না।
বড় জোর বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের হাওয়া উঠলে
গেঞ্জি খুলে ঘরের রেগুলেটরে স্পিড্ কমিয়ে দেবো।

আমি পাঁচ-পাহাড় তোমাদের ছেড়ে দিয়েছি,
তোমরা এককজন এককেচূড়ায়
যে কোনো দেশের বোকা নিশান ওড়াও,
অথবা যা ইচ্ছে তাই করো।
আমি বড়জোর সমতল ভূমি থেকে, গৃহস্থ বাড়ির জানালা থেকে
'কমিট্ নো নুইসান্স' বলে হাতজোড় করবো।

সব পাহাড়, সবসমুদ্রের মালিকানা
আমি সমস্তই তোমাদের ইজারা দিলাম।
শুধু যদি কোনোদিন কোনো ভুলে চলে যাই,
বোলো, 'ছোটবাবু, এই পাহাড়, এই সমুদ্র,
এই যা সব দেখছেন, এই সবই তো আপনার।'

মন্দির হওয়ার মন্ত্র

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

তোমার রক্তের উষ্ণ প্রবাহ মুহূর্তে
যদি ডাকে, যদি তীক্ষ্ন স্পর্শে কাছে ডাকে,
অপরাধ আমার সনাক্ত অনুভবে?

না না কোন তিরস্কার কোরো না এখন
আগামী কখনো সন্ধ্যা নিও হাতে,
যে কোন নির্মম শাস্তি মাথা পেতে নেব।

এখন হাতের মুঠো ভর্তি থাক, ছুটে যাক নদীর চরণে,
তোমার নরম স্পর্শে রক্তের প্রাচুর্যে।

আমার বুকের ভাষা সে শুধু আমার
চিরকাল থাক সে ডাকার অধিকার।
মন্দির হওয়ার মন্ত্র শিখিনি কখনো,
মন্দিরের সিঁড়িতেও চাপচাপ অন্ধকার ভয়,
মনে হয় ঘোর ষড়যন্ত্র ওই মন্দিরে-মন্দিরে।

এই রক্তমাংস নিয়ে কি করে মন্দির হবো বলো!

আপনি কী পারবেন!

শোভন সোম

আপনি কী শরীর থেকে সমস্ত যন্ত্রণা
নির্মূল করবেন,
যতখানি রোগের বিস্তৃতি
কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে, রেডিয়ম দিয়ে তাড়াবেন!
রোগের উপান্তে স্নিগ্ধ নাম নিরাময়,
তন্ন তন্ন করে তাই দেখছেন আমায়!

রোগের মতন সারাক্ষণ
আমাকে জড়িয়ে আছে শরীরের আরো কিছু অসহ্য যন্ত্রণা
আরো ভয়াবহ,
তন্ন তন্ন করে কেটে দেখুন না, ডাক্তার
কোনখানে এত তাপ এত ঘৃণা ভালোবাসা
বাঁচবার বাসনা
আমাকে জ্বালায়.........
কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে পুড়িয়ে এদের
তাড়ান, দোহাই!

সীমান্ত প্রদেশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দরজার আড়াল থেকে হীরেন দেখতে পেল, ওর স্ত্রী ললিতাকে ওর বন্ধু হেমকান্তি চুমু খাচ্ছে। হীরেন একটু হাসলো।

হীরেন চিঠি ফেলতে গিয়েছিল, কাল বিকেলবেলা বেড়াতে গিয়ে ওরা যে-দোকান থেকে ঢাকাই পরোটা খেয়েছে, তার পাশেই অশথগাছের সঙ্গে লাগানো ডাকবাক্স, হেমকান্তির কাছে ডিরেকশন শুনে নিয়ে হীরেন সেটা ঠিকই চিনতে পারতো, এবং তা হলে চিঠিটা ফেলে আসতে হীরেনের সময় লাগতো বারো মিনিট, মেরে কেটে দশ মিনিটতো বটেই। তা বলে হীরেন যে অন্য সময়ও অনুপস্থিত থাকে না তা নয়, বা, কালকে বিকেলেই তো বেড়াবার সময়, একটা লোকের হাতে বেতের তৈরী ব্যাগ দেখে হীরেন এমন মোহিত হয়ে যায় যে, সেই লোকটির সঙ্গে বেত-শিল্প বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা জুড়ে দেয়, বিরক্ত হয়ে, সেই মন্থর অবসন্ন সন্ধ্যায় ললিতা ও হেমকান্তি আলাদা হাঁটতে থাকে মাঠের মধ্যে, অনেক দূর চলে গেলে হেমকান্তি চেঁচিয়ে বলেছিল, এই হীরেন, আমরা খালের ধারে গিয়ে বসছি! তুই আয়– এ কথা বলারও অনেকক্ষণ পর হীরেন এসেছিল। সুতরাং এখন এই চিঠি ফেলতে যাবার দশ মিনিটের কোনো আলাদা মূল্য নেই, শুধু, হীরেন যদি সত্যি সত্যি দশ মিনিট ব্যয় করতো, তাহলে এই দৃশ্যটা তাকে দেখতে হতো না। কারণ, ললিতা ও হেমকান্তি এ বিষয়ে মুখে কিছু আলোচনা না করে নিলেও দু'জনের মনে মনে নিশ্চিত ছিল, এখন সময় আছে দশ মিনিট, এবং ললিতা ঝট্‌কা মেরে হেমকান্তিকে ঠেলে দেবার সময় বলেছিল, কি করছেন কি! আপনি পাগল, এক্ষুণি ও এসে পড়বে—। হেমকান্তি বলেছিল, না, আসবে না, একবার, একবার—

কিন্তু হীরেন দশ মিনিট খরচ করেনি। সেটা ঠিক তার দোষও নয়। হীরেনের হাতে ঘড়ি নেই, কিন্তু বোধহয় ও সাড়ে তিন কি চার মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসেছে। এই অসময়ে ফিরে আসার জন্য, পরোক্ষে হেমকান্তিই দায়ী। পিসীমাকে বলে এসেছিল পেঁছি-সংবাদ দেবে, কিন্তু যেদিন হীরেনরা হেমকান্তির কাছে এসে পেঁছোয় সেদিন শনিবার বিকেল, পরদিন রবিবার ডাক বন্ধ, আজ সোমবার সকালে চা-পর্ব শেষ করার পর, হীরেনেরই মনে পড়ে চিঠি লেখার কথা, ওর সুটকেশেই পোস্টকার্ড ছিল, হীরেন একপিঠে লেখার পর অন্যদিকে ললিতা পিশতুতো বোন বুলুকেও কয়েক লাইন লিখে দেয়, হেমকান্তি তখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, ললিতা মুর্গীর মাংসের গা থেকে পালক ছাড়াচ্ছে, সে-সময় হীরেনের ঠিক কিছুই করার নেই ভেবে সে নিজেই চিঠিটা ফেলে আসার কথা ভাবলো, চাকর এই মাত্র বাজার থেকে এসেছে, তাকে আবার এখুনি পাঠানো ঠিক নয়। পরণে সিল্কের লুঙ্গি ছিল, তার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিয়ে হীরেন যখন বেরুবে, তখন হেমকান্তি চেঁচিয়ে বলেছিল, সিগারেট নেই, দু প্যাকেট সিগারেটও আনিস তো! হীরেন আচ্ছা বলে বেরিয়ে যায়, ভুজাওলার দোকান পর্যন্ত পেঁছেই ওর মনে পড়ায় পকেটে হাত দিয়ে দেখে যে পকেট ফাঁকা। কাল রাত্তিরে, হেমকান্তি বলেছিল এখানে বড় চোরের উপদ্রব, তাই হীরেন পকেট থেকে টাকাকড়ি ও খুচরো পয়সা পর্যন্ত সবই সুটকেশের মধ্যে

রেখেছিল। তাহলে সিগারেট কেনার পয়সা আনার জন্যই তাকে ফিরতে হয়।

হীরেন ভেবেছিল বাড়িতে আর না ঢুকে জানলা দিয়েই পয়সা চেয়ে নেবে। কিন্তু তখন মনে পড়ে, উঠোনের রোদে বসে হেমকান্তিকে ও দাড়ি কামাতে দেখে এসেছে, ললিতাও রান্নাঘরের সামনে বারান্দায়, সুতরাং ওরা কেউই শুনতে পাবে না হীরেন তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে, বৈঠকখানা পেরিয়ে, হেমকান্তির ঘর পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় হেমকান্তির ঘরের একপাল্লা ভেজানো দরজা দিয়ে একেবারে ওপাশের দেয়ালের কাছে সেই চুম্বনের দৃশ্য দেখতে পায়। ঠিক ওদের না দেখলেও, হয়তো আলমারি-জোড়া আয়নায় ওদের ছায়া দেখেছিল, মোটকথা হীরেন দেখেছিল মাত্র একঝলক, ললিতার চুলের মধ্যে হেমকান্তির হাত ও মুখের কাছে মুখ। আর হীরেন কয়েকটা কথাও শুনতে পেয়েছিল, সে কথাগুলো ছবির মতন, সব দেখতে পাওয়া যায়। উঠোনে হেমকান্তির দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ছড়িয়ে আছে, রান্নাঘরের বারান্দায় রাখা আছে আনাজ ও মাংস, চাকর বাথানি বাইরের কুয়ো থেকে জল তুলছে। হীরেন একটু হাসলো।

অন্তত দশ মিনিট হীরেনের বাইরে থাকার কথা ছিল, তার মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন কি চার মিনিটে ফিরে এসেছে। না এলেই ভালো হতো, এই দশ মিনিটের দাম বড় কম নয়, হয়তো সারাজীবন, দশ মিনিট বাদে এলে ওরা নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে যেতো, ওরা দুজনের কেউই তো কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়।

হীরেন এক মিনিট কি দেড় মিনিট ওখানে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরই মনে পড়লো, হঠাৎ ওরা ওকে এখন দেখতে পেলে ব্যাপারটা বিশ্রী লজ্জাজনক হয়ে পড়বে, ওরা দু'জন হয়তো ভাববে হীরেন আগে থেকেই ওদের সন্দেহ করেছিল বলেই গোপনে ফিরে এসে চোরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে হীরেনের এই কথাই মনে হয় যে, সে মোটেই এমন খুঁতখুঁতে ও অনুদার নয় যে বন্ধুকে সন্দেহ করবে। বন্ধুর সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে একা রেখে সন্দেহবশে আড়ি পেতেছে—ওরা যদি তাকে দেখে এখন সেইকথা ভাবে, সেটা খুবই অন্যায় হবে। হীরেন ঘুণাক্ষরেও এসব কিছু ভাবেনি, সেইটা প্রমাণ করার জন্যই যেন তার সেখান থেকে তখুনি চলে যাওয়া দরকার। তাছাড়া, দ্বিতীয় কারণটি এই, এখুনি যদি ওরা দুজনে তাকে দেখে ফেলে, তা হলেই ব্যাপারটা সারাজীবনের মত স্থায়ী হয়ে গেল, হেমকাতির সঙ্গে সে ঝগড়া করতে বাধ্য হবে, ঘটনাটা দু'জনের কাছেই জানাজানি হয়ে গেলে—তারপর আর শান্তভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, ললিতার সঙ্গেও তার সম্পর্ক কি দাঁড়াবে কে জানে—শেষ পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা একটা আত্মহত্যায় পর্যন্ত গিয়ে ঠেকতে পারে। অথচ সামান্য একটা চুমুর জন্য, দেখে ফেলার জন্য—। এখানেই হীরেন একবার হাসলো। ভাবতেই আরও তিন-চার মিনিট কেটে যায়, চুম্বন শেষ করে ললিতা ও হেমকান্তি একটু দূরে সরে গিয়ে পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এই অবসরে হীরেন খুব সাবধানে আবার উঠোন পেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে।

এখন আর সিগারেট খাবার কোনো উপায় নেই জেনে সামান্য অস্বস্তি হলো, শরীরটার মধ্যেও খানিকটা চিন্‌চিন করছে। বস্তুত, হীরেন শরীরে এক ধরনের অবসাদ বোধ করতে থাকে, ললিতার চুলের গুচ্ছে হেমকান্তির একটা হাত মুঠো করা—হেমকান্তি মুখখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে আনছে—এই দৃশ্যটাই শুধু তার চোখে ভাসছে। হীরেন লক্ষ্য করলো, ওর কপালের কাছে ও নাকের ডগাটা একটু গরম গরম লাগছে, অর্থাৎ ও উত্তেজিত

হয়ে পড়েছে। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, হীরেন ভাবলো, কিছুই এতে আসে যায় না, সামান্য একটা চুমু, সে নিজেও কি আগে একাধিক মেয়েকে চুমু খায়নি? সে কি তাদের জন্য বিরলে দুঃখ বোধ করে? মোটেই না—তারা কোথায় হারিয়ে গেছে, বিশেষ বিশেষ সেইসব চুমু খাবার মুহূর্তে খানিকটা আকর্ষণ বোধ করেছিল—এই পর্যন্ত। একমাত্র অরুণা, মাঝে মাঝে অরুণার ব্যাপারটা একটু খট্‌কা লাগে, কিন্তু সে ঘটনাটাই তো অন্য রকম। অরুণাকে তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে, মনে পড়লেই একটু খারাপ লাগে। কিন্তু অরুণা তাকে ভুলে গেছে নিশ্চয়ই, ভুলে যাওয়াই ভালো। ললিতাও হেমকান্তিকে ভুলে যাবে—এবার হেমকান্তির জন্য একটা ভালো পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দিতে হবে দেখছি!

লাল ডাকবাক্সটার গায় এমন একটা মরচে ধরা তালা লাগানো যে দেখলে সন্দেহ হয়—কোনোদিন এটা খোলা হয় কিনা! হীরেন একটু ইতস্তত করলো, এসব মফঃস্বল শহরের ডাক ব্যবস্থায় ঠিক বিশ্বাস নেই, সে মিষ্টির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে গেল। দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে চায়ের প্লাশ হাতে নিয়ে কয়েকজন যুবক আড্ডা দিচ্ছে। চায়ের দোকানে আড্ডা মারার স্বভাব কলকাতা থেকে পুরুলিয়ার মতন শহরেও পৌঁছে গেছে। হীরেনের খুবই লোভ হলো ঐ দোকানে বসে একটু চা খায়, আরও খানিকটা সময় কাটিয়ে ফিরতে চায়, কিন্তু উপায় নেই, পকেটে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই! সিগারেটের তৃষ্ণাও তাকে আকুল করে তোলে। এখানে একা বসে চায়ের সঙ্গে সিগারেট খেতে পারলে তার মুখখানা স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারতো, তখন সে ওদের দুজনের মনে সামান্যতম সন্দেহ না জাগিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতো।

স্বাভাবিক তাকে হতেই হবে, হীরেন খুব মনের জোর দিয়ে কথাটা ভাবলো, একটা চুমুর জন্য কিছু আসে যায় না। হেমকান্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব সে নষ্ট করতে পারবে না। আর, ললিতার ভালোবাসা হারালে পৃথিবীতে সে আর কোথায় আশ্রয় পাবে? হীরেন তখন একটু আগে দেখা সেই দৃশ্য ও ওদের দুজনের যা সামান্য কথা সে শুনতে পেয়েছে তাই মনে করার চেষ্টা করলো।

হীরেন যখন দরজার কাছাকাছি এসেছিল, তখন ললিতার কাঁধে হেমকান্তির হাত। তা দেখে হীরেনের একটুও খটকা লাগেনি, এমনকি একথাও ভাবেনি, মাত্র সাড়ে তিনমিনিট আগে ওরা দুজন ছিল উঠোনে ও রান্নাঘরে, এরই মধ্যে দুজনে দুজনের কাজ ফেলে ঘরের মধ্যে চলে এলো কি করে? তবে কি আগে থেকেই ওদের ঠিক করা ছিল, হীরেন বেরিয়ে যাবার পরই চোখাচোখিতে কথা ঠিক হয়ে যায়? হীরেন তখনও একথা ভাবেনি, ভেবেছিল পরে, তার আগে সে অন্যমনস্কভাবে দরজা পেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় শুনতে পেলো, কি করছেন কি? আপনি পাগল! এক্ষুণি ও এসে পড়বে!—আর, তারপরই হেমকান্তির ব্যাকুল মিনতিপূর্ণ গলা, না আসবে না, একবার, একবার! হীরেন তখনি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, যেন নিজের স্ত্রী ভেবে নয়, কোথাও কোনো যুবতীকে কোনো যুবক চুমু খাচ্ছে—এই দৃশ্য দেখে ফেললে যেমন আড়াল থেকে আরও দেখতে ইচ্ছে হয়—অনেকটা সেইরকম। ললিতা বলেছিল, না, একবারও না, ছিঃ!

হেমকান্তি বলেছিল, এসো, একবার, শুধু একবার!

—না! না!

—হ্যাঁ! এসো!

—না! কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন!

—আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, তুমি জানো না!

এরপর হেমকান্তি একহাত ললিতার কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছে ডুবিয়ে অন্য হাতে ললিতার চিবুক ধরে, এবং ললিতার সকালবেলার ফোলা ফোলা ঠোঁটে প্রগাঢ় চুম্বন করে। একবার মাত্র। চুম্বনের পর দুজনই কয়েক সেকেন্ড একেবারে নিঃশব্দ। তারপর, ললিতা খানিকটা কাতর গলায় বলেছে, কেন এরকম করলেন?

হেমকান্তি চাপা গলায় স্বীকার করে, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু, আমি আর পারছিলাম না, তুমি এত সুন্দর—

—ও কথা আর বলবেন না।

—ওকথা বারবার বলবো। কিন্তু এইমাত্র যা করলুম, তার জন্য আমার অনুতাপ হচ্ছে, হীরেনকে আমি দুঃখ দিতে চাই না।

—সত্যি এরকম আর কখনো করবেন না বলুন? ও আপনার কতদিনের বন্ধু

—আমার ওপর রাগ করো না, আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনো না

এই সময় হীরেন চলে এসেছিল।

চিঠি ফেলার পর হীরেন স্টেশনের দিকে বেড়াতে যায়। এই মাত্র একটা ট্রেণ ছেড়ে গেল। এই ট্রেণে খবরের কাগজ এসেছে, কিন্তু তার তো কাগজ কেনারও উপায় নেই। সে উঁকি মেরে প্রথম পাতার খবরগুলো দেখে নেবার চেষ্টা করে। চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ ও সিগারেট খাওয়া—কলকাতার এই বাঁধা অভ্যেস আজ কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু এখানকার রোদ্দুরটা এত ভালো, কলকাতার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না, বেশ গাঢ় ধরনের শীতের সকালে এমন ধপধপে সাদা রোদ্দুর, সারা শরীরটাকে বেশ মোলায়েম করে তুলেছে। এই রোদ্দুরে বুড়ি ভিখারীর মুখও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনের বাইরেই পুরোনো ডাকবাংলো, সাহেব-মেম বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রোদ্দুরে আরাম করছে। ওদিকে বোকারোর কাজ শুরু হয়েছে বলে, এ পথ দিয়ে আবার অনেক খাঁটি সাহেব-মেমের যাতায়াত সুরু হয়েছে। টুকটুকে লালরঙের সোয়েটার পরা দু'টি ফুটফুটে বাচ্চা বল নিয়ে খেলা করছে মাঠের মধ্যে, একটি অষ্টাদশী মেম-তরুণী কি-যেন খেলার নিয়ম যোগাচ্ছে ওদের। নীল-রঙা গাউন, মাথায় হলদে স্কার্ফ বাঁধা, কি স্বচ্ছন্দ স্বাস্থ্য মেয়েটির, মসৃণ চামড়া, ঝকঝকে সাদা দাঁত, নরম রক্তিম ঠোঁট। হীরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ খেলা দেখতে লাগলো। ওদের তো ওসবে কিছুই আসে যায় না। অনেক সময় স্বামীর সামনেও বউকে চুমু খেলে-সেটা হয় ঠাট্টা। কি যেন একটা রুমাল-চোর ধরনের খেলা আছে ওদের? যে জিতবে, সেই পাশের মেয়েটিকে একবার চুমু খাবে—

দরজা খোলা ছিল কেন? ওরা দরজাটা বন্ধ করে নিলেই পারতো। কিন্তু সকালবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করা দৃষ্টিকটু। সাড়ে তিন কি চার মিনিটেই ওরা ব্যাপারটা ঠিক করে ফেললো কি করে? আসলে যা মনে হয়, ওরা কিছুই আগে ঠিক করেনি, রান্নাঘরের বারান্দায় ছিল ললিতা, উঠোনে বসে হেমকান্তি দাড়ি কামাতে কামাতে দু'একটা ফষ্টিনষ্টি করছিল। কিছু একটা দরকারে ললিতা এসেছিল ঘরের মধ্যে, সেই সময় হেমকান্তিও টপ্ করে উঠে এসে ঝোঁকের মাথায় ওকে জড়িয়ে ধরে। একটা অন্ধ আবেগের ব্যাপার। ছবিটা ভেবে নিয়ে নিজের যুক্তিবাদী কল্পনা শক্তিতে হীরেন বেশ খুশী হয়ে ওঠে। অন্ধ আবেগের ব্যাপার, হঠাৎ করে ফেলে—দু'জনেই এখন অনুতপ্ত, তাতো ওদের কথা শুনেই বোঝা গেল। ললিতা তো রাজী হয়ইনি, হেমকান্তিটা বরাবরই একগুঁয়ে, যখন যা মনে হয় না করে ছাড়ে

না, কিন্তু পরে অনুতাপ করে। হেমকান্তির অন্যায় আবদারে ললিতা যে চেঁচিয়ে ওঠেনি, কান্নাকাটি করে নাটক বাঁধায় নি, এতে ললিতার প্রতি হীরেনের কৃতজ্ঞতাই বোধ হয়, নাটকীয় ব্যাপার সে একেবারেই পছন্দ করে না।...ওদের যে-কটা কথা শুনেছে, তাতে হীরেন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে, ললিতা আগাগোড়াই হেমকান্তিকে বাধা দিয়েছে, হেমকান্তির ছেলেমানুষী দৌরাত্মির কাছে একবারের মত আত্মসমর্পণ করলেও, মন থেকে সায় দেয়নি কিছুতেই। ললিতার কথার সুরে একথাও ফুটে উঠেছে যে, হেমকান্তির অন্যায় আবদারের জন্য—হীরেনকে বলে দিয়ে সে কোনো শাস্তি আদায় করতেও পারবে না। হেমকান্তি হীরেনের প্রায় জন্ম থেকে বন্ধু, গোটা ইস্কুল আর কলেজ জীবন এক সঙ্গে কাটিয়েছে, হীরেনের বিয়ের সাতপাকের সময় হেমকান্তি পিঁড়ি ধরেছিল, বৌভাতের দিন দোতালার বারান্দায় ফ্লাড লাইট ফিট করতে গিয়ে শক্ খেয়ে হেমকান্তি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। সেই হেমকান্তির সঙ্গে হীরেনের বিচ্ছেদ কল্পনাও করা যায় না, ললিতাও তা জানে। তার বদলে, সামান্য একবার—। 'কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছেন?' ললিতা একথা বলেছিল কেন? হীরেন আবার একটু হাসলো। পরপুরুষের মুখে রূপের স্তুতি শুনে একটু অন্তত বিচলিত বোধ করবে না—এমন মেয়ে আবার হয় না কি? ওটা তো স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক যত প্রিয় বন্ধুই হোক, তার সুন্দরী স্ত্রীকে আড়ালে পেলে যে-কোনো পুরুষের পক্ষেই একটু ফষ্টিনষ্টি করার লোভ জাগা। দুজনের মধ্যে কেউ যদি একটু বদ হতো, তা হলেই ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াতো। কিন্তু হীরেন হেমকান্তিকে জানে—ওর চরিত্রে হঠকারীতা থাকলেও মলিনতা নেই এক ছিটে। আর ললিতা, সাড়ে চার বছর বিয়ে হয়ে গেছে, তবু হীরেন জানে—ললিতাকে ছাড়া তার জীবনটা শূন্য হয়ে যাবে, ললিতা ছাড়া তার আর কোনো অবলম্বন নেই। স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু ভালোবাসা পাওয়াই যথেষ্ট নয় ললিতার স্বভাবের মধ্যে একটা গভীর সমবেদনা আছে।

ললিতার প্রথম কথাটাতেও একটু খট্‌কা লাগতে পারে। 'কি করছেন কি? এক্ষুনি ও এসে পড়বে!' হীরেনের এসে পড়াতেই একমাত্র আপত্তি। একমাত্র না হোক্, হীরেন ভাবলো, সত্যিই তো এইটাই প্রধান। দেখে ফেলাটাই তো সবচেয়ে ভয়ংকর! অন্য কেউ দেখে না ফেললে, আর সব কিছু মিটিয়ে ফেলা যায়, ভুলে যাওয়া, দূরে যেতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার কেউ দেখলেই তা শাশ্বত হয়ে গেল! ভাগ্যিস, হীরেন যে দেখে ফেলেছে, তা ওরা দেখে নি! অজান্তেই হীরেন মনে মনে হিসেব করে, সাত না আট? আটজন—এ পর্যন্ত ললিতা ছাড়া আরও আটটি মেয়েকে চুমু খেয়েছে হীরেন, সেজো মামীমাকে ধরেই, বিয়ের পরই তো দুজনকে, একবারও কেউ দেখেনি, কেউ সন্দেহও করেনি, তাই কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই! দীপ্তির সঙ্গে এখনো দেখা হয়, ললিতার সঙ্গে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েও তো দীপ্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কত স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা হলো, মুখের একটি রেখাও বদলায় নি। কল্যাণী বিয়ের পর বোম্বাইতে আছে, তিনটি ছেলেমেয়ে হয়ে না কি। নীলি, মানে নীলিমা—হীরেনের পিশতুতো বোন, তাকে তো চুমু ছাড়াও আরও কত কি,—সে তো এক আই. এ. এস-কে বিয়ে করে এখন খুব সমাজসেবিকা হয়েছে—সংবাদে সেজোমামীমা এখনো নিরালায় দেখলেই চোখের ইঙ্গিত জানায়—এসব তো আর কেউ দেখেনি, তাই কোথাও অশান্তি নেই! দেখাটাই তো একমাত্র দোষের, তাছাড়া কোথায় কি বলছে—কে জানে! ওদের কারুর জন্য হীরেনের পিছুটানও নেই, শুধু, একমাত্র অরুণা, অরুণার কথা ভাবলেই হীরেনের বুক শিরশির করে—। না, অরুণাকে চুমু খাবার সময়েও

কেউ দেখেনি, কিন্তু, একমাত্র অরুণাকেই ও চুমু খেয়েছিল জোর করে। তখন হীরেনেরা থাকতো কোন্নগরে, ওদের পাশের বাড়ির পরিবারটা ছিল ছন্নছাড়া। অরুণার বাবা গগনবাবু ছিলেন রেসের বুকি, লোকের কাছ থেকে পাঁচ আনা-দশ আনা পয়সা নিয়ে রেসের বাজি ধরতেন, প্রত্যেক শনিবার ওদের বাড়ির সামনে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লেগেই থাকতো। গগন-বাবুকে দেখলেই মনে হতো লোকটা ভালো নয়, মানুষ ঠকানোই ও'র কাজ, তা ছাড়া, স্টেশনের পাশে রিক্সাওলাদের সঙ্গে বসে গগনবাবুকে দিশি মদ খেতে হীরেন নিজের চোখে দেখেছে! অরুণার দাদা সাধনটা তো ছিল এক নম্বরের গুণ্ডা, শুধু পাড়ায় বখামিই নয়, রাত্তিরবেলা ছিনতাই, জোচ্চুরির কাজেও ওস্তাদ ছিল, দু'তিনবার পুলিশেও ধরা পড়েছিল, পাড়ার এক রাজনৈতিক নেতা বারবার ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। অরুণার ছোট ভাইবোনরা বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে রাস্তায় ছিপি খেলতো, কি কুৎসিত গালাগালি শিখেছিল দশ-বারো বছরেই—অরুণার মা বালিশের ওয়াড় আর ফ্রক-পায়জামা শেলাই করে বিক্রি করতেন। সেই বাড়ির মেয়ে অরুণা, অরুণা কলেজে পড়তো, অসম্ভব তেজ ছিল তার। পাড়ার কারুর সঙ্গে, বাড়ির কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলতো না, নিরেট মুখ করে সোজা হয়ে হেঁটে যেতো রাস্তা দিয়ে। পাড়ার ছেলেরা, অনেক সময় সাধনের বন্ধুরাও অরুণাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য করেছে, সিটি দিয়েছে, অরুণা কোনোদিন ঘাড় তুলে তাকায় নি। সন্ধেবেলা দুটো টিউশানি করতো, তাই দিয়ে পড়ার খরচ চালিয়েছে। হীরেন চেয়েছিল অরুণার কাছাকাছি আসতে। গোড়ার দিকে অরুণাকে শ্রদ্ধা করতো সে, ক্রমে একধরনের মায়া ও শারীরিক আকর্ষণ জাগে। বছর সাতেক আগের কথা, হীরেন তখন সদ্য পোর্ট কমিশনার্স অফিসে চাকরি পেয়েছে, হীরেন চেয়েছিল অরুণাকে বিয়ে করে তাকে ঐ পরি-বেশ থেকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু অরুণা হীরেনকে গ্রাহ্য করেনি, কিছু যেন একটা ব্রত ছিল তার। অরুণা একমাত্র কিছুটা কথাবার্তা বলতো হীরেনের দিদির সঙ্গে, হীরেনের দিদি তখন উইমেন্স কলেজে পড়ান, অরুণা মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসতো পড়াশুনো দেখে নিতে। হীরেন চেষ্টা করেছিল অরুণার সঙ্গে ভাব করতে, অরুণা ঠাণ্ডা গলায় কাটাকাটা উত্তর দিয়েছে শুধু, অরুণার চোখ দুটো অসম্ভব জলজলে, সব সময় চোয়াল শক্ত, ভেতরে ভেতরে যেন সর্বক্ষণ একটা তীব্র ক্রোধ জ্বলছে। হীরেন একদিন বলেছিল, বাগবাজারে একটা মেয়েদের স্কুলে একটা চাকরি খালি আছে—আমার এক বন্ধু বলছিল, তুমি করবে নাকি? আমার বন্ধুর কাকা সেই স্কুলের সেক্রেটারি—। অরুণা শুধু সংক্ষেপে জানিয়েছিল, আমি কারুর চেনাশুনোর জোরে কোনো চাকরি নিতে চাই না!

হেমকান্তির মতন হীরেন অমন হঠকারী নয়, কিন্তু অরুণার ব্যাপারে হীরেন কিছু-দিনের জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। সে যে সৎ এবং ভালো উদ্দেশ্যেই অরুণার সঙ্গে মিশতে চায়—অরুণা এটুকুও বুঝতে চায়নি বলেই যেন হীরেন ক্রমশ বেশী ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। একদিন দিদির ঘরে অরুণাকে একা পেয়ে, দিদি তখন নিচে বাথরুমে গেছে, হীরেন অকস্মাৎ এসে অরুণার হাত ধরে আবেগবিহ্বল গলায় বলেছিল, অরুণা, শোনো—। অরুণা এক ঝটকায় সরে গিয়ে তিক্ত গলায় বলেছিল, হাত ধরছেন কেন? হীরেন তখুনি কাচুমাচু ভাবে বলেছিল, অরুণা, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই।—অরুণা ওর দিকে না তাকিয়েই বলে, আমি কারুর বন্ধুত্ব চাই না। হীরেন আহতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেন? সত্যি, বিশ্বাস করো! অরুণা অস্থির হয়ে জ্বলে ওঠে, আপনি

কি চান, আমি এখান থেকে চলে যাই?

আরও দু'তিনটি কথা বলার পর অরুণার তিক্ততা আরও বাড়তে দেখে হীরেন উন্মত্তের মতন হয়ে যায়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অরুণাকে জড়িয়ে ধরেছিল, অরুণা সমগ্র শক্তিতে বাধা দিয়ে হীরেনের চুল ধরে টানতে থাকে, এক হাতে সরিয়ে দিতে চায় হীরেনের মুখ, তবু হীরেন জোর করে অরুণার ঠোঁট কামড়ে ধরে, একহাত নেমে আসে অরুণার বুকের কাছে, তখনও কাতরভাবে বলতে থাকে, অরুণা আমায় বিশ্বাস করো—। কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অরুণা বলে, আপনারা সবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করবেন? আপনারা সবাই—অরুণা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে এবং তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে ঘটনাও কেউ দেখেনি, দিদি জানতে পারেনি, কেউই জানে নি, কিন্তু অরুণা আর কখনো ওদের বাড়িতে আসেনি এবং মাসখানেকের মধ্যেই বাঁকুড়া না কোথায় ইস্কুলের কাজ নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে অরুণা ওর বাড়ির লোকের সঙ্গে বিষম ঝগড়া করেছিল।

রোদের তাপ বেশ চড়া হতে হীরেনের খেয়াল হয় অনেকক্ষণ আগেই তার ফেরা উচিত ছিল। এতক্ষণ না ওরা আবার তারজন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এবং ডাকবাংলোর কাছ থেকে সরে এসে কখন যে সে চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও খেয়াল করেনি। একটু দ্রুত বাড়ি ফেরার পথ ধরতেই কিছুটা দূরে গিয়ে, মিউনিসিপ্যালিটির সামনে হেমকান্তির সঙ্গে তার দেখা হয়। হেমকান্তির স্নান করা চেহারা, পুরোদস্তুর স্যুট-টাই ও পালিশ-করা জুতো। হেমকান্তি এখানকার আদালতের হাকিম। হীরেনকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো, কিরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? হীরেন আলগাভাবে বললো, ঘুরে ফিরে সহরটা দেখছিলাম—ছোট হলেও মন্দ না সহরটা, বেশ ছিমছাম।

—তোকে সিগারেট কিনতে বলেছিলুম, ললিতা বললো, তুই পয়সা নিয়ে বেরোস নি! হীরেন সহাস্যে উত্তর দিল, এই পর্যন্ত এসে পকেটে হাত দিয়ে দেখি যে খালি! দে, সিগারেট দে!

হেমকান্তির কাছ থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তোর ছুটি পাওনা নেই?

—আজ সোমবার তো, আজ অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে তারপর টানা চারদিন ছুটি নিয়ে নেবো। কাল অযোধ্যা পাহাড় যাবি!

—সেটা কতদূরে? পুরুলিয়ায় আবার পাহাড় আছে নাকি?

—পাহাড় মানে ঢিবি আর কি। বেশী দূরে না, তবে জায়গাটা সুন্দর, একটা চমৎকার বাংলো আছে। দেখি লাহিড়ীকে বলে একটা স্টেশন ওয়াগন জোগাড় করতে পারি কি না। না হলে, কোনো ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলে রাখবো—।

—তুই খেয়েছিস?

—না, ললিতা মাংস চাপিয়েছে। দুপুরে এসে খাবো এখন। হেমকান্তির হন্‌হন করে হেঁটে যাওয়া চেহারার দিকে হীরেন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পাতলার ওপর চেহারা, হেমকে দেখলে এখনো তিরিশের নিচে বয়েস মনে হয়।

বারান্দাতেই তোলা উনুন এনে ললিতা মাংস চাপিয়েছে। এর মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে তার, একরাশ কোঁকড়া চুল পিঠময় ছড়ানো। রোদ্দুরে এখন আর অমন ধপধপে সাদা নেই, এখন একটু হলদেটে, তবু এই মফঃস্বল রোদ্দুরে ললিতার সুন্দর মুখ আরও সুন্দর

মনে হয়। উনুনের আঁচে খানিকটা লালচে ছায়াও পড়েছে।

হীরেনের দিকে চোখ তুলে ললিতা জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? হীরেন বললো, ঘুরে ফিরে দেখে এলাম। এখানে বেতের জিনিস বেশ শস্তা। ভাবছি যাবার সময় এখান থেকে কয়েকটা বেতের চেয়ার নিয়ে যাবো।

—হ্যাঁ! এ্যাদ্দুর থেকে আর বেতের চেয়ার নিতে হবে না। তা ছাড়া বেতের চেয়ার বেশী দিন টেঁকে নাকি?

—বরং কয়েকটা বেড কভার নিয়ে যাবো। ঠাকুরপো বললো, এখানকার বেড কভার নাকি ভালো?

কথা বলতে বলতে হীরেন এসে রান্নাঘরের বারান্দাতেই বসে পড়ে। বাথানি এক কোণে বসে শিল-নোড়ায় পেঁয়াজ বাটছে আর গামছা দিয়ে চোখের জল মুছচে। বড় সাইজের দু'তিনটে দাড়কাক কি জন্য চিৎকার করছে কে জানে? হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তোমার রান্নার কত দেরী?

ললিতা মুখ টিপে হেসে বললো, তোমার এর মধ্যেই খিদে পেয়েছে নাকি?

—তা মন্দ পায়নি! এখানকার জলে বেশ খিদে হয়!

—কোলকাতার জলেও তো তোমার খিদে কম দেখি না।

—তা বলে তুমি মোটেই আমাকে পেটুক বলতে পারো না! কতক্ষণ চাপিয়েছো, দাও একটু চেখে দেখি।

—বেশীক্ষণ চাপেনি, এখনো কাঁচা। তুমি বরং ততক্ষণ স্নান করে নাও না। আর একটা উনুনে ভাত বসিয়ে দিয়েছি।

—দাঁড়াও, এখুনি কি চান করবো? খবরের কাগজ দেয়নি, না?

—উঁহু!

—হেমটা বোধহয় কাগজের পয়সা বাঁচায়। কোর্টে গিয়ে কাগজ পড়ে!

—তোমার বন্ধু বোধহয় একটু কৃপণ আছে, না?

—কৃপণ? হেম? মোটেই না—

—চারজন খাবো দুবেলা, মোটে একটা মুরগী আনতে দিয়েছে কেন? তুমি কিন্তু কাল সকালে নিজে বাজার করবে। সবকটা দিন বন্ধুর ঘাড়ে চালিও না।

—হেম মোটেই কৃপণ নয়। ও খাওয়া-টাওয়া বেশী পছন্দ করে না, কিন্তু অন্য অনেক-রকম শৌখিনতা আছে। দেখছো না, ঘরে কতরকম স্নো-পাউডার সেন্টের শিশি! ব্যাচেলার মানুষ, বেশ আছে!

—তোমার বুঝি লোভ হচ্ছে? তুমি খুব খারাপ আছো, না?

—আমার মতন ওর তো কোনো বন্ধন নেই!

—আমি তোমার বন্ধন?

—বন্ধনই তো—

এ কথা বলে হাসতে হাসতে অভ্যাস বশে হীরেন ললিতার দিকে হাত বাড়ায়। ললিতা ত্রস্তে সরে গিয়ে চাকরকে ইসারায় দেখিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলে, কি হচ্ছে কি? যত দিন যাচ্ছে তত তোমার লোভ বাড়ছে!

কথা শেষ করে ললিতাও ছোট্ট করে মধুরভাবে হাসে। দাঁড়িয়ে ওঠে হীরেন বলে, ভাগ্যিস ও বেচারা একবর্ণ বাংলা বোঝে না।

বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে হীরেন আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভারী মনোরম এই ছুটি, এই সকাল, দূরে ট্রেনের হুইশ্‌ল বেজে উঠলো, বাইরে একটা ছাগলের বাচ্চা তখন থেকে একটানা ডাকছে—কোথাও কোনো গড়মিল নেই। হঠাৎ হীরেনের মনে হলো, সকালে ঐ দৃশ্যটা ওকি সত্যিই দেখেছিল, নাকি তার দিবাস্বপ্ন? রাস্তায় দেখা হলো হেমকান্তির সঙ্গে, ঐ তো ললিতা বসে পিঠে চুল মেলে, কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই, জড়তা নেই. সবই স্বচ্ছন্দ, সারা পৃথিবী কি তার সঙ্গে অভিনয় করে যাচ্ছে নাকি আজ সকালে? নাঃ, ওরকম কিছু সত্যিই ঘটেনি, সবটাই হীরেনের কল্পনা! দিবাস্বপ্নকে কে গুরুত্ব দেয়?

আস্তে আস্তে হীরেন এসে হেমকান্তির ঘরে ঢুকলো। খুব সন্তর্পণে দরজাটা তখন যেমন ছিল, সেইরকম আধখোলা রাখলো। বন্ধ জানলাটার কাছে আলমারি, এখানে ললিতা দাঁড়িয়েছিল, আলমারির দুটো পাল্লাজোড়া আয়না, আয়নায় ছায়া পড়ছিল। হয়তো আলমারি থেকে মাখনের টিন নিতেই ললিতা তখন ঘরে ঢুকেছিল। ঐখানে দাঁড়িয়েছিল হেমকান্তি, হীরেন নিজে এসে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়ালো, না, এখান থেকে দরজা দেখা যায় না। হীরেন ফিসফিস করে বললো, একবার! একবার!—একথা কি বাইরে থেকে শোনা যায়? শুনতে পাবারই তো কথা! হঠাৎ হীরেনের মনে হলো, হেমকান্তি আর ললিতা যেন দু'জনেই তাকে উকিল হিসেবে নিয়োগ করেছে, সে যেন প্রাণপণে ওদের দু'জনের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করছে। আর ওদিকে আদালতে বসে হেমকান্তি এতক্ষণে অনালোকদের শাস্তি দিচ্ছে।

এই সময় ললিতা এসে ঘরে ঢুকলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটা হাল্কা করে হীরেন বললো, তোমায় আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, লতু!

ললিতা ওর কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে, বুকে শরীরটা হেলান দিয়ে একটু আদুরে গলায় বলে, মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে এলে, বেশ হয়, না? এবার থেকে আমরা বছরে একবার করে আসবো—

—খরচ কম নয়—

এমন কিছু খরচ নয়। সারা বছর চেষ্টা করলে ঠিকই হয়। হীরেন দু'হাত দিয়ে ললিতাকে বেষ্টন করে। ললিতার বুকের ওপর ওর হাতের চাপ পড়লেও ললিতা বিশেষ আপত্তি করে না, শুধু বলে, চাকরটা যদি এদিকে আসে আবার—

হীরেন নিজের মুখটা ললিতার কাছে এগিয়ে এনেও ভাবে, আচ্ছা, এখন থাক, অন্তত একটা দিন থাক্ না—। সে তার গালটা রাখে ললিতার গালে, আঃ কি ঠান্ডা, কি শান্তি, গরীবের ঘরের বৌ হয়েও ললিতা স্বাস্থ্যটা ভালো রেখেছে। গালে গাল রেখেই হীরেন ললিতার শরীরটা দোলাতে থাকে, এবং ইয়ার্কি করার মতন লঘু গলায় বলে, হেম আবার তোমার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করার চেষ্টা করেনি তো?

ললিতা বললো, কেন, ভয় আছে নাকি তোমার? আমার মাথা ঘুরে যেতে পারে?

হীরেন বললো, তা নয়, হেমটা আবার একটু কবি-কবি স্বভাবের আছে। ও যদি কখনো একটু বেশী গদগদ হয়ে ওঠে, তুমি আবার সেটা খুব সীরিয়াসলি নিও না!

কলহাস্য করে উঠে ললিতা বলে, বত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, এখন আর এ চেহারা দেখে কারুর কবিত্ব জাগবে না—তোমার ছাড়া!

গাল সরিয়ে এনে, উদাসীনভাবে হীরেন বলে, বাথরুমে জল দিয়েছো?

—হ্যাঁ জল আছে। আমি দেখি, মাংসটা আবার ধরে গেল নাকি! ছাড়ো—

হেমকান্তির বাথরুমও খুব শৌখিনভাবে সাজানো। সিঙ্ক, বেসিনগুলো পরিষ্কার, ঝকঝকে। এরকম মফঃস্বল শহরের বাড়িতেও এরকম আধুনিক কায়দার বাথরুম আশা করা যায় না। তাকে সারি সারি সাজানো সাবান, শেভিং ক্রিম, পেস্ট, শ্যাম্বু। র‍্যাকে দু'তিনটে তোয়ালে। হীরেন নিজের তোয়ালে নিয়ে এসেছিল, একটু বাদে ও খেয়াল করলো, তোয়ালে কাঁধে নিয়ে ও বাথরুমের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেন ও দাঁড়িয়ে আছে, নিজেই প্রশ্ন করলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো, এরকমভাবে তো সে কোনো দিনই স্নান করে না। একে শীতকাল, তার ওপর কুয়ো থেকে তোলা কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল, এরকম জলে হীরেন কখনো স্নান করতে পারে না। তার বিষম ঠাণ্ডার ধাত, বারো মাস সে গরম জলে স্নান করে, শীতকালে তো কথাই নেই। সে পুকুরে কিংবা নদীতে পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে স্নান করতে পারে না। ললিতা আজ তাকে গরম জল দিতে ভুলে গেছে। কালও গরম জলে স্নান করার ব্যাপারে হেমকান্তি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গরম জল না করিয়ে হীরেন কিছুতেই স্নান করেনি। আজ, ললিতার গরম জলের কথা মনেই পড়ে নি। হীরেন একবার ভাবলো চেঁচিয়ে ললিতাকে গরম জলের কথা বলে, কিন্তু মনে পড়লো, দুটো উনুনেই রান্না চাপানো—এখন জল গরম করা অনেক ঝঞ্ঝাট! যেন ললিতার সঙ্গে ঠাট্টা করার লোভেই হীরেন আজ বহুকাল বাদে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করবে ঠিক করে ফেললো। ব্রাসে পেস্ট নিয়ে মুখ ঘষতে লাগলো সে।

সেই দারুণ ঠাণ্ডা জল বালতির পর বালতি মাথায় ঢেলে অল্পক্ষণে স্নান সেরে ফেলে হীরেন, সমস্ত শরীরটা যেন অবস হয়ে গেছে, দাঁত ঠক্‌ঠক্‌ করছে তার। তাড়াতাড়ি গা মুছে দরজার সামনে আসে, পা-টা তখনও ভিজে বলে তোয়ালে দিয়ে পা মুছতে থাকে বারবার। তারপর, বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, দরজা না খুলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায় একটু। বাথরুমের মধ্যে এইমাত্র কি যেন একটা ঘটে গেল! কি ঘটলো! হীরেন ভাববার চেষ্টা করে এবং একটু বাদেই সেটা বুঝতে পেরে অপরাধীর মতন লাজুকভাবে হাসে। হেমকান্তির ওপর সত্যিই তার রাগ হয়েছে তা হলে। কেননা, হীরেন বুঝতে পারলো, অন্যমনস্কভাবে সে হেমকান্তির পেস্ট থেকে দাঁত মাজতে গিয়ে, টিউবের প্রায় অর্ধেকটা টিপে অনেকখানি পেস্ট মাটিতে ফেলে নষ্ট করেছে। হেমকান্তির দামি চন্দন সাবানখানা গায়ে মাখার পর সে সাবানটা মাটিতেই ফেলে রেখেছে—জলের মধ্যে সাবানটা ক্ষয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবং এতক্ষণ সে, নিজের তোয়ালের বদলে হেমকান্তির দামি তোয়ালেটা দিয়েই পায়ের তলা মুছছিল। সাবানটা তুলে রেখে, তোয়ালেটা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে হীরেন আপন মনে সস্নেহে বললো, না, হেম, আমি তোর ওপর রাগ করিনি। ওসব কিছু না, মুহূর্তের ভুল। ওতে কিছু যায় আসে না। সেজোমামাও তো বউয়ের একেবারে আঁচল ধরা, আমার সঙ্গে সেজমামার ব্যাপারটা কখনো জানতে পারেন নি বলেই তো।

দুপুরে হেমকান্তি এসে খেয়ে চলে যাবার পর, ললিতা চাকরটাকে পাঠিয়েছে পান আনতে এবং গরম কাপড়ের ব্লাউজটা হীরেনের সামনেই খুলতে আরম্ভ করে। শুধু ব্রেসিয়ার পরা বুকে ললিতা যখন মাটিতে উবু হয়ে বসে সুটকেশ খোলে—তখন হীরেন খানিকটা অস্থির বোধ করে। দিন কয়েক ধরে ওদের দাম্পত্য ব্যাপারটা হয়নি। শনিবার দিন ট্রেনজার্নি করে এসে খুব ক্লান্ত ছিল, এসেই মড়ার মতন ঘুমিয়েছে। কালকেও বেড়িয়ে

ফেরার পর, তিনজনে অনেকরাত পর্যন্ত গল্প করেছে ঘরে বসে, শেষের দিকে ললিতারই চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। সুতরাং আজ দুপুরবেলা, এখনই তো ঠিক সময়, কিন্তু হীরেন চঞ্চল হয়ে ভাবে—একটা দিন থাক্ না! হীরেন উঠে জামাটা গায় দিতে দিতে বলে, এখানে আমার এক পিসেমশাই থাকেন, একটু খোঁজ নিয়ে আসি বুঝলে? তুমি দরজা-টরজা বন্ধ করে শুয়ো!

ললিতা অবাক হয়ে বললো, এখন এই দুপুরবেলা যাবার দরকারটা কি?

—যদি শোনেন, দুদিন ধরে এখানে এসেছি, অথচ খোঁজ করিনি, আমি চট্ করে ঘুরে আসছি। তুমি দরজা বন্ধ করে থেকো।

হীরেনের ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়। ললিতা ও হেমকান্তি তখন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল, হীরেনের চেহারা দেখে আঁৎকে ওঠে দু'জনেই। হীরেনের চোখ দুটো টক্‌টকে লাল, সারা শরীরটা কাঁপছে। বারান্দার মেঝের ওপরই বসে পড়ে হীরেন আস্তে আস্তে বলে, দেখো তো, আমার বোধ হয় খুব জ্বর এসেছে! কথা বলতে বলতেই হীরেন সেখানে শুয়ে পড়ে। ললিতা ছুটে এসে হীরেনের মাথাটা কোলে তুলে নেয়, সত্যি জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। হেমকান্তি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করে, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

হীরেন চোখ দুটো বন্ধ করে অস্পষ্টভাবে বলে, এই একটু ঐ দিকে গিয়েছিলাম। আজ ঠাণ্ডা জলে চান করেছি তো, তাই বোধহয় জ্বর এসে গেল।

দেখতে দেখতে হীরেনের জ্বর বাড়তে থাকে, জ্বরের ঘোরে ছটফট করে। ওর খুবই কষ্ট হচ্ছে মনে হয়। একটা তীব্র যন্ত্রণা পাওয়া চাপা গলায় শুধু বলে, আঃ, আঃ!

কপালের জলপট্টি বারবার ভিজিয়ে দিতে দিতে ললিতা কাঠ হয়ে বসে থাকে ওর শিয়রের কাছে। হেমকান্তি ডাক্তার ডাকতে চলে যায়। হীরেন বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছটফট করে, খালি সেই যন্ত্রণাসিক্ত গলায় বলে, আঃ, আঃ! ললিতা বিপন্ন-আকুল-ভাবে ওর বুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, তোমার ব্যথা করছে? কোথায়? পেটে না বুকে? হীরেন কোনো উত্তর দিতে পারে না।

ডাক্তার এস ভালো করে পরীক্ষা করলেন। বললেন, আর তো কোনো খারাপ লক্ষণ দেখছি না, কিন্তু একশো পাঁচ জ্বর উঠে গেলো হঠাৎ! ঐ ঠাণ্ডা জলের জন্যই—নিউমোনিয়া না হয়ে যায়! জ্বর আজ কমে গেলে আর ভয় নেই।

জ্বরের ঘোরে হীরেনের সারা শরীর দুমড়ে-মুচড়ে উঠতে থাকে, আর ওর দুপাশে হেমকান্তি আর ললিতা বসে থাকে নিঃশব্দে। ললিতা এক সময় বললো, কোনোদিন ওর ভুল হয় না, অথচ আজ যে কেন ঠাণ্ডা জলে চান করলো! হেমকান্তি বললো, একদিন ঠাণ্ডা জলে চান করলেই ওরকম জ্বর হবে তার কোনো মানে নেই। অসুখ কেন হয়, তা কেউ জানে না! ফুড পয়জন হয় নি তো?

—তাহলে তো তিনজনেরই হতে পারতো। একই খাবার—

—তা ঠিক। অনেক সময় হঠাৎ একজনেরও হয়—

—ঠাকুরপো, তুমি তো ওকে অনেকদিন জানো, এরকম হঠাৎ এত জ্বর ও'র আগে কখনো হয়েছে?

—এরকম তো কখনো দেখিনি। অবশ্য এটাও এমন কিছু না, ডাক্তার তো বললেই, দু'একদিনে সেরে যাবে—

—তবু, কেন যে এরকম হলো—

ঘণ্টা চারেক ছটফট করার পর হীরেন খানিকটা আচ্ছন্নের মতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ওর মুখখানা ভারী করুণ আর অসহায় দেখায়। ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে ওর মুখখানা কুঁচকে আসছে। এতক্ষণ টানা উৎকণ্ঠার মধ্যে থেকে ললিতা আর হেমকান্তির মুখও শুকিয়ে এসেছে। ললিতার আর খাওয়া-দাওয়া করার কোনো ইচ্ছেই নেই, হীরেনের শিয়র ছেড়ে সে আর উঠলোই না। খানিকক্ষণবাদে হেমকান্তিও নিজের ঘরে চলে গেল।

হীরেনের ঘুম ভাঙলো মাঝরাত্তিরের দিকে। তখনও গায় বেশ জ্বর, বুকে ব্যথা। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে হাত বাড়িয়ে হীরেন ডাকলো,—লতু! লতু! মশারী গুঁজে এতক্ষণ বসেই ছিল ললিতা, কোন্ এক সময় ঘুমের মধ্যে এক পাশে লুটিয়ে পড়েছে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি জেগে উঠলো, হীরেনের মুখের কাছে মুখ এনে বললো,—এখন কেমন আছো? ভালো লাগছে একটু? ইস্, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে এখনো।

হীরেন ক্লিষ্ট স্বরে বললো,—লতু, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে!

ললিতা জিজ্ঞেস করলো,—কোথায়?

—তা ঠিক জানি না, দম আটকে আসছে যেন মনে হচ্ছে।

—ডাক্তার এসেছিলেন, বলেছেন ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একটু ঘুমোও।

হীরেন একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর কি ভেবে আবার ছটফট করে উঠে বলে, —লতু! লতু! আমার খুব কণ্ট হচ্ছে, আর পারছি না, যদি মরে যাই—

—ওকি অলুক্ষুণে কথা! চুপ! না-না কিছু হয় নি তোমার—

ললিতা প্রায় হাহাকার করে। জোর করে একহাতে হীরেনের মুখ চাপা দেয়। আর এক হাতে হীরেনের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। হীরেন একটু শান্ত হয়ে মুখ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আঃ, এখন আরাম লাগছে। আগে হাত বুলিয়ে দাও নি কেন?

—দিচ্ছি তো, অনেকক্ষণ থেকে। এখন কম লাগছে?

—অনেক কম লাগছে। হঠাৎ আমার এমন অসুখ হলো কেন বলো তো?

—কি জানি!

হীরেন একটা অনেক বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো। হঠাৎ ওর চোখটা ভিজে এলো। পাশ ফিরে ললিতার জানু দুটো চেপে ধরে বললো,—না, মরবো কেন? এমনি বলছিলাম, যদি হঠাৎ মরে যাই।

—আবার ঐ কথা? তুমি চুপ করে ঘুমোও বলছি।

—লতু, তোমায় আমি কতটা যে সত্যি ভালোবাসি, তুমি জানো?

—জানি।

—তোমায় যদি একটা কথা বলি, তাহলেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে?

—কি কথা?

—লতু, কথা দাও আগে, সে কথা শুনেও আমায় তুমি ভালোবাসবে?

লতিকা সমস্ত শরীর নিয়ে হীরেনের আরও ঘনিষ্ট হয়ে আসে। ভয় পাওয়া গলায় বলে, ওকি, তুমি ওরকম করছো কেন? তোমার ঠোঁট কাঁপছে! আজ আর কিছু বলতে হবে না—কাল বলো—

—না, কথা দাও, সে কথা শুনেও

—কথা দিচ্ছি। তুমি তো জানোই, তোমায় আমি চিরদিন ভালোবাসবো

—না, আজ সকাল থেকে একটা কথা মনে পড়ে এমন মন খারাপ লাগছে। আমি অন্যায়

করেছিলুম, ওঃ! জানো লতু, অরুণা বলে একটা মেয়েকে আমি একবার জোর করে চুমু খেয়েছিলাম। তার একটুও ইচ্ছে ছিল না, সে আমায় পছন্দ করতো না, তবু আমি গায়ের জোরে, জন্তুর মতন, ওঃ, আমার জন্যই মেয়েটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। একথা শুনেও তুমি আমাকে ভালোবাসবে বলো? বলো?

হঠাৎ দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে হীরেন শিশুর মতন কাঁদতে শুরু করে!

ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

ভারতবর্ষে সংস্কৃতির ধারা কখনো খণ্ডিত হয় নি, নতুন নতুন সমন্বয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন রেখেও সে সংস্কৃতি যুগে যুগে অধিকতর সমৃদ্ধিলাভ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে এবং ইতিহাসের আদি যুগে হারাপ্পা, অনার্য ও আর্যদের বিচিত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে পরস্পরকে স্বীকার করে নিয়েছিল, তার বর্ণনা পূর্বেই দিয়েছি। এদেশে ইসলামের আবির্ভাবের পরে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের সে কাহিনী আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। আমরা যতদূর জানি, ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজদৃষ্টি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কোনদিন এ ধরনের সুসংবদ্ধ ও পরিণত ধর্মবিশ্বাস ও সমাজদৃষ্টির সম্মুখীন হয় নি। আলেকজান্ডারের বিজয় অভিযানের পরে গ্রীক সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু সে পরিচয়ে সংঘর্ষের অবকাশ ছিল না। সেখানে দর্শনচিন্তায় পারস্পরিক প্রভাবের পরিচয় মেলে, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে সংঘাতের বিশেষ কোনো নিদর্শন মেলে না। তার একটি কারণ যে ধর্মের ব্যাপারে গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী চিরদিনই খানিকটা বীতরাগ এবং সমাজচিন্তায় গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তাধারার বহু সাদৃশ্য ছিল। তা ছাড়া যে সমস্ত গ্রীক সেনানী এদেশে রয়ে গেল, দীর্ঘদিন গ্রীস ত্যাগ করে নানা দেশের নানা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাদের মনে আর গ্রীক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তেমন অনুরাগ ছিল না। যাযাবর জীবনযাপনে ক্লান্ত হয়ে তারা সেদিন ভারতবর্ষে স্থায়ী বাসের জন্য উদগ্রীব, তাই এদেশের সংস্কৃতিকে স্বীকার করতে তাদের মনে কোন বাধা আসে নি। এ সমস্ত কারণে ভারতীয় এবং গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে সংঘর্ষ ও সমন্বয় তীব্রভাবে দেখা দেয় নি। মুসলমান যেদিন এ দেশে বসতি আরম্ভ করল, সেদিন তার ক্লান্তি আসেনি, বরং নতুন জীবন তেজে সে উদ্দীপ্ত এবং নিজের সংস্কৃতি ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা তাই হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস বিচিত্র এবং বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ইতিহাস বললেও তাই অত্যুক্তি হবে না।

কালক্রমে ভারতবর্ষে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গীতে সন্ন্যাসমনোবৃত্তি ও পরকালমুখাপেক্ষিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্রহ্মের সাধনায় বহুক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখকে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ভারতবর্ষে যেদিন ইসলামের আবির্ভাব, সেদিন এই সন্ন্যাসমনোবৃত্তিই এদেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইসলাম সন্ন্যাসমনোবৃত্তির বিরোধী এবং তার প্রথম বিপ্লবী যুগে পরকাল এবং ইহকালের মধ্যে কোন ব্যবধান স্বীকার করে নি। ব্যক্তিকে স্বীকার করেও ইসলাম সমাজধর্মের উপরে বেশী জোর দিয়েছে বলে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধে এক নূতন সমন্বয় দেখা দিয়েছিল। এ সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবে হিন্দু সমাজের সংগঠন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গভীরভাবে আলোড়িত হল।

হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তি সমাজকে অস্বীকার করেও মোক্ষলাভ করতে পারে। ইসলাম ঘোষণা করল যে সমাজের সমস্ত বন্ধন ও সম্বন্ধকে স্বীকার করেই মানুষের মুক্তি

সাধনা। দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে বৈষম্য, তার সমন্বয় সাধন তাই মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। আজও বহুক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য, আজও যে সময় সময় সে পার্থক্য সংঘর্ষে আত্মপ্রকাশ করে, তার ফলে অনেকে মনে করেন যে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয় নি। আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর যে ধরনের সমন্বয় ঘটেছিল, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের বেলা তা হয় নি একথা স্বীকার করেও বলা চলে যে দুটি সমাজের বিরাট জনসংখ্যা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং জীবনের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা মনে রাখলে পরিপূর্ণ সমন্বয় যে সাধিত হয় নি তাতে আশ্চর্যের কারণ নেই, বরং এতখানি সমন্বয় যে ঘটেছে সেটাই আশ্চর্য।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা চলে। আজকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ঘটে অথবা সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে। কেবল মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নয়, প্রায় প্রতিযুগে প্রতি দেশেই মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়েছে। ধর্ম অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সত্যিকার সংঘর্ষের নিদর্শন নেই বললেই চলে। ভারতবর্ষেও এ সত্যের ব্যতিক্রম হয় নি। প্রথম দৃষ্টিতে যে সমস্ত সংঘর্ষকে ধর্মসংঘাত বা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বলে মনে হয়, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলিও প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠির কোন পার্থিব স্বার্থসংঘাত নিয়েই গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বহুবার হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে লড়াই হয়েছে, কিন্তু রাজ্য অথবা ধনসম্পদ নিয়ে সে ধরনের লড়াই হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু করেছে, মুসলমানও স্বার্থসংঘাতের বেলায় অন্য মুসলমানকে রেহাই দেয় নি। বস্তুতপক্ষে রাজ্য অথবা অর্থ নিয়ে সাতশো আটশো বছরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যতবার যুদ্ধ হয়েছে, মুসলমানে মুসলমানে লড়াই হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী।

বাণিজ্যিক স্বার্থের তাগিদে আরব রাজশক্তি সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে দখল করেছিল। মহম্মদ গজনী বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছেন কিন্তু ভারতীয় ধনসম্পদ লুঠ করে তার সাহায্যে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মধ্য এশিয়ার লোকপ্রবাহে স্থানচ্যুত হয়েছিল বলেই পাঠান মোগল তুর্কী দল বেঁধে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। প্রাগৈতিহাসিক কালে ঠিক একই কারণে আর্য অভিযাত্রীর দল এদেশে এসেছিল, এবং আর্যদের পরে বার বার একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বাবরের আত্মজীবনী পড়লে সন্দেহ থাকে না যে তাঁর মনপ্রাণ সমরকন্দের দিকে পড়ে থাকলেও অবস্থার চাপে তাঁকে ভারতবর্ষে স্থায়ী বসবাসের কথা ভাবতে হয়েছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে পুরানো ইতিহাসের এ পুনরাবৃত্তির মধ্যে কিন্তু একটি পার্থক্য স্পষ্ট। আর্য অভিযাত্রীর পরে যাঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে তাঁদের মধ্যে প্রায় কোন অভিযাত্রীই নিজেদের সুসংবদ্ধ জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে এদেশে আসেন নি। গ্রীস দেশে সভ্যতার বিকাশ সত্ত্বেও গ্রীক অভিযাত্রীরা কেন গ্রীক সংস্কৃতির বাহক হন নি সে কথা পূর্বেই বলেছি। ফলে প্রাক-ইসলামিক অভিযাত্রীরা সকলেই ভারতীয় সমাজে মিশে গেলেন। স্বতন্ত্র কোন সংস্কৃতি বা সভ্যতা গড়ার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। সিন্ধুদেশে আরব অভিযানের ইতিহাস একটু আলাদা। পরে আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত অভিযাত্রী এদেশে এলেন, তাঁরাও সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং মুসলীম সভ্যতার দ্বারা

প্রভাবান্বিত। ইসলামের মর্মকথা তাঁদের মধ্যে অনেকে বোঝেন নি, কিন্তু তাঁরাও মুসলমান সমাজের আচার ব্যবহার রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁরা ভারতীয় জনসমুদ্রে একেবারে বিলীন হয়ে যান নি। তাঁদের ক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের পরিবর্তে দুটি সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের সমস্যা দেখা দিল। বস্তুতপক্ষে, সেদিক থেকে ভারতবর্ষে ইসলামের যে ইতিহাস, এশিয়ার বা ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে তার নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে সমস্ত দেশ ইসলামের প্রভাবে এসেছিল, তাদের মধ্যে বহুস্থানে মুসলমান সমাজ পুরাতন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে তাকে পুরোপুরি ইসলামী ঢঙ দেয়। ইরান, তুরস্ক অথবা মিশরে প্রধানত আরবনেতৃত্বে এ রূপান্তর ঘটেছিল। যেখানে এ রূপান্তর ঘটে নি, সেখানে মুসলমান সভ্যতা স্থানীয় সভ্যতার মধ্যে কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। চীনদেশে অথবা ইয়োরোপে সে দেশের মুসলমান সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপিয় অথবা চীন সভ্যতার অনুবর্তী। ভারতবর্ষে [এবং আংশিকভাবে ইন্দোনেশিয়ায়] এ ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভারতবর্ষে মুসলিম সভ্যতা পুরাতন সভ্যতাকে গ্রাস করে নি, নিজেও লুপ্ত হয় নি বরঞ্চ দুইয়ের সমন্বয়ে এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এদেশে হয়েছে।

ইসলামের প্রভাবে ভারতবর্ষের জীবনধারায় গভীর ও ব্যাপক রূপান্তর দেখা দেয়। নতুন আদর্শের সংঘাতে অনেক পুরানো বিশ্বাস ভেঙে গেল, যে সমস্ত আদর্শ টিকে রইল তাদের মধ্যেও পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। প্রাচীন এবং নতুন চিন্তাধারার সংঘর্ষে সংবেদনশীল মানুষ চিরন্তন সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও নতুনভাবে চিন্তা করতে সুরু করল। প্রাচীন ভারতের হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে বহিরাগত মুসলিম চিন্তাধারার সমন্বয়ে নতুন নতুন দর্শন ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় মেলে। এভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মন-জানাজানি হল বটে কিন্তু তাদের চিন্তা ও ভাবধারার পরিপূর্ণ সমন্বয় আজও হয় নি। প্রথম যুগে প্রধানত দুটি কারণে সমন্বয় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিরাট পটভূমিতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন-সেকালে সম্ভব হয় নি, তাই শহরে নগরে রাজসভায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে আদানপ্রদান, দূরপ্রদেশে বা গ্রামাঞ্চলে তার পরিচয় মেলে না। সংখ্যায় কম হয়েও রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহারে সহরে নগরে মুসলমান সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ফলে রাজসভার আদবকায়দা নাগরিক সভ্যতার স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। অন্যপক্ষে চলাচলের অসুবিধার জন্য গ্রামগুলির আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রইল, রাজনৈতিক হিসাবে নওয়াব বাদশার অধীন হয়েও আচার ব্যবহারে স্বকীয় স্বাধীনতা তারা হারায় নি। বাইরের মানুষ নতুন নতুন ভাবধারা নিয়ে আসে বলেই সমাজ বদলায়, তা নইলে সমস্ত দেশের সমস্ত সমাজেই রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় মেলে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নাগরিক সমাজ যেভাবে বদলিয়েছে, গ্রামীন সমাজ তাই সেভাবে বদলায় নি। গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতিতে তাই হিন্দুসমাজের প্রভাবই শক্তিশালী হয়ে রইল। কারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস যত সহজে বদলান যায়, তাদের মনোবৃত্তি বা জীবনধারা তত সহজে বদলানো সম্ভব হয় না।

ইংরেজ আমলে এবং দুঃখের বিষয় আজও যে সব পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তরুণ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের ইতিহাস শেখে, তাদের অধিকাংশ মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিরোধ ও সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ দেয়, কিন্তু সে যুগে বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মিলন ও সমন্বয় সাধনের যে প্রয়াস হয়েছিল, হয় তার একেবারেই উল্লেখ করে না অথবা করলেও অত্যন্ত সংক্ষেপে ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হয়। রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বহিরাগত নতুন নতুন অভিযাত্রীদের ভারত আক্রমণের বিবরণ ও লুণ্ঠন অত্যাচার ও

ধ্বংসের বর্ণনায় সে ইতিহাস মুখর কিন্তু যে সমস্ত নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান বহু শতাব্দির সাধনায় হিন্দু মুসলমানের যুক্ত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, তাদের কোন আলোচনা সে ইতিহাসে মেলে না। ফলে হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে সভ্যতার যে বিকাশ, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কৃতি রূপ নেয়, সেগুলি একান্তভাবে প্রাক ইসলামিক ভারতবর্ষেই গড়ে উঠেছিল, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিরই অন্য নাম। মুসলমানদের মধ্যেও অধিকাংশ অনুরূপ মতে বিশ্বাসী এবং ফলে তাদের মনে আত্মঅবিশ্বাস, সন্দেহ ও দ্বিধা। হাজার বৎসর ভারতবর্ষে বাস করেও ভারতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে মুসলমান সমাজ সাহায্য করে নি একথা যদি সত্য হয়, তবে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বভাবে নিশ্চয়ই ইসলামবিরোধী উপাদানের জন্যই তা সম্ভব হয়েছে মনে করে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বীতরাগ হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে হিন্দু এবং মুসলমান দুইয়েরই ধারণার মূলে গলদ রয়েছে এইজন্য যে তারা উভয়েই হাজার বৎসরের সহযোগিতা ও সমবেত প্রচেষ্টার কথা ভুলে গিয়েছে। হাজার বৎসর পরস্পরের প্রতিবেশী থেকেও যদি সহযোগ এবং সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় না হয়, তবে মানব অভিজ্ঞতার যে বিপুল অপচয়, তার ফলে যে তারা পরস্পরকে সন্দেহ ও ঘৃণা করবে, তাতে বিচিত্র কি? পরস্পরের সহযোগ এবং প্রীতির ভিত্তিতে ভারতবর্ষে মধ্যযুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে অপূর্ব বিকাশ, সে বিবরণ জনসাধারণের কাছে যেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেদিন দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানের সন্দেহ এবং ঈর্ষার নিরসন হবে।

সমস্ত তথ্য না জানলেও মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন। দুইটি সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসবে অথচ নতুন সংস্কৃতির বিকাশ হবে না, একথা বিশ্বাস করা যায় না, মানুষের অভিজ্ঞতায় এ রকম কখনো ঘটে নি। ভারতবর্ষের হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার ও গভীরতা সমস্ত বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে যেদিন মুসলমানের আবির্ভাব, সেদিন হিন্দুমানসের তেজ এবং দীপ্তি খানিকটা কমে আসলেও তখনো তার জীবনশক্তি লোপ পায় নি, তখনো বিশ্বসভ্যতায় তার দেয় অনেক। নবযৌবনদীপ্ত মুসলমান সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু অনুদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। একদিকে গ্রহণেচ্ছু মুসলমান এবং অন্যদিকে দানোৎসুক হিন্দু—উভয়ের সম্মিলনে ভারতবর্ষে সংস্কৃতির নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল। বস্তুতপক্ষে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে যার প্রাণশক্তি যত প্রবল, সেই তত বেশী গ্রহণ করতে পারে। যুবক যেমন সমস্ত ধরনের খাদ্য থেকেই উদ্যম ও তেজ সংগ্রহ করে, স্বাস্থ্যসম্পদে সমৃদ্ধ বলে তার যেমন বাছবিচারের প্রয়োজন নেই, প্রাণরসে উদ্বেল জাতিও ঠিক তেমনিভাবে নানা দেশের নানা সংস্কৃতিকে আপন করে নিতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষে অনার্যদের উন্নততর সভ্যতা অভিযাত্রী আর্যদের হাতে সামরিক পরাজয় স্বীকার করেও আর্যমানসকে রূপান্তরিত করেছিল। গ্রীসদেশেও মাইকেনিয়ান সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করেই গ্রীস সভ্যতার বিস্ময়কর বিকাশ। রোম সমরক্ষেত্রে গ্রীসকে পরাজিত করল কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীসই বিজয়ী হয়েছিল। ভারতবর্ষে সামরিক সংঘর্ষে হিন্দুদের পরাজয় হল কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনায় যে নতুন ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠল, সেখানে জেতা ও বিজেতার কোন প্রশ্ন রইল না। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের পরিচয়, সহযোগ ও সমন্বয়ের সাধনাই তাই মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সত্যিকার ইতিহাস। [ক্রমশঃ]

শব্দের খাঁচায়

।কুঠিঘাট।

অসীম রায়

সারা গায়ে ঘুঁটেভর্তি পাঁচিলটার ছ্যাৎলাপড়া মাথার ওপরেই টিংটিংয়ে এক শিউলির কয়েকটা ডাল। তার গায়ে সাতজন্ম রঙ না-ফেরানো হলদে কালো সাদায় মেশা দোতলা বাড়িটার পাশে খোলা ড্রেন পার হয়েই পাড়ার ক্লাবের মাঠ মানে এক চিলতে ঘাস-চটা জমি যেখানে মাঝেসাঝে ব্যাডমিণ্টন খেলার মারফত তারুণ্যে টিকিয়ে রাখবার মর্মান্তিক চেষ্টা। তারপর দুতিনটে শিবমন্দিরের বুকে প্লাইউডের কারখানা আর সেখানে স্তূপাকার কাঠের পাশে গঙ্গাস্নান ফেরত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের 'জয় বাবা' আর্তধ্বনি পথহারা, সে আওয়াজ প্লাইউড কারখানার ঘর্ঘরে নিমজ্জিত।

বিশ বছর আগেও যাঁরা এদিকে এসেছেন বা দু এক রাত কাটিয়েছেন তাঁদের কাছে এ স্থানের পরিবর্তন প্রায় পি. সি. সোরকারের ইন্দ্রজাল। অবশ্য বরানগর মানেই গলি। কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ভদ্রমহোদয়গণ মিউনিসিপ্যালিটির মামাকাকাদের ধরে বাড়ির সীমানা বাড়াতে বাড়াতে রাস্তা আরও সর্পিল সঙ্কুচিত করে তুলেছেন। তবে জামানা রাস্তা কিংবা নতুন বাড়িতে নয়—পাল্টেছে মেজাজে।

কারণ এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয়। বরানগরের গা দিয়ে যে গঙ্গা বয়ে গিয়েছে সেদিকে পশ্চিমাস্য হয়ে রামকৃষ্ণ একদা তাঁর জগজ্জননীর ধ্যান করেছেন আর সেই ধ্যান টেনে এনেছে কলকাতার বহু ধনী নির্ধনকে। বাবুদের এই বাগানবিলাসের জায়গাকে এক আধ্যাত্মিক গুরুত্ব দান করেছে এই গঙ্গা। তখন অনেক পাপীতাপী মানুষের কাছে পূতসলিলা ভাগীরথি আক্ষরিক সত্য। কিন্তু এখন অত্যধিক লোকের চাপে কলের জলের চাপ কমে যাওয়ায় জলাভাবই প্রধানত গঙ্গাস্নানের কারণ। আশেপাশের পুকুর বুঁজিয়ে যেখানে সেখানে বাড়ি উঠেছে, যে কটা আছে সেগুলো স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে ময়লাস্থান— আকণ্ঠ আবর্জনায় পূর্ণ। টিউবওয়েলের সামনে লম্বা লাইন। কাজেকাজেই গঙ্গাস্নান। মাঝে মাঝে কিছু বয়স্ক লোকজন 'মা তারা' কিংবা 'জয় শম্ভু' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন কিন্তু সে আওয়াজের কোন প্রতিধ্বনি নেই। তা অনেক চীৎকারের মাঝখানে তলিয়ে গেছে।

ওপারে বেলুড় মন্দিরের মাথা আশেপাশের কলের চিমনি থেকে উঠে আসা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। জোয়ারে মরা মোষ ভেসে আসে। কাকগুলো উড়ে উড়ে ভাসন্ত শবের ওপর নামে আর ওঠে তবে চামড়া এখনও শক্ত থাকায় সুবিধে করতে পারে না। ভাটার সময় পুরনো জামানার বড় বড় ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলো কাদার মধ্যে দাঁত বের করে থাকে। কলের তেল ভাসে জলে।

এ গঙ্গা যেন স্টেটসম্যান খবরের কাগজের গঙ্গা : দ্য সিল্টিং অফ্ দ্য হুগলী বেড হ্যাজ বিকাম এ ম্যাটার অফ্ গ্রেট কন্সার্ন ফর দ্য পোর্ট অথরিটিজ। অথবা বাংলা কাগজের মূর্ত সাবধানবাণী : 'একথা ভুলিলে চলিবে না যে গঙ্গার ভবিষ্যতের সঙ্গেই কলিকাতা মহানগরীর ভবিষ্যত যুক্ত।' এক চলন্ত সমস্যা, প্রবাহিত এক বেদনাদায়ক জিজ্ঞাসা এই গঙ্গা। মহত্ত্বের যে শক্তিমত্তা, প্রাণদায়িণী যে সঞ্জিবনী তা এই গঙ্গা থেকে বহুদূরে, যেমন অপসৃত আমাদের জীবন থেকে অনেক কিছু।

আর সকালে বরানগরের বাজারে চায়ের দোকানগুলোয় স্থানীয় যুবকবৃন্দ খবরের কাগজগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আকুল আগ্রহে কাগজের হেডলাইনে, বিশেষ প্রতিনিধিদের লেখায় বা সম্পাদকীয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে একটা সস্তা সিগারেট ধরিয়ে। মাঝে মাঝে রাস্তার উল্টোদিকে চেয়ে থাকে যেদিকে মাংসের দোকানে সদ্য ছালছাড়ানো পাঁঠা ঝোলানো হয়েছে আংটায়। গরম ধোঁয়া ওঠে পাঁজরা আর রাং থেকে।

আগে মানুষ যে ভাবে রামায়ণ মহাভারত পড়ত আর মুদিখানায় যে ছবি দেখে মঙ্গলাকাঙ্খী সাদামাটা ওয়াজেদ আলি সাহেব বলেছিলেন 'ইহাই ভারতবর্ষ'। বরানগরের বাজারে অন্তত মোটেই তাহা নহে। ভারতবর্ষ কিনা বলা দুষ্কর তবে গোটা বাংলাদেশই এমনি করুণভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে খবরের কাগজের ওপর।

আর সন্ধ্যের পর তরুণ বাপ পুজোয় কেনা নতুন নীল-ফ্রক-পরা খুদে মেয়েটার হাত ধরে যেই বেরোয় একটু বেড়াতে অমনি বত্রিশ নম্বর বাসখানা হুড়মুড় করে সারাপথ জুড়ে এসে পড়ে গায়ের ওপর। এক আনার একটা বেলুন প্রাণপণ আঁকড়ে ফুটপাথশূন্য সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা থেকে মেয়েটা বাপের হাত ধরে লাফ মেরে ওষুধের দোকানের বারান্দায় উঠে রক্ষা পায়। এরই নাম সান্ধ্যভ্রমণ।

মাঝে মাঝে অবশ্য টিনের চায়ের দোকানের পাশে নতুন রঙ-করা উঁচু পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে পাকা উঠোনে বোগেনভিলিয়ার মাচার নীচে অপেক্ষমান ঝকঝকে এ্যামবাসাডর, উচ্চকিত অ্যালসেশিয়ান। অদূরে মন্দিরের বুকের ওপর প্লাইউড ফ্যাক্টরি অথবা মার্বেলপাথরের মূর্তিশোভিত বিরাট লনের ওপর প্রকান্ড মোটরের গ্যারাজ, রঙচটা বনেটের ঠিক ওপরেই যেন নৃত্যরতা সুন্দরী। মস্ত মোজেইক সিংহদ্বারের ভেতরেই এক-পাহাড় কয়লার সামনে দুটো উঁচু বড় বড় শিংওয়ালা বলদ, পাশে একটা হলদে টিনের ওপর লাল কালিতে লেখা—রামসিং কোল ডিপো, অথবা একদা সযত্নে লালিত বটল পামের সারির গায়ে গায়ে যৌবনমদমত্ত কারখানার নিওন সাইন।

খালি গরমের দিনে নদীতে যখন মাঝে মাঝে বাতাস দেয়, জল শব্দ করে, ওপারের চিম্‌নিগুলোয় ধুঁয়ো থাকলেও হাওয়া আকাশে নির্ধূমতা আনে, বেলুড় মন্দিরের মাথায় তারা ওঠে, ঘাটের বড় বড় অশথবটগুলো হাওয়ায় দোলে তখন মনে হয়, না এ গঙ্গা হয়ত শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবে। এর প্রাণশক্তির জোরে আবার আস্থা আসবে। আবার রামকৃষ্ণ-বর্ণিত জগজ্জননী হোক কিংবা মার্কসকীর্তিত সাম্যবাদ হোক, কোন এক প্রাণদায়িণী শক্তিতে বিশ্বাস করে' মানুষ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। এরকম মন্দিরের গায়ে প্লাইউড কারখানা উঠবে না আর হুমড়ি খেয়ে কাগজ পড়বে না মানুষ।

দুই

কুঠিঘাটায় যাঁরা স্নান করতে আসেন তাঁদের মধ্যে কেদার মুখুজ্জে সবচেয়ে প্রাচীন। বিরাট একজোড়া গোঁফ যা আজকাল বাঙালী মুখ থেকে উধাও তা এখনও শোভা পায় তার মুখে। মাথার প্রায় সবটাই টাক কিন্তু নীচের দিকে গোলাকার ঘিরে শাদা রেশমী চুলের বাহার। নাতনীকে চান করান ঘাটে বসে আর বলেন, 'ব্যস্, এইবারই শেষ।'

সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু তারিনী যে বাজারে মাংসের দোকানের পাশেই সাইকেলের দোকান দিয়েছে সে টপ করে প্রশ্ন করে, 'একেবারে সব শেষ দাদু?'

'সব শেষ। এবার দেহ যেন গঙ্গা জলে যায়।' নাইয়ে শর্ষের তেল ঘষতে ঘষতে কেদার মুখুজ্জে বলেন।

নলিনী বলে যে ছোকরা বামপন্থী কোন পার্টির স্থানীয় মোড়ল সে এতক্ষণ নিমের দাঁতন করছিল। কাদায় কাঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, 'দূর, বন্ধন কি আর শেষ হয়! অসংখ্য বন্ধন মাঝে......কি যেন বলেছে রবিঠাকুর......?' হাওয়ায় তার কথা ভেসে যায়।

'দূর শালা, একি একটা নদী! এর চেয়ে আমাদের কলের জল শতগুণে ভাল।' দীপক বলে যে ছোকরা গতবছর বাড়িশুদ্ধ ভবানীপুর থেকে উঠে এসেছে সে বললে।

'তা যাও না কেন দাদা তোমাদের ভবানীপুরে। তোমাকে তো কেউ বেঁধে রাখে নি এখানে,' নলিনী বললে।

'কাকা বেলেঘাটায় সি. আই. টি. রোডে বাড়ি কিনছে।'

'অনেক কাল শুনছি।'

দীপক রুখে উঠল নলিনীর কথায়, 'আমি কি গুল মারছি না কি?' তারপর হেজলিনের শিশি থেকে শর্ষের তেল চেটোয় ঢালতে ঢালতে বললে, 'কি দাম শালা! শুনলে চোখ ট্যারা! সাড়ে আট হাজার করে কাঠা।'

অনেককাল আগে বরানগরে যে গানখানা খুব চলত সেই গান কেদার মুখুজ্জে ধরলেন :

> শ্যামাপদ আকাশেতে মন-ঘুড়িখান উড়তেছিল,
> কলুষের কুবাতাস পেয়ে গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল।
> মায়াকান্না হোল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি;
> দারাসুতকলের দড়ি, ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল।

সঙ্গে একটা কমণ্ডুলও তাঁর আছে। তাতে জল ভরে গামছাপরণে নাতনির হাত ধরে তিনি যখন 'ফাঁস লেগে সে ফেঁসে গেল' ভাঁজতে ভাঁজতে সূর্যের দিকে মুখ করে ঘাটে উঠছিলেন তখন নলিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'বোগাস্, বোগাস্। আজীবন পাটের অফিসের বড়বাবু হয়ে টুপাইস্ করলেন, এখন শ্যামাসঙ্গীত। দূর, দূর!' নলিনী ঝাঁপ খেল গঙ্গায়।

তারিণীর দাঁতন করা হোল। 'দাদু যা বলে তা বিশ্বেস করে আর অন্যেরা......' বলে দাঁতনের কাঠি ফেলে সে শূন্যে নলিনীকে অনুসরণ করলে।

বাকী থাকে দীপক। ঘাটের একদিকে চোখের পাতা অবধি কয়লার গুঁড়ো মেখে যে দুটো হিন্দুস্থানী মুটে কাপড়কাচার সাবানে সর্বাঙ্গ মর্দনে ব্যস্ত, তাদের দিকে সে প্রবল বিদ্বেষে তাকায়। ভবানীপুরে দেবেন ঘোষ রোডে তিরিশ বছরের বাসা তুলে তাদের বরানগরে উঠে আসা দীপক মেনে নিতে এখনও পারে নি। যে যুক্তিতে এ প্রদেশের বাইরের বাসিন্দারা চড়াভাড়ার থাপ্পড়ে কলকাতার আদি বাসিন্দাদের ক্রমাগত বরানগর কিংবা অন্য কোন নগরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেই 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র যুক্তি তার অন্তরের গুমরাণি আরও বাড়িয়েছে। সে এখনও ভাবে তাল করে' বাড়িওয়ালাকে জব্দ করতে পারলে বা পুলিশকে ঠিকমত হাত করতে পারলে ভবানীপুরেই তাদের একটা হিল্লে হত। ভবানীপুরে তাদের পাড়ার ক্যাবিনে এতক্ষণে চায়ের আসর ভাঙছে আর সে ছন্নছাড়া হয়ে নোংরা শহরতলীর নোংরা জলে নামছে, এ চিন্তায় তার মুখখানা দেখায় জলেভরা থম্‌থমে মেঘ। তার দিব্যচক্ষুতে তখন ভবানীপুরের সেই চটা ওঠা গাড়াগর্তশোভিত দেবেন ঘোষ রোড সিনেমার মসৃণ নির্জন রাস্তায় রূপান্তরিত আর সামনে গঙ্গার ঘোলা জল এক অপরিচিত

অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের মত প্রসারিত হয়ে থাকে।

এবার জোয়ার আসে। জোয়ারে চানে আরাম। তাঁতীবাবু তাই সবার শেষে আসেন। লম্বা একহারা লোকটার আদিবাস চন্দননগর। কিছুকাল যাবৎ এখানে উঠে এসেছেন তাঁর মেয়ের বাড়ি। হঠাৎ কলেরায় জামাইয়ের মৃত্যু তাঁতীবাবুকে বরানগরে টেনে এনেছে। তাঁতও বসিয়েছেন বাড়িতে।

দীপকের প্রায় চোখ ফেটে জল আসে তাঁতীবাবুকে দেখে। এই তো এখানকার 'কম্পানি', এই তো এখানকার 'কালচার'—সে বিষণ্ণভাবে চিন্তাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। 'কম্পানি' কিংবা 'কালচার' বলতে নির্দিষ্ট কি বোঝায় সে সম্পর্কে তার দৃঢ় ধারণা না থাকলেও এ অবস্থায় লোকে যেরকম আক্ষেপ করে সেও তেমনি আক্ষেপে চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে।

'এখনও জলে নামা হয় নি?' তাঁতীবাবুর এ প্রশ্নে দীপক ভুরু কুঁচকায়। তার এখন ইচ্ছে সিনেমার প্রসঙ্গ আলোচনা, কিন্তু তা কি সম্ভব? সিনেমার প্রসঙ্গ মানে সাম্প্রতিককালে তারকাদের নানা ভঙ্গীমাময় চিত্রসম্বলিত যে সব কাগজ বেরিয়েছে যেখানে শ্রীমতী অমুক কি বেশে রাত্তিরে শুতে যান বা শ্রীমতী তমুক শুধু ভেট্‌কী ফ্রাই খেয়ে শরীর কেমন চাঙ্গা রেখেছেন এই ধরনের ভেতরকার খবর দেয় সেই সব খবরের ওপর এতক্ষণ আলোচনা জমাট বাঁধত। আর শুধু ফিল্ম কেন সবরকম আলোচনা জমত—সুচিত্রা সেন বা রাশিয়ান্ স্পুটনিক। দীপক আধখাওয়া সিগারেট ছুঁড়ে দেয় জলে।

'এবার কেমন কাপড় বেচলেন পুজোয়?' কর্কশ লাগে দীপকের আচক্‌কা প্রশ্ন।

'আর কাপড়!' পাশছাঁটা ধবধবে গোঁফের নীচে তাঁতীবাবুর ফোকলা মুখখানা হাসিতে ভরপুর। 'সে কাপড় আর নেই! এই আঙুলে একশো চল্লিশ কাউন্ট কাপড় বুনেছি। রেশমের মত নরম। ঐ যে কিরু মিত্তির হাইকোর্টের জজ, নেংটাপোঁদে খেলেছি, কিরুর বাড়ি সারা বছর আমার হাতের কাপড় বরাদ্দ। এখন আর সুতো কোথায়? চোখে দেখি না। এখন সব গামছা, যাট কাউন্ট।' তাঁতীবাবুর চোখ পর্যন্ত হাসি উঠে আসে।

দীপকের এ ধরনের কথাবার্তা ভাল লাগে না। এ ধরনের কথাবার্তা তার জীবনের ছকের সঙ্গে মেলে না। একসঙ্গে তাঁতী আর জজের বাল্যক্রীড়া সে সন্দেহের চোখে দেখে। তাকে নতুন পেয়ে বুড়ো বোধহয় গুলপট্টি চালাচ্ছে।

'আপনার ছেলেরা কি করে?' এমনভাবে সে জিজ্ঞেস করে যেন সে যাচাই করছে যেমনভাবে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে থাকেন। যেন বেফাঁস কথা বলবে না—এরকম সাবধান-বাণী প্রচ্ছন্ন সে প্রশ্নে।

'ছেলেরা আর কি করবে! তারা সব লেখাপড়া শিখেছে। বাপদাদার ব্যবসা তারা পারেও না, পোষায়ও না। ম্যাকফিল্ড সাহেবের মেম, সেই তো বড় ছেলেটাকে কারখানায় লাগালে। খুব ভালবাসত। একবার অসুখ করেছিল, কি সেবা করলে! বলেছিল বিলেত নিয়ে যাবে, ট্রেনিং দেবে, তা আর পাঠালাম না। এখন জব্বলপুরে।'

তাঁতীবাবু কয়েকটা ডুব দিয়েই উঠে পড়েন। তারপর অন্যান্য স্নানার্থীদের সঙ্গেই প্রায় ঘাটে ওঠেন। তারিণীর সাইকেলের দোকান এখনই খুলবে। নলিনী বেলুড়ে পাটের অফিসে কাজ করে, বাড়ি ফিরেই দুটি খেয়ে তাকে খেয়া পার হতে হবে। ঘাট প্রায় খালি। দুটো মুটে শুধু এককোণে তাদের পরনের কাপড় আছড়ে কেচে তুলছে।

বিষণ্ণ দীপক ঘাটে বসে থাকে। বটগাছের শুকনো পাতা ওড়ে।

ইতিমধ্যে পায়জামা পরনে একটি যুবক ঘাটে নামে। পিঠে টার্কিশ তোয়ালে, হাতে সাবানের বাক্স। পিছলের ভয়ে অনভ্যস্ত লোকটি নামে বেশী সন্তর্পণে। কদিন হলই আসছে, দীপক লক্ষ্য করেছে। ঘাট প্রায় খালি হলে আসে। চান করার ব্যাপারে একটু আত্মসচেতন, আগন্তুকের ভাবখানা খুব চেষ্টা করে মুছে ফেলবার চেষ্টা তার মুখে।

দীপক আত্মীয়তাবোধ করে। বলে, 'নতুন এসেছেন নাকি এদিকে?'

'নতুন, হ্যাঁ!' অস্পষ্ট উত্তর আসে।

হাল্কা লম্বা খুব সাধারণ চেহারা, মুখের মধ্যে বড় বড় দুটো চোখ আর সযত্নে ছাঁটা গোঁফ আকর্ষণীয়। তবে কপাল চওড়া হতে শুরু করেছে। বুকে লোমের আধিক্য থাকায় রোগা গা কিঞ্চিৎ বেশী লোমশ লাগে। দীপকের বোধ হচ্ছিল ভাল কাপড়চোপড় পরে মাজা দিলে চেহারাটা ভালই লাগবে।

'কোথায় যেন স্যর আপনাকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে। বালিগঞ্জে থাকেন না?'

'না বোসপাড়া লেনে—বাগবাজার।'

'তাহলে মার্টিন বার্ণে বোধহয়। আমার এক দাদা ঐ অফিসে...'

'মাস্টারী করি কলেজে।'

'ও!' দীপক চুপসে যায়।

'জ্যাঠার বাড়ি এসেছি বেড়াতে।'

'কোন বাড়িটা? দীপকের জিজ্ঞাসা খুব মোলায়েম পাছে গেঁয়োমি প্রকাশ পায়।

'প্রবোধ সেনের বাড়ি।'

'প্রবোধ সেনের!' অস্ফুট আওয়াজ বেরোয় দীপকের মুখ দিয়ে। এই লোকটাও কি গুল চালাচ্ছে তাঁতীবাবুর মত? সম্ভব। নইলে কুঠিঘাটার কাদায় মিনিস্টারের ভাইপো চান করতে নামবে কেন? দীপক বিমর্ষভাবে জলে নামল।

জোয়ারে নির্মল গা ভাসায়। যে শীতশীত ভাব লাগছিল জলে নামবার আগে তা কেটে যায় মুহূর্তে। একটা স্টীমার দুদিকে দুটো গাধাবোট বেঁধে পারের বেশ কাছ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যায়। প্রথম শীতের মিঠে রোদ্দুরে জল কাটতে কাটতে এবার সে এগোয়। উল্টোদিকে সারি সারি মন্দির, কারখানার চিমনি, ঘাটের সিঁড়ি, কোথাও এখনও-টিকে-থাকা সবুজের আভাস। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবছাভাবে নির্মলের মনে হতে থাকে এ গঙ্গা হয়ত সেই গঙ্গাই—সেই শ্রীম-বর্ণিত কথামৃতের গঙ্গা যখন স্টীমারে করে কেশব সেন রামকৃষ্ণকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন নদীতে আর ভক্তরা চারপাশ ঘিরে মন্ত্রমুগ্ধ, যখন ঘোড়ার গাড়ি চেপে কলকাতার সম্পন্ন ব্রাহ্ম-হিন্দু ভদ্রলোক সব দক্ষিণেশ্বর আসতেন, স্টার থিয়েটারে গিরীশ ঘোষ বিনোদিনীকে নিয়ে নিতাইয়ের পালা করছেন, বিদ্যাসাগর একা হয়ে আছেন বেঁচে, ব্রাহ্মরা নতুনভাবে উৎসাহিত হচ্ছেন ধর্মব্যাখ্যায়, বঙ্কিম ঘোড়ায় চেপে ডেপুটিগিরি করছেন আর উপন্যাস লিখছেন—এককথায় জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কিছু লোক ফাঁদাফাঁদি করত। স্বল্পবিস্তৃত হলেও সেই প্রাণের জোয়ারের সঙ্গে কি এই ঘোলা-জলের উচ্ছ্বাস তুলনীয় নয়?

আসলে নির্মলের চরিত্রের ত্রুটি এইখানে। তার জ্যাঠা বলেন, এই জন্যে তার কিছু হোল না। ঘটনাকে ঘটনা ভেবে স্বচ্ছ হাল্কা মনে গ্রহণ করে পথচলবার যে দর্শন তার জ্যাঠা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে, তা তাঁর ভাইপোর আয়ত্তের বাইরে। নির্মলের চরিত্রে এই তাত্ত্বিক ঝোঁক সম্পর্কে তার জ্যাঠা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বলেছিলেন, 'আই ওয়াণ্ডার হোয়াই হি

ইজ্ সো সীরিয়াস্! হোয়াই শুড হি টেক লাইফ সো সীরিয়াসলি? এই বুড়ো ইয়াং-মেনদের দিয়ে কি হবে দেশের?'

'আপনার কি আপন জ্যাঠা?' গামছা দিয়ে লম্বা চুল ঝাড়তে ঝাড়তে দীপক বলেই ফেলে।

'নকল নয়।'

দীপক তবু সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে লোকটাকে। একবার বিড়বিড় করে, 'ওটা গবা-দের বাড়ি। ও তল্লাটে আরও তিনচারখানা বাড়ি ছিল গবাদের। এখন সবই গেছে।'

গবার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হলেও দীপক সেই ছেলেটির সঙ্গে পরিচয়ের সংবাদ মারফত তার নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব জানাতে চায়। বোধহয় এভাবে মিনিস্টার-ভাইপোর পাশে দাঁড়ানো তার পক্ষে সোজা হয়ে যায়।

'কদিন আছেন?'

'আর কয়েকদিন। ছুটিটা ভাবছি এখানেই কাটিয়ে যাব।'

'এইখানে? কোন অ্যাসোসিয়েশন নাই, কিচ্ছু নেই!'

'কলকাতায় যে পরিমাণ ধুলো আর ধোঁয়া তাতে বেশীর ভাগ লোকেরই ফেনিন্-জাইটিস্। আমারও টন্‌সিলের দোষ আছে।'

'কাটিয়ে ফেলুন,' দীপক আবার অন্তরঙ্গতা বোধ করে। 'আজকালকার সায়েন্সের যুগে ওসব পুরনো কুসংস্কার পচিয়ে রাখা ঠিক না।'

'আমি সবটা সায়ান্স মানি না আপনার মত,' নির্মল ঝাঁপ খায় জলে। মাথা থেকে কতগুলো অবাঞ্ছিত ভাবনা হটাবার জন্যে সে জোয়ারে অনেকদূর উজিয়ে যায়। চিৎ হয়ে ভেসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। দূরে বালি ব্রিজের ওপর একখণ্ড মেঘ, একদিকের কলের চিমনি, মন্দিরের চূড়ো। চিৎ হয়ে ভাসলে জল দেখা যায় না যে জল চারপাশে তাকে বেষ্টন করে আছে। বাস্তব ঘটনা তো একই, যে যেমনভাবে দেখে—কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে। তার জ্যাঠা আর সেও দেখছে এই রিয়ালিটি দুভাবে। কোনটা ঠিক দেখা ভগবান জানে।

নির্মল ঘাটে ওঠে।

তিন

পরদিন সকালে কুঠিঘাটায় স্নানার্থীদের মধ্যে প্রায় একটা আলোড়ন। দীপক কথাটা পাড়বার আগে ভেবেছিল সে এই আলোড়নের নায়ক হবে, প্রবোধ সেনের ভাইপোর কুঠি-ঘাটায় আবির্ভাবের মত ঘটনাটা বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু মাটি করল কেদার মুখুজ্জে, 'প্রবোধ সেনের কোন্ ভাইপো?' এমন নির্বিকারভাবে বুকে পিঠে তেল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন যে নলিনী-তারিনী আরও দুতিনজনের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়ল।

'ওরা দুভাই দুরকম। ছোট সুবোধচন্দ্র ওয়ারে গেল। আই-এম-এস হোল। এ বলছি সেই প্রথম যুদ্ধ। নাইন্‌টিন ফোর্টিন। তারপর ফিরে এসে এক সাহেবের নাকে ঘুষি চালালে। ভীষণ স্বদেশী বনলে। চাকরী গেল। লোকটা তারপর বিনি ফিয়ে ডাক্তারী করে ডুবল। অবশ্য ছেলেটা দাঁড়িয়েছে শুনছি। বোধহয় ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার—

'কলেজের মাস্টার।' দীপক চট করে বললে।

'ঐরকম একটা কি হবে। শুনেছি সুবোধচন্দ্রের বিশেষ কিছু হয় নি।...হলেই বা কি, না হলেই বা কি। সবই তো ফক্কা! সংসার মানেই দাদা ফক্কাবাজি!'

'বড্ড ঠাণ্ডা!' মুখুজ্জের পাঁচ বছরের নাতনীটা চেঁচাল।

'তোর আর চানে কাজ নেই। একটু চাঁদিতে জল দিয়ে দেব।'

কেদার মুখুজ্জের সংসার প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণবাণীর ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি আর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষয়িক জগত সম্পর্কে কৌতূহল তাঁকে অন্যান্য স্নানার্থী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। জিজ্ঞেস করলে রামকৃষ্ণ পুনরাবৃত্তি করেন, 'রাজা জনক—ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি।' তিনি যেমন রোজ ভোর থাকতে পুজোয় বসেন, গঙ্গাস্নান করেন তেমনি বিখ্যাত লোকদের লেটেস্ট কেচ্ছা তাঁর নখদর্পণে। বিধান রায় নলিনী সরকারের ব্যক্তিগত জীবন কেন, মন্ত্রীমহল, বিরোধীদলের নেতৃবর্গ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সওদাগরী অফিসের বড় সাহেব সবাইকেই তিনি যেন বুকে টেনে নিয়েছেন। কে কত ঘুষ খায়, কে কটা রক্ষিতা রাখে এ ব্যাপারে তাঁর অভিনিবেশ খুব সামান্য নয়।

'আপনার দাদু খবরের কাগজের চীপ্ রিপোর্টার হলে ভাল মানাত,' তারিনী বাংলা 'চ'তে ইংরেজী 'ফ'-এর উচ্চারণ আনে।

'সুবোধচন্দ্রের দাদা প্রবোধচন্দ্র ওকালতিতে খুব পসার করলে। ওদের বাড়ি কেষ্টনগর, আমার মামার বাড়ির গায়ে। মুসলমান চাষীরা বলত, 'ওপরে আল্লা, নীচে প্রবোধ সেন।' খুন করেই দৌড়ত তার কাছে। প্রবোধচন্দ্র ওকালতি জোর চালালে, সাহেবসুবোদের সঙ্গে বিস্তর দহরমমহরম ছিল আবার গান্ধিজী কলকাতা এলেই দৌড়তেন দেখা করতে।'

'জনক রাজা, ইদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি!' দীপক চেঁচিয়ে উঠল।

'সেই জন্যেই উঠেছেন। নইলে কে প'ছত? আরও ঢের এলেমদার লোক ছিল জেলায়। ভুরি ভুরি জেল খেটেছে লোকে। কিন্তু সবাই প্রায় একবগ্গা। প্রবোধ সেন সে জাতের নয়। সে দুদিক সামলায়।'

'দু নৌকোয় পা দিয়ে চলে,' নলিনী গম্ভীরভাবে বলে।

'হ্যাঁ বাবা, সেইভাবেই চলতে হয় এ সংসারে।'

'আমি মানি না,' নলিনী ঘাড় নাড়ালে। 'বাঁচতে গেলে প্রবোধ সেন হতে যাব কেন? যা নিজে বিশ্বেস করি তা বিসর্জন দেব? তার জন্যে মরতে হয় সেওভি আচ্ছা।'

তারিণী উত্তেজিত হয়ে বললে, 'যার সম্মান নেই তার বাইচ্যা থেকে কি লাভ?'

'কে বললে প্রবোধ সেনের সম্মান নেই? তোমার আমার চেয়ে তার ঢের সম্মান।'

'অমন সম্মানের ওপর......' অশ্রাব্য ভাষা বের হয় তারিণীর মুখে।

কেদার মুখুজ্জে হাত তুলে বললেন, 'খামাকা মাথা গরম করো কেন? আমি তো আরও দেখেছি তোমাদের চেয়ে। ছেলেবেলা থেকে ইংরেজের আমল দেখলাম, কংগ্রেসের আমল দেখলাম, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দেখলাম, পার্টিশান দেখলাম, রিফিউজি-মিছিল—'চলবে না চলবে না' সবই তো দেখলাম। একটা কথাই ভাই দাঁড়াচ্ছে। যারা দুদিক রেখেছে তারাই দাঁড়িয়েছে। আর সব তলিয়ে গেছে।'

নলিনী তাদের কারখানার ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক। ট্রাইবুনালে মালিকের সঙ্গে লড়ে মজুরদের দাবী আদায় করেছে। বোধহয় সেইজন্যেই তার আত্মবিশ্বাস বেশী। সে মাথা বাঁকিয়ে বলে, 'আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী দেখেছি অনেক কম সময়ে।

আপনার জনক রাজার থিওরী এখানে দেবেন না। কারখানায় অনেক জনক রাজা দেখা আছে। স্ট্রাইক হলেই দালাল বনে যায়।'

কেদার মুখুজ্জে নাতনীর মাথা ধোয়ান। সে চেঁচায়, 'বড্ড শীত করছে, বড্ড শীত করছে।' তার মাথা মুছিয়ে তিনি ঘাটে ওঠেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'যার যা বিশ্বেস বাবা। আমার কথা মানতে হবে এমন দিব্যি দিয়েছি কাউকে।'

তিনি চলে যাবার পর ঘাটের হাওয়া থমথমে লাগে। নতুন শীতের রোদ্দুর ঘোলা জলে চিকচিক করছে। গল গল করে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে দুটো ফ্ল্যাট দুই বগলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে একটা স্টীমার। সহসা ফট্ ফট্ করতে করতে একখানা নীল চালিয়াৎ মোটর বোট বেরিয়ে গেল। তার ঢেউয়ে মাঝ গঙ্গায় দুতিনখানা নিশ্চল মেছো নৌকো দুলতে থাকে। কিন্তু কেমন তাল কেটে যায়। এই মিঠে রোদ্দুরে সামনের অতিপরিচিত অথচ চির নতুন গঙ্গাদৃশ্যও সেই বেতাল অবস্থা কাটাতে পারে না।

'বেশ জমেছিল কিন্তু আজ,' দীপক উৎসাহ দেখায়।

'দূর! মিছিমিছি দাদুকে চটালাম,' নলিনী গা মুছতে মুছতে বলে।

চার

চান করে গঙ্গার ধারে তার জ্যাঠামশায়ের সম্প্রতি কেনা বাগান বাড়ির গেটে ঢুকতেই বাড়ির দারোয়ান জানালে, 'ভবেনবাবু এসেছেন ওপরে।'

গ্যারেজে তার উনুনে ডাল ফুটে উঠেছে। দালদার সম্বরা দেবার আগে তাদের এই সরল ভালমানুষ দাদাবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয় রঘুর। এইমাত্র ভবেনবাবুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তার কথা হচ্ছিল। রঘু ভবেনকে বলেছে, 'আমার ছেলেকেভি কলেজের মাস্টার হতে মানা করেছি। ছেলেপেলে মানুষ কোরতে হোবে তো। মাস্টার হলে খাবে কি?'

দারোয়ান রঘুর নামকাওয়াস্তে। আসলে সুদের কারবার। বরানগরে আসতে হবে শুনে সে প্রথমে মুহ্যমান হয়ে পড়ে টাকার শোকে। কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকলে মানুষ বড় হয় অর্থাৎ অধ্যবসায় কর্মতৎপরতা তা তার চরিত্রে প্রচুর পরিমাণ থাকায় এই অচেনা পরিবেশেও প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। বাজারের বাবু, দোকানের কর্মচারী, গঙ্গার ওপারে মিলের কেরানী, মেকানিক তার কাছে বাঁধা চড়া সুদের গেরোয়।

খয়নি ডলতে ডলতে নির্মলের কাছে এসে বলে, 'একটা কাজ আমার করিয়ে দিতে হবে বড়সাবকে ব'লে—একটা পিট্রোল পাম্পু। আর আমার লেড়কা লিয়ে একটা টেক্সি পারিমিট। মামুলি বাত।'

'তোমার ছেলে তো ভাল লেখাপড়া শিখেছে, তার পারমিট কি দরকার?' নির্মল বিরক্ত হয়ে বললে।

'লেখাপড়া শিখেছে কি সংসার করবে না? চার সাল আগে সাদি দিয়া। দো লেড়কা পয়দা কিয়া। লেখাপড়া শিখনে মে কেয়া ফয়দা!'

তারপর রোদ্দুরে ঘাসের ওপর বেতের একখানা চেয়ার পেতে দিয়ে রঘু ডাল নামায়। 'আপ এক কাম্ করিয়ে। সিনেমা লাইনমে যাইয়ে। বহুৎ পয়সা।'

'সিনেমায় আমায় নেবে না। গান গাইতে হবে। নাচতে হবে।'

'সে সব সিখে লিবেন। আর যদি তা না হয় ফিল্মের স্টোরী লিখুন। আমার মুলুকে ভারী ভারী রাইটার, কেতনা সান্দান, সব ফিল্ম লাইনে চলা গিয়া।...আপনার বাবা, ছোট-বাবু, বহুৎ বড়া আদমী, বহুৎ শুধ হ্যায় য্যায়সে গঙ্গামায়িকি পানি। লেকিন গঙ্গাপানি আভি থোড়া কমজোরি হো গেই। আদমিলোক কলকা পানি পিতে হ্যাঁয়।'

নির্মল লক্ষ্য করেছে আজকাল সব ভাষায় খবরের কাগজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে মানুষ আগের চেয়ে অনেক চালাক। অনেক কথা সে অনেকভাবে বলতে পারে। আর দারোয়ান থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবাইকেই তো এদেশে কথার ভূতে পেয়েছে। এই কথার ভূতগুলো রোজ সকালে খবরের কাগজের পাতায় নাচে, সভায় সভায় হাত পা তুলে লাফায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারী দপ্তরে, স্টক এক্সচেঞ্জে, জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে, পাড়ার রেস্তোরায় যেটা দাঁড়াচ্ছে তা হল কথা দিয়ে জীবনের প্রত্যেক সমস্যার তৎক্ষণাৎ সমাধান।

আর এই গঙ্গার ধারে নির্জনতায় গ্যারেজে দুবেলা রান্না করে' ফুলগাছ নিড়িয়ে হিন্দি "সন্মার্গ" কাগজখানা আদ্যোপান্ত পড়ে' কেদারের পেটেও অনেক কথা জমে। আবার বড়বাবু আসছেন। পেট্রোল পাম্প নিদেনপক্ষে ট্যাক্সির পারমিট প্রসঙ্গ কিভাবে পাড়বে বড়বাবুর কাছে কাল সারারাত তাই ভেবেছে। কারণ রঘু বিশ্বেস করে যদি তাক্ করে কথাটা পাড়তে পারে কিংবা আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারে তাহলেই অর্ধেক কাম হাসিল। তারপর হয়ত অপেক্ষা করতে হবে একবছর দেড় বছর। তা সে করবে।

সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোয়াল-চওড়া কাঁধমোটা মানুষটার কঠোর হাসিতে ভারাক্রান্ত মুখ-খানার দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল বললে, 'তুমি বরং কথাটা ভবেনবাবুকে দিয়ে বলাও।'

নির্মল ওপরে উঠে যেতেই রঘু মাথা নাড়ায়। একটু মায়াও হয় নির্মলের জন্যে। বস্তুত সে নিজে অনেক বেশী রোজগার করে এই দাদাবাবুর চেয়ে। দাদাবাবুর অর্ধেক লেখাপড়া যদি সে জানতো তাহলে কি বিপ্লবই না ঘটিয়ে দিত সে মাঝে মাঝে ভাবে। বাজার ঘুরে ঘুরে রঘু দেখেছে বোম্বাই থেকে আনা যে সব ভাল রেডিমেড্ বুশশার্ট শার্ট বাজারে আসছে কিংবা ছোট ছেলেমেয়েদের রকমারি জামা উঠেছে তাদের একটাও ভাল দোকান এখানে নেই। রাস্তার মোড়ে সে বড় দোকান দেবে। বাইরে নিওন আলো জ্বলবে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, তার রাখা টাইপরা ইংরেজী জানা কর্মচারীরা মেয়েদের দিকে হাত বাড়িয়ে জিনিস দেখাবে। কিংবা পাঞ্জাবীরা যেমন সাম্রাজ্য বিস্তারের মত একটার পর একটা কলকাতায় জম্‌জম্ রেস্তরা দিচ্ছে তেমনি একটা লাগাবে এখানে। রঘু গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। আশ্চর্য কোমল, স্বপ্নেভরা, প্রায় গর্ভবতী নারীর যে দৃষ্টি। সেদিকে চেয়ে চেয়েই রঘু ভাত চাপিয়ে দেয়।

পাঁচ

নির্মল অবাক হয়ে দেখল ওপারের ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলতেই ভবেন সান্ন্যালের আর্তকণ্ঠ বেজে ওঠে, 'খুলবেন না, খুলবেন না, এক মিনিট।'

ভেজানো দরজার ওদিক দিক থেকে শোনা যায় দেয়ালে পেরেক ঠোকার শব্দ। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর ভবেন যেন যবনিকা তোলার হুইসিল্ দিলে, 'আসুন।'

ঢুকতেই নির্মলের চোখে পড়ল, জ্যাঠামশায়ের এক বিরাট আবক্ষ ফটো। গরম গলা-বন্ধে যতখানি রাসভারি গম্ভীর নন তার চেয়ে অনেক বেশী দেখাচ্ছে। চোখেমুখে বোধহয়

রিটাচিং-এর দরুন অতিমাত্রায় প্রকট 'ভি-আই-পি-লুক্'। নির্মলের মনে হচ্ছিল স্মিত হাসবার চেষ্টা না করলেই পারতেন জ্যাঠামশাই। ওটা বাদ দিলে আরও স্বাভাবিক হত। বোধহয় নেহেরুকে নকল করে বোতামের ফাঁকে গোলাপ আঁটা হয়েছে। জ্যাঠামশাই সম্পর্কে তার নিজের খুব একটা বড় ধারণা নেই কিন্তু এরকম দাম্ভিক অসামাজিক ঢং-এ তাঁকে উদিত হতে নির্মল খুব কমই দেখেছে।

ভবেন সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে নির্মলের দিকে মুখ ফেরাল। 'ভাল হয় নি? আমিই করিয়ে দিয়েছি। কলেজ স্ট্রীটে চ্যাটার্জী ব্রাদার্স।...আপনারা চারদিকে বলছেন বাঙালী ডুবছে। কিন্তু আমি তা মোটেই মানি না। এই দেখুন না। এই ছোট্ট ছবির দোকান। কি নিপুণ কাজ। অশোক মিত্তির সেনশাস্ রিপোর্টে মশাই বাজে কথা বলে নি। ঠিকই, বাঙালীর 'প্রিসিশান ওয়ার্কে'র দিকে নজর বেশী।'

নির্মল ঠিকই জানে ভবেন এ রিপোর্ট পড়ে নি। এমনকি কাগজেও সে সামান্য সারাংশ বেরিয়েছে তাও ভালভাবে পড়েছে কিনা সন্দেহ। তবে বলছে এক্সপার্টের চালে।

'ও ঘরে যান, ও ঘরেও দেখে আসুন,' ভবেন বললে।

শোবার ঘরে খাটখানার ঠিক চালচিত্রের মত বিরাট ছবিটায় আজানুলম্বিত গড়ে মালায় ভূষিত জ্যেঠামশাই হাসছেন। চারপাশে তাঁকে অভিনন্দন দিতে জড়ো জেলার কর্মীরা। পাশে স্থানীয় একজন বড় কাপড়ের দোকানদার চোখ বন্ধ করে হাসছেন। কোন বাংলা কাগজে বোধহয় ছবিটা বেরিয়েছিল।

আর একটা ছোট খাটের পাশে স্থানীয় স্কুলের তরফ থেকে বাঁধানো মানপত্র। নির্মল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক লাইন পড়ে ফেলে :

'হে দেব, আপনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে উদিত হয়ে সমস্ত দেশ উদ্ভাসিত করেছেন আপনার প্রতিভার রশ্মিতে, বিকীর্ণ হয়েছে দিক্‌বিদিক আপনার কর্মৈষণার বর্ণাঢ্য বিকাশে।' খানিকটা দম্ নিয়ে নির্মল আবার পড়ে, 'সমস্ত দেশ-ব্যাপী যে নবীন কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছে আপনি তার হোতা; হে গুণনিধি, আপনার অতুলনীয় ঔদার্যে, অনন্যসাধারণ মনীষায়, অপরিসীম দেশপ্রেমে, অনির্বচনীয় চরিত্রমাধুর্যে আমরা মুগ্ধ। হে জ্ঞানতপস্বি!...'

হঠাৎ হাসির দমকে নির্মল চোখে ঝাপসা দেখে। 'এটা একটু...' হাসি চাপতে চাপতে কোনরকমে বলে।

'এক্‌জ্যাক্টলি! আমিও সেই কথাই ভাবছি। আপনার জ্যাঠামশাইও ঠিক বলবেন, 'এটা কি করেছো ভবেন?'...আপনি জানবেন, আই হেট্ ফ্ল্যাটারি।'

ভবেন চাপা উত্তেজনায় হঠাৎ চুপ করে' আবার ফেটে পড়ে, 'আমিও মশাই দেশের জন্যে সাফার করেছি। আমিও দেশকে ভালবাসি। এই কন্‌শাস্‌নেস্ আমার আছে। আর তা আছে বলেই আমার কোন 'ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স' নেই।...আপনি বলবেন, এটা ব্যাড টেস্ট। আমিও ঠিক তাই বলি। আপনার জ্যাঠামশাইও তাই বলেন। তবে কি জানেন, পলিটিক্স ইজ্ এ ডার্টি গেম্। সব পলিটিক্স—গান্ধী পলিটিক্স, কংগ্রেস পলিটিক্স, কম্যুনিস্ট পলিটিক্স। সব মিয়াকে দেখা আছে নির্মলবাবু। সব জায়গায় এক কথা। কে কত শো দিতে পারে। নেহেরু বলতে আজ সবাই পাগল। দেখতাম মতিলালের বেটা না হলে নেহেরু কেমন নেহেরু হোত।'

'তাহলেও একটা সামঞ্জস্য বলে জিনিস আছে। আর শো বেশীদিন টেঁকে না।'

নির্মল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে।

ভবেন সান্ন্যালের রোগা মুখ, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর উজ্জ্বল চোখ সব মিলে বেশ এক বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। হয়ত চোখের দোষ, কিন্তু উত্তেজিত হলেই তার চোখ জ্বলতে থাকে। তখন সাধারণ কথা বললেও শোনায় অসাধারণ।

'দরকার কি! দরকার কি! পলিটিশিয়ান তো ফিলজফার নয়। একথা আপনার জ্যাঠামশাইকে কতবার বলেছি যে এক ভারতবর্ষ ছাড়া সব দেশেই পলিটিক্স কেরীয়ার। ইংরেজদের বড়ঘরের ছেলেরা মিনিস্টার হবার জন্যে ছেলেবেলাতেই আয়নার সামনে ঘুসি পাকিয়ে বক্তৃতা দেয়। গান্ধিজী নেহেরু এদের অহিংসা ফাহিংসা নীতিটিতি খুব ভাল। এগুলো লোকজনদেরও বলা দরকার। কিন্তু এসব কথায় চিঁড়ে ভেজে না।'

'কিসে ভেজে?'

'আপনি তো মশাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। কেষ্টনগরে কি লোকের ঘাটতি ছিল? সব দিক থেকে অ্যাডভান্সড্ ডিস্ট্রিক্ট, কি সব জাঁদরেল লোক,—তারিণী মুখুজ্জে, রতন শেঠ, মদন মিত্তির। উকিলকে উকিল, ডাক্তারকে ডাক্তার, ব্যারিস্টারকে ব্যারিস্টার। আর জেলখাটাওয়ালাদের তো গোনা যায় না। তবু বলুন, প্রবোধ সেনকে কেন সিলেক্ট করা হোল?'

তারপর নির্মলকে কিছু বলতে না দিয়ে অত্যুজ্জ্বল চোখ মেলে ভবেন বললে, 'সিলেক্ট করা হোল তার কারণ তাঁর মত সেন্স অফ্ অরগানাইজেশান আর কার আছে। তাঁর সম্পর্কে একটা এডিটোরিয়ালে যা লিখেছে একদম খাঁটি কথা—হি স্ট্রাইক্স এ ব্যালেন্স। সবাই নিজের নিজের মত নিয়ে আছেন কিন্তু তিনি সব মত এক করলেন।'

তার জ্যাঠামশাইয়ের তারিফ শুনে নির্মলকে ম্রিয়মান দেখায় না। জ্যাঠামশাই তার মতে কাজের লোক। এ কথাটা তার সবচেয়ে বড় শত্রুও স্বীকার করবে। কিন্তু নির্মলের কাছে ভবেন সান্ন্যালের এই উৎসাহ কিছুটা ভাড়াটে, কিছু পরিমাণ কমিক না হয়ে যায় না। তার মানে মার চেয়ে মাসীর দরদে সে অসন্তুষ্ট হচ্ছে এমন না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আত্মীয়ের চেয়ে বন্ধু বড়। কিন্তু তার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে এই চারপাশের জগতে, রোজকার খবরের কাগজের পাতায় এই ফাঁদাফাঁদি সে ঠিক বুঝতে পারে না।

এটা বোধহয় চরিত্রের দোষ। তার জ্যাঠামশাইয়ের মত ঘটনাকে সে কেবল ঘটনা ভেবে পরিচ্ছন্ন অনাসক্ত মনে গ্রহণ করতে পারে না। তবে না করেই বা উপায় কি? এই যে ভবেন সান্ন্যাল তার সামনে চেঁচাচ্ছে, দাপাচ্ছে, তারও বোধহয় একটা মানে আছে। কিন্তু সে নিজে কি করছে? সে কি পৃথিবীর এই জীবননাট্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই? আর তাতে লাভ কি?

উৎসাহে ভবেন যত জ্বলতে থাকে, দেশকাল সম্পর্কে মামুলী উদ্দীপনাপূর্ণ কথা-বার্তা বলে যায় ততই নির্মল বিষণ্ণ বোধ করে। তার মনে হয় তার নিজের সিদ্ধান্ত নেবার দিন আসছে। তাকেও হয় ভবেন সান্ন্যালের কোম্পানীতে যোগ দিতে হবে অথবা—

অথবাটা কি? অথবা রাজনীতির শাঠ্যের মুখোস টেনে ছিঁড়তে হবে, দেশকালের নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে হবে, নতুন দল গড়তে হবে কিংবা গড়তে সাহায্য করতে হবে, দরকার হলে নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে......নাঃ, তা আর হয় না।

নির্মল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার যৌবনের প্রথম দশ বারো বছরের দিকে এবার অপলক দৃষ্টিতে তাকানোর সময় এসেছে। ভবেন ভাড়াটে কিন্তু সে নিজে কী? একজন

ভাল লোক, বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক যে এখনও প্রাইভেট ট্যুইশানি করে পয়সা রোজগার করে নি বা নোট লেখে নি। এখনও দু চারখানা বই পড়ার চেষ্টা করে এই মাত্র। কিন্তু এভাবে কি সামনে বেশী দূর বেশী দিন চেয়ে থাকা যায়?

তার চেয়ে চার-পাঁচ বছর আগে জ্যাঠামশাই যে 'অফার' দিয়েছিলেন (নীলু, তুই কেন পচছিস এখানে? ব্যারিস্টারিটা দি আয়। আমি তো আছি। বছর আট-দশেকের মধ্যে একটা ভাল প্র্যাকটিস্ গড়ে তোলা কঠিন হবে না।) সেটা গ্রহণ করলে কি ভাল ছিল না?

'কি মশাই আপনি যে গুম মেরে গেলেন! এরকম চুপ মেরে যাওয়া আমার পছন্দ না। যদি কেউ খোলাখুলিভাবে আমাকে বলে জোচ্চর......'

'আপনি কি মনে করেন আপনি তা নন?'

'সত্যি বলছেন?' ভবেন আবার প্রদীপ্ত চোখ মেলে তাকায়।

'ঠাট্টা বোঝেন না?'

'জোচ্চর বলুন আর যাই বলুন, ভালমানুষদের নিয়ে সংসার চলে না। পলিটিক্সের কথা বাদ দিন। আপনি যদি নিপাট্টি ভালমানুষ হন দেখবেন বাড়ির চাকর থেকে স্ত্রী পর্যন্ত কেউ আপনার আর বশে নেই।'

'কে বললে আমি নিপাট্টি ভালমানুষ? আমিও জোচ্চুরী করতে চাই। তবে সাহসে কুলায় না,' নির্মল হেসে ফেললে।

'কি জানি মশাই, আপনি ঠিক বলছেন না ঠাট্টা করছেন। তবে ভালমানুষ কিংবা পাগল না হলে এই গঙ্গার ধারে একলা এতগুলো দিন কাটিয়ে দিলেন! কর্তা যখন এই বাগানবাড়িখানা কিনলেন আমার অমত ছিল। আমি বলেওছিলাম, এসব পুরনো জামানার ব্যাপার। এখন ছুটিতে কাশ্মীর যাবেন, পাহালগামে কটেজ নেবেন। এই সব পুরনো চিন্তার জট এখনও ছাড়ানো যাচ্ছে না, এই হচ্ছে মুস্কিল।'

নির্মল আগেও লক্ষ করেছে এই ব্যাপার। ভবেন প্রায়ই বলে, তার জ্যাঠামশাইকে এটা বলেছে সেটা বলেছে। যা তার বলা উচিত ছিল কিন্তু বলতে পারে নি তাই পরে গল্পে গল্পে অন্যেকে বলে। তার জ্যাঠামশাই নিশ্চয় এত উপদেশ সহ্য করেন না। কতবার নির্মল দেখেছে মাঝপথেই ভবেনের উৎসাহ তিনি ফুৎকারে নিভিয়ে দেন।

'আপনি ভাবছেন তো, আমি এসব বলি নি, বলবার ক্ষমতা নেই.' ভবেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নির্মলকে দেখে।

'দূর মশাই, আপনার সম্পর্কে আমি ভাবছিই না। ইউ আর ওয়ান্ডারফুল! জ্যাঠামণি কখন আসছেন?'

ছয়

ঠিক যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল। প্রবোধ সেন ঘরে ঢুকেই ভুরু কুঁচকালেন। 'নিশ্চয় ভবেনের কান্ড। ভবেনটা তেমনি গেঁয়ো রয়ে গেল' বলে সস্নেহে নিজের চেহারার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ঠোঁটের দুপাশে অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'যাই বলো, ওরকম দাম্ভিক চেহারা আমার না।'

'দাম্ভিক কেন হতে যাবেন। ওটাই তো ব্যক্তিত্ব। যা আপনি ঢেকে চলেন ছবিতে তাই বেরিয়েছে,' ভবেন বললে।

প্রবোধ সেনের পেছনে পেছনে তাঁর ছোট মেয়ে বুলবুলি ঢুকল। গীতা না বেলা এরকম এক সাদামাটা নাম ছিল তার। তারপর কলেজে ঢুকে নাম হয়েছিল নীলাঞ্জনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ঠাকুমার দেওয়া ডাক নামটাই টিকে গেল। আর তা ছাড়া তার আঁটসাট ছোট গড়ন, এক ঝাপড়া কোঁকড়া চুল, ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অনর্গল বকা—এসব মিলে বুলবুলি নামটা বেশ জুতসুই হয়েছে।

তার বাবার পেছনে ঘরে ঢুকেই সে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'অপূর্ব, অপূর্ব, ভবেনদা। তোমায় মাইরি সন্দেশ খাওয়াব।' আর নির্মলের দিকে চোখ পড়তেই সামনে প্রায় ছুটে এসে বললে, 'তুমি একটা দেখালে ছোড়দা! লোকে গঙ্গার ধারে হৈ হল্লা করবে, ফুর্তি করবে, আর তুমি একলা বাড়ি আগলাচ্ছো!' তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বললে, 'প্রেমে টেমে পড়লে নাকি ছোড়দা?'

'পড়ি নি, পড়ব।'

'তুমি প্রেমে পড়বে? ও বাবা! মেয়েরা ঘেষবেই না তোমার কাছে!'

'তা তুই বলতে পারিস না বুলবুলি। নির্মলের মত সোবার সীরিয়াস ছেলেকেই মেয়েরা বিয়ে করবে,' প্রবোধ সেন জ্ঞান দিলেন।

'তুমি মেয়েদের ব্যাপারে কি বোঝ বাবা? চাল কোন দেশ থেকে কেনা হবে, কোন নদীতে ড্যাম্ তৈরী হবে, কোথায় টেস্ট রিলিফ, দণ্ডকারণ্য, রেফিউজি—এসব তুমি বোঝ। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তুমি কি বোঝ?'

প্রবোধবাবু মৃদু হাসেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এই প্রগল্ভ মেয়ের সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বর্ণিত সেই সৌম্য ভদ্রলোক এবং তাঁর আদরিণী স্পর্শকাতর কন্যার সম্পর্ক থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা। প্রবোধ সেন ঠিক সেই ধরনের সৌম্য বৃদ্ধ নন। বস্তুত সৌম্যতা তিনি বরদাস্ত করেন না। যে মিঠে বার্ধক্যের রূপ দেখে বড় মেজাজে সঞ্জীবচন্দ্র একদা লিখেছিলেন, মানুষ বৃদ্ধ না হলে সুন্দর হয় না, সে সৌন্দর্য প্রবোধচন্দ্র ভয় করেন। তিনি চান এক ধরনের জোয়ান বার্ধক্য যা যুবকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পিছ্পা নয়, যা তৎপর, ব্যস্ত, কর্মমুখর। সেখানে পেছনে তাকাবার সময় নেই, স্মৃতিচারণের স্বপ্নালুতা নেই। শুধু বর্তমানের সঙ্গে ক্রমাগত মোকাবিলা করে সামনে চলা। প্রবোধচন্দ্র তাঁর পার্টি কর্মীদের সভায়, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, সর্বদাই বলেন,—জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাতির প্রতি কর্তব্য তাঁর আদর্শ। আর এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাঁর উদার মধুর হবার সময় নেই। অবশ্য তার মানে এ নয় তিনি হিউমার করবেন না। প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করেছেন হিউমার আসলে সাফল্যের অন্যতম সোপান। বিপজ্জনক অবস্থাতেও যাঁরা কায়দা করে' হাসেন তারাই হচ্ছেন আসল মানুষ। আর প্রবোধচন্দ্র এইরকম আসল মানুষ হতে চান। একবার নিজের অজান্তে তাঁর চোখদুটো তাঁর ছবির দিকে চলে যায়। ভবেন ঠিকই ধরেছে। ব্যাটার প্র্যাকটিকাল সেন্স খুব। যে ভাব বেরিয়ে পড়েছে ছবিতে সেটাই তাঁর আসল ভাব।

বুলবুলি কিন্তু তার বাপের এই ভাব বোঝে না। গত চারপাঁচ বছরে তাদের বাড়িতে যে পারিবারিক বিপ্লব ঘটে গেছে তা থেকে শ্বশুরবাড়ি বীডন স্ট্রীটে দূরে ছিল বলে অথবা বুদ্ধির অভাবেই এই পরিবর্তন সে বুঝে উঠতে পারে নি। কিংবা সূর্য যেমন চিরকাল পূর্ব দিকে ওঠে তেমনি বাবা চিরকাল বাবাই থাকে এই ধরনের কোন যুক্তি সে এখনও ছাড়তে পারে নি।

নির্মল তার বেকায়দা অবস্থা আঁচ করে বলে, 'কি নতুন ছবি দেখলি?'

'ছবি? না, ছবি দেখা আমার বারণ।'

'কেন, তোর বর আবার কবে থেকে বকধার্মিক বনল?'

'সে আমাকে কেন বারণ করবে? তবে আমার তো ইংরেজী থ্রিলার দেখা অভ্যেস। সবচেয়ে ভাল লাগে ছোড়দা সাসপেন্স। দিশী ছবিতে ওটা ঠিক পারে না। যাকে ভাবা গেল নির্দোষ সেই দেখা গেল খুনী। 'থ্রি ডেথ্‌স্‌ বাই দ্য রিভার'—দেখোনি? অপূর্ব!'

'তা সেগুলোই দেখ না,' নির্মল চেষ্টা করে তার বোনের উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে।

'না ছোড়দা, ডাক্তার বারণ করেছে। বলেছে, এসময় দেখা ঠিক হবে না। নার্ভাস্‌ টেনশান,—চাইল্ডের শরীর খারাপ হবে।'

প্রবোধবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ সময় ওসব ছবি দেখে উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। মেডিক্যাল সায়েন্সে বিশ্বেস রাখা ভাল। ডাক্তারদের ম্যাক্সিমাম্‌ কোওপারেশান দেওয়া দরকার।'

নির্মল আর বুলবুলি একই সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রবোধচন্দ্রের দিকে তাকায়। প্রবোধচন্দ্র বুঝি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভবেন প্রকারান্তরে তাঁর ভুল শুধরিয়ে দেয়। দেশনেতাদের একদিকে বজ্রাদপি কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল হতে হবে এই ধরনের উপদেশ দেবার ছলে বলে, 'আপনিই তো বলেন স্যর মেডিকেল সায়েন্স কত ইম্‌পারফেক্ট।'

'তা যা বলেছো, তবে সিনেমা এখন থাক। তুই একটা শর্ষে বাটা দিয়ে ভাল করে মাছের ঝোল রাঁধতো বুলবুলি। ডাক্তারদের কথা শুনে কতদিন আর পান্‌সে খাওয়া যায়!'

গত দশ বারো দিন এক নাগাড়ে রঘুর হাতে রান্না খাবার পর সেদিনের খাওয়াটা জমকালো ভুরি ভোজনের মতই লাগছিল। তারপর গা গড়িয়ে সারা বিকেল বুলবুলির সঙ্গে তার বীডন স্ট্রীটের শ্বশুরবাড়ি, কাঠের ব্যবসায় তার শ্বশুরের ভাগ্যের ওঠাপড়া, তার ছেলে টুবলু যে দার্জিলিংয়ে সেন্ট জোসেফে পড়ে তার পাঠ্য জীবনের সমস্যা (বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছে ছোড়দা, খালি মুসুরির ডালের সুপ খেতে দেয়), তার এক দেওর যে খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে বিলেত গিয়েছে এবং বিলেত থেকে রং বেরংয়ের কার্ড পাঠায় সে যদি মেম বিয়ে করে আনে সেই ভাবনা, তারপর হাত দেখা, এ নিয়ে হাসি চীৎকার—বিকেলটা এমনি কেটে যাচ্ছিল। নির্মলের মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তার নিজের জগত বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, তার বাপের জগত, তার রং-জ্বলা ছেতলাপড়া বেসরকারী কলেজবাড়িটায় মাস্টারী জীবন, চারপাশের জগত সম্পর্কে তার ভাবনা এ সবই অবাস্তব। বুলবুলির কথার বন্যায় ভাসতে ভাসতে তার মনে হতে থাকে বোধহয় জীবনটা খুব সরল, সোজা। আর সেইভাবেই তাকে গ্রহণ করে' নেওয়া ভাল। আর সে নিজে বোধহয় জোর করে' বেঁকাভাবে দেখছে, বোধহয় তার বাবাও দেখেন সেইভাবে। সেই বেঁকা করে জীবন দেখবার উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে চলার কি কোন মানে আছে?

বুলবুলির ঝাঁকড়া চুলের দিকে চেয়ে চেয়ে নির্মল ভাবে—সে নিজে দুটো জগতের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দরজাটা ভেজানো কিন্তু চাবি দেওয়া নেই। একটু ধাক্কা দিলেই সে আর একটা জগতে চলে আসতে পারে যেখানে বুলবুলি, বুলবুলির বর, জ্যাঠামশাই আর তার বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি, ভবেন স্যান্নাল আরও অনেকে। আর এদিকে? এদিকে তার বাপ, জীবনযুদ্ধে পরাজিত সুবোধচন্দ্র, বোসপাড়ার পুরনো গলির স্যাঁতসেতে ঘর,

একশো ছেলের বিশাল ক্লাসে গলার রগ ফুলিয়ে জন কীট্‌সের সৌন্দর্য ও সত্যের অভিন্নতা প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টা, ছেলেবেলার স্মৃতি, অবিভক্ত বাংলা দেশ সম্পর্কে একটা মায়া, সব মিলে মন-অবশ-করা এক বিষণ্ণতা। গত দশ-বারো দিন এই গঙ্গার ধারে আসলে সে এই দুই জগতের মধ্যবর্তী দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আচ্ছা ছোড়দা, তুমি হাত দেখায় বিশ্বেস করো?'

'কলেজে থাকতে চেরো-র বইটা পড়েছিলাম। এখন সব ভুলে গেছি।'

'যাক, তুমি অন্তত একটা ব্যাপারে একটু নর্মাল।'

তারপর নির্মলকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, 'উনি আবার খুব বিশ্বেস করেন। অনেক বইপত্তর ঘাঁটেন। বাবাকে তো উনিই খবর দিয়েছেন বরানগরের সাধুর কথা।'

'বরানগরের সাধু!'

'বাঃ, তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। কেন, ভবেনদা তোমায় বলেনি?...অবশ্য সাধু ঠিক নন। একেবারে মডার্ন। সিগারেট খায়, বুশশার্ট পরে। তবে আশ্চর্য ক্ষমতা ছোড়দা। যা বললে, সব মিলে গেল।'

'সব মিলে গেল?' নির্মলের গলায় বিদ্রূপ স্পষ্ট।

'স-অ-ব। আমায় বললে, আপনার মনে একটা কষ্ট আছে। সন্তান সম্পর্কে আপনার অনিশ্চয়তাবোধ আছে।......ঠিক বলে নি? আমি তো টুবলুকে নিয়ে ও'র সঙ্গে ক্রমাগত ফাইট করছি। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না। শুকোচ্ছে ছেলেটা। কেন, কলকাতায় কোন ইস্কুল নেই?'

'আর কি কি মিলল?'

'সব-সব। আবার ইংরেজী জানে লোকটা। বললে, আপনার সঙ্গে যার ভাগ্য যুক্ত হবার কথা ছিল তা ঘটে নি। অবশ্য তাতে ভালই হয়েছে। মঙ্গলের দোষ ছিল।......তুমি জানো না, এক বিলেতফেরত বড় ডাক্তারের সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক। এমন সময় জানা গেল লোকটা ড্রাংকার্ড।'

'জ্যেঠামণিও হাত দেখায়?' নির্মলের সন্দেহ হয় প্রবোধচন্দ্রের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাত দেখানো ঠিক খাপ খায় কি না।

'তুমি কি বলছো ছোড়দা? কৃষ্ণমাচারী, দিল্লীর আরও সব মিনিস্টার, পুলিস কমিশনার, হাইকোর্টের জজ একেবারে গাড়ি গিসগিস করছে সাধুর বাড়ির সামনে। বাবা যাবে না কেন? বাবাকে বলেছে 'লেবার' দেবে। বাবা নেবে কেন? বাবা 'হোম' চায়।'

ভবেনের পায়ের আওয়াজ এল। 'ব্রাদার, কর্তা ডাকছেন,' ভবেন এসেই বললে।

নীচে লনে রঘু চেয়ার পেতে দিয়েছে। সামনে কার্তিকের গঙ্গায় পড়ন্ত রোদ। ইলিশ মাছের নৌকোগুলো ফিরছে। বিশেষ কিছু আর হয়নি ওদের এ বছর।

'সুবোধের খবর কি?' নির্মলকে পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে প্রবোধবাবু বললেন।

বাপের প্রসঙ্গ জ্যাঠামশাইয়ের সামনে পাড়তে নির্মলের বাধো বাধো ঠেকে যদিও দুই পরিবারের ভেতর সেই সবচেয়ে বড় যোগসূত্র। বছর পনেরো আগে যখন দুভাই একসঙ্গে থাকতেন বোসপাড়া লেনে তখন থেকেই নির্মল ছিল জ্যাঠার পেয়ারের। তারপর ক্রমশঃ ছোটভাইয়ের পতন ও দাদার উত্তরোত্তর উন্নতি। কিন্তু বালিগঞ্জ প্লেসের যখন বাগানওয়ালা বাড়ি উঠল তখনও স্কুলের ছুটিতে মাসের পর মাস কাটিয়েছে নির্মল জ্যাঠার সঙ্গে।

তারপর অবশ্য কলেজে পড়ার কয়েকটা বছর আবার চাকরীর কয়েকটা বছরে সে বাপের জগতেই ফিরে গিয়েছে। তিন চার বছর আগেও যখন তাকে সোজাসুজি বিলেত পাঠাবার প্রস্তাব পেড়েছিলেন প্রবোধবাবু তখন নির্মল বলেছিল, 'না জ্যাঠামণি, দেশে থেকেই যা করার হয় করব।'

নির্মল চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'এখন তো ভালই আছেন। মাস তিনেক আগে সেই অ্যাটাক্‌টা হয়েছিল তারপর থেকে একটু নরম হয়ে পড়েছেন। সকাল বিকেল শ্যাম-পার্কে গিয়ে বসেন। দূরে বেরোন বারণ।'

'তখন একবার যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এমন চাপ কাজের......পাব্লিকম্যান হতে গেলে নিজের ভালমন্দ বলে আর কিছু থাকে না,' প্রবোধবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন।

তাঁর মনে পড়ল তাঁর ভাইয়ের যখন গুরুতর অবস্থা ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের পার্টির কর্তাদের সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়েছিল দুর্গাপুরে কোন একটা প্লান্ট উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। এখন হলে হয়ত যাওয়ার খুব দরকার হত না কিন্তু তখন কর্তাদের মনের অবস্থা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তারিণী মুখুজ্জের মত ডেন্‌জারাস্‌ রাইভেল-কে জেলা থেকে পুশ দিচ্ছিল। বাস্তবিক তিনমাস আগে প্রবোধচন্দ্রের হঠাৎ মনে হয় ঘাটে এসে তরী ডুবল। তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও জোরাল করবার জন্যে বলতেন তাঁর মিহি চাঁছা প্রায় মেয়েলী গলায়, 'আই ডোন্ট্‌ কেয়ার। দ্য ক্যালকাটা বার ইজ অলওয়েজ রেডি টু ওয়েলকাম্‌ মি উইথ্‌ ওপন্‌ আর্মস্‌'। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যারপর নাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময় বুলবুলির বরের কাছে বরানগরের সাধুর খোঁজ পান। আর সে লোকটা যা যা বললে সব মিলে গেল। টাইম দিয়েছিল তিনমাস থেকে ছ মাস,—এর মধ্যেই মোড় ফিরবে ('শনিটা স্যর আপনাকে বড় জ্বালাচ্ছে')। তখন বলতে কি প্রবোধ সেনের মনে স্বজন বলতে কেউ ছিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন প্রবোধচন্দ্র। পাব্লিকম্যান হবার গভীর সচেতনতায় তাঁকে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ দেখায়।

'আচ্ছা জ্যাঠামণি, তুমি নাকি কোন সাধুর পাল্লায় পড়েছো? তোমার তো এসব বাই ছিল না। তুমি আবার কবে থেকে এসব ধরেছো?' নির্মল কিছু চিন্তা না করেই বলে বসল।

প্রবোধ সেন ভুরু কুঁচকান। তাঁর ভাইপোর এ ধরনের অন্তরঙ্গতা তিনি আজকাল অপছন্দ করেন। বরং তার স্বাভাবিক চুপচাপ থাকা কিছু পরিমাণ অসামাজিক হলেও সহনীয়। ভুরু কুঁচকানো অবস্থাতেই বললেন, 'আমি কাউকে ধরি নি নির্মল। তোমার জ্যাঠাকে অতো গেঁয়ো ভেবো না।' তারপর হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন, 'এস্ট্রলজাররা আমাদের কেউ বেশী জানে না। দে ট্রেড ইন্‌ হিউম্যান্‌ উইক্‌নেস্‌। তবে সবাই তো আমরা বাণিজ্য করছি। শুধু ও বেটাদের দোষ দেওয়া কেন?'

আবার চুপ করে থেকে বললেন, 'আর কিছু গুণী লোক যে একেবারেই নেই তাই বা বলি কি করে। চোখের ওপর লোকটা গড়গড় করে তোমার অতীত বলে দিল। যেন নোট বই দেখে মুখস্ত বলছে। তুমি কি করবে বলো? বিশ্বেস করো বা না করো তার কিছু এসে যায় না।'

তারপর গঙ্গার বুকে পড়ন্ত রোদ্দুরের দিকে চেয়ে বললেন, 'লাইফে চান্স আসে এ কথাটা মানতেই হবে। যখন চান্স আসে না তখন যতই চেষ্টা করো কিচ্ছু হবে না। কিন্তু যখন চান্স আসে তখন অতি সহজেই সব হয়ে যায়। একটু চেষ্টা করলেই অনেকখানি আসে। বাজে মালা জপ্‌টপে আমি বিশ্বেস করি না, কিন্তু চান্সে আমি বিশ্বেস করি।

সুবোধ ইন্ ফ্যাক্ট বুঝতেই পারল না কখন তার ভাল সময় এল গেল। সে ঠিক এক ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। তার ফলেই শেষ বয়সে এত কষ্ট।'

নির্মলের মুখে একটা চাপা অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'আমার ভাইকে তো আমার চেয়ে কেউ বোঝে না। একেবারে গিনি সোনা। কাউকে কোনদিন পরোয়া করে নি। কিন্তু তোমায় পরোয়া করতে হবে। জামানা পাল্টে গেছে। এখন মানুষকে তার...তার এফিশিয়েন্সি প্রমাণ করতে হবে। শুধু দরজা বন্ধ করে আইডিয়ালিস্ট হলে চলবে না। পিপ্‌লের কাছে যেতে হবে। তার জন্যে সর্বস্ব পণ করতে হবে। গান্ধিজী বলেছেন...।' প্রবোধ সেন হঠাৎ চুপ করে যান। নিজেরই মনে হয় যেন ইলেকশান মিটিংএ বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভাইপো'র সামনে এই আত্মসচেতনায় নিজের ওপর অসন্তুষ্টও হলেন। একটু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয় সাধুর কাছে যেও, আমি কিছু বলছি না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ যাব। আজকেই যাবে?' নির্মল উৎসাহ দেখায়।

প্রবোধ সেন উঠে পড়ে হাঁক দেন, 'রঘু, চেয়ার উঠাও।...আজ রাত্তির বারোটায় সময় দিয়েছে। খুব স্ট্রেঞ্জ্ সময়। কি করা যাবে।'

জ্যাঠামশাই উঠে যাবার পরও নির্মল কিছুক্ষণ বসে থাকে। গঙ্গা প্রায় খালি। শুধু এক জায়গায় লাল জলে একটা গাধাবোটকে নিয়ে ছোট একখানা লঞ্চ ধীরে ধীরে এগোয়। নির্মলের মনে হচ্ছিল সে প্রায় চৌকাঠ পেরিয়ে অন্যজগতে চলে গিয়েছিল আবার পা গুটিয়ে নিয়েছে। যে জায়গায় ছিল সেখানেই আছে। ঠান্ডা পড়ছে। নির্মল উঠে পড়ল।

সাত

রাত বারোটায় বরানগরের সাধুর সঙ্গে 'এপয়েন্টমেন্ট'। স্থানীয় এক উকিল তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী। তাঁর মারফত সময় ঠিক করা হয় ফোনে। রাত বারোটার কথা শুনে প্রথমে প্রবোধ সেন ধমকিয়েছিলেন ভদ্রলোককে, 'সবটাতে বাড়াবাড়ি করবেন না।' কিন্তু দেখা গেল শেষপর্যন্ত তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। উকিল ভদ্রলোক ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পে গল্পে বলেন, 'পাঁচ টাকা পোনা মাছের কাটা, যার পোষাবে নেবে, যার পোষাবে না নেবে না।' অর্থাৎ রাত বারোটায় কেন তিনটেতেও 'এপয়েন্টমেন্ট' করা যেতে পারে। যার গরজ আসবে, যার নেই আসবে না। আর সাধুকে ঘিরে সর্বদা এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করায় মাছের দরের মত তাঁর পশারও চড় চড় করে রোজ বাড়ছে।

গাড়ি অতিকষ্টে ঢুকতে পারে এমন অনেকগুলো গলি, হেডলাইটের আলোয় আলোকিত ইঁট-বের-করা কালচে বাড়ির সারি, খাটা পায়খানা, ভাঙা মন্দিরের দাওয়ায় কুঁকড়ে শোয়া কুকুর আর ভিখিরী দেখতে দেখতে নির্মলের ঘুম এসে গিয়েছিল। একটা গলির মুখে ঢুকে গাড়ি আর যাবে না। বুলবুলি ঠিকই বলেছিল, এত রাত্তিরেও এ জায়গায় গাড়ি একেবারে গাদা হয়ে আছে। তাদের কোনটার পাশে তকমা আঁটা আর্দালী, কোনটার ভেতর ঠাসাঠাসি বসে মারোয়াড়ি বৌ। বাড়ির সামনে একটা রোয়াকে এই শীতে খোলা জায়গায় লোকের ক্রমাগত আনাগোনা। বসার জায়গার অভাবে কেউ কেউ গাড়িতে, কেউ কেউ বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। বুলবুলিকে অনেক কষ্টে নিরস্ত করা গেছে। 'ওরা কি বলতে কি বলে ফেলে! আর এ সময় ওসব এক্সাইট্‌মেন্টে লাভ কি দিদি।'

ভবেনই শেষকালে তাকে সামলেছে।

যে ঘরে সাধু বসেছেন সে ঘরের সামনে একটু বড় ধরনের ঘরখানা জুড়ে যেখানে সেখানে পাতা লম্বা বেঞ্চ, খান চার পাঁচেক ভাঁজকরা চেয়ার। বাড়িতে ঢুকবার আগেই ভবেন টপ করে সামনে এগিয়ে গিয়ে অতিথি যেমনভাবে আপ্যায়ন করে তেমনিভাবে প্রবোধবাবুর সামনে মাথা হেলিয়ে হাত দেখিয়ে আসুন আসুন করতে করতে ঢোকে, সঙ্গে সঙ্গে দুটো চেয়ারও খালি হয়ে যায়। তার একটাতে বসে পড়েই নির্মল চমকে ওঠে, 'তুমি এখানে?' নিজের অজ্ঞাতসারেই তার প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

'তুমি?' সামনে যে ছোকরাটি বসেছে সে একটু আত্মসচেতনভাবে নির্মলকে বললে।

প্রদীপ্ত মালদার এ-ডি-এম্। নির্মল তার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে প্রবোধচন্দ্র বোধহয় অপ্রসন্ন হলেন। জ্যোতিষের কাছে তাঁর আনাগোণা বেশী প্রচার হওয়া ঠিক না ভাবলেন। কোথা থেকে কি হয়ে যায় বলা যায় না। হয়ত কাগজে বেরিয়ে গেল। যেরকম বিশ্রী সব কার্টুন বেরোচ্ছে কাগজে। হুজুগ পেলেই তো বাঙালী জাতটা আর কিছুই চায় না—একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা মাথায় আসে। প্রদীপ্তও আঁচ করে প্রবোধ সেনের মনের অবস্থা। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে নির্মলকে বললে, 'বড্ড গরম হচ্ছে না? একটু বাইরে যাই।'

'তুমি এখানে কেন ভাই?' বাইরে এসেই নির্মল জিজ্ঞেস করলে।

'আমি তো কলকাতায় এলেই আসি। তোমার মত আমিও তো মাস্টারী করতাম। ডিড্ আই এভার ড্রিম্ আই উড্ টেক চার্জ অফ এ ডিস্ট্রিক্ট?' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রদীপ্ত বললে। তারপর তার পুরু ফ্রেমের চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে বসিয়ে বললে, 'লাইফ্ ইজ্ এ চান্স আফ্টার অল্। আমার তোমার ইচ্ছে খুব ম্যাটার করে না। আর সেইজন্যেই খানিকটা অ্যালার্ট থাকা দরকার।'

চুপ করে থেকে বললে, 'এই যে আমি মালদায় রট করছি। এও চান্স। দেড় বছর আগে ট্রান্সফারের কথা হয়েছে। তারপর থেকে ফাইল চাপা পড়েছে।...ও আচ্ছা। তোমার জ্যাঠা মে বি অফ্ সাম্ হেল্প। এও হয়তো একটা চান্স। এই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া।'

তার কথায় ছেদ পড়ে একটি মহিলার আবির্ভাবে। ফোঁস ফোঁস করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মহিলাটি তাদের গা ঘেষে বেরিয়ে গিয়ে সামনের গাড়িতে ওঠে। তার এক ছেলে নাকি দমদম্ এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে তিনমাস আগে আন্তর্জাতিক কোন সোনা পাচার কেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে। সেদিক চেয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রদীপ্ত বললে, 'ওর কিচ্ছু হবে না। সাধু বলেই দিয়েছে। মঙ্গলের দাপট এমন বেশী যে শনি নিউট্রাল থাকলেও কিছু হবার নয়।'

'তুমি এসব সীরিয়াসলি বলছো নাকি প্রদীপ্ত? এই সব শনি মঙ্গল! তাহলে লেখাপড়া শিখে লাভ কি!'

'লেখাপড়া শেখার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ওভাবে বলাটা সিম্প্লিফিকেশান। এত লোক তো রাস্তা দিয়ে হাঁটে, এর মধ্যে কটা লোক গাড়িচাপা পড়ে মরে? এটাকে কেউ বলবে অ্যাক্সিডেন্ট, আর জ্যোতিষে বলবে ফাঁড়া। তুমি ফাঁড়া মানো কি না এইটাই হচ্ছে কথা।'

তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'তোমার জ্যাঠামশাই আগেও এসেছেন। সাধুকে

জিজ্ঞেস করেছিলাম। সাধু বললে, ওঁর হোমটা হচ্ছে না সেজন্যে আসেন। তবে হবে। কর্মিষ্ঠ পুরুষ। বলেছেন কর্মিষ্ঠ পুরুষের রাশিচক্রে এক ধরনের ডিনামিজম আছে যা তোমার জ্যাঠামশাইয়ের বেলায় আছে।'

ভেতর থেকে ডাক এল। নির্মল প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সামনের ভেজানো দরজা খুলে ঢুকল। একটা রোগা হ্যাংলা লোক, একমুখ কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে লাল-পেড়ে ধুতি, তার ওপর হলদে কাঁধময়লা হাতকাটা বুশশার্ট। পচর পচর করে লোকটা এমন পান খাচ্ছে যে কষ গড়িয়ে পড়ছে পানের রস। নীচু গলায় সামনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ চলেছে। নির্মল আর একটু পরেই জানতে পারল ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। সাধু একটা আঙুল দেখিয়ে আগন্তুকদের বড় ঘরখানার কোণায় পার্টিশন-আড়াল অংশটি দেখিয়ে দিয়ে যেমনভাবে কথা বলছিলেন তেমনি বলতে থাকেন। উকিল ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, 'উনি আগেই ডাকতে বললেন।'

বলা যায় এটা এক স্বতন্ত্র রিসেপশান রুম। টেবিলের ওপর দু কাপ ঠান্ডা চা আর দুটো করে সিটানো সিঙাড়া। প্রবোধবাবু বললেন, 'তুলে নাও হে। সাধু লোক, না খেলে চটবে।'

উল্টোদিকে ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত এক বুড়ো। নির্মল আন্দাজ করে বোধহয় বুলি-বুলি-বর্ণিত হাইকোর্টের জজ।

পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে কেবল সাধুর মাথা দেখা যায়। সামনে একটু ঝুঁকেপড়ে সম্ভবত কোন রাশিচক্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রায় হৈহৈ করে ওঠেন, 'আঃ হা! একেবারে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! কি প্রচন্ড প্রাণদায়িণী সম্ভাবনা! কি অমলা যশ! কি অহৈতুকী শ্রদ্ধা অপামর মানুষের কাছ থেকে। সব মেরে দিলি মা, সব মেরে দিলি! লোকটাকে একেবারে পথের কাঙাল করে দিলি রে! পথের কাঙাল ছাড়া আর কি। যে হাতে প্রাইম মিনিস্টার হওয়া যায় সে হাতে ভাবতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটির চেয়ার পাওয়া যায় কিনা।...তবে এ হলো কুটিলা জটিলার খেলা। কুটিলা জটিলার খেলা না হলে ঠিক পোষায় না।'

'কথামৃত বলছেন?' কম্পিতকণ্ঠ উল্টোদিক থেকে ভেসে আসে।

'আরে সব শালারই এক অমৃত। সব কেষ্টর মুখে এক কথা। গুড্ আর ইভিল-এর কন্‌ফ্লিক্ট। কি মশাই ছাত্রদের পড়াতে হয় না আপনাদের?'

'কিন্তু ইভিল্ যে বাবা বারেবারেই জিতছে। হেড্ অফ্ দ্য ডিপার্টমেন্ট সেটাও পেলে। তারপর চেয়ার—সেটাও নিলে। মুস্কিল হয়েছে বেটার স্বাস্থ্য। আটান্ন বছরে কি স্বাস্থ্য! ডায়বেটিস্ নেই। মনের আনন্দে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে রসগোল্লা খায় আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আপনাকে স্যাকারিন্ দিয়েছে তো!—একটা কিছু না করলে তো চলছে না বাবা!'

'তুই শালা পাপী,' হরঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন।

'পাপী বলেই তো এসেছি ঠাকুর। তোমার মত সাধু হলে তো গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতাম এক জায়গায়।'

হরঠাকুর কুষ্ঠিটা সামনের গদিতে ফেলে একমনে কি দেখতে থাকেন। সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আছে, আছে! এখনও ছটি মাস দাঁত কামড়ে থাকতে হবে। সামনের অঘ্রাণ থেকে জ্যৈষ্ঠের তোর যদি হিল্লে না হয় তবে হরঠাকুর এ কাজ ছেড়ে দেবে।'

সামনে বেঁটে গোলগাল চশমাওয়ালা কালো ভদ্রলোকটির মোটা ঘাড়খানা এবার দেখা যায়। বোধহয় উত্তেজনায় সামনের দিকে আরও এগিয়ে এসেছেন। যেন বিমর্ষভাবেই স্বগতোক্তি করলেন, 'তাহলে আর হোল না!'

'হোল না কিরে, হোল না কিরে?' হরঠাকুর খিঁচিয়ে উঠলেন, 'তোর বাপের সম্পত্তি যে হবে না। যে মালিক সে যা ব্যবস্থা করেছে তাই হবে। সামনের আশ্বিন থেকে কর্ম-ক্ষেত্রে যে যশপ্রাপ্তির যোগ দেখা যাচ্ছে তা তোকে কয়েক মাসের মধ্যেই ঠেলে তুলবে। দেখিস, আবার সামলাতে না পেরে ছুটে আসিস না হরঠাকুরের কাছে।'

সচরাচর অধ্যাত্মচর্চায় যাঁরা খ্যাতিমান তাঁরা যেমন সীজারের মত কথা বলেন ('যখন সীজার স্থির করেছেন এটা হবে...) তেমনি আগাগোড়া হরঠাকুর বলতে থাকেন, 'হরঠাকুর তোমাদের মত লাফালাফি করতে পারে না। হরঠাকুরের যা কাজ তাই করবে। সে মার কাছে তোদের কথা জানাবে। তারপর মায়ের হাত। সে যদি রাখে রাখবে। এতে হরঠাকুর কি করবে? সে তো আর ফুটপাতে হাত দেখানোর বিজ্ঞাপন এঁটে বসে নি।...তোরা আসিস কেন? তোরা না আসলে তো আমি বেঁচে যাই। একটু মন স্থির করে মায়ের ধ্যান করতে পারি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটি পাঞ্জাবীর ওপর গরম শালখানা ঠিক করতে করতে উঠে পড়লেন। বোধহয় ঠিক বুঝতে পারলেন না তাঁর দুঃখিত বা আনন্দিত হওয়া উচিত। আশ্বিন মাস থেকে সুদিন সুরু হবে তার মানে ঠিক আশ্বিনেই হবে তার কোন মানে নেই। হতে হতে বছর ঘুরে যেতে পারে। তাঁর হাতে ছটা না আটটা মাস। তারপরই রিটায়ারমেন্ট। মানে কয়েকটা মাস হয়ত মেরেকেটে চেয়ারে থাকতে পারেন। তবে হরঠাকুর যা বলছেন তা যদি ঘটে—যদি যশপ্রাপ্তিযোগ ঠেলেই তোলে তাহলে কি গোটা দুয়েক এক্সটেনশান পাওয়া যাবে না? অধ্যাপকমশাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সে নিঃশ্বাস বিষাদের না উল্লাসের বোঝা গেল না।

আট

হরঠাকুরের আদিবাস পাইকপাড়া। তখন প্রতি প্রশ্নে তিনি দশ টাকা করে নিতেন। আর তাঁর প্রচুর খদ্দের ছিল। যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বাঙালী-অবাঙালী কেউ বাদ যেত না। হরঠাকুর বলতেন প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে অঙ্কের মত। যেমন পাঁচ আর পাঁচে দশ ঘটবেই তেমনি গ্রহের অবস্থার ফেরে মানুষের ভাগ্যের ফের হতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোয়াড়ে, খয়া কাঁচাপাকা দাড়িভর্তি প্রায় অশোভন ব্যক্তিত্ব তিনি কাজে লাগান। চেহারা ভাঙিয়ে ভক্ত বাড়ান না, একথা হরঠাকুর প্রায়ই বলতেন। 'যারা আমার কাছে আসবে দায়ে পড়ে আসবে যেমন লোকে খুন করে উকিলের কাছে দৌড়য়। আমার চেহারা দেখে আসতে যাবে কেন?'

বস্তুত পচ্‌পচ্‌ করে মুখের কষ গড়িয়ে দিবারাত্র পানসেবন, প্যাকেটের পর প্যাকেট সস্তা চারমিনার সিগারেট ওড়ানো, খোঁচাখোঁচা অনাদৃত চুল আর ধুতির ওপর কাঁধময়লা বুশশার্ট এগুলো কেউ কেউ বলেন স্বেচ্ছাকৃত। হরঠাকুর যেন প্রকারান্তরে ভক্তদের বলছেন, 'চেহারায় নয়, কোন বাহ্যিক কারণে নয়, কেবল এলেমের জোরে আমি তোমাদের আকর্ষণ করছি।'

তারপর উনি পাইকপাড়া থেকে বরানগনর উঠে এসেছেন খ্যাতির শিখরে। এখন আর তিনি কোন ফি নেন না। কেউ কেউ বলেন, ফি নেবার দরকার নেই সেজন্যে নেন না।

আসলে লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী আড্ডিদের বড় ছেলের পেটে আল্‌সার হয়ে যখন মরণাপন্ন হল তখন থেকেই বলা চলে হরঠাকুরের গ্রহেরও অবস্থান্তর ঘটল। ছেলেটিকে অপারেশান করার পরও যখন কিছু হল না, যখন চৌষট্টিটাকা ফিওয়ালা ডাক্তারবাবুরাও হাল ছাড়লেন সেই সময় হরঠাকুরের মায়ের ফুলের স্পর্শ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল ছেলেটির শরীরে। ছেলেটি সারতে সুরু করল। ছেলেবেলা থেকেই একটু গানবাজনার বাই ছিল তার। হরঠাকুরের প্রবল ভক্ত বনে যাবার পর অফিসেও সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক কলি গেয়ে ওঠে। তার সমাজসচেতন কোন কোন সহকর্মী তার মধ্যে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ লক্ষ করলেও তার ডিপার্টমেন্টের বাঙালী বড়সাহেব একটু ফাঁপরে পড়েছিলেন। ছেলেটির কাজে ফাঁকি নেই, কামাই করে না। তবে মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে ফাইল নিয়ে এসে হঠাৎ তাঁর মুখের সামনে হাসিমুখে হাত নাড়িয়ে হয়ত গেয়ে ওঠে :

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না।

বাঙালী সাহেব হকচকিয়ে ওঠেন। 'এক্কেবারে মাথাটা গিয়েছে তোমার,' সামান্য প্রতিবাদও করেন। কিন্তু ঘাঁটাতে সাহস পান না। বলা যায় না, হয়ত দিব্যব্যাপার কিছু আছে। জীবনের সব কিছুই তো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সব ভেবে চুপ করে থাকেন।

সেই ছেলেটির ভাগে যা ছিল অর্থাৎ বরানগরের সাত বিঘে জমির বাগান, মার্বেল মোজেইকের মেজেওয়ালা পুরনো তিনতলা বসতবাটি, বাজারে দশ-বারোখানা দোকানঘর এসবের এখন কার্যত মালিক হরঠাকুর। কিছুটা ভাগ বসায় তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী, সেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের উকিল। এখন হরঠাকুর আর ফি নেন না, মানুষ স্বেচ্ছায় সোনা-দানা দিয়ে যায়।

রিসেপশান রুমে বসে বসে নির্মলের ঢুলুনি আসে। আর মাঝে মাঝে চোখ মেলতেই আর একদিকে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে নজরে আসে সারি সারি উদ্বিগ্ন মুখ। এক বৃদ্ধ নিতান্ত বেজারভাবে তাদের দিকে চেয়ে আছেন এবং হরঠাকুরের সান্নিধ্যে তাদের মত ভাগ্যবানদের মনে মনে গাল দিচ্ছেন।

'আমার জ্যাটা স্যর এল-পি খালি বলতেন, ইটার্নাল্ ভিজিলেন্স্ ইজ দ্য প্রাইস্ অফ ফ্রিডম। আমিও সেই কথাই বলি। সেদিন ময়দানে কি কাণ্ডটাই ঘটে গেল দেখলেন। কেউ ধারণা করেছিল মশাই কলকাতার বিশ তিরিশ লাখ লোক কমিউনিস্টদের কাণ্ড দেখবার জন্যে জমায়েত হবে!'

প্রবোধ সেন ভুরু কুঁচকান। এই অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবটিকে বোকা জরদ্গব বলে তাঁর মনে হয়। এই কথামালার গল্পের মত একেবারে সোজা নীতিশাস্ত্র যে আজকাল অচল একথা পুরনো জামানার লোকগুলোর মাথায় একদম ঢোকে না। চাপা উষ্মায় বললেন, 'কমিউনিস্টদের কাণ্ড কে বলেছে! রাশিয়ার সব বড় বড় নেতা, বুলগানিন, ক্রুশ্চভ্ এরা কি আমাদের দেশের হেঁজিপেঁজি কমিউনিস্ট নাকি? তাছাড়া ভারতবর্ষ সকলের বন্ধু। রাশিয়া আমেরিকা সকলকে আমরা ডাকছি, যে সৃষ্টিযজ্ঞ সুরু হয়েছে আমাদের দেশে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে।'

নির্মল আবার চলছে। তার মনে এল বোধহয় গতবছর আক্ষরিকভাবে এই কথাগুলোই বিরোধীদের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তার জ্যাঠামশাই 'হীয়ার' 'হীয়ার' হর্ষধ্বনি অর্জন করেছিলেন অ্যাসেম্বিতে।

কিন্তু জজসাহেব ছাড়বার পাত্র নন। আগে বার্ধক্যে ছিল ধর্মচর্চা এখন রাজনীতি। জজসাহেব আজকালকার অনেক বৃদ্ধের মত রাজনীতির অনেক 'ইনসাইড স্টোরী' জেনে ও আলোচনা করে আনন্দ পান। আর তা ছাড়া প্রবোধ সেন সম্প্রতি মিনিস্টার হলেও তাঁকে নেকনজরে দেখবার অধিকার তাঁর আছে, এটা তিনি বোধহয় বিশ্বেস করেন। কারণ যখন সেনমশাই কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করেন তখন তিনি সেখানে বিরাজ করছেন। তাঁরই আদালতে প্রবোধ সেনের মক্কেল, এক ধনী মারোয়াড়ী হেরে যায়। একটা বিরাট ইনকাম্ ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কেস্ খুব সুদক্ষভাবে ওকালতি করেছিলেন প্রবোধ সেন কিন্তু জজসাহেবের রায় বিপক্ষে গিয়েছিল। তাছাড়া তাঁর জ্যাঠা স্যর এল-পি। গলাবন্ধ বিলেতি আলেষ্টারের মাঝখান থেকে ছুঁচলো মুখে তিনি যেন খেঁকিয়ে ওঠেন, 'আপনার ক্রুশ্চভ্ বুলগানিন কমিউনিস্ট নন? ডোন্ট্ থিঙ্ক এ'রা গাঙ্গুরামের দই খেতে এদেশে এসেছে। দে হ্যাভ্ ইভিল্ ডিজাইনস্। দুধকলা দিয়ে সাপ পুষলেও ঠিক সময় সে ছোবল দেবে।'

তারপর তাঁর কাশি ওঠে। সম্প্রতি তাঁর হাঁফানি বেড়েছে। ডাক্তার বলেছে, উত্তেজনার মধ্যে কখনও যাবেন না। জজসাহেব সেই ভেবে আরও নার্ভাস্ বোধ করেন। ভাবলেন, হরঠাকুরের সঙ্গে আজ না হয় থাক্। কি হবে? মারা তো যাবেনই আর দুবছরের মধ্যে। যে প্রচন্ড শনির দশা তাতে হরঠাকুর কিছু করতে পারবে না মনে হচ্ছে। তার চেয়ে ফেস্ লাইফ্ বোল্ডলি। কিন্তু রাজনৈতিক কথাবার্তার একটা নেশা আছে। এক আবর্ত থেকে তা আর এক আবর্তে মানুষকে নিয়ে যায়। প্রবোধ সেনের সামনে ঝুঁকে পড়ে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'দেশের এরকম অবস্থা তার কারণ ইট্ ইজ রান বাই মেন্ লাইক্ ইউ।'

প্রবোধবাবুর নাক লাল হয়। চেঁচিয়ে ওঠেন, 'যান যান, আজীবন ইংরেজের মোসায়েবি করেছেন আবার কথা বলছেন আপনারা! কি করেছেন দেশটাকে? শুধু জঞ্জালে পরিণত করেছেন। রবি ঠাকুর ঠিক বলেছিল!'

কি ঠিক বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ রাগের মুখে প্রবোধবাবু সে কথাটা হারিয়ে ফেলেন। নইলে তিনি তো সম্প্রতি বক্তৃতায় ভাল ভাল বাংলা ব্যবহার করবার জন্যে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বই দেখেন না যে এমন না।

'ওসব রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বলতে আসবেন না, ওগুলো আপনাদের অ্যাসেমব্লীতে দাঁড়িয়ে বলবেন।...রবিবাবুর কথা বলছেন? তবে শুনুন। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় খুব স্বদেশী গান লেখা চলছে। তারপর যেই ইংরেজ চোখ রাঙালে অমনি—ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে!'

রোগা শরীরখানা বেঁকেচুরে ভাঙা কেশোগলায় গেয়ে ওঠেন জজসাহেব। তারপর খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসেন কতক্ষণ। আবার কাশি উঠে পড়ে। কাশির দমক থামলে পরম প্রশান্তিতে 'তুমি'তে নেমে আসেন। 'দ্যাখো, ওসব জেল খেটে চরকা কেটে দেশ চালানো যায় না। দ্যাখো না, চোর ছ্যাঁচোড়ে দেশ ছেয়েছে আজকাল। আমরা ইংরেজের মোসায়েবি করেছি বলছো। কিন্তু সে যুগে ছিল মেন্ অফ্ ইন্টিগ্রিটি। এখন সেসব কোথায়? আগেকার তুলনায় এখন সব ছেলেখেলা।'

গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'তুমিই তো দেখেছো হে, ক্যালকাটা বারের কি ইন্ডিপেন্ডেন্স্! কি সব স্ট্যাচারের লোক! স্যর রাসবিহারী ঘোষ, স্যর, এল-পি, সি-আর-দাস। এখন সব মুড়িমুড়কি।'

এমন সময় সামনের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটি কাঁধে ফেলা শাল গায়ে জড়াতে জড়াতে বেরিয়ে গেলেন। হ্যাংলা, উকিলটি মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আপনাকে স্যর ডাকছেন।'

জজসাহেব তড়াক করে উঠে এগিয়ে গেলেন। উকিলমশাই হাতজোড় করে বললেন, 'আপনাকে একটু পরে। মিনিস্টার সাহেবকে ডাকছেন।'

প্রবোধ সেন প্রবল ব্যঙ্গভরে কুঁকড়ে বসে থাকা জজসাহেবের দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'নির্মল, চল।'

নির্মলের দুচোখ জড়িয়ে এসেছিল। দুজন বয়স্ক লোকের চেঁচামেচিতে সে চট্‌কা কেটে যাওয়ায় সামনের অপ্রিয় অবস্থাটা এড়াবার জন্যে চোখের ওপর হাত রেখে তন্দ্রার ভান করেছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, 'আমায় আর কেন? আপনিই যান।'

মেঝেতে হলদে কাপড়ের ফরাস। এককোণে স্তূপাকার ফুল, মালা। প্রবোধ সেন তাঁর ভাইপোকে নিয়ে ঢুকতেই সাধু সম্বোধন করলেন, 'আসুন, আসুন। এটি কে?'

'সুবোধের ছেলে।'

'ভাল, ভাল।...আমি দিনরাত মাকে বলি, কেন আমার কাছে এত লোক আসে? আমার কী আছে? আমি পয়সা জানি না, পলিটিক্স জানি না, আর এখন কতরকম বই বার হচ্ছে। এইসব ছোকরারা কত খবর রাখে। রোজ খবরের কতরকম আলোচনা। আমি তো এর কিছুই জানি না। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা হলে আমি তো লাস্ট হব। এত সব লোকজন আসে। তাদের কাছ থেকে শুনে যা শিখি। আর মাকে জিজ্ঞেস করি, কোনটা ঠিক মা? কমিউনিস্ট ঠিক না কংগ্রেস ঠিক? ওয়ার্কার ঠিক না ক্যাপিটালিস্ট ঠিক? আমেরিকা ঠিক না রাশিয়া ঠিক? যে দুভাই সম্পত্তি নিয়ে আদালতে লড়াই করছে তাদের কোন জন ঠিক? জীবনটা ঠিক না মৃত্যুটা ঠিক? দুঃখ ঠিক না আনন্দ ঠিক? আঁতুড়ঘরটা ঠিক না শ্মশানটা ঠিক? মা সব ঠিক করে দেন।'

'এই দেখুন কি অবস্থা!' হরঠাকুর তাঁর বুশশার্টের বোতামগুলো টপাটপ খুলে ফেলেন। অনুসন্ধিৎসু চোখে নির্মল সেদিকে তাকায়। রোগা নয় হরঠাকুর। কাঁচাপাকা লোমের ভেতর দিয়ে পাঁজরার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, 'একেবারে হাড় জিরজিরে হয়ে গেলাম। অথচ আমার শরীর কি রকম ছিল বিশ্বেস করবেন না। রোজ দশবারো মাইল হাঁটিতাম।'

নির্মল হাই তোলে। সেদিকে চোখ পড়তেই হরঠাকুর বলে উঠলেন, 'আমি এসব কেন বলছি। এসব তো আমার কথা নয়। দেখেছেন আপনাদের কি পার্সোনালিটি! আমাকে বলাচ্ছে।' শূন্যে দৃষ্টি মেলে বললেন, 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। যেমন বলাও তেমনি বলি।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হরঠাকুর নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি বাবা একটু বাইরে অপেক্ষা করো। আমি একজন একজন করে সারি।'

নির্মল আবার বাইরে অপেক্ষামান উদগ্রীব জনতার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এ ঘরখানা

বেশ বড়। সতরঞ্চিতে বেঞ্চে লোকগুলো কুঁকড়ে মুকড়ে বসে আছে। একটা সরু বেঞ্চে তিন চারটে মাঝবয়সী স্ত্রীলোক মাথা নীচু করে বসে আছে। তার মধ্যে একজন হঠাৎ বিলাপ করে ওঠেন, 'অমলারে আর বাঁচান্ যাইব না।' সামনে চকোলেট র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে এক বৃদ্ধ বিড়ি ফুঁকছিলেন। পোড়া বিড়িটা ঘরের এককোণে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু বলা যায় না। আমার ছেলেটা তো এলিয়ে গিয়েছিল। পেনিসিলিন ফুঁড়ে ফুঁড়ে গায়ে আর ছেঁদা করবার জায়গা ছিল না। তারপর নাড়ী ছেড়ে গেল। হরঠাকুর কোন আশা দিলে না। খালি গঙ্গাজলের সঙ্গে একটা দুটো গাঁদাফুলের পাঁপড়ি জিভে ঠেকাতে দিলে। তাতেই হোল। কিছু বলা যায় না।'

নির্মল বিহ্বলবোধ করে হরঠাকুরের মক্কেলদের বৈচিত্র্যে। সতরঞ্চির এককোণে একদল কলেজের মেয়ের মধ্যে একটা অত্যন্ত চেনাচেনা মুখ আবিষ্কার করে' চমকিয়ে ওঠে। কোথায় যেন মুখখানা দেখেছে। তারপর খেয়াল হয় বাংলা কাগজে একখানি এককলাম ছবির নীচে হেডলাইন, 'আমেরিকা-ফেরত তরুণীর সন্ন্যাস গ্রহণ।' বছর তিরিশেকের মহিলা। চুলে আধুনিক মেমসাহেবদের মত পুরুষালী ছাঁট। তার সঙ্গে গরদের চাদর। বোধহয় সিস্টার নিবেদিতার অনুকরণে গলায় রুদ্রাক্ষ। রোগা, ফ্যাকাশে ফর্সা। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে। মেয়েদের তদারক করছেন। কয়েকজন কমবয়সী মেয়েকে বলছেন, 'এবারে ঘর থেকে লোক বেরোলেই তোমাদের টার্ন।'

নির্মল লক্ষ করে এতগুলো লোক যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এত রাত্তির ধরে সতরঞ্চিতে বেঞ্চে বাইরে বারান্দায় রাস্তায় সময় কাটাচ্ছে তারা বেশীর ভাগই উদ্বিগ্ন। তাদের মুখে যেন অস্পষ্ট এক ভয়ের ছাপ। কারো মৃত্যুভয়, কারো চাকরীর অনিশ্চয়তার ভয়, কারো জেলে যাবার ভয়, কারো পারিবারিক অশান্তির ভয় (বিশেষ করে কমবয়সী বিবাহিত মহিলাদের), কারো ন্যায়ের ভয়, কারো অন্যায়ের ভয়। সকলেই কোন না কোন ভয়ে তাড়িত জ্যাঠামশাইয়ের কী ভয়? যদি 'হোম' শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়? অথবা ডায়াবেটিস্ চাড়া দিয়ে ওঠে? কিংবা অনর্গল বক্তৃতা দিতে দিতে তাঁর কি ভয় তাঁর ভাইয়ের মত তাঁরও হার্ট অ্যাটাক্ হবে? জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে এসব ব্যাপারে সবসময়ই তার একটা দূরত্ব থাকে। গাড়িতে আসবার সময় নির্মলকে বলেছিলেন, 'আমি ওসব অকাল্ট পাওয়ারে বিশ্বেস করি না নির্মল। নিজেদের ওপর যাদের বিশ্বেস নেই তারাই দৌড়য় সাধু-ফকিরদের কাছে। তবে হরঠাকুর শুনেছি ইন্টারেস্টিং ম্যান্। বরানগরে যখন এসেছি একবার দেখা করে যাই।' বুলবুলিকেও এর চেয়ে বেশী কিছু বলেন নি।

নির্মল আবার সেই ছোট ঘরখানায় গিয়ে বসলে। নির্মলকে দেখে তড়াক করে উঠে জজসাহেব বলেন, 'সর্বত্র করাপশান। সমস্ত দেশটা করাপশানে ছেয়ে গেল। করাপশান ঠেকানোর জন্যে কমিটি হোল। সেখানেও করাপশান। তখন সে কমিটির কাজ তদারক করবার জন্যে আর একটা কমিটি হোল। দেশটা তো এইভাবে চলেছে। কারা চালাচ্ছে?'

অনিদ্রায় চোখ দুটো লাল। টাকের পাশ থেকে কয়েকটা চুল খাড়া হয়ে আছে। চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কারা চালাচ্ছে? অল্ টম ডিক হ্যারি। কোথায় সেই আদর্শ, দেশাত্মবোধ। সেই বিদ্যেসাগর বিবেকানন্দের বাংলাদেশ কোথায়? এখন তো শর্ষের মধ্যে ভূত। এই তোমার জ্যাঠা...'

নির্মল বিরক্ত বোধ করে। বিখ্যাত লোকদের আত্মীয় হবার দুর্ভাগ্য গত দু'তিন বছর হল চেপে ধরেছে। যেমন তাকে দেখামাত্র সরকারবিরোধী কথাবার্তা উঠে পড়ে

বরানগরে স্নানের ঘাটে। তারপর যখন সে তার বাবার মত সরকারবিরোধী সমালোচনায় যোগ দেয় তখন তাকে আরও ভুল বোঝা হয়। ভাবা হয় বন্ধুত্বরক্ষার জন্যেই সে এসব বলছে। আর কটু কথায় যখন সরকারকে দাঁড় করানো যায় না কিংবা কাত্ করা যায় না তখন নির্মল সচরাচর এসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকতেই ভালবাসে। তাতে মাস্টারী জগতে সে 'স্নব' আখ্যা পেয়েছে। তার অধ্যাপনা কোন কোন তরুণ সহকর্মীর কাছে প্রায় প্রহেলিকা। ও সখ ক'বছর পরেই কেটে যাবে, কেউ কেউ বলেন। তাদের হেড অফ্ দ্য ডিপার্টমেন্ট সদানন্দবাবুই মজা করেন। নির্মলকে কিভাবে দেখবেন বুঝতে পারেন না। একদিন সস্নেহে বলেছিলেন, 'এ লাইনে আর ক'দিন থাকবেন ভাবছেন? যদি ছাড়তে হয় আগে ছাড়াই ভাল।'

তাই জ্যাঠার প্রসঙ্গে নির্মল স্বভাবতই সিঁটিয়ে যায়। বলে, 'জ্যাঠামশাইয়ের কথা ওঁর সঙ্গেই বলবেন।'

'আহা চটো কেন!' বিদ্রূপে অনিদ্রায় ও অম্লের আধিক্যে ভদ্রলোকের চোখ জ্বলজ্বল করে। 'আহা রাগো কেন! এসব ইন্‌সাইড খবর কে আর দেবে বলো। আমরা তো দু'দিন পরই চল্‌রে। তখন তোমাদের সবকটা কাগজ মিলে তোমার জেটাকে প্যাট্রিয়ট করে তুলবে।'

ভদ্রলোক পেনাল কোডের সাতচল্লিশ না দুশো তেতাল্লিশ না ঐরকম কোন একটা সেকশান উল্লেখ করে কতক্ষণ কি বললেন নির্মলের মাথায় ঢুকল না। শুধু বক্তব্যের সারাংশ তাঁর বোধগম্য হোল, 'বুঝেছো, চালাকি দিয়ে জজকে ঠকানো যায় না ইফ্ হি ইজ্ আপরাইট। তোমার জেটা ভেবেছিল রঘুবীর সিংয়ের গোটা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াটা চাপা দিতে পারবে। এখনও আইন জানে এরকম লোক দেশে আছে। ইউ কান্ট্ ব্লাফ্ এভ্‌রিবডি।'

পর্দা সরিয়ে প্রফুল্লমুখে প্রবোধচন্দ্র ঢুকলেন। নির্মলকে বললেন, 'যাও, দু-চার মিনিটের জন্যে ডাকছেন। বেশী দেরী কোর না। ড্রাইভার বেচারা খুব টায়ার্ড। সেই সকাল থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে।'

'আমার আবার যেয়ে কি দরকার।' নির্মল চারপাশের অপেক্ষমান উদগ্রীব জনতার কথা ভেবে অপ্রস্তুত বোধ করে।

না না যাও! জ্যাঠামশাই আবার ধমকান।

'শর্ষের মধ্যে ভূত,' জজসাহেব বিড় বিড় করেন।

অত্যন্ত আত্মসচেতনভাবে ক্যাবলার মত হাসতে হাসতে নির্মল হরঠাকুরের কুঠরীতে ঢুকল।

নয়

নির্মলের কোন প্রশ্ন নেই। সে হরঠাকুরের খদ্দের নয়। একবার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে বোসপাড়া লেনে হারুমামা—যিনি দাবী করেন গান্ধীজীর রাশিচক্র দেখে মৃত্যুর একবছর আগে বলে দিয়েছিলেন আততায়ীর হাতে মৃত্যু অবধারিত—তিনি তার হাত দেখে যখন বলেছিলেন মহাপুরুষ হবার লক্ষণ আছে এ হাতে তখনও সে উৎফুল্ল হয়নি। বরং তার বাপের মত সমস্ত ব্যাপারটা ফক্কো মনে হয়েছিল। তারপর কলেজে ছাত্রাবস্থায় এবং পরে

মাস্টার হয়ে জ্যোতিষের দুর্গ্রহ তাকে বহুবার তাড়িত করেছে। অনেকবার সে হাতও বাড়িয়েছে হাসিমুখে আর শুনেছে 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়স থেকে আপনার লাইফটা পাল্টে যাবে,' কিংবা 'আগামী কার্তিক পর্যন্ত মঙ্গলটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়' বা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করবার জন্যে 'প্রভূত স্ত্রীধন লাভ ঘটতে পারে যদি' কিংবা 'পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি...পিতা নেই?' তাদের কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক শম্ভুবাবু তো বলেই দিয়েছেন কান কেটে ফেলবেন যদি নির্মল দুবছরের মধ্যে কলেজ ছেড়ে অন্য কোন বড় চাকরীতে চলে না যায়। কিন্তু যে জন্যে নির্মল বিস্মিত বোধ করছিল তা হোল এই ঠাণ্ডায় এত রাত্তিরে এতগুলো মানুষের সমাবেশ। এরা কি সবাই মানে হরঠাকুর সত্যিই ভবিষ্যৎবক্তা অথবা যেমন লোকে কঠিন রোগে পড়লে চৌষট্টি টাকার ডাক্তার ডাকে ও একই সঙ্গে মাদুলি নেয়, যদি যে কোন ভাবে আশু বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, কায়দা করে পাশ কাটানো যায়, অন্যকে সার্থকভাবে ল্যাং মারা যায়, যে কোন অসহায় অবস্থায় নিজেকে ভোলান যায়—এই লোকগুলোর এখানে আসার পেছনে হয়তো এরকম কোন চিন্তা আছে। নিজের লাভক্ষতির তাগিদেই এখানে ভিড়।

নির্মল ঘরে ঢোকামাত্রই হরঠাকুর উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান, 'আয় আয়।' নির্মল হলদে ফরাসের ওপর ধুপ করে বসে পড়ে। এতক্ষণ ভাঁজকরা কাঠের শীর্ণ চেয়ার যেন তার পিঠে ফুটছিল। এখন অতিথিদের জন্য একপাশে রাখা লম্বা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নির্মল আরাম পায়।

'কি করিস তুই মাষ্টারী? থুঃ থুঃ!'

হরঠাকুর থুথু ছিটাবার ভঙ্গী করলেন। তারপর নির্মলের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'ঈশ্বর তোকে টেনে তুলবে অনেক ওপরে। তুই যতই জড়ের মত পড়ে থাক তোর মধ্যে আছে দাহিকা শক্তি। ঈশ্বর চান না তুই এরকম গড়াবি, এরকম বছরের পর বছর ধরে জড়ের মত কাটাবি। এটা কি একটা জীবন? এই মানসিক জাড্য তোর জন্যে নয়। তুই কেন তোর এই সুন্দর জীবনে বৈরাগী হবি? ধনধান্যেভরা এই বসুন্ধরা, এখানে এত মানুষের স্থান হচ্ছে, তোরও হবে। তুই ভাবিস না তুই একটা অদ্ভুত কিছু। এটাই মানুষের দুর্বলতা। সেভাবে সে একটা অদ্ভুত অসাধারণ। অন্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একটা একেবারে বিচ্ছিন্ন অপূর্ব জগৎ।'

নিষ্পন্দ নির্মলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হরঠাকুর কি খোঁজেন, যেন এমন কোন সূত্র আবিষ্কার করতে চান যা শ্রোতার হৃদয়ের বন্ধ দরজা এক দমকায় খুলে দেবে। 'আমার এখানে একটা মেয়ে আসে, লীলা না বীণা, ঐ যে কাগজে লিখেছে না আমেরিকা-ফেরত বিদুষী মহিলার ভক্তি? তা দ্যাখো, শিক্ষিত হলে কি হয়, শিক্ষিত হলে আধার আরও পরিষ্কার হোল। একটা মাটির ভাঁড় থেকে স্টেনলেস্ স্টীলের কাপ ভাল না?'

নির্মল স্তব্ধভাবে হরঠাকুরের কথামৃত পান করতে থাকে, আর মনের ভেতরটা একটু ছল ছল করে। কোন অলৌকিক সত্য নয়, নেহাত একটা বুঝদার লোকের কথা হিসেবেও কি এই কথাগুলো ফ্যালনা? সেও কি বাস্তবিক গড়াচ্ছে না গত দশটা বছর ধরে? গড়ানো ছাড়া আর কি? একশোটা ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে মাসিক আড়াইশো টাকার বদলে কীটস্-সৌন্দর্যতত্ত্ব বা উইলীয়াম্-সেক্সপীয়রের লাইনের পর লাইন আক্ষরিক অনুবাদ যা এখন চোখবন্ধ করে মুখস্ত বলা যায়, এমনকি তার এক মাস্টারমশাই এক-একটা কথার ওপর যেরকম ঝোঁক দিতেন নিজের অজ্ঞাতসারে ঠিক সেইভাবে ঝোঁক দেবে, ঠিক তাঁর মত

কতগুলো কথা উচ্চারণ করে যাবে যথা ইন দ্য ফিট্‌নেস অফ থিংস্‌ কিংবা ইন্টিগ্রেশান অফ দ্য ডিস্‌ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্স বা ইমোটিভ্‌ রিয়ালিটি—এগুলো তো এখন কথাছাড়া আর কিছু নয়, কতগুলো কথার রঙীন ফানুস যেগুলো নিয়ে বাচ্চাদের মত লোফালুফি করে গত আট-দশটা বছর কাটিয়ে দিল।

আট-দশটা বছর আগে কিংবা তারও আগে সাহিত্যের ছাত্রাবস্থায় তার সত্যিই মনে হয়েছিল সে এক নতুন কথামৃত পান করছে। কিন্তু কথার পেছনে অর্থ তো শব্দের পেছনে প্রকাশের ইচ্ছে। সে অর্থ, সে ইচ্ছে বছর গড়াতে গড়াতে ঘষে গেছে। এখন মাঝেমাঝে বিস্ময়ে বইয়ের সেল্ফগুলোর দিকে নির্মল তাকিয়ে থাকে। সেই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স, কোলরীজের বায়োগ্রাফিয়া লীটারেরিয়া, টি-এস-এলিয়টের প্রবন্ধের বই। আই এ রীচার্ডস, গীলবার্ট মারে, এফ আর লিভিস—সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে দশ বছর আগে কলেজে ঢুকে এ নামগুলো মন্ত্রের মত জপ করত। কিন্তু এখন আর নামগুলোর কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, এগুলো এখন সব মুখস্ত করা উৎসাহ, মুখস্ত করা উদ্দীপনা যে উৎসাহ উদ্দীপনায় হাত-পা নাড়িয়ে গলা চিরে সে চীৎকার করে যাচ্ছে স্বভাবতই নির্বিকার এক বিরাট ক্লাসের সামনে বছরের পর বছর। এটা যদি গড়ানো না হয় তাহলে কাকে গড়ানো বলা হবে?

হরঠাকুর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোঁ ফোঁ করে কয়েকবার টান দেন। আবার তাঁর তীক্ষ্ম রাতজাগা লালচে চোখদুটো নির্মলের দিকে চেয়ে কোন হারান মানিক খুঁজতে থাকে। তারপর প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নেতি নেতি থেকেই শুরু। এতো সবাই জানে। এ ব্যাপারে তুমি একটা অনন্যসাধারণ কিছু না। মানুষমাত্রেই তার বিচারশক্তি প্রয়োগ করে, যদি মানুষ হয় তাহলে সে না বলে। না বলতে শেখা খুব একটা বড় জিনিস। তুই তা বলতে জানিস তা আমি জানি। সেইজন্যে এমন চারপাশ থেকে জোড়ালাথি খেয়ে মাষ্টারীর চৌকাঠ আঁকড়ে পড়ে আছিস। সেটা আমি জানি না?'

নির্মল একটু বোকা বোকা হাসে। সে চেষ্টা করে এই সব 'বাবা'দের কথায় কান না দিয়ে মনের বিশ্লেষণ প্রবৃত্তি সজাগ রাখতে। নেতি নেতি সম্পর্কে হরঠাকুর যা বললেন তা তো রামকৃষ্ণের কথামৃত থেকে একেবারে আক্ষরিক চুরি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ রাস্তায় নির্মলের চিন্তা অগ্রসর হয় না। এ কথাটাও একবার তার খেয়াল হয়েছিল যে আসলে জ্যেঠামশাইয়ের এখানে আসা তাকে উপলক্ষ করেই। তাঁর 'হোম' পোর্টফোলিওর প্রয়োজনীয়তাটাও তিনি জানিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সে খেয়ালের বিদ্যুৎ একবার ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে যায়। নির্মল যা ভাবে নি তা করে। সে কৌতূহলী হয়ে শুনতে থাকে।

'আমি জানি তোর কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন কাদের থাকে? যারা ক্লীব, নপুংসক, কীট। তারা দিনরাত আমার পাশে ভন ভন করে। আমি তো মাকে অহর্নিশি ডাকছি, পাঠাও পাঠাও, বেছে বেছে এই সব পোকা মাকড়গুলোকে আমার কাছে পাঠাও কেন মা? যাদের নিজেদের কোন চিন্তাশক্তি নেই, আত্মরতির কাদায় যারা গড়াচ্ছে। যাদের ভগবান নেই, দেশ নেই, সমাজ নেই আর পাঁচটা লোক নেই। খালি আমি আর আমার স্ত্রীটি আর আমার সন্তানটি। এদিয়ে কি মহৎ কিছু গড়া যায়? কোনদিন গড়া হয়েছে? তুই প্রশ্ন করিস নি তাই আপনা থেকেই আমি তোর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। নেতি নেতি করে কাটিয়েছিস। বেশ করেছিস। বিশ্বের লোক তোকে নিন্দে করুক, হরঠাকুর করবে না। হরঠাকুর বলবে তুই ঠিক করেছিস।'

নিজের অজান্তে নির্মলের মন বর্ষার পুকুরের মত টলমল করে। লোকটা অলৌকিক কথা কিছু বলছে না। কিন্তু সে ঠিক তার মনের কথা বলছে—এরকম একটা চিন্তায় এবং বোধহয় নিজের প্রতি মমতায় তাকে ভরপুর লাগে। একবার সে জোর করে' চেষ্টা করে' এই মন্ত্রমুগ্ধ জগত থেকে সরে আসে। পর্দার ওপারে যে উদ্বিগ্ন বিনিদ্র মুখের সারি অপেক্ষমান তাদের প্রতি সহানুভূতিতে এই ধরনের দীর্ঘ আলাপের ছেদ পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কিন্তু আবার সেই একটার পর একটা সিগারেট টেনে-চলা হ্যাংলা কাঁধময়লা বুশশার্টপরা লোকটার কথার দিকে তার মন চলে যায়।

'কদ্দিন নিজের মুখ নিজের আয়নায় দেখবি?' হরঠাকুরের কর্কশ গলায় নির্মল চমকে ওঠে। তারপর গলা নামিয়ে হরঠাকুর বলেন, 'সারা জীবন তো নেতি নেতি করা যায় না, এক জায়গায় এসে—তোরা আজকাল কি বলিস না—সীনথিসিস্? সেই সীনথিসিস্ হয়। তখন মনে হয় ঈশ্বরের এই আশ্চর্য সৃষ্টি, এই চন্দ্রসূর্যনক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে এতরকম উদ্ভিদ এত প্রাণী, এত ধরনের জীবনযাত্রা, এতরকম মানুষ—পাপী তাপী পুণ্যবান, মাতাল চোয়াড়ে আবার নির্জন অপাপবিদ্ধ পুরুষ, এত নীচতা হীনতা আবার এত আনন্দ, এর মাঝখানে আমার স্থান করে নিতে হবে। শুধু বৈরাগী হয়ে ঘুরলে চলবে না। তুই ভগবান মানিস না তো?—সে তোকে এক ঝলকে দেখেই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু হরঠাকুর তোকে বলবে না তুই ভগবান মান, তুই এটা কর সেটা কর, মন্তর নে, দশ-হাজার নাম জপ কর। এসব কিছু বলবে না সে। সেরকম মিঞা হলে (এখানে হরঠাকুরের চোখদুটোর ঔজ্জ্বল্য অসম্ভব বেড়ে যায়) হরঠাকুরের কাছে ইউনিভার্সিটির ডি-এস-সিরা আসত না। তারা বলে, সায়ান্স অনেক পড়েছি, এখন তোমার কথা শুনি। সেরকম কিছুই বলবে না হরঠাকুর।'

আবার সিগারেট ধরালেন। টং করে দেয়ালঘড়িতে একটা বাজল। পর্দার ওপাশ থেকে একটা চাপা বিলাপ ভেসে আসে। 'আমার মাইয়াটারে আর বাঁচান্ যাইল না।'

'ঐ শোন্ কার মাইয়ারে আমার বাঁচাতে হবে। আমি কেন বাঁচাব? আমি কেন বাঁচাব? আমি বাঁচানর কে? যিনি বাঁচাবার তিনি বাঁচাবেন। আমি তো মাকে দিনরাত বলছি এইসব অপগণ্ডোদের হাত থেকে আমায় মুক্তি দাও। এরা তো আমাকে ধর্মের পথে থাকতে দেয় না। এরা আমার ধর্মভ্রষ্ট করে। তুমি আমার সামনে বরং নাস্তিক আনো যার মেরুদণ্ড আছে, যে আমাকে মানে না, আমাকে মনে মনে ব্যঙ্গ করে।'

হরঠাকুর তাঁর জ্বলজ্বলে চোখ মেলে নির্মলের দিকে চেয়ে থাকেন। আর মনে হয় তিনি এতক্ষণ যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। সেই যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, চাবিকাঠি পাওয়া গেছে যা বন্ধ দরজা দমকায় খুলে দেবে। হরঠাকুর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোকে ভগবান মানতে বলব না। সবই তো মা জগদম্বার খেলা। আমি খালি বলব, নেতি নেতি করার দিন গিয়েছে তোর। তোর সামনে এখন নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন, নতুন ভবিষ্যৎ।......এগিয়ে যা, আরও এগিয়ে যা। নেতির পরে যে নতুন জগত সেখানে তুই পা ফেল।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে হরঠাকুর চোখ বুঁজলেন। খুব শান্ত চোখে নির্মলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এবারে তুই যেতে পারিস।' রাত্তির দেড়টার সময় নির্মল ছাড়া পেল। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল অবসাদে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হরঠাকুরের কথাগুলো মিষ্টি হাওয়ার মত তার মনটা জড়িয়ে দিচ্ছিল। 'নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন জীবন, নতুন পৃথিবী'—কথাগুলো

খুব সুন্দর। সকলেরই ভাল লাগে। প্রেমিক বলে, রাজনৈতিক বক্তা বলে, ধর্মপ্রচারক বলে। প্রায় সময়ই এ কথাগুলোর কোন মানে থাকে না, প্রায় এক মামুলি গতের মত বলা হয়। কিন্তু হরঠাকুরের সেদিনের কথা (যেরকম ধরনের কথা তিনি নিত্য বহুলোককে হয়ত বলেন) নির্মলের কাছে ঠিক মামুলি লাগছিল না, কিংবা চেষ্টা করেও মামুলি লাগাতে পারছিল না।

বেরিয়ে আসবার মুহূর্তে জজসাহেব নির্মলকে প্রায় ধাক্কিয়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আবার অপেক্ষমান লোকজনের দিক থেকে উসখুস, দীর্ঘশ্বাস, নড়ে চড়ে বসার আওয়াজ, গলা খাঁকারি, একসঙ্গে ভেসে আসে। কেউ কেউ রিসেপশান রুমের দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ভিড় করে এবং বাইরের বারান্দায় এবং রাস্তার লোক সেদিক থেকে ভেতরে ঠেলা দেয় যে প্রবোধ সেন পেটে একটা কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই চাদর মুড়ি দেওয়া উকিলবাবুটি বোধ হয় মন্ত্রীকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি স্যর পাশের ঘর দিয়ে বেরিয়ে যান। ওদিকে খিড়কির দরজা।'

নির্মল পাশের ঘরে পা দিয়েই চমকে যায়। সামনের দেয়ালের আধখানা জুড়ে একটা ছবি। হরঠাকুর জলচৌকিতে বসে আছেন। মুখে বিমল হাসি। সেই প্রখর রাতজাগা লালচে চোখের বদলে শান্ত স্থির চাহনী। যদিও তাঁর কোন কোন ভক্ত মনে করেন যে তাঁর মত চোখ পৃথিবীতে খুব কম লোকের আছে কিন্তু নির্মলের কাছে তা বেশ ছোটই লেগেছিল। কিন্তু সে চমকায় আর এক কান্ড দেখে। একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হরঠাকুরের পায়ের কাছে। তাঁর পায়ে একখানা হাত রেখে বসে আছেন।

প্রবোধ সেন লক্ষ করেন তাঁর ভাইপোর মুখের ভাবান্তর। তাঁর নিজের মুখ প্রশান্ত অবিচলিত। গাড়িতে পাশাপাশি জ্যাঠা-ভাইপো। বরানগরের অন্ধকার অলিগলি অকস্মাৎ আলোকিত করে,' কখনও মন্দিরের চুড়ো, খাটা পায়খানা, ছ্যাৎলাপড়া বিরাট বাড়ির পলকাটা বারান্দার থাম, কখনও বটগাছের গুঁড়ি বা হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা কুকুরের গায়ে হেডলাইট ফেলতে ফেলতে গাড়ি এগোতে থাকে।

'একেবারে হামবাগ নয়, কি বলিস?' প্রবোধ সেন বলেন।

এমন নীচু গলায় নির্মল না বলে যে গাড়ির শব্দে প্রায় শোনা যায় না। তারপর একটু সন্দিগ্ধভাব ফুটে ওঠে তার মুখে। একবার ভাবে জিজ্ঞেস করবে কি না তার সম্পর্কে জ্যাঠামশাই কিছু বলেছিলেন কি না আগে হরঠাকুরের কাছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয় যে ভাবেই বলুক না কেন, হরঠাকুরের কথা নিজের। জ্যাঠামশাইকে সে জানে, অ্যাসেমব্লিতে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে বিরোধীদলের সমালোচনা খন্ডন করতে পারেন কিন্তু এরকম ঘরোয়াভাবে ঠিক মনের কথা ধরতে কিংবা বলতে পারবেন না।

'লোকটা অনেক লোকজনের সঙ্গে মিশেছে, অনেক কথা জানে। একটু মনস্তত্ত্ব চর্চা করলে ওরকম খানিকটা বলা যায়। এমন কিছু এক্সট্রাডিনারী পাওয়ার নেই,' প্রবোধ সেন বললেন।

'তুমি গেছিলে কেন জ্যাঠামণি?'

'আমি? এমনি! লোকটাকে দেখলাম। শুনে আসছি অনেক দিন থেকে। আমি তোমার বাবার মত ডগ্‌ম্যাটিক নই। আমি পাব্‌লিক ম্যান্। পিপলের সঙ্গে থাকতে হয়। পিপলের সুখদুঃখ বুঝতে হয়। লোকটাকে কাছ থেকে দেখলে তো। এই শীতের রাতেও এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখা করবার জন্যে। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন্? লোকটাকে

তুমি আমি হামবাগ বলতে পারি। কিন্তু তাতে কি এসে যাচ্ছে! ভিড় যেমন হচ্ছিল তেমনি হবে। আর তাছাড়া সব ব্যাপারই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তা যদি হত তাহলে আমি মিনিস্টার হতাম না, সুবোধও এমন রট্ করত না।'

হেডলাইটের আলোয় কতগুলো কুকুর ঘুমভেঙে একসঙ্গে ভৌ ভৌ করতে করতে গাড়ির পেছনে তেড়ে আসে। তাদের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর প্রবোধবাবু বলেন, 'পলিটিক্সের পাঠ তো সুবোধের কাছেই। তখনকার দিনের আই-এম-এস-এর চাকরীটা ছেড়ে দিলে। সুবোধের চিরকাল এই ডকট্রিনাল্ অ্যাপ্রোচ্......যেমন আমার ছোট পুত্রের।'

প্রবোধচন্দ্র শেষ কথাটা আস্তে বলেন। আর সমস্ত ব্যাপারেই প্রবোধচন্দ্র জয়ী কিন্তু একটা ব্যাপারে হেরে গেছেন। তাঁর ছোট পুত্র গত দশবছর ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে স্রেফ পাগলামী করছে। এ আজাদী তার কাছে এখনও ঝুটা। সে সম্প্রতি কোন গাঁয়ে গিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের ছুতো করে।

প্রবোধচন্দ্র হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দেশপ্রেম মানেই আত্মত্যাগ? দেশপ্রেম মানেই আত্মত্যাগ না। এটা হয়ত ইংরেজ আমলে চলত। এখন দেশপ্রেম মানে কে কত কাজ করতে পারে। দেশপ্রেম মানে এফিশিয়েন্সি। বুড়োকে দেখো (প্রবোধবাবু তাঁর সহকর্মীদের কারোর মত বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে বুড়ো কিংবা কর্তা বলেন ঘরোয়া আলাপে)। একেবারে কাছ থেকে দেখেছি। মুসৌরীতে এক বাড়িতে ছিলাম। উনি একদিকে আমি একদিকে। ভোর চারটেতে দেখতাম লোকটা অন্ধকারে ঘুট্ ঘুট্ করে বেড়াচ্ছে। আর একটু ফর্সা হলে কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে হাঁকতেন, কি হে প্রবোধ, ঘুম ভাঙল? একেবারে যন্ত্রের মত লোকটা। আমরা যদি নিজেদের দেশের কাজে লাগাতে চাই তাহলে আমাদের নিজেদের এরকম এক একটা যন্ত্র হওয়া দরকার। কি ভবেন ঠিক না?'

ভবেন গাঙ্গুলী এতক্ষণ সামনের সীটে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল। জলের চেয়ে রক্তের ঘনত্ব বেশী, ইংরেজী এই প্রবচনে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল নিজেকে। নইলে হরঠাকুরের ওখানে যাওয়ার সমস্ত ব্যাপারটা সেই সব ঠিক করলে আর সেখানে যাওয়ার পর থেকে কর্তা তাকে একেবারে ভুলে গেলেন। তাঁর ভাইপো যে যথেষ্ট সন্দেহজনক রাজনৈতিক মনোভাব পোষন করে তাকে নিয়েই তিনি এতক্ষণ মত্ত। ভবেনের অস্তিত্ব একেবারে ভুলেই গেছেন। তাছাড়া ভবেন লক্ষ করেছে গাড়ীতে বেশীর ভাগ সময়ই প্রবোধবাবু এত নীচু গলায় আলাপ চালিয়েছেন যে সে চেষ্টা করেও একটা আধটা ছাড়া কিছু ধরতে পারে নি।

'কি হে, তুমি যে একেবারে গুম মেরে আছো,' প্রবোধবাবু ভবেনের প্রতি সদয় হলেন।

'আমরা আর কি জানি স্যর।'

'তুমি সব জানো ভবেন। তবে তুমি একটু বেশী চাও। তুমি আর নির্মল একেবারে বিপরীত। তুমি চেয়ে গোলমাল বাধাও আর নির্মল না চেয়ে চেয়ে গেঁজে গেল।'

বাড়ির কাছে গাড়ি এসে গেল। ঘুমচোখে রঘু দৌড়ে এসে গেট খুলে দেয়। লনের সবুজে আলো পড়ে আরও চকচক করে। কিন্তু বারান্দার আলো খারাপ হওয়ায় বাড়ি অন্ধকার। ফুরফুর করে সারা বাগানে মাঝ রাত্তিরের হাওয়া দিচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে নির্মলের দিকে ঘুরে হঠাৎ তীক্ষ্ন গলায় প্রবোধ সেন বলেন, 'আই হেট্ পভার্টি'। নান্টুকে (জ্যাঠামশাইয়ের বড় ছেলে) বিলেত পাঠালাম সেইজন্যে। অবশ্য হি ইজ ব্রিলিয়েন্ট। কিন্তু দেশে ব্রিলিয়েন্সের জায়গা কোথায়? আমি এসব ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বেস করি না যেখানে ইউ রিডিউস এভরিবডি টু রামা শ্যামা। শেষ পর্যন্ত আই হ্যাড্ টু রাইট টু ইন্দিরা

(বোধহয় ইন্দিরা গান্ধী, নির্মল আঁচ করে)—ব্যালিওল কলেজে নান্টুর সীট পাওয়ার জন্যে। আই ডিড ইট ইন কম্প্লিট ফেথ দ্যাট্ আই শ্যাল্ সী হিম থ্রু। সুবোধ যাই বলুক। একটাই জাত আছে দুনিয়ায়—ইংরেজ। আজীবন সুবোধ ইংরেজের দোষই দেখল। তারা আমাদের দেশে এটা করে নি সেটা করে নি। কিন্তু ডেমোক্র্যাসীর এডিফিস্টা ইংরেজরাই তৈরী করে দিলে। সুবোধ বলবে ইংরেজ না হলেও আমরা আজকের অবস্থায় আসতে পারতাম। ঘণ্টা পারতাম, ঘণ্টা! (প্রবোধ সেন তাঁর দুটো মোটা বুড়ো আঙুল তাঁর ভাইপোর মুখের সামনে তুলে ধরেন)। ইংরেজ না এলে আমরা অযোধ্যার নবাবের আন্ডারে থাকতাম কিংবা বাহাদুর শার রাজত্বে। কোথায় থাকত হে তোমাদের রামমোহন রায়, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ? তোমাদের কালচার, সাহিত্য, তোমাদের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি?'

বারান্দায় উঠেও তাঁর কথার তোড় থামে না। 'সুবোধ চিরকাল ভুল করেছে। সে যুগের ঐ চাকরী, এক কথায় ছেড়ে দিলে। শীয়ার ম্যাড্নেস্। আরে সুভাষ বোস ছাড়লে বলে তুমি ছাড়বে? তখন আমি অপ্রিয় হয়েছি কথাটা পেড়ে। এখন পস্তাচ্ছে।'

'বাবা ঠিক পস্তাচ্ছেন না। ওঁর যেরকম জীবন ভাল লাগে বেছে নিয়েছেন,' নির্মল মৃদু দৃঢ় গলায় বললে।

'পভার্টি মানেই পস্তানো। তুমি মানো না?' প্রবোধবাবুর গলা একটু কর্কশ শোনায়। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা যে সুবোধের অত্যন্ত অবাস্তব আইডিয়ালিজমের ধোঁয়া নির্মল এমনকি তাঁর ছোট পুত্রকেও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এখন অন্তত নির্মলের সময় এসেছে এ ধোঁয়া থেকে সরে আসার। নির্মলের কমনসেন্সকে তিনি বিশ্বেস করেন এবং আশা রাখেন শেষ পর্যন্ত হয়ত তাঁর ভাইপোর এ মোহ কেটে যাবে।

নির্মল ধীরভাবে বললে, 'তোমার কথা যদি ঠিক হয় জ্যাঠামণি তাহলে তো সারা দেশটাই পস্তাচ্ছে।'

'এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি!' প্রবোধবাবু যেন লাফিয়ে উঠলেন। 'সেইজন্যেই তো দেশের সামনে একমাত্র সমস্যা স্ট্যান্ডার্ড অফ্ লিভিং বাড়ানো, সেইজন্যেই তো স্টীল প্ল্যান্ট—'

'তোমরা ওখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন চেঁচাচ্ছো? ঘরে এসে কথা বললে হয় না?' ঘুমচোখে বুলবুলি উঠে আসে। প্রবোধবাবুর কাছে এসে বললে, 'ওঁর কথাটা বললে?'

প্রবোধবাবু বেজারভাবে বললেন, 'রতনের এখন হবে না। আর কী এমন হয়েছে? দুটো বছর অন্তত ওকে চাকরী করতে দে। তারপর আমিই বলে টলে কলকাতায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করব।'

'তুমি আমার কোন ব্যাপার সীরিয়াসলি নাও নি, নেবেও না,' বুলবুলির গলায় রাগ।

প্রবোধবাবু সেদিকে কান না দিয়ে বললে, 'নির্মল তুমি কাল যাচ্ছো?'

'আর ছুটির দুতিনটে দিন এই নিরিবিলিতে কাটিয়ে দিই ভাবছি।'

'হ্যাঁ, তোমাদের দিকটা যা ধুঁয়ো।......ভবেন, কাল আটটায় বেরোব। সকাল দশটায় দমদম। বার্মিস্ প্রেমিয়ার আসছে।......বুলবুলি, রতনের জন্যে ভাবিস নে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি ওদের কলকাতার হেড কোয়ার্টারে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করব। ওদের ডাইরেক্টার জৈন, না ভবেন?'

'হ্যাঁ স্যার, সতেরো তারিখে ইউ. এন., অ্যাসোসিয়েশান্ মিটিং। আপনি প্রেসিডেন্ট, জৈন ভাইস্ প্রেসিডেন্ট।'

'সতেরো তারিখে তো স্মল্ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিস্ কন্ফারেন্স।'

'ওটা স্যর আঠারো তারিখে।'

এ সব খ‍ুঁটিনাটির ওপর খ‍ুব দখল ভবেনের। বস্তুত প্রবোধবাব‍ু আউটলাইনেই থাকতে ভালবাসেন কিন্তু খ‍ুঁটিনাটিতে ভবেনের সাহায্য ছাড়া চলা ম‍ুস্কিল।

'তাহলে ফ্রেঞ্চ এক্সপার্ট?' অস্পষ্টভাবে বললেন।

'ওটা তো স্যর বিশ তারিখে তিনটেতে।'

'ঠিক বলেছো,' এমনভাবে বললেন যেন ভবেনকে এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলেন। এবার ব‍ুলব‍ুলির দিকে ফিরে বললেন, 'আমি কোনদিন কাউকে আন্‌রিজনেব্‌ল রিকোয়েস্ট করি নি, করব না। তবে রতনের কথা আলাদা, হি ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট এঞ্জিনিয়ার। তার জন্যে বলা ম‍ুস্কিল না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান প্রবোধবাব‍ু। সামনে ম্লান চাঁদনীতে গঙ্গা ছলছল করছে। ওপারে আবছা বেল‍ুড় মন্দিরের মাথা জেগে আছে।

'হাউ গ্র্যান্ড্! বাড়িটা কিনে ভালই করেছি, কি বলো নির্মল?'

'হ্যাঁ জ্যাঠামণি।'

'ঘাটটা আবার বাঁধাব ভাবছি। মারোয়াড়ীদের হাতে ছিল। ওরা কি রাখতে জানে!'

একট‍ু থেমে সস্নেহে বললেন, 'শ‍ুয়ে পড়ো। লেপ দিচ্ছো তো। ঠান্ডাটা চেপে পড়ে নি। তবে চিল্ লেগে যেতে পারে।' একবার গঙ্গার ওপারের দিকে চেয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হরঠাকুর রামকৃষ্ণ নয়, সেটা সবাই জানে। আমিও তো সি.আর. দাশ নই।'

আবছা অন্ধকার গঙ্গার দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্স, না?'

দশ

কুঠিঘাটার স্নানার্থীদের সঙ্গে নির্মল আজকাল বেশ জমে গেছে। তার সম্পর্কে স্নানার্থীদের দ‍ুরকম অভিমত। কেদার ম‍ুখ‍ুজ্জে রামকৃষ্ণের 'কথামৃত' উদ্ধৃত করে বলেন, 'লেংড়া আমের কুচি ম‍ুখে ফেললেই টের পাওয়া যায়। ও এখন চুপচাপ আছে। সময় যখন আসবে সবাইকে মেরে বেরিয়ে যাবে।' অর্থাৎ নির্মলের সম্পর্কে যে উৎসাহ তা কেবল তার সম্ভাবনায়। সে পরে কী হতে পারে সেইটাই তার পরিচয়। আর একটা অভিমত স্পষ্ট ব্যক্ত করলে দীপক, 'পাঁচ বছর মাস্টারী করলে গাধা বনে যায়। ওর দ্বারা আর কিছ‍ু হবে না।'

এমন সময় নির্মল ঘাটে নামে। গতকাল হরঠাকুরের কৃপায় ভাল ঘ‍ুম হয় নি। এখানে নিরিবিলিতে তার মনটা একলা একলা বেশ তৈরী করেছিল। যেসব ইংরেজী সাহিত্যের বই পড়াতে গিয়ে একেবারে প্রাণহীন আপ্তবাক্যের মত ঠেকে সেগ‍ুলোর সঙ্গে আর একবার পরিচয় করে নিচ্ছিল। সেগ‍ুলো অতো প্রাণহীন লাগছিল না। যেমন উইলিয়াম সেক্সপীয়রের চিত্রকল্প। যখন সে ছাত্রদের সামনে ম‍ুখস্ত গতের মত বলবার চেষ্টা করেছে কিভাবে লেখকের চিত্রকল্প পাল্টে গেছে পর্বে পর্বে (যা বহ‍ুবার বহ‍ু ভাষ্যকার বলেছেন) তখন তার মনে এ সম্পর্কে কোন প্রতিধ্বনি ছিল না। কিন্তু এই নির্জনে 'কীং লীয়ার' পড়তে পড়তে তার মনে হোল লীয়ারের সেই হিংস্রতা নিষ্ঠ‍ুরতার চিত্রকল্প—নেকড়ে, শেয়াল, বাঁদর, ব্যাঙ—

এগুলো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ গঙ্গার হাওয়ায় ভাল খাওয়াদাওয়ায় তার মনটা এলিয়ে না গিয়ে আরও আঁট হয়ে উঠছিল এমন সময় সহসা তার জ্যাঠামণির আবির্ভাবে তার চিন্তাগুলো ওলোটপালোট হয়ে গেল। প্রবোধ সেন তাঁর একবেলার আবির্ভাবে যেন তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে চিন্তাশীল হবার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছে, এখন কর্মবীর হওয়ার প্রয়োজন—আর সে কর্ম যে ধরনেরই হোক।

'পাঁচবছর কি মশাই! একটা বছর ছেলে পড়ালেই মাথার চুল পাতলা হয়ে যায়,' অপ্রতিভ দীপকের দিকে চেয়ে নির্মল বললে।

তারিণী বললে, 'মাস্টারমশাইদের যুগ আজকাল আর নাই। ছেলেবেলায় দ্যাখতাম কি সম্মান, এখন প্যাটের দায় রাস্তায় নাইম্যা মিছিল করে। এখন আর প্যাট ছাড়া কিসু নাই।'

নলিনী ধমকে উঠল, 'মিছিল করবে না তো কি করবে? শুকিয়ে মরবে? তোমাদের সরকার তাদের পয়সা দেবে? লুটছে তো যত চারশো বিশগুলো, কাগজ আর সিনেমার মালিক। বি-টি রোডের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো না। এত কারখানা হচ্ছে। চাকরী-বাকরীর কিছু সুবিধে হচ্ছে? যেই একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে অমনি ছাঁটাই। আর গরীবের সরকার ব্যবস্থা করেছে ট্রাইবুনাল। তার মানে তিন বছর বুড়ো আঙ্গুল চোষ।'

'মাস্টারী একটা মিশান,' দীপক বললে।

'তা ভায়া যা বলেছো,' কেদার মুখুজ্জে বললেন। 'সব লোকের মাস্টারী হয় না।' তারপর নাতনীকে তেল মাখাতে মাখাতে বললেন, 'নির্মলবাবুর যদি ভাল লাগে মাস্টারী করবেন, যদি না লাগে ছেড়ে দেবেন। এতে আর কি কথা আছে!'

নির্মলের মুখে ঠিক উল্টো কথা এসেছিল। কিন্তু বললে, 'আমার তো বেশ ভালই লাগে।'

দীপক চোখ উল্টে বললে, 'সে কি মশাই, মাস্টারী করতে ভাল লাগে এরকম লোক আছে না কি?'

কেদার মুখুজ্জে বললেন, 'এটা তোমরা বাড়াবাড়ি করছো। আমি যখন অ্যান্ড্রুলে চাকরী নিলুম—সেটা হোল নাইনটিন হান্ডরেড এইট—তখন ভাবতুম এ কোন যবনদের দেশে এলুম। বেশ ছিলুম মা মাসির আদরে। তারপর তিনচার বছর যেতে না যেতে সন্ধ্যেবেলা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কাজ। গিলবার্ট সাহেবের তো ডান হাত হয়ে গেলুম বছর কয়েক যেতে না যেতে।'

'আপনার দাদু টু পাইস্ ছিল,' দীপক বললে।

'আপনাদেরও টুইশানি আছে, নোট লেখা আছে। কি বলেন নির্মলবাবু? ভগবান সব ব্যবস্থা করেছেন। যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান।'

'দাদু ঠান্ডা!' কেদার মুখুজ্জের নাতনী এতক্ষণ একটা কঞ্চি দিয়ে ঘাটের সিঁড়িতে দাগ কাটছিল। সে চেঁচিয়ে উঠল।

নলিনী সারা গায় শর্ষের তেল চাপড়ায়। তারপর নাকের ফুটোয় সজোরে তেল টেনে নিয়ে বলে, 'সব লাল হো জায়গা।'

'সে কি রে! আবার ইংরেজ আসবে নাকি?' তারিণী বিদ্রূপ করলে।

'দূর; ইংরেজরা তো আজকাল সেকেন্ডক্লাস পাওয়ার।...সেদিনের ময়দান মিটিং তো দেখলে। সমস্ত কলকাতা নেমে এসেছে বুলগানিন ক্রুশ্চভকে দেখবার জন্যে। ইংরেজ এলে

দেখত, আমেরিকান এলে দেখত?'

কেদার মুখুজ্জের মা কালী আর নলিনীর কমিউনিজম কুঠিঘাটার সবচেয়ে জোরাল দুটো কথা। এ দুটোই অবশ্য দুজনের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি। গত নভেম্বরে কলকাতার ময়দানে 'বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাবেশ' নির্মলকেও বিহ্বল করেছে। সেই জন-সমুদ্রে মাইক তলিয়ে গিয়েছিল। বুলগানিন কী বলেছিলেন, ক্রুশ্চভ কী বলেছিলেন বেশীর ভাগ মানুষের কাছেই তা পৌঁছয় নি। তারা দূর দূর থেকে এসেছে, ভিড়ের মধ্যে বসেছে, কখনও হাততালি দিয়েছে, কখনও 'রুশ ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ' স্লোগানে যোগ দিয়েছে, কেউ প্রাণপণ শুনবার চেষ্টা করেছে, কেউ কিছু শুনেছেও। তারপর তারা অনেকেই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে এবং নির্মলের মত তাদের অনেকের মনেই পরের দিন খবরের কাগজে বর্ণিত 'বিশ্বের বৃহত্তম জনসমাবেশ' এক বিরাট প্রহেলিকা হয়ে আছে।

'এই কলকাতায় জনসাধারণ সেদিন দেখিয়ে দিয়েছে সারা দুনিয়াকে...' নলিনী জলে নেমে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে থাকে।

দীপক চুপ করে থাকে। এসব রাজনৈতিক উত্তেজনা সে পছন্দ করে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হুজুগ, হুজুগ। নার্গিস কলকাতায় এলে দেখো না গ্র্যান্ড-হোটেলের সামনে লাঠিচার্জ হয়। কি বলুন দাদু?'

কেদার মুখুজ্জের চান হয়ে গেছে। নাতনীকে জামা পরাতে পরাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, 'এই কলকাতা অনেক কিছু দেখেছে। ছেলেবেলায় লালবাজারের কাছ দিয়ে আসছি। নেটিভদের তখন সহরের কোন কোন জায়গায় ফুটপাথে হাঁটা বারণ। একটা গোরা আসছিল। কাছে আসতেই সপাং করে ছড়ির বাড়ি কষিয়ে দিল গালে। ইংরেজদের আমলে সে কি জাঁক! লাটসাহেব কি এখনকার মত ছিল? লাটের গাড়ি বেরিয়েছে। রাস্তা খাঁ খাঁ। অন্যসব গাড়ি ঘোড়া চলবে না রাস্তায়।'

'আপনি দাদু বড্ড প্রাচীনপন্থী। পুরনোকে টেনে না এনে আপনি কথা বলতে পারেন না,' দীপক তার মনের কথাটা বলে ফেললে।

কেদার মুখুজ্জে নাতনীর ফ্রকে বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেন, 'আজ যা নতুন কাল তা পুরনো। সব মায়ের খেলা। কংগ্রেসও মায়ের খেলা কমিউনিস্টও মায়ের খেলা। একদিন সব খেলা সাঙ্গ হবে। কিন্তু মা তেমনি থাকবে।'

নাতনীর হাত ধরে যখন তিনি ঘাটে উঠতে থাকেন তখন দীপক নিজের মনে চেঁচায়, 'বোগাস্, বোগাস্, সব বোগাস্!'

কেদার মুখুজ্জে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সব বোগাস্, সব মায়া। খালি একজন এ মায়ার ওপরে—যিনি এ মায়া সৃষ্টি করেন।'

তিনি চলে যাবার পরও দীপক গজরাতে থাকে, 'এখন তো ভগবান ভগবান করবেনই। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আমাদের ভগবান ভগবান করলে চাকরী হবে, সস্তায় বাড়ি পাওয়া যাবে?'

'কেউ যদি সত্যিই ভগবানে বিশ্বেস করে শান্তি পায় সে তো খুব ভাল কথা,' নির্মল চাপা বিরক্তিতে বলে।

'লেনিন বলেছেন' দীপক শুরু করে।

নির্মল অসহিষ্ণু হয়ে বললে, 'রিলিজিয়ান ইজ দ্য ওপিয়াম্ অফ দ্য পিপ্ল্। তাতে হোল কি? ভগবানে বিশ্বাস লোপ পেয়ে গেল। আর আপনি তো মশাই দরকার হলে

লেনিন বলবেন, দরকার হলে রামকেষ্ট দেখাবেন।'

এতক্ষণে তাঁতীবাবু ঘাটে এসেছেন। তাঁতীবাবু ঘাটে এলেই বোঝা যাবে জোয়ারের সময় এসেছে। তাঁতীবাবু সাদা গোঁফজোড়ার ভেতর থেকে হাসতে হাসতে বলেন, 'আজ যে ঘাট খুব গরম...আমার মশাই লেনিনও নেই, রামকেষ্টও নেই। ছেলে দুটোকে মানুষ করলাম। তাদের বাইরে চাকরী। মেয়েটাকে সাধ করে বিয়ে দিলাম। জামাই মরল। এখন মেয়ে আর নাতি এই নিয়ে আছি।...ভেবেছিলাম শেষ বয়সে তীর্থ করব। তা এখন এই তীর্থেই আছি। চোখে দেখতে পারি না, তবু তাঁত চালাই।'

জল বাড়তে থাকে। ঘাটে ঢেউ আছড়ায়। জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার জোর বাড়ে। নির্মল, নলিনী, তারিণী গা ভাসিয়ে দেয়। কতকগুলো চিল নীচু হয়ে পাখসাট খায় মাছের সন্ধানে। মাঝে মাঝে চোখ খুলতেই ভেসে ওঠে অপসৃয়মান কুঠিঘাটার সিঁড়ি, বটগাছের মাথা, নির্মলের জ্যাঠার সদ্যোকেনা বাড়ি, কারখানার চিমনি, মন্দিরের চূড়ো আর নির্মেঘ শীতের আকাশ। নির্মল সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাবে যদি এত সহজে, এমন অবলীলাক্রমে সে এমন জগতে পেঁৗছতে পারত যে জগতটা তার জ্যাঠামশাই আর বাপের দুটো জগত থেকেই আলাদা, যেখানে তার জ্যাঠামশাইয়ের জগতের বাগাড়ম্বর নেই আবার তার বাপের জগতের দৈন্য এবং রূঢ়তাও নেই।

[ক্রমশঃ]

ঈজিপ্সীয় কবরের গল্প

অচ্যুত গোস্বামী

খটাস্ করে চাবি ঘুরিয়ে দারোয়ান ফটকের তালা খুলে ফেলল। ঠেলে ঠেলে দুটো দরজাকে দু'প্রান্তে সরিয়ে দিল। লোহার ভারী দরজা ঝন্‌ঝন্ ঘর্-ঘর্ শব্দ করে নিষ্ফল প্রতিবাদ জানালো।

গাড়ি ফটক খোলার প্রতীক্ষায় খানিকক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেই অবকাশে মহেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে একটা অ্যালবামের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। প্রায়-নগ্ন ছায়া-নটীদের চটুল চেহারার উপর দিয়ে তার চোখ আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এরকমই স্বভাব মহেন্দ্রনাথের। দারুণ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেও মহেন্দ্রনাথ যে-কোন লঘু বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিতে পারে।

ম্যানেজার বলল,—আমি কি আপনার সঙ্গে যাব? অন্ততঃ খানিক দূর অবধি?

মহেন্দ্রনাথ শব্দ না করে হাসল।—আমাকে সাহস দেওয়ার জন্য? প্রহ্লাদ, আমি তোমাকে যে কোন নরকে নিয়ে যেতে পারি; তুমি পারবে না।

প্রহ্লাদ অপ্রতিভ হয়ে একটু কাশল,—আমার চেয়ে আপনার সাহস বেশী তা জানি—

—থাক। তবুর কোন দরকার নেই। তবে তুমি চল আমার সঙ্গে। তোমাকে গোটা কয়েক পরামর্শ দেওয়ার আছে।

ততক্ষণে ফটক খোলা পেয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। বিরাটাকার তৈল-মসৃণ গাড়ি অনায়াস গতিতে ফটক ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে নামল। রাস্তার জনতা সভয়ে সসম্ভ্রমে দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল। জনতার মধ্যে দু'চারজন শ্রমিকও রয়েছে। মহেন্দ্রনাথের কারখানার শ্রমিক। যারা সম্প্রতি ধর্মঘট করেছে। যাদের ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য এই সর্বপ্রথম মহেন্দ্রনাথকে পুলিস ডাকতে হয়েছিল। আধ ঘণ্টা আগে এই রাস্তাতেই পুলিস লাঠি চালিয়েছে। এখন অবশ্য রাস্তা দেখে তা অনুমান করা শক্ত।

ধর্মঘটী শ্রমিকরাও মহেন্দ্রনাথকে দেখে ভয়ে পাঁশুটে হয়ে গেছে। মনে মনে হাসল মহেন্দ্রনাথ। তাকে দেখে ওরা ভয় পায়। ভয় পায় বলেই ওদের কোন জাড়িজুড়ি তার কাছে চলে না। ধর্মঘট করে ওরা কোনদিন সুবিধে করতে পারে নি। আজও পারবে না। ওদের ভয় শেষ পর্যন্ত ওদের দুঃসাহসকে পরাস্ত করবে। ওরা ভয় পায়, কারণ মহেন্দ্রনাথের মনে কোন ভয় নেই।

মানুষের সমস্ত ভয়ের মূলে রয়েছে মৃত্যু-ভয়। মহেন্দ্রনাথ সেই মৃত্যুভয়কে জয় করেছে। জীবনে সে অনেক মৃত্যুকে পা দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। মৃত্যু তার কাছে ছেলের হাতের মোয়া। প্রয়োজন বোধে যে-কোন মানুষকে সে মৃত্যু দান করতে পারে। অপ্রগতির পথে যে প্রতিবন্ধক হবে তার বেঁচে থাকার অধিকারকে সে স্বীকার করে না। সেই অবাঞ্ছিতদের খুঁজে বার করার জন্য সে তার কারখানায় গুণ্ডা পোষে। কোন দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। যা অপরিহার্য, যে দরজায় প্রত্যেক মানুষকেই একদিন না একদিন পৌঁছুতে হবে, সেই দরজায় কাউকে যদি কিছুদিন আগেই পৌঁছে দিতে হয়, তবে তাতে ভয় কিসের?

শ্যামবাজারের মোড়ের কাছাকাছি এসে গাড়িখানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। নিশ্চয় ট্রাফিক জামের ব্যাপার। এত দীর্ঘ সারির মধ্যে মহেন্দ্রনাথের গাড়ি এখন একটি ক্ষুদ্র বিন্দু-মাত্র। ট্রাফিক পুলিসের ছুটোছুটি আর ঘন ঘন এলোমেলো হুইসলের শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে কয়েক শো গাড়ির বিশৃঙ্খল জট ছাড়াতে এখন কিছু সময় লাগবে। বিরক্তিকর! মহেন্দ্রনাথ এখন যেন গাড়ির জনতার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। বিরক্তিকর!

গরমে ঘেমে উঠল মহেন্দ্রনাথ। ফরসা গোলগাল মুখখানা লাল হয়ে উঠল। চওড়া কুঞ্চিত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। মহেন্দ্রনাথকে এ ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার অর্থ তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা। রাবিশ! রাগে গর্বিত পুরু ঠোঁটখানা চেপে ধরল দাঁত দিয়ে। আর ঠিক সেই সময়ে মৃত্যু এক অভাবিত নতুন রূপ নিয়ে উপস্থিত হল তার সামনে।

মাত্র কয়েক হাত দূরে ফুটপাথের উপর থেকে একটি লোক গুলি ছুঁড়ল। এক পলকের জন্য লোকটাকে দেখতে পেল মহেন্দ্রনাথ। পরমুহূর্তেই সে অসংখ্য মানুষের মাথার মধ্যে হারিয়ে গেল। গুলিটা গাড়ির দুরজার উপর রাখা তার বাহুকে স্পর্শ করে একটু বেঁকে গিয়ে গাড়ির পিছন দিককার কাঁচের জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্বচ্ছ কাঁচে মার্বেলের মতো একটি ছোট্ট নিটোল ছিদ্র সৃষ্টি হল মাত্র।

পুড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা বোধ হল বাহুটাতে। রক্তও দেখতে পেল মহেন্দ্রনাথ। কিন্তু সে-সব কিছু নয়। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে মৃত্যু তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আসল কথা সেইটে। সেই কয়েক ইঞ্চির ভুলটুকু সংশোধন করে নেওয়ার জন্য আততায়ী হয়তো কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে। চিন্তার কারণ সেইটে।

মৃত্যু? তার তরুণ তাজা প্রতিভাবান দেহের দিকে পা বাড়াবে মৃত্যু? এ কী অভাবনীয় অকল্পনীয় কথা! যারা মরেই থাকে, সে তাদের দিকেই চিরকাল মৃত্যুকে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মৃত্যু পথ ভুল করে তার দিকে এগিয়ে আসবে? এ সম্ভাবনাটার কথা তো তার মনে কোনদিন উদয় হয় নি!

ম্যানেজার এবং ড্রাইভার দুজনেই 'ধর ধর' শব্দ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। যত সব নির্বোধ শয়তানের দল! জনতার ভীড় যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে খুঁজে বার করা যেন এতই সহজ! আর এদিকে যে তাদের অন্নদাতা, যে তাদের চোখের মণি, সেই মহেন্দ্রনাথ, আহত মহেন্দ্রনাথ, অরক্ষিত গাড়িতে পড়ে রইল একা! কী আশ্চর্য!

খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে ম্যানেজার হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল,—নাঃ! ব্যাটাকে ধরা গেল না।

—সে তো জানা কথা। মহেন্দ্রনাথের গলা একটু রুক্ষ শোনালো।

কিন্তু হারামজাদা ব্যাটা ধরা পড়বেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একি! আপনার হাতে যে রক্ত!

—সেটা বুঝি এতক্ষণে নজরে পড়ল?

ম্যানেজার ক্ষতটা এক নজর দেখে বলল,—না—এমন কিছু নয়। আমি এক্ষুনি ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করছি। ভাগ্য ভাল যে অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে!

ভাগ্য খুব ভাল নয়। অনেক গুরুতর কিছু ঘটতে পারত। এই তার চৌদ্দ বছরের পুরোন বিশ্বস্ত ম্যানেজার! গুরুতর সম্ভাবনাটার কথা না ভেবে ঘটনার গুরুত্বকে লঘু করে দিতে চাচ্ছে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর সমস্ত সহানুভূতির কথা মৌখিক। তার মধ্যে

কোন আন্তরিকতা নেই। আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মহেন্দ্রনাথ বুঝতে পারছে সে কত নিঃসঙ্গ।

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। গাড়িতে বসেই মহেন্দ্রনাথ দেখল গাড়ি বারান্দায় মিসেসের গাড়ি তৈরি। সেজেগুজে মিসেস্ অস্থিরভাবে গাড়ি চলাচলের গোলাকার রাস্তার উপর পায়চারি করছেন। ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে আনতেই মিসেস ছুটে এসে জানলাটা চেপে ধরে ভিতরে মুখ বাড়াল।

—এত দেরি করে ফিরলে—তোমার কি কোন কান্ডজ্ঞান নেই? মিস্টার তালুকদারের পার্টিতে তুমি আজ চীফ্ গেস্ট—মনে নেই? ওরা এর মধ্যেই দু'তিনবার ফোন করেছে। মিসেস্ ব্যস্ত কণ্ঠে বলল।

মহেন্দ্রনাথ ব্যস্ত না হয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল,—ওদিকে কি হয়েছিল খবর পাওনি?

মমতাময়ী মিসেস্ সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে মমতা ঢেলে দিয়ে বলল,—ফোনে খবর পেয়ে আতঙ্কে বাঁচিনে। ভাগ্যিস্ বিশেষ আঘাত লাগেনি। কথা তো শুনবে না! পই পই করে বলেছিলাম—হাঙ্গাম হুজ্জোতের সময় কারখানায় গিয়ে কাজ নেই। অফিসারদের ডাকিয়ে পরামর্শ দাও। যাক্ গে, যা হয়েছে হয়েছে। নেমে পড়ো চট্ করে। পোষাকটা পাল্টিয়ে নিতে হবে। রক্তের দাগ লেগেছে দেখছি।

আশ্চর্য লাগছে কথাগুলো শুনতে! তার নিজের স্ত্রী মমতা, তার জীবনের অর্ধাংশ, এই কথাগুলো বলছে! হিন্দু স্ত্রীর সাধ-আহ্লাদ সুখ-সম্পদ নাকি নির্ভর করে স্বামীর জীবনের উপর! অথচ দেখা যাচ্ছে মমতা পার্টিতে গিয়ে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করা এবং ফষ্টিনষ্টি করার কল্পনায় এমনি মশগুল যে অনায়াসে স্বামীর বিপদের গুরুত্বটা অস্বীকার করতে পারলে বেঁচে যায়!

মহেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে বলল,—আঘাত গুরুতর নয়। কিন্তু গুরুতর হতে পারত।

—ও কথা বোলো না, কাতর কণ্ঠে মমতা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,—ও কথা ভাবতে গেলেও আমার বুক কাঁপে। তোমার প্রাণ যে ফিরে পেয়েছি এ জন্য কালিঘাটের মায়ের কাছে পুজো দেব। নাও—এখন তৈরি হয়ে নাও।

বুক কাঁপে না হাতী! সমস্ত ফাঁকা কথা মাত্র। স্তোক বাক্য দিয়ে স্বামীকে খুশি করার চেষ্টা। কিন্তু মহেন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে মানুষ চড়িয়ে বেরিয়েছে। তাকে ঠকানো অত সহজ নয়।

বলল,—তুমি যাও। আমি যাব না।

এবার ম্যানেজারও স্ত্রীর সুরে সুর মেলালো, বলল,—স্যার! আপনি কিন্তু গেলেই ভাল হয়। তাতে প্রমাণ হবে আপনার উপর সামান্য আক্রমণকে আপনি গ্রাহ্য করেন না। তাতে লৌহমানব বলে আপনার খ্যাতি আরও বাড়বে।

ধারী শয়তানের কুযুক্তির বহর দ্যাখ! কিন্তু মহেন্দ্রনাথ ছেলেমানুষ নয়। তুচ্ছ নামের চেয়ে তার জীবনের মূল্য অনেক বেশী।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—বাজে কথা বলো না ম্যানেজার। আততায়ীকে দ্বিতীয়বার আমার জীবননাশের সুযোগ আমি দেব না।

—কী যে বলেন! সে ব্যাটার কি প্রাণের ভয় নেই? ম্যানেজার বললে।

তর্কে কান দিল না মহেন্দ্রনাথ। গাড়ি থেকে নেমে স্ত্রীর আর ম্যানেজারের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে সে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আর আশ্চর্য! তাকে ফেলে রেখে মমতা অনায়াসে ম্যানেজারকেই সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল! আহত স্বামীর চেয়ে পার্টির আকর্ষণ অনেক বেশী। দু'জনের যুক্তির মধ্যে বেশ খানিকটা মিলও মহেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াল না। তবে কি—

অনেক ব্যথা স্বীকার করে মা শিশুর জন্ম দেন। অনেক যত্নে, বহু পরিশ্রমে সেই শিশু-কোড়কটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তিল তিল করে বড় করে তুলতে হয়। ইস্কুলে কলেজে কর্মক্ষেত্রে কত হাজার হাজার ঘণ্টা পরিশ্রম করে আর কষ্ট সহ্য করে সেই মানুষটা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবন কি সহজ জিনিস! মহেন্দ্রনাথ তার চল্লিশ বছরের জীবনের অতীতের পাতাগুলি উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখে শিউরে উঠল। কত দুঃখ-কষ্ট, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা-মৃত্যুকে অতিক্রম করে আজ সে এত বড় হয়ে উঠেছে! এত মূল্য দিয়ে গড়ে তোলা জীবনটা অনায়াসে একটি আততায়ীর গুলিতে এক নিমেষে নষ্ট হয়ে যেতে পারত! ভাবতে গিয়ে মনে মনে আঁৎকে উঠল মহেন্দ্রনাথ।

আশ্চর্য! এতদিন এ-সব কথা কেন সে এমন করে ভাবে নি? উন্নতি লাভের নেশায় মশগুল হয়ে ছিল—জীবনটাকে যে সাবধানে রক্ষা করতে হয়, এ কথা কোনদিন মনেই হয় নি। জীবন যে সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশী মূল্যবান এ-কথা কেন একবারও মনে হয় নি। হলে হয়তো আততায়ী ওরকম একটা সুযোগ পেত না।

আর অবহেলা করা চলবে না। জীবনের চারপাশে একটি সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য বর্ম রচনা করবে মহেন্দ্রনাথ। জীবনকে সে নিরাপদ করবে। মূল্যবান জিনিসকে মূল্যবান বলেই গণ্য করবে।

ম্যানেজার ফিরে এলে তাকে বলল,—শোন প্রহ্লাদ, আমার গাড়ির সমস্ত কাঁচ খুলে ফেলে সে-জায়গায় বুলেট-প্রুফ্ স্বচ্ছ প্লাস্টিক বসাতে হবে। ইঞ্জিনের সামনে পাকা স্টীলের রড আর স্প্রিং লাগাতে হবে। অ্যাকসিডেন্ট হলেও গাড়ি ভাঙবে না বা গাড়িতে ঝাঁকুনি লাগবে না।

প্রস্তাব শুনে ম্যানেজার খানিকক্ষণ অবাক হয়ে মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল,—কিন্তু অমন চমৎকার গাড়িখানা দেখতে একেবারে খারাপ হয়ে যাবে যে!

বদমাইশ! তোর কাছে মালিকের জীবনের চেয়ে মালিকের গাড়ির সৌন্দর্যের মূল্য বেশী! কর্কশ কণ্ঠে বলল,—তর্ক কোরো না। যা আদেশ করছি, তাই করো।

তিন চার দিন পরে যখন গাড়ি কারখানা থেকে ঘুরে এল, তখন গাড়ির চেহারা দেখে মহেন্দ্রনাথ খুশী হল। তিনি যা চেয়েছিলেন, কারিগর তার চেয়েও বেশী কিছু করেছে। মনে হচ্ছে সমস্ত গাড়িখানাকেই যেন একটি সুদৃঢ় স্টিল ফ্রেমের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। গাড়ির আভিজাত্য নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ কোন এক্সিডেন্টে এ গাড়ি জব্দ হবে না। বুলেট-প্রুফ প্লাস্টিকের জানলা কাঁচের মত অত সুন্দর আর স্বচ্ছ নয়। কিন্তু ভারী মজবুত।

ধর্মঘট মিটে গেলে গাড়ি নিয়ে মহেন্দ্রনাথ কারখানায় এল। তার আপিস ঘর কারখানার মূল আপিস-বাড়ি থেকে একটু দূরে, স্বতন্ত্র জায়গায়। আধুনিক ডিজাইনে তৈরি ঘরখানি

খুবই সুন্দর, রুচি-সম্মত আর আরামদায়ক। হলে হবে কি, নিজের চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতে মহেন্দ্রনাথের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। অফিস-কামরা দালানের একপ্রান্তে; তার চারদিকে জানলা; জানলা দিয়ে গাছে গাছে ফুটন্ত ফুল দেখা যায়। কিন্তু ঐ ফুলগুলির মধ্যে অনায়াসে এক জোড়া ধূর্ত চোখ লুকিয়ে থাকতে পারে। চেম্বারে এসে সে কথায় বা কাজে ব্যস্ত থাকবে, ফুলের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু এক জোড়া অতন্দ্র চোখ তার কথা ভুলে যাবে না; নিরলস ধৈর্যের সঙ্গে হয়তো সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকবে। তার চোখের দৃষ্টি বস্তু থেকে বস্তুতে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে; কিন্তু একটি হিংসা-কুটিল দৃষ্টি অভ্রান্ত নিরিখে নির্ণিমেষে কেবল তাঁর অরক্ষিত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

ঘরে ঢুকেই সে জানলাগুলির কাঠের শার্সি ফেলে দিতে আদেশ করল। তবু মনের স্বস্তি ফিরে এল না। কেবলি মনে হতে লাগল একজোড়া ক্রুদ্ধ চক্ষু কাঠের শার্সিগুলোকে নিষ্ফল আক্রোশে বারবার আঘাত করছে, চোখের আগুন দিয়ে কাঠের আবরণকে পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে। বেশিক্ষণ সে চেম্বারে বসে থাকতে পারল না। গোটা কয়েক জরুরী সই শেষ করে ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাল।

ম্যানেজার এলে বলল,—প্রহ্লাদ, আমার আপিস-ঘরের চারদিকে ছাদ সমান উঁচু করে পাঁচিল দিয়ে দাও। আর সামনাটায় এ আর পি-র ব্যাফল্‌-ওয়ালের মত তিন সারি দেওয়াল থাকবে। যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাকে তিনটি দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ঘুরতে হবে। পথে তিন জন দ্বারোয়ান তার পকেট আর কোমড় পরীক্ষা করে দেখবে।

ম্যানেজারের মুখে-চোখে অমনোনয়নের ভাব ফুটে উঠল। বলল,—স্যার, আপিস-বাড়ির সৌন্দর্যটা চোখের আড়াল করে রাখবেন?

তাইতো! খুবই অন্যায় কথা! মালিকের জীবন যায় যাক। তা বলে আপিস বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট করা? চলবে না চলবে না। শালা ম্যানেজার! তোর সৌন্দর্য-প্রীতিটা খুবই বেশী বেড়েছে দেখতে পাচ্ছি! কষ্টে রাগ দমন করে মহেন্দ্রনাথ বলল,—ম্যানেজার, এই কারখানার সব কিছু আমি। আমি আছি বলেই এই কারখানার এত বাড়বাড়ন্ত। তোমাদের উচিত ছিল আমার জীবনটাকে চোখের মণির মত জ্ঞান করে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তুমি ম্যানেজার বটে, কিন্তু সেটুকু দূরদর্শিতা তোমার নেই। কাজেই আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হচ্ছে।

ম্যানেজার পুরোন লোক। তাঁর সাহস বেশী। কাজেই এ-কথার উত্তরে বলল,—স্যার, আমাদের কারখানায় তো নয়ই, কলকাতার কোন কারখানাতেই মালিকের প্রাণনাশের চেষ্টার কোন নজীর নেই। রাস্তায় একটা উট্‌কো লোক সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতিবশতঃ একটা কাজ করেছে। তার উপর আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?

এ-কথা শুনে মহেন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ মনে হল, ম্যানেজার বিপজ্জনক ব্যক্তি। কঠিন স্বরে বলল,—কেন গুরুত্ব দিচ্ছি তা বোঝার ক্ষমতা বা ইচ্ছা তোমার নেই। যাক্‌। আমি আদেশ দিয়েছি, তুমি আদেশ পালন করবে। দ্যাট্‌স্‌ অল্‌।

ম্যানেজার তবু একটু ইতস্ততঃ করে, কী যেন বলি-বলি করে না বলে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

বাড়িতে ফিরে এসে মহেন্দ্রনাথকে আর একটি অপ্রিয় কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হল। বাড়ির গেটের কাছে এসে গাড়ি বাঁক নিতেই দ্বারোয়ান অর্ধেক ভেজানো গেটটাকে ভাল করে খুলে দিয়ে বুক টান করে দাঁড়িয়ে বুটে বুট ঠুকে সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকবে—

এটা এই বাড়ির বহুদিনকার রেওয়াজ। আজকে এসে দেখল্ গেটটা হা করে রয়েছে; তার প্রশস্ত উদার গহ্বর দিয়ে এক রেজিমেন্ট সৈন্য ঢুকে গেলেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। বাড়ির এই বিপজ্জনক প্রবেশ পথটাকে অনায়াসে সহস্র শত্রুর অনুপ্রবেশের জন্য অনাবৃত করে রেখে প্রহরী উধাও হয়েছে। খোলা পথ পেয়ে ড্রাইভার নির্বিধায় ভিতরে ঢুকে পড়ছিল মহেন্দ্রনাথ জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ দিল,—দাঁড়াও।

অতএব গাড়িখানা গেটের মুখে দাঁড়িয়ে গেল, এবং দাঁড়িয়ে রইল পুরো এক মিনিট ধরে। পেট্রোলের ইঞ্জিন বৃথাই ঘর্ র্ ঘর্ র্ শব্দ করতে লাগল, আর প্রায় অদৃশ্য নীলচে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। এটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে করে ভিতরের লনের দেবদারু গাছের উপরে বসা তিন-চারটে কাক তারস্বরে চিৎকার জুরে দিল। কোন অদৃশ্য স্থানে বাঁধা টেরিয়ার কুকুরটি প্রভুর আবির্ভাবের সঙ্কেত পেয়ে প্রবল বেগে ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করল। একমাত্র সূর্যদেব ঘটনাটির প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যের সঙ্গে যেমন কিরণ দিচ্ছিলেন, তেমনি কিরণ দিয়ে যেতে লাগলেন।

পুরো দেড় মিনিট পর কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে দ্বারোয়ান লজ্জিত মুখে প্রভুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকল। প্রভু তা দেখতে পেলেন এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেক পরে প্রভুর কাছে দ্বারোয়ানের তলব হল। দ্বারোয়ান আসতেই মহেন্দ্রনাথ এই তেরো বছরের পুরোন বিশ্বস্ত ভৃত্যটিকে একমাসের মাইনে আগাম দিয়ে বিদেয় দিল। এ-সব ব্যাপারে কোনরকম দুর্বলতাকে সে প্রশ্রয় দেবে না। তার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের কর্তব্যকর্মে এক চুল বিচ্যুতিকেও ক্ষমা করা যায় না। পুরো এক মিনিট বাড়ির প্রবেশ পথে দ্বারোয়ান থাকবে না এ যে সাংঘাতিক কথা!

আততায়ীর আক্রমণের দিন থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে একটু একটু প্রচ্ছন্ন ব্যবধান গড়ে উঠছিল। লোহা এবং প্লাস্টিকের অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে গাড়িটা যেদিন বেরিয়ে এল, সেদিন তার চেহারা দেখে মমতা মন্তব্য করেছিল,—কয়েদী গাড়ী। শুধু তাই নয়, একদিন যখন দু'জনে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়ার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, তখন মমতা তার গাড়িতে উঠতে অস্বীকার করেছিল। এমনকি মমতার খোলা গাড়িতে চড়তে অনুরোধ করতেও তার এতটুকু আটকায়নি। মহেন্দ্রনাথ যেন মমতার ভিটে বাড়ির প্রজা। রাস্তার প্রতি মোড়ে মোড়ে শত্রুরা অপেক্ষা করে রয়েছে এ-কথা জেনেও মমতার আদেশে খোলা গাড়িতে যেতে যেন সে বাধ্য! সুতরাং সেই দিন থেকে স্বামীস্ত্রীর একসঙ্গে বাড়ি থেকে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

পুরোন দ্বারোয়ানকে বরখাস্ত করার ঘটনাকে মমতা সহজভাবে নিতে পারেনি। যে-ভাষায় মমতা আপত্তি জানিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল যে এ-বাড়িতে যদি কোন কিছুর দাম থাকে তো তা মমতার খেয়ালী ইচ্ছার। কিন্তু মমতার সঙ্গে বিরোধ চরমে উঠল সেদিন অন্য একটি ঘটনায়।

মহেন্দ্রনাথের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে প্রশস্ত রাজপথ; ডান পাশ দিয়ে গিয়েছে একটি বাই-লেন; বাঁদিকে আর একটি বাড়ি। তেতলা বাড়ির দোতলায় সে থাকে। দুটি রাস্তাই যাতে দেখা যায় সেজন্য তার ঘরের দুপাশে দুটি করিডর। সেদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটি সিগারেট ধরিয়ে সে সবে সামনের করিডরে বেরিয়েছে। দেখল, একটি লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে। চোখাচোখি

হতেই ব্যাটা চোখ নামিয়ে নিল। ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক বলে বোধ হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল! খানিক পরে ডাইনের বারান্দায় গিয়েও দেখল একটি লোক তেমনিভাবে গলি থেকে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে এবং তার চোখে চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিল। এরা নিছক দু'জন কৌতূহলী পথচারী মাত্র নয়। এরা শত্রুর চর। এরা যে মহেন্দ্রনাথের গতিবিধির সন্ধান নিতে এসেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকে মহেন্দ্রনাথ দরজা জানলা বন্ধ করে দিল। সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। আজ সকালেই তার জীবনের অবসান ঘটতে পারত। ঘটেনি যে সেটা ভাগ্য! কী আশ্চর্য! সে গাড়ি নিরাপদ করার কথা ভেবেছে, কিন্তু তার নিজের বাড়ি, তার শয়ন-ঘর যে এমন অরক্ষিত হয়ে রয়েছে এ কথা একবারও তার মনে হয়নি! তার শয়ন-ঘরের পরিচ্ছন্ন খোলামেলা ভাবটি, তার দুপাশের নীচু পাঁচিল, যে-জন্য রাস্তা থেকে দোতলাটা খুব ভাল দেখা যায়—এ-সব তো পরিষ্কারভাবে শত্রুকে আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। সে যখন করিডর দিয়ে পায়চারি করতে করতে বড় বড় অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভাবে, তখন বিরাট রাস্তার যে-কোন নিরাপদ বিন্দু থেকে একটি বন্দুকের নল মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠতে পারে। সে ঝলসানিটুকু হয়তো তার নজরেই পড়বে না। তার আগেই—। এত যত্নে এত আয়াসে পালিত তার এই জীবনটাতো আসলে পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দুর মতই অস্থিরচিত্ত। পদ্ম-পত্র একটু কাঁপলেই তা ঝরে পড়বে, এবং পাতার গায়ে তার ক্ষণপূর্বের অস্তিত্বের চিহ্নটুকুও থাকবে না।

ভয়ে শিউরে উঠে মহেন্দ্রনাথ চোখ বুজল। রাশি রাশি অন্ধকারের মধ্যে ভেসে উঠল অসংখ্য লাল লাল বিন্দু। সে লাল বিন্দুগুলো আর কিছু নয় গুলি ছোঁড়ার মুহূর্তে নলের মুখে যে ক্ষণদীপ্ত শিখাটি দেখা যায়, তাই।

একটু পরেই সে মমতাকে ডেকে বলল,—বাড়ির দু'পাশের পাঁচিল অন্ততঃ পনের ফিট উঁচু করতে হবে। যাতে রাস্তা থেকে কিছু দেখতে না পাওয়া যায়। শুনে মমতা চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলল। মমতা বলল,—লোকে তাদের অভিজাত বলে জানে কারণ তাদের বাড়ির চেহারায় আভিজাত্য আছে। তারা যদি বাড়িটা না-ই দেখতে পায়, তবে আর এ-বাড়ির মূল্য থাকল কী! সে লোককে কী করে এ-কথা বলবে যে অলীক মৃত্যুভয়ে তার স্বামী স্বাস্থ্যের সাধারণ বিধিগুলো উপেক্ষা করছেন!

ম্যানেজারের যুক্তি আর মমতার যুক্তি ঠিক একরকমের। ম্যানেজার না হয় বেতন-ভুক কর্মচারী, কিন্তু স্ত্রী মমতারও যে স্বামীর নিরাপত্তার জন্য এতটুকু দুর্ভাবনা নেই এ বড় আশ্চর্য! মহেন্দ্রনাথ তক্ষুণি সরকারকে ডেকে পাঁচিল পনেরো ফুট উঁচু করে তার উপর দিয়ে শরকির মত সব লোহার-ত্রিশূল বসিয়ে দিতে আদেশ দিল। প্রতিবাদে মমতা পিত্রালয়ের দিকে রওনা হল। ভালই হল।

যত দিন যাচ্ছে ততই মহেন্দ্রনাথের মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাচ্ছে যে তার শত্রু এক আধজন নয়, অনেক। শুধু সেই শ্যামবাজারের অজ্ঞাত আততায়ী নয়, শুধু কতিপয় বিক্ষুব্ধ শ্রমিক নয়, বা বিভিন্ন সময়ে নিহত শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজনরা নয়। তার চার-দিকেই শত্রু। তাকে কেন্দ্র করে শত্রুরা তার চারদিকে এক অদৃশ্য অথচ সুদৃঢ় বেড়াজাল রচনা করছে, যাতে কোনদিক দিয়েই সে বেরোবার বা পালাবার পথ না পায়। যারা জল-বাতাসের মতোই ঘনিষ্ঠভাবে তার জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, যাদের উপর সে এতকাল ধরে সব ব্যাপারে নির্ভর করে এসেছে, নিজের চেয়েও যাদের সে বেশী বিশ্বাস করেছে তারা

আজ কার্যতঃ শত্রুর অনুচরের কাজ করছে। এদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে গভীর সন্দেহ দেখা দেয় মহেন্দ্রনাথের মনে। যখন তার জীবনের নিরাপত্তার প্রতি এদের চরম ঔদাসীন্য দেখা যায়, যখন নিজের স্ত্রী ঠিক ম্যানেজারের ভাষায় কথা বলে, তখন একথা কি করে না ভেবে পারা যায় যে তারাও শত্রুদলে? আসলে একথা এখন জলের মতো স্পষ্ট যে মহেন্দ্রনাথের জীবনাবসান ওদের কাছে কাম্য। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্য হাতে নেই, তবে মহেন্দ্রনাথ যেদিন আক্রান্ত হয়েছিল সেদিন পার্টিতে যাওয়ার সময় মমতা প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগ-সাজস আছে। মহেন্দ্রনাথ যদি অস্তমিত হয়, তবে মমতা এই বিপুল সম্পদের অধিকারিণী হবে; আর তার অঙ্কশায়ী হয়ে ম্যানেজার পরমানন্দে তা ভোগ করবে। সাধারণ যোগ-অঙ্কের ব্যাপার—দুয়ে আর দুয়ে মিলে চার হয়।

কিন্তু মহেন্দ্রনাথ তাই বলে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করবে না। যদি সবাই তার পাশ থেকে দূরে সরে যায়, সবাই অবাঞ্ছিত বলে তাকে ত্যাগ করে, তবু আপন নিঃসঙ্গ একাকীত্ব নিয়েই সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবে। এক সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার দুর্গ রচনা করে সে তার মধ্যে বাস করবে—একা। অনেক যত্নে রচিত এই জীবনকে সে অবহেলায় নষ্ট হতে দেবে না। জীবন গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্যের বিনিময়েরও নয়। কুবেরের ঐশ্বর্য এককণা জীবনও দান করতে পারে না। কাজেই যেখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন সেখানে মহেন্দ্রনাথ নির্মম, নিষ্ঠুর, বেপরোয়া।

কয়েকদিন পরে একদিন কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে কী নিয়ে একটু গোলমাল হয়েছিল। এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। দু'জন মজুরের মধ্যে ব্যক্তিগত রেশারেশির ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি। আর কিছু মজুর দুইপক্ষ নিয়ে ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ম্যানেজার কারখানার একটা সিফট্ বন্ধ করে দিয়েছিল। মোটের উপর ব্যাপারটা সামান্য হোক বা না হোক, মহেন্দ্রনাথ ব্যাপারটাকে সামান্য বলেই ধরে নিল। দু'তিন জন কর্মচারীকে দিয়ে সে ব্যাপারটাকে সামান্য বলে লিখিয়ে নিল। ম্যানেজারকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না। পাছে সে ঘটনাকে অসামান্য বলে প্রমাণ করার সুযোগ পায়। তারপর কলমের এক খোঁচায় চৌদ্দ বছরের পুরোন ম্যানেজারকে অযোগ্যতা এবং ডিসিপ্লিন রক্ষায় অক্ষমতার অভিযোগে বরখাস্ত করল। চিঠিখানা ছেড়ে দিয়ে আপিসে সে আর এক মুহূর্তও বসল না। যদি ম্যানেজার এদিকে এসে পড়ে! এ সময়ে ম্যানেজারের সঙ্গে চোখাচোখি হলে কি ভাল লাগবে?

তিনদিন পরে মমতার একখানা ক্রুদ্ধ পত্র পাওয়া গেল। ম্যানেজারকে বরখাস্ত করা নিয়ে সে মহেন্দ্রনাথকে উন্মাদ, অবিবেচক, অবিবেকী, নিষ্ঠুর প্রভৃতি নানাবিধ মধুর মধুর বিশেষণে ভূষিত করেছে। যাক্, এবার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। ম্যানেজারের চাকরি যাওয়ায় স্ত্রীর এত উষ্মা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরেই পাওয়া যাবে স্ত্রীর সঙ্গে ম্যানেজারের সম্পর্ক কী। আর কালবিলম্ব না করে মহেন্দ্রনাথ এটর্নির বাড়ি গেল। দেহের কোন অঙ্গ দূষিত হয়ে গেলে তাকে যত তাড়াতাড়ি অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। চিকিৎসা-শাস্ত্রের এই নীতি মহেন্দ্রনাথ মেনে চলবে। ঘুন-ধরা অঙ্গের প্রতি মিথ্যা মায়াবশতঃ সমস্ত দেহকে বিপন্ন করবে না।

যথাসময়ে সে কোর্টে স্ত্রীর সঙ্গে জুডিসিয়াল সেপারেশনের আবেদন উপস্থিত করল। আবেদন সহজেই মঞ্জুর হল। অভিমানক্ষুব্ধ স্ত্রী আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করল

না। অভিমান না লক্ষ্মী!

স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বাড়িটা হয়তো একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। হয়তো কখনো একটি পরিচিত সরু গলার শব্দ শোনার জন্য তার মন ব্যাকুল হবে। কিন্তু সে-সব অতি তুচ্ছ। ভাগ্য তার উপর হয়তো একেবারে বিরূপ নন। অথবা মানসিক দৃঢ়তার জোরে সে বিরূপ ভাগ্যকে অনুকূল করতে পেরেছে। তার নিরাপত্তার সবচেয়ে মারাত্মক দুটি কাঁটা যে এত সহজে নিষ্ক্রান্ত হল এ কি কম ভাগ্যের কথা! রাস্তার প্রতি মোড়ে, সময়ের প্রতি বিন্দুতে যে নলের মুখের ক্ষণদীপ্ত অগ্নিশিখাগুলি অপেক্ষা করছে সুযোগের প্রতীক্ষায়, তারা এখন অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে থাকবে। মহেন্দ্রনাথকে নাগালের মধ্যে পাওয়া এখন সহজ হবে না। এ কি কম স্বস্তির কথা! জীবনের চেয়ে বড় কেউ নয়। যেখানে বাঁচামরার প্রশ্ন সেখানে যে-কোন রকমের নির্মমতা সমর্থনযোগ্য।

তবু স্বস্তি কোথায়? সহজ সুস্থ স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর—যেমন সে এতকাল ছিল তেমনটি হতে পারছে কোথায় মহেন্দ্রনাথ! এত সাবধানতা সত্ত্বেও যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে, পথে নিরাপদ গাড়িতে চড়ে যাওয়ার সময়, অথবা চার দেওয়ালের সুনিবিড় সুদৃঢ় নিরাপত্তার মধ্যেও অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ভয় এসে আক্রমণ করে তার মনকে। প্রথমে চর্বি-পুষ্ট পেটের মধ্যে কেমন একটু মুচ্‌ড়িয়ে ওঠে। তারপরই সেই ঠাণ্ডা শীতল রোমাঞ্চক ভয়টা একটা শরীরী রূপ গ্রহণ করে। সেই শরীরী ভয় যেন পায়ে হেঁটে বুক অবধি এসে একটু দাঁড়ায় আর প্রচণ্ড বেদনায় বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা শুরু হয়। সেখান থেকে ভয়টা আরও এগিয়ে যায় মস্তিষ্কের দিকে, স্নায়ু কেন্দ্রের দিকে। মাথার কোন্ এক অজানা অদৃশ্য বিন্দুতে একটি নাম-না-জানা শিরা দপ্‌দপ্ করতে শুরু করে, আর একটি সকম্পন শিহরণ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

যদি তন্দ্রা এসে যায় তবে এই যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি থেকে সাময়িক অব্যাহতি পাওয়া যায়। তারপর হঠাৎ একটা কাল্পনিক শব্দে তন্দ্রাটা ভেঙে যায়, আর অর্ধ আচ্ছন্ন চেতনায় মনে হয় কনক্রীটের তৈরি নিশ্ছিদ্র দেওয়াল আর নিশ্ছিদ্র নেই, তার মধ্যে অসংখ্য জোড়ায় জোড়ায় ফুটো; আর সেই যুগল ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে অসংখ্য যুগল চক্ষু—স্থির অচঞ্চল নিষ্পলক অমানুষিক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই হিংস্র ক্রূর কুটিল চক্ষুদ্বয় তার পরিচিত—শ্যামবাজারের মোড়ে একদিন সে এক মুহূর্তের জন্য এর সাক্ষাৎ লাভ করে-ছিল, আর সেই এক মুহূর্তের দেখাকে হয়তো সারা জীবনেও তার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে না। সেই চক্ষুদ্বয় সহস্র যুগ্ম-চক্ষু হয়ে তাকে নিরন্তর অনুসরণ করে ফিরছে। সে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করে জনতার ভীড়ের মধ্যে, গাছের ডালের মধ্যে তারা ঘুপটি মেড়ে বসে থাকে, রাস্তার পাশের বাড়ির জানলায় বা ছাদে একটু আড়াল রচনা করে তারা অপেক্ষা করে।

না, ভাল করে চিন্তা করে দেখা দরকার। মহেন্দ্রনাথ যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে তা কী পর্যাপ্ত? বিপজ্জনক ব্যক্তিদের সে সরিয়ে দিয়েছে; কিন্তু বাড়িতে জীবনযাপনের প্রয়োজনে তাকে তো চাকরবাকরদের উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও সে তাদের উপর খবরদারী করার জন্য গোয়েন্দা-চাকর নিযুক্ত করেছে, যদিও সে নিজেও তাদের উপর কড়া নজর রাখছে, তবু চাকরদের কতটুকু বিশ্বাস করা যায়? চাকরদের বিশ্বস্ততা তো সহজেই কেনা যায়; এবং শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই কোনদিন সে চেষ্টা করবে। সে জানতেও পারবে না,

কিন্তু হয়তো একটি লোক চাকরদের হাত করে তার ঘরে খাটের নীচে চুপটি করে বসে থাকবে। সে যখন ঘরে পা দিয়ে মনে মনে ভাববে এখন সে সবচেয়ে নিরাপদ, ঠিক তখনই হয়তো তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদটা একখণ্ড সিসের বলের রূপ ধরে তার পেটে বা বুকে—হয়তো ঠিক হৃৎপিণ্ডটার উপর—মোক্ষম চূড়ান্ত আঘাত হানবে। এ বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল আরাম এবং বিলাসিতার কথা ভেবে; নিরাপত্তা বলে যে একটা সমস্যা আছে তা তখন কারও মনে আসেনি।

সুতরাং মহেন্দ্রনাথ তার এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর শরণাপন্ন হল। নিজে গেল তাঁর বাড়িতে।

মামুলি সম্ভাষণাদির পরে বলল,—ভাই আমার বাড়িটা একটু রি-মডেল করে দিতে হবে।

—বৌ বুঝি নতুন কিছু বায়না ধরেছে?

বন্ধুটি জানে না যে সে বৌয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল,—না, খেয়ালটা আমারই। আমি এমন একটা বাড়ি চাইছি যার মধ্যে আমি ইচ্ছে করে ধরা না দিলে কারও সাধ্য হবে না আমাকে খুঁজে বার করে।

—রহস্য উপন্যাসের মতো শোনাচ্ছে যে। ব্যাপার কি?—বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন।

—ধরে নে—বড়লোকের বদ খেয়াল। তার চেয়ে বেশী কিছু জানতে চাসনে।

পয়সার কোন অভাব ছিল না। সুতরাং বন্ধুটি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জাদুবিদ্যায় যতখানি সম্ভবপর ছিল তা সবই বাড়িটা পুনর্গঠনে প্রয়োগ করল। বাড়ির যা বিশেষত্ব দাঁড়াল তা হল এক বিসর্পিল করিডরের জটিল জট। সঙ্কীর্ণায়তন প্রকোষ্ঠগুলিকে বেষ্টন করে করিডরটি ক্রমাগত এঁকেবেঁকে গিয়েছে এবং শাখা-প্রশাখা-বিস্তার করেছে। বাইরের লোকের পক্ষে, এবং অনেক সময় ঘরের লোকের পক্ষেও, একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি খুঁজে বার করা বিষম দায় হয়ে উঠল। করিডর ক্রমাগত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে বলে যে-কোন সংযোগ-স্থলে ভুল পথে চলে যাওয়ার আশঙ্কা; একবার ভুল পথে গেলে আর সিঁড়ি অবধি পেঁছানো যাবে না। পেঁছেও আগন্তুককে অনুরূপ করিডরের জটের সম্মুখীন হতে হবে। এ করিডরটিও একই মূলনীতি অনুযায়ী রচিত, কিন্তু তার ছকটি সম্পূর্ণ আলাদা। করিডরটি অনেক ঘুরে ফিরে অবশেষে যে ঘরের দরজায় এসে শেষ হয়েছে সেটা ঠিক দোতলার মাঝখানটা। এই ঘরের চারপাশে আরও ঘর রয়েছে, সুতরাং বাইরের বাতাসের সঙ্গে এ ঘরের কয়েকটি দেওয়ালের ব্যবধান। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্টীল ফ্রেমের দরজাটি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে বলে এ ঘরে কোন জানলা রাখার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। তবে বাইরের বাতাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবস্থা আছে। দিনের বেলাও ঘরে ঢুকে আগন্তুককে অমাবস্যার নিঃসীম অন্ধকারের সম্মুখীন হতে হবে, যতক্ষণ না সে কৃত্রিম আলো জ্বালতে পারছে।

বাড়ি পুনর্গঠনে প্রায় ছ'মাস সময় লাগল। যেদিন মহেন্দ্রনাথ প্রথম তার নিভৃত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল, মনে হল দীর্ঘ জটিল বিসর্পিল সুরঙ্গ-পথ পার হয়ে সে এক নিরন্ধ্র ভূগর্ভ প্রকোষ্ঠে এলো। সূচিভেদ্য অন্ধকার, কিন্তু আলো জ্বালতেই পরিচ্ছন্ন ঘরটি হেসে উঠল, যেন পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠে তাকে সম্বর্ধনা জানাল

স্মিত হাস্যে। ঘরে আসবাবের বাহুল্য নেই। একটি ইজিচেয়ার, একটি ওআর্ডরোব্, একটি ড্রেসিং টেবিল আর শোবার জন্য আড়াই ফুট মোটা একটি গদি কাঠের ফ্রেমে বসানো। ফ্রেমটার নীচে মাত্র ছ' ইঞ্চি ফাঁক : কারো পক্ষে সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অনেকদিন পরে মহেন্দ্রনাথ যেন প্রকৃত স্বস্তি বোধ করল। আঃ! এইবার নিশ্চিন্তি! এইবার আশা করা যায় যে জীবনের বাকি দিন-গুলো তার নির্ভাবনায় কাটবে। সে আজ সত্যি সত্যি নিরাপদ। বাইরে থেকে কামান দাগলেও তা এত ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। এই ঘর থেকে একটি মাত্র বিশ্বস্ত ভৃত্যের মারফৎ তিনি বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। সুতরাং চাকরবাকরদের সঙ্গে যোগসাজস করে কেউ তার ঘর খুঁজে বার করবে এবং লুকিয়ে থাকবে এ সম্ভাবনা খুবই কম। তাছাড়া মৃত্যুভয় সবারই আছে। কর্তার ঘরে প্রবেশ করলে যে বেরুনোর রাস্তা পাওয়া যাবে না এ সে নিশ্চয়ই জানবে এবং সাবধান হবে।

কী আনন্দ! এতদিন পরে মহেন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। নিশ্চিন্ত আরামে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে বলে খাদ্যের স্বাদ পাবে। এমনকি এতদূর অবধি আশা করা যায় যে ভাবনাহীন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার প্রসাদ সে লাভ করবে। ভয়াবহ অজস্র যুগ্ম চক্ষু তাকে তাড়া করছে তন্দ্রার ঘোরে সে দৃশ্য আর দেখতে হবে না। অনেকদিন রোগভোগের পর আজ ঘাম দিয়ে যেন জ্বর সারল। অনেকদিন ধরে যেকালো ছায়াটা ভাগ্যের অমোঘ বিধানের মত নিরন্তর তাঁকে অনুসরণ করে ফিরছিল, আজ সেটা চরম হতাশার শিকার হয়ে যেন মরে গেল।

ক্লান্তিতে মন ভেঙ্গে আসছে। এক নিদারুণ অবসন্নতায় সমস্ত দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গুলি যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ছে। আজ মনের সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান ঘটেছে, তাই ক্লান্তি। আজ দীর্ঘদিনের প্রয়াসের সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাই অবসন্নতা। মনে হচ্ছে নিরাপত্তার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন আর বেঁচে না থাকলেও চলে। বাঁচার জন্য নিষ্ঠুর উন্মাদ নিরবকাশ সংগ্রামের আজ পূর্ণচ্ছেদ, তাই আজ মরে যাওয়া যায়।

মহেন্দ্রনাথ তার নতুন প্রকোষ্ঠের স্প্রিং-এর বিছানার উপর গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। বিছানাটা দু-তিন বার একটু দুলল। আর ঠিক তখন তার একমাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য কানাই কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভুর আদেশে সে ফুল আনতে গিয়েছিল। তার হাতে এক তোরা রজনীগন্ধা আর এক তোরা লাল গোলাপ।

—বাবু, ফুল এনেছি।

মহেন্দ্রনাথ চোখ খুলল না। বলল,—রেখে দাও।

প্রভুর দিকে মিনিটখানেক কানাই তাকিয়ে থাকল। তারপর কিছু জিজ্ঞাসা না করে, কোন অনুমতি না নিয়ে সে সাত তাড়াতাড়ি একটা ছোট গেলাসে খানিকটা খাঁটি ফরাসী দেশীয় পানীয় ঢেলে প্রভুর দিকে এগিয়ে ধরল।

—খেয়ে নিন তো বাবু।

মহেন্দ্রনাথ বিনা প্রতিবাদে সেই নির্জলা মদটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলল। আরও মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে শুয়ে রইলো। মদের উত্তেজক ধোঁয়া চুঁইয়ে চুঁইয়ে শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণুতে পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করুক। প্রতি রোমকূপে উষ্ণ শিহরণ জাগুক।

তারপর মহেন্দ্রনাথ উঠে বসে জিজ্ঞেস করল,—নিতাই, এই বাড়ি তোর পছন্দ?

—ঠিক যেন একটা গোলক ধাঁধাঁ।

—এখন আমি নিরাপদ, কী বলিস? কোন শালার সাধ্য নেই আমাকে স্পর্শ করে।

—এ ঘরে ঢোকা অবশ্য কারও পক্ষে সহজ হবে না।

—ব্যাটা উজবুক!—মহেন্দ্রনাথ রাগ করে বলল,—আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা। সোজাসুজি উত্তর দে।

কানাই এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল প্রভুর দিকে।

—বাবু, হাতের কাছে সব সময় একটা অস্তর রাখবেন।

—কেন? এ-কথা বলছিস কেন?

—যদি কেউ সামনাসামনি এসে পড়ে? শেষ মুহূর্তের সম্বল একটা রাখা দরকার।

মহেন্দ্রনাথের ইচ্ছে হল ব্যাটাকে সেই মুহূর্তে একটা জুতো ছুঁড়ে মারে। কত বড় স্পর্ধা! প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তাকে উপদেশ দিতে চায়। যেন এক পরম বিজ্ঞ ব্যক্তি! যে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তার মুখের উপর কথা বলছে কীটস্য কীট এক গৃহভৃত্য! অথচ আশ্চর্য এই যে প্রচণ্ডভাবে রেগে উঠতে গিয়েও মহেন্দ্রনাথ মনে না করে পারল না একমাত্র এই লোকটি তার প্রকৃত বন্ধু।

ভৃত্য ঠিকই বলেছে। মহেন্দ্রনাথ তবু নিরাপদ নয়। তার সব কিছু আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত—অর্থ, ভোগ, স্বাস্থ্য।—নেই শুধু জীবনের নিরাপত্তা। এত আয়োজন করার পরও সেই ভাবনা। একটা ঠাণ্ডা যুক্তিহীন ভয় গ্রাম্য কুসংস্কারের মত অশরীরী অস্তিত্বের আজগুবি কল্পনার মত তার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন নেমে গেল নীচের দিকে। ভয় দাপাদাপি করছে তার রক্তের মধ্যে; হাড়ের মধ্যে কুঁড়ে কুঁড়ে বাসা তৈরি করছে। সাময়িক নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায় মিলিয়ে গেল। ভয়—এক সর্বগ্রাসী ভয়ের সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে মহেন্দ্রনাথ।

মহেন্দ্রনাথের অবশ্য একটি রিভলভার আছে। কিন্তু রিভলভার থাকা না থাকা সমান। রিভলভার সব সময় লোকের চোখের সামনে প্রদর্শনী করে হাতে বা টেবিলের উপর রাখা যায় না। লোডেড্ রিভলভার পকেটে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। এমন কিছু একটা জিনিস দরকার যাকে আদৌ অস্ত্র বলে মনেই হবে না। যাকে লোকে একটা সাধারণ ব্যবহার্য জিনিস ছাড়া আর কিছু বলে ভাবতে পারবে না।

সমস্যার রকমটা যখন মাথার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন প্রতিকার বেরুতে নিশ্চয়ই দেরী হবে না। এটা বিজ্ঞানের যুগ। ভাবতে ভাবতে মহেন্দ্রনাথের মনে পড়ল ইছাপুর গান শেল ফ্যাক্টরীতে তার এক বন্ধু অফিসার আছে।

বন্ধুর কাছে অভিপ্রায়টা ব্যক্ত করতেই সে জিজ্ঞেস করল,—এ জিনিসের তোমার কী দরকার হে? তুমি কি গোয়েন্দাগিরির কাজ টাজ নিয়েছ নাকি?

—না—না। ইচ্ছে করলে গোয়েন্দা আমি পুষতে পারি। এটা আমি এমনি বানাচ্ছি শখ করে। ধরে নাও—বড় লোকের বদ খেয়াল।

বন্ধুটি তাই ধরে নিল। এক মাসের চেষ্টার পর সে যা বানিয়ে দিল তা সত্যিই অবাক হওয়ার মত। জিনিসটি ঠিক একটি মোটা সাইজের অটো পেন্সিল। শিস দিয়ে দিব্বি লেখা যায়; ক্লিপ এঁটে দিয়ে দিব্বি পকেটে রাখা যায়। অথচ দরকারের সময় ক্লিপটাতে একটু কায়দা মত চাপ দিলেই সেটা সরে যাবে, আর তার নীচে একটা ছোট্ট সুইচ বেরিয়ে আসবে। শিসটা পড়ে গিয়ে একটা নলের মুখ তৈরি হবে। সুইচটাতে আর একটা চাপ দিলেই ভিতরে একটা ছোট্ট বিস্ফোরণ হবে, আর নলের মুখ দিয়ে সূঁচের মত সরু

একটা জিনিস তীর বেগে বেরিয়ে এসে সামনে যে থাকবে তার গায়ে বিঁধবে। জিনিসটা একটা তীব্র বিষ। আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জ্ঞান হারাবে, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করবে।

আততায়ী যত তাড়াতাড়ি রিভলভার ছুঁড়বে, তার চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রনাথের যন্ত্র কাজ করবে। যাক, এবার তার প্রতিরক্ষার আয়োজন ষোল আনা পূর্ণ হল। মহেন্দ্রনাথ নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

আবার সেই অবসন্নতা। সেই অপারিসীম ক্লান্তি! সেই অদ্ভুত চিন্তা। বেঁচে থাকার সব আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন বেঁচে না থাকলেও চলে।

আর কিছু করার নেই। মানবিক কোন বুদ্ধি দিয়ে নিরাপত্তার এর চেয়ে সুদৃঢ়তর কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। আর কোন ভয় নেই; অথচ তবু ভয় চির জাগ্রত প্রহরীর মত বেঁচে রয়েছে মহেন্দ্রনাথের মনে।

গভীর রাত্রি। দুর্ভেদ্য দুষ্প্রবেশ্য ঘরের উষ্ণ নিরাপত্তার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ একা। একা বলেই আরও বেশী নিরাপদ। এ ঘরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আরামের সব ব্যবস্থাই রয়েছে। তবু রবার ফেনার গদির উপর রচিত উষ্ণ নিবিড় বিছানায় মহেন্দ্রনাথের ঘুম আসতে চায় না সহজে। শিয়রের দিকে একটা ছোট টেবিলে জলের কুঁজো, গেলাস, বোতলায়িত তরল অমল যার নাম মদ, ঘুমের ট্যাবলেট প্রভৃতির আয়োজন রয়েছে। ঘুমের সহায়তার জন্য যখন যেটার প্রয়োজন মহেন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারে। এই ঘরের নিরন্ধ্র লৌহ বেষ্টনী, ঘরে প্রবেশের ঐন্দ্রজালিক পথ, হাতের কাছের রহস্যময় জাদু পেন্সিল, নিদ্রার অশরীরী সত্তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে নি। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে নিদ্রা উধাও হয়েছে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে; আর মহেন্দ্রনাথের জাগরণক্লান্ত চোখ জ্বলছে—জ্বলছে অকারণ আতঙ্কে। পলাতক নিদ্রার দুর্গের ফাটল দিয়ে চকিতের মত কি ভেসে ওঠে কতকগুলো মুখ—তরুণ মুখ—মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং যাদের হত্যার আয়োজন করেছিল একদিন অসীম নিরাশক্তির সঙ্গে?

খাটের তলায় কিসের যেন একটা নড়াচড়ার শব্দ। তার খাট মানে একটা কাঠের ফ্রেমের উপর আড়াই ফুট মোটা গদি। খাটের নীচের ছ' ইঞ্চি ফাঁকের মধ্যে কি মানুষ ঢুকল? সে যেমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে এই আবাস তৈরি করিয়েছে, তেমনি কোন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে?

নিশ্বাস-রুদ্ধ করে, কান পেতে রইল মহেন্দ্রনাথ। কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। তারপর আবার খট করে একটু আওয়াজ। কারও যেন মাথা ঠুকে গেল খাটের কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে। খুবই মৃদু আওয়াজ—প্রায় শোনা যায় না যেন, শুধু অনুভব করা যায়। কিন্তু সেটুকু শব্দই বা হবে কেন? এ ঘর থেকে একমাত্র মহেন্দ্রনাথের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর সব শব্দ নির্বাসিত। ইলেকট্রিক পাখার আওয়াজ নেই, বাইরের বাতাসের প্রবেশের সুযোগ নেই, এমন-কি টিকটিকি প্রভৃতিরও কোন স্থান নেই। তবু শব্দ?

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সেই রহস্যজনক অশরীরী শব্দটা যেন হঠাৎ একটা লম্বা দৌড় দিয়ে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেল। সর্-সর্-সর্-সর্ শব্দ করে একটা অসম্ভব অস্তিত্ব যেন কিসের গায়ে ঘষতে ঘষতে নড়েচড়ে বেড়ালো খানিকটা। শব্দটা যেন বাতাসের কম্পন নয়; মহেন্দ্রনাথের সরু দুর্বল শিরার মধ্যে প্রচন্ড রক্তের দাপাদাপি।

দাপাদাপিটা যেন শিরদাঁড়ার শেষ সীমা থেকে ছুটে গেল মস্তিষ্কের দিকে।

আবার চুপচাপ। নিশ্বাস রুদ্ধ করে মহেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করছে। শুধু শোনা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের অনবকাশ ধুক্‌ধুক্‌ শব্দ। তারপর আবার থপ্‌। কী যেন লাফিয়ে উঠল টেবিলের উপর—খুব নরম এক জোড়া পা টেবিলের উপর পড়ল অত্যন্ত আলগোছে। আততায়ী কি ক্ষুদ্র শিশুর বেশ ধরে অনুপ্রবেশ করেছে এই সুদৃঢ় দুর্গের শ্বাসরুদ্ধ গভীরতায়?

তারপর এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। সেই অসম্ভব অস্তিত্বের কোন অসতর্ক অঙ্গসঞ্চালনেই হয়তো জল-ভর্তি কাচের কুঁজোটা কাত হয়ে পড়ল। এবং ভক্‌ ভক্‌ করে জল উদ্গীরণ করতে করতে সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝের উপর পড়ল। পিশাচের অট্টহাসির মত একটা বীভৎস শব্দ করে ভঙ্গুর কাচ শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বিস্ফোরণ ঘটল মহেন্দ্রনাথের হৃৎপিণ্ডে। সক্রিয় হয়ে উঠল দেহের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী আত্মরক্ষার শেষ চূড়ান্ত তাগিদে। ধরমর করে উঠে বসল মহেন্দ্রনাথ। বালিসের পাশ থেকে পেন্সিল-দানবকে তুলে নিল। আঙ্গুলের একটি চাপে স্থানান্তরিত করল ক্লিপটিকে। এখন সেই মারাত্মক সুইচটির উপর তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ। একটুখানি চাপের অপেক্ষা। মুহূর্তে করাল শরীরী মৃত্যু অনিবার্য বেগে ছুটে যাবে আততায়ীর বুক লক্ষ্য করে।

অন্য হাত, অর্থাৎ বাঁ হাতটা দিয়ে সে বেড্‌সুইচ্‌ টিপল। নিওন লাইটের শুভ্র আলোয় হেসে উঠল ঘরের উজ্বল নীলাভ দেওয়াল। মহেন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখল টেবিলের উপর বসে রয়েছে একটা নাদুস নুদুস সুদৃশ্য চেহারার বেড়াল। চক্‌চকে সাদা গায়ে কালো কালো ডোরা। মাত্র একটা বেড়াল? মহেন্দ্রনাথের মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলো একটু মোলায়েম হল। মাথায় যে প্রচণ্ড রক্তের প্রবাহ ছুটে গিয়েছিল, তা কল্‌ কল্‌ শব্দে নেমে আসতে লাগল শিরা ও ধমনীর শাখা-প্রশাখা দিয়ে।

বেড়ালটা ওর চেহারা দেখে বোধ করি ভয় পেয়েছে। শিকারী গোফপুঞ্জকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে ডাকল: মিউ। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের চেহারার মধ্যে তবু বোধ করি খুব আশ্বাস খুঁজে পেল না। পালিয়ে যাওয়ার জন্য হঠাৎ আচমকা লাফ দিল বেড়ালটা। খাটের উপর দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটাকেই সে সহজতর পন্থা বলে মনে করল কেন কে জানে? মহেন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ একটু হিসাবের ভুলে বেড়ালটা এসে পড়ল মহেন্দ্রনাথের ডান হাতের উপর। হাতটা একটু ঘুরে গেল। বুড়ো আঙ্গুলের তলাকার সুইচটার উপর একটু চাপ পড়ল। একটু ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দ; আর অর্গলবদ্ধ করাল শরীরী মৃত্যু পথ খুঁজে পেয়ে বেরিয়ে পড়ল গুহামুখ থেকে।

সারা দেহব্যাপী সে অনুভব করলো—হাজার ভোল্টের বিদ্যুতশক্তির তাণ্ডব। বর্ণনাতীত কল্পনাতীত এক সচল সজীব যন্ত্রণা। চৈতন্য হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্তে মহেন্দ্রনাথের মনে পড়ল—হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন ঈজিপ্সীয় রাজন্যগণ জীবিত-কালেই নিজেরা নিজেদের কবর রচনা করতেন—যার নাম পিরামিড—সেই কবরের মধ্যে চিরকাল মমি হয়ে অবস্থান করবেন বলে।

আধুনিক সাহিত্য

সংগীত যেমন চতুঃষষ্টি কলার অন্যতম তেমনি অপর দিকে তা সাহিত্যের বিশেষ একটি শাখারও অবলম্বন। পাশ্চাত্ত্যে এমনকি প্রাচীন ভারতে পর্যন্ত সংগীতকে অবলম্বন করে সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় সাহিত্যের যে বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছিল তা যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বহুবিস্তৃত। তুলনায় বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে এই বিভাগটিকে অবহেলিত দেখা যায়।

পাশ্চাত্ত্য সংগীতকে অবলম্বন করে যে সংগীতসাহিত্য গড়ে উঠেছে তা যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি অনুসন্ধিৎসু। প্রকৃতপক্ষে এতাবৎ এ দেশে সংগীত-সাহিত্য বলতে আমরা বুঝে এসেছি শ্রুতি, স্বর, রাগ ইত্যাদির ব্যাকরণিক সমাচার। সংগীতের পরিভাষা, সংগীতজ্ঞদের জীবনতথ্য, সংগীত-সমালোচনা এবং নান্দনিক বিচারও যে সংগীতসাহিত্যের এলাকাভুক্ত, এই চেতনা আমাদের দেশে অতিসাম্প্রতিক।

পাশ্চাত্ত্যসংগীত বহু শতাব্দী ধরে শুধু মাত্র শিক্ষণীয় বা ক্রিয়াসিদ্ধ বস্তু নয়—তা পাঠ্যবস্তুও বটে। অপর পক্ষে ভারতীয় স্বরলিপি পদ্ধতির বয়ঃক্রম কিঞ্চিন্যূন শতাব্দী কালের হলেও ভারতীয় সংগীত অদ্যাবধি বহুলাংশে পাঠ্যবস্তু নয়। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ইতিবৃত্ত, সংগীতজ্ঞজীবনী, রচনা এবং ব্যবহৃত পরিভাষা দ্ব্যর্থহীন এবং পুস্তকলভ্য। জিজ্ঞাসু পাঠক অল্পমূল্যে একটি অভিধান সংগ্রহ করতে পারলেই সংগীত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় সংগীতে সে সুযোগ নেই। অবশ্য হিন্দী ভাষায় দু'একটি সংগীতাভিধান যে নেই এমন নয় কিন্তু বাঙালী পাঠক অদ্যাবধি সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এর উপরে আছে পরিভাষা সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। এক বাদী সংবাদী সম্বন্ধেই মতৈক্যের কত অভাব। তথাকথিত সংগীতজ্ঞগণ এতকাল আমাদের বুঝিয়ে এসেছেন যে, রাগে যে স্বরের প্রয়োগবাহুল্য তা-ই বাদী এবং তার পরের স্থানাধিকারী-ই সংবাদী। কিন্তু বহুতর ধ্রুবপদ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বাদী স্বর সর্বাধিক ব্যবহৃত নাও হতে পারে*। অতঃ কিম? বলা হয়েছে, বাদিত্বাৎ বাদী। কিন্তু কোন্ প্রসংগে কার বাদিত্ব, সে সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা খুব স্পষ্ট নয়। বরং বলা চলে, ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমাদের শাস্ত্রকারদের তেমন শিরঃপীড়া নেই। সংগীতশাস্ত্র একটি বিজ্ঞান। কোনো বিজ্ঞান যখন অনুসন্ধান এবং প্রশ্নের পথ পরিহার করে আপ্ত বাক্যের অনুসারী হয়, বিজ্ঞান হিসাবে তা তখন পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য। আমাদের সংগীতবিজ্ঞান সেই মধ্য-যুগীয় দুর্দশা থেকে আজো সম্পূর্ণ উদ্ধার পায়নি।

বস্তুত গতানুগতিক চিন্তাভ্যাস যদি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গী হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধানের ক্ষেত্রে কতবড় নৈরাজ্যের সৃষ্টি হতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতীয় সংগীত-বিজ্ঞানের 'নাদ' শব্দ। সংগীত সম্বন্ধে আমাদের যে কোনো লেখক তাঁর গ্রন্থের সূচনা করেন এই 'নাদ' শব্দ দিয়ে। কিন্তু শব্দটির কোনো বৈজ্ঞানিক অথবা সাংগীতিক ব্যাখ্যার

* *Ragas and Raginis*—Amiyanath Sanyal.

পথে না গিয়ে 'নাদব্রহ্ম' ইত্যাদি আধা-দার্শনিক আধা-ধর্মীয় কথাবার্তা বলেই তাঁরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করেন। ফলতঃ নাদের সংজ্ঞা এবং সংগীতে তার উপযোগিতার প্রশ্ন চিরকাল অব্যাখ্যাতই থেকে যায়। ধর্ম এবং তথাকথিত দার্শনিকতার ধূম্রজাল থেকে সংগীতবিজ্ঞানকে রক্ষা করা খুব দুরূহ ব্যাপার।

এর জন্য চাই মোহমুক্ত সপ্রশ্ন মানসিকতা। "ভারতীয় সঙ্গীতকোষ" গ্রন্থে এই দুর্লভ গুণের পরিচয় পেয়ে একটু চমকিত হয়েছি। উস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য হিসাবে লেখকের শ্রুতি এবং কৃতি অবগত ছিলাম। আলোচ্যমান কোষ গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর পরিপ্রশ্ন এবং বিশ্লেষণমুখিতার প্রমাণ রেখেছেন। প্রায়োগিক সংগীতের চর্চাকারী বলে পারিভাষিক শব্দ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা কপোলকল্পনা পরিহার করে তথ্য-ভূয়িষ্ঠ হতে পেরেছে। যেমন হলক তান কথাটিকে ধরা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে পত্রিকান্তরে এক সাংগীতিক বিতর্কে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জনৈক অনুরাগী লিখেছিলেন যে, হলক তানের সঙ্গে আগুনের হলকার একটি সাদৃশ্য থাকার জন্যই নাকি এ তানটির ঐ প্রকার নামকরণ। ইত্যাকার বিবরণ পাঠ করে মাদৃশ সংগীতানুরাগীর গায়ে ছ্যাঁকা লাগার মত হয়েছিল। কেউ বোধ হয় জানায়নি যে, ফার্শি হল্‌ক্‌ কথাটার মানে হল কণ্ঠ। ইংরেজীতে যাকে বলে gutteral sound ফার্শীতে তাকেই হলক তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় রাগসংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ অঙ্গগুলির পারিভাষিক অভিধা সম্বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী অজ্ঞতা এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার মূল।

এমনি আর একটি হাস্যকর ব্যাখ্যার কথা কয়েক বছর আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। খ্যাল গানে ব্যবহৃত সারগম সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকায় লিখিত হয়েছিল যে 'অশিক্ষিত' উস্তাদগণ ঘরে বসে যে কণ্ঠসাধনা বা রিবাজ করেন তার অপপ্রয়োগই নাকি সারগম এবং গানে সারগমের ব্যবহার করলে তার দ্বারা খ্যাল গানের নাকি অপকর্ষ সাধিত হয়। এইসব 'গবেষণার' প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হয় না।

এইরূপ আর একটি বিভ্রান্তিকর শব্দ 'মিশ্ররাগ'। সেই পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে, আশাবরী তোড়ি একটি মিশ্ররাগ যার মধ্যে আছে আশাবরী এবং তোড়ি রাগদ্বয়ের মিশ্রণ। বিদগ্ধ সমালোচক জানিয়েছিলেন যে, মিশ্ররাগে মিশ্রিত রাগদ্বয়ের রূপ স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শন না করলে নাকি প্রকৃত মিশ্ররাগ গাওয়া হয় না। অতএব আশাবরী তোড়িতে আশাবরী এবং তোড়ি রাগ দুটির রাগরূপ আলাদা আলাদা ভাবে দেখাতে হবে।

রাগসংগীতে, বিশেষতঃ খ্যাল জাতীয় গানে, কাব্যাংশের গুরুত্ব বিগত শতবর্ষ যাবৎ কেতাবী সংগীতজ্ঞসমাজের দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে আসছে। উত্তর ভারতীয় উস্তাদগণ যে ভজনজাতীয় অথবা পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য-প্রভাবিত কাব্যাংশকে স্বরের বিস্তার এবং বিবিধ গমক উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন না—এর হেতু নাকি এই যে, এইসব উস্তাদেরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন নি; ইংরেজী মতে শিক্ষিত হলেই নাকি তাঁরা খ্যাল গানে কাব্যাংশের মহত্ত্ব বুঝতে পারতেন*। বিশুদ্ধ সংগীত এবং কাব্যসংগীতের পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবই যে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের হেতু, সে বিষয় বলার অপেক্ষা রাখে না। সংগীতের পরিপূর্ণ শ্রবণ এবং রসগ্রহণের জন্য কেবল গান-বাজনা শোনাই যথেষ্ট নয়—সংগীতের প্রায়োগিক অঙ্গ এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান শুধু যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের কারণেই প্রয়োজন তা নয়—সংগীতের সম্পূর্ণ উপভোগ এবং রসগ্রহণের জন্যও এর

* ভাতখণ্ডেজীর ক্রমিক পুস্তক মালিকার ভূমিকা।

প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে সাহিত্যের প্রয়োজন, আমাদের দেশে তার একান্ত অভাব। আগেই বলেছি—পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ইতিবৃত্ত, পরিভাষা, আঙ্গিক সমাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুজন একটি সুলভ মূল্যের অভিধানের সাহায্যে স্বল্প সময়ে যে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন বাঙালী বা ভারতীয় পাঠকের সে সুযোগ নেই। প্রতিবন্ধক প্রথমতঃ যোগ্য পুস্তকের অভাব, দ্বিতীয়তঃ তথ্যনিষ্ঠ সাংগীতিক আলোচনার অপ্রতুলতা। শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায় চৌধুরীর "ভারতীয় সঙ্গীতকোষ" বাঙালী পাঠক বিশেষতঃ সংগীতজিজ্ঞাসুর এই দীর্ঘকালীন অভাব মোচনে সহায়তা করবে। এই অভিধান স্বয়ংসম্পূর্ণ এমন দাবি লেখক নিজেও করেননি, আমরাও তা বলি না। কেননা, ভারতীয় সংগীত বলতে তিনি উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতের পরিচয় প্রদানের দিকেই অধিকতর দৃষ্টিমান। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের সাধারণ পরিচিতি থাকলে পুস্তকটি ভারতীয় সংগীতের পূর্ণতর কোষগ্রন্থ হ'ত বলে আমার ধারণা। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানী এবং কর্ণাটকী উভয় প্রকার সংগীতেই যখন ভারতীয় সংগীতের নির্মিতি তখন তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য যথা রাগম্, তানম্, পল্লবী; পল্লবী, অনুপল্লবী, চরণম্ ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এর পরের সংস্করণে থাকলে সাধারণ জিজ্ঞাসু জনের সুবিধা হবে।

গ্রন্থকার প্রায়োগিক যন্ত্রশিল্পের স্বনামপরিচিত বিশারদ। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শব্দ-নিচয়ের ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা ও আলোচনায় স্বভাবতই স্বকপোলকল্পিত ধারণার পরিবর্তে প্রায়োগিক তাৎপর্য প্রাধান্যলাভ করেছে। তবে দু'একটি শব্দ সম্পর্কে বর্তমান লেখকের কিছু জিজ্ঞাসা আছে। যেমন গৎ কথাটিকে তিনি গতি শব্দনিষ্পন্ন ধরে নিয়েছেন (সম্প্রতি কলকাতা বেতারের এক আলোচনায় শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষও অনুরূপ উক্তি করেছেন)। আমাদের বিবেচনায় শব্দটি গম ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত গত শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হওয়া অধিতকর যুক্তিসংগত বোধ হয়। কীর্তন গানকে তিনি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। কীর্তন গান যে বাংলা দেশেও মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য তার প্রমাণ। বস্তুতঃ দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটকী সংগীতে এবং গুজরাতী লোকসংগীতে কৃতিগানের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা কীর্তন নামে অভিহিত। সংস্কৃত বাস্তুবিজ্ঞান-সম্পর্কিত সমরাঙ্গনসূত্রসার গ্রন্থের শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ-কৃত আলোচনায় দেখা যায় আরাধ্যদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত শিল্পকৃতি মাত্রেই 'কৃতি' অর্থাৎ কীর্তন নামে অভিহিত হত*। সেই হিসাবে দেবতার রূপ অথবা গুণগাথা যথা ধ্রুপদ, ধামার, খ্যাল ইত্যাদিকে সাধারণ ভাবে কৃতি অথবা কীর্তন গানের অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে।

ক্লাসিক সঙ্গীতের যে সংজ্ঞা গ্রন্থকার দিয়েছেন তার সঙ্গে অনেকেই একমত না হতে পারেন। এক শতাব্দী যাবৎ যে গান চলে আসছে তাই যদি ক্লাসিক সঙ্গীত হয় তাহলে রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীত, দাশু রায় ইত্যাদি কবির পাঁচালী, গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের গান, কবীর, মীরাবাঈ ইত্যাদির ভজন ও দোঁহা, ময়মনসিংহ গীতিকা-র গান অথবা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার লোকসংগীতও ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত হওয়ার সংগত দাবিদার। বস্তুত ক্লাসিসিজম সময়ের উপরে নির্ভরশীল হলে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব অথবা ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেবের রচনা এই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না কেননা, তাঁদের বয়ঃক্রম শতাব্দী

* *Hindu Temple*—Stella Kramrisch.

অতিক্রম এখনো করেনি। বোধহয় ক্লাসিক লক্ষণ সংগীতের অন্তর্গত। সংগীতের ব্যাপারে স্বরনিচয়ের হার্মনিক সম্পর্ক যথা sonance, dissonance, consonance অর্থাৎ অনুবাদী, সংবাদী বিবাদী এবং পরিবাদী সম্পর্কের নিয়ম, নীতি ও রীতির উপরে নির্ভরশীল যে সমস্ত সাংগীতিক রচনা আলাপ, বিস্তার, তান ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে সংহত আবেগের দ্যোতনাপূর্বক ভাবাবেগের চেয়ে রূপনির্মাণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টিশীল তাহাই ক্লাসিকাল সংগীত। সেই হিসাবে খ্যাল গান ক্লাসিক কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত রোমান্টিক কেননা, রবীন্দ্রসংগীত স্বরের পারস্পরিক সম্পর্ক উদ্ঘাটনের প্রয়োজন তো স্বীকার করেই না, বরং সেই প্রয়োজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাগের রূপের চেয়ে কাব্যিক ভাবাবেগকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। এইটি যারা অনুধাবন করতে পারেন না তারাই শেষোক্ত গানে তান-বাঁটের প্রয়োগ করেন নতুবা তার স্থিরীকৃত সুরের বিকৃতি সাধন করে নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে সংগীতে রোমান্টিক আন্দোলনের লক্ষণ, সংজ্ঞা ও পরিচয় এই পুস্তকে থাকলে ভাল হত। লোকসংগীতের লক্ষণ. সংজ্ঞা এবং আলোচনাও গ্রন্থে বাদ পড়েছে। এটিও অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

রাগ শব্দের সংজ্ঞায় শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সাধারণ লেখকগণ রঞ্জয়তি যঃ স রাগঃ এই যে ব্যাখ্যা দেন, তা ধুন্, সিনেমা সংগীত অথবা বাণিজ্যসফল আধুনিক সুরের বেলায় কেন প্রযোজ্য হবে না তা বোঝা দুষ্কর। শ্রোতার রঞ্জকতাসাধন যে কোনো নাট্যগীতি বা লোকসংগীত অথবা রবীন্দ্রসংগীতের মত কাব্য-সংগীতের দ্বারা সম্ভব হলেও তা রাগবাচ্য নয়। কেননা, রাগত্বের কয়েকটি বস্তুগত শর্ত আছে। সে হিসাবে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর সংজ্ঞা সমর্থনযোগ্য। ঠাট এবং রাগের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যও আমার কাছে যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। তবে এই বক্তব্যগুলিকে সংজ্ঞার আকারে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয়।

গ্রন্থশেষে বিভিন্ন ঘরানার গায়ক পরিবার এবং শিষ্যবর্গের যে বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে তা এই পুস্তকের অমূল্য সম্পদ। লেখকের অধ্যাবসায়ের এটি প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রসঙ্গক্রমে—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে বারাণসীর মৌলবীরাম মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মিশ্রজীর শিষ্যবর্গের মধ্যে তাঁর নাম বাদ পড়েছে। এই উস্তাদের অপর শিষ্য শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায় বহুকাল যাবৎ রায় উপাধি ব্যবহার করে আসছেন। তাঁকে অন্যভাবে উল্লেখ করলে চেনবার অসুবিধা হয়। অপর বক্তব্য এই যে আত্মীয়তার উপরোধ থেকে মুক্ত থাকা যে কোনো ইতিহাসকারের প্রথম কর্তব্য।

তবু এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী যতটুকু তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। আশা করি গ্রন্থকার এবং প্রকাশক পুস্তকটির একটি সুলভ সংস্করণের কথা ভেবে দেখবেন।

বাংলা দেশের সাংগীতিক ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের দ্বারা এই স্বাতন্ত্র্যের কথা আরো জোরদার হয়েছে। প্রায়-ই এবংবিধ ধারণা প্রচার করা হয় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় দরবারী সংগীতের ধারা থেকে বাংলা দেশের সংগীত চিরকাল স্বতন্ত্র পথে বিচরণ করে এসেছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে উল্লিখিত রাগনামগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করলে অষ্টম-নবম

শতকীয় বাংলা গানে তৎকালীন রাগসংগীত অর্থাৎ প্রবন্ধগীতির প্রাদুর্ভাব অনস্বীকার্য। "প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীতে"র গ্রন্থকারের ধারণা যেহেতু দেবগিরিনিবাসী শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে ১৩শ শতকেই চর্যাগীতি প্রকীর্ণ প্রবন্ধ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে সেইহেতু এই চর্যাগীতি প্রাচীন বাংলাগানের অকৃত্রিম নিদর্শন কিনা তা সন্দেহজনক। চর্যাকার বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ কেবলমাত্র বাংলাদেশেই অবস্থান করতেন এমন দাবি কেউ করবেন না। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনতন্ত্রের কেন্দ্র ভারতের বহুস্থানে এমন কি নেপালে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মধ্যযুগের সংগীত প্রচারে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণ শুধু ভারতেই হয়নি, ইউরোপেও হয়েছে। ইউরোপীয় সংগীতের প্রচারে এবং বিকাশে খৃষ্টান যাজকগণের ভূমিকা ইতিহাসস্বীকৃত। ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং সংগীতের প্রচার ও বিকাশে ধর্মযাজকগণের প্রাধান্য এই কারণে স্বাভাবিক যে, সংস্কৃতির প্রচার ও বিকাশের জন্য যে অবকাশ ও যোগাযোগ আবশ্যক তা তৎকালে ধর্মপ্রচারকগণের যতটা ছিল অন্য কোনো শ্রেণীর তত ছিল না। অবহট্ট ভাষায় বা অপভ্রংশ প্রাচীন বাংলায় চর্যাগীতি রচনা আমাদের কাছে তেমন বিস্ময়কর ঠেকে না। বাংলার মধ্যযুগীয় বৌদ্ধবিহারগুলিতে অবস্থানরত সাহজিয়া সিদ্ধাইগণ শুধু যে তন্ত্রমন্ত্রের এবং ডালরুটির ধ্বংসসাধন করতেন এমন মনে করবার হেতু নেই।

কীর্তনের পূর্বতর পর্যায় হিসাবে চর্যাগীতির ভূমিকা শ্রীযুক্ত মিত্র কর্তৃক দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। তাঁর (এবং সংগীতরত্নাকরের) মতে এই গীতি প্রকীর্ণ প্রবন্ধ জাতীয়। কিন্তু কীর্তনও যদি এক প্রকার প্রবন্ধের পরবর্তী বিকাশ হয়ে থাকে তাহলে অসুবিধা কোথায়? বস্তুত চর্যাগীতির ধ্রুবাংশ (সংক্ষেপে 'ধ্রু' অথবা 'ধ্রু') যেভাবে কয়েক পদ পরে পরে সরে যায় তাতে তার সংগে কীর্তনের সাদৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য একই গান দুই রীতিতে আগেও গাওয়া হত যেমন বর্তমানে হয়। জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' যেমন প্রবন্ধ রীতিতে এককালে গাওয়া হয়েছে তেমনি আজকাল কীর্তন পদ্ধতিতেই গাওয়া হয়, প্রবন্ধ রীতিতে গাওয়া হয় না।

কীর্তনকে শাস্ত্রোক্ত সংগীত হিসাবে লেখক স্বীকার করেননি। কিন্তু কৃতি নামে যে প্রবন্ধ গানের উল্লেখ প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায় তার পরবর্তী বিকাশ হিসাবে কীর্তন উদ্ভূত হয়েছে এমন অনুমান অসংগত হবে কি? কীর্তন শুধু বৃন্দাবন বা বাংলা দেশের একচেটিয়া নয়—কর্ণাটকী সংগীত থেকে গুজরাতী সংগীত পর্যন্ত কীর্তন বা কৃতি গানের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান। তবে একথা ঠিক যে, বাংলা দেশের কৃতিপ্রবন্ধ রীতিকে ভেঙে যে বিস্তারিত শৃঙখলা এবং রীতিনীতিকে বিকশিত করে তুলেছে তা অন্য প্রদেশের কীর্তন অর্থাৎ ইষ্টদেবতার স্তুতিগানে পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ ইষ্টদেবতার নামে উৎসর্গিত মন্দির যথা কোণার্ক অথবা বৈরাটী (ভারহুত) কৃতি নামে অভিধেয়।

বাংলা গানে এর পরবর্তী সংগীত আন্দোলন কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ। এটিকে শুধুমাত্র একটি গীতিকাব্য বললে ভুল হবে—বাংলা দেশের সংগীতজগতে এটি একটি মহা-প্লাবন এনেছিল বিশেষ করে মহাপ্রভুর আমলে। গ্রন্থে উক্ত রাগ ও তাল থেকে এই ধারণা স্বাভাবিক যে, আদিত : 'এই পদগুলি প্রবন্ধ পদ্ধতিতে গাওয়া হত। আবৃত্তি এবং গীত তো বটেই, এই গানে প্রচুর তাল ও লয় ফেরতার ব্যবহার হত যার ফলে এই দীর্ঘ পদগুলি একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পেত। দ্বিতীয়তঃ, বৈচিত্র্য সাধনের জন্য ধ্রুপদের মত আলাপ এবং মৃদঙ্গের বোল গায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। প্রাচীন কীর্তনের আলাপ-বিস্তার এবং

আধুনিক খ্যাল গানের বিস্তারের সাদৃশ্য মূলগত এবং রহস্যজনক মনে হয়। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে ধর্ম অথবা দর্শনবহির্ভূত শিল্পরচনা বোধ হয় এই প্রথম এবং ভারতীয় সংগীতে এই কাহিনীর মাইথোপীয়িক প্রভাব কতদূর প্রসারী তার প্রমাণ ধ্রুপদ, ধামার, হোরী, খ্যাল, দাদরা, ঠুমরী ইত্যাদি ধ্রুপদী এবং আধা-ধ্রুপদী গীতরীতিগুলি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ শুধু বাংলা দেশেই নয়—সারা ভারতের ভাবনচিন্তনকে প্রভাবিত করেছে। মেবারের রাণা কুম্ভ এই গ্রন্থের যে সটীক সম্পাদনা করেন তার সংগে বাংলা সংস্করণগুলির রাগতালের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে শোনা যায়।* মোগল ও তৎপরবর্তী মুসলমান সংগীত রচয়িতৃগণ এই রাধাকৃষ্ণ উপকথার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যা রচনা করেছেন তা-ই আমাদের বর্তমান রাগসংগীত এবং আধা-রাগসংগীত।

চর্যাগীতি, গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উল্লিখিত রাগতাল দৃষ্টে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, মুসলমান আমলের প্রথম যুগ পর্যন্ত ভারতীয় রাগসংগীতে উত্তর ভারত এবং কর্ণাটকী পদ্ধতির কোনো প্রভেদ ছিল না এবং বাংলা দেশও এই ঐক্যবদ্ধ সংগীতচিন্তা ও প্রয়াসের অংশীদার ছিল। সেন রাজাদের আমলে বহিরাগত কনৌজী অথবা কর্ণাটকী-মহারাষ্ট্রী অধিবাসীদের দ্বারা জয়দেবের তথা রাঢ় দেশের সংগীতচেতনা প্রভাবিত হয়েছিল —একথা যদি মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও ৮-১০ম শতকের চর্যাগীতির রাগ-রাগিণী উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের সংগে একজাতীয় হল কি করে সেই রহস্য অমীমাংসিতই থেকে যায়। অতএব এ সিদ্ধান্ত অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয় যে, বাংলা দেশের সংগীত বৃহত্তর ভারতীয় সংগীত থেকে সেকালে বিচ্ছিন্ন হয়নি তার অন্যতম কারণ বৌদ্ধ সহজিয়াতন্ত্র যা সংগীতের ক্ষেত্রে বাংলা দেশকে বৃহত্তর ভারতের সংগীতের সংগে যুক্ত করে রেখেছিল। রাষ্ট্রীয় বিরোধ সত্ত্বেও যে ঐক্যবোধ প্রাচীন ভারতে সৃষ্টি হয়েছিল, হয়তো হিন্দু ধর্মই ছিল তার প্রধান ঐক্যবিধায়ক। এই ঐক্যের সূত্রপাত মৌর্য এবং গুপ্ত আমলেই হয়ে গিয়েছিল যে কারণে শত বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও ধর্ম, সংগীত এবং সংস্কৃতির কোনো কোনো বিচারে ভারতের বিভিন্নতার মধ্যে একটা অন্তর্লীন ঐক্যসূত্র পরিদৃশ্যমান।

সংগীতের ক্ষেত্রে বাংলা দেশ বৃহত্তর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ইলিয়াসশাহী তথা মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে যখন দিল্লীর রাজশক্তির সংগে বাংলার যোগের মধ্যে প্রাণের সমর্থন অন্তর্ধান করেছিল। আকবর যে রাজনৈতিক একীকরণ আরম্ভ করেছিলেন তা তাঁর পরবর্তিগণের দূরদৃষ্টির অভাবে সফল হয়নি। সংস্কৃতির দিক থেকে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির সংগে ইংরেজ আমলের আগে বাংলাদেশ আর অপর ভারতের সংগে একাত্মতা বোধ করেনি। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ভারতের সর্ববিধ আন্দোলনের নেতা বাংলাদেশ। মোগল আমলের ধ্রুপদ, খ্যাল ইত্যাদির সংগে বাংলাদেশ নতুন করে পরিচিত হল কোম্পানীর আমলে। অবশ্য শাহ্ সুজার অথবা আজিমুশ্ শানের আমলে ঢাকায় দরবারী গায়ক-বাদকের আগমন ঘটেছিল কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংগীতকে তারা তেমন প্রভাবিত করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এই সময়ে কীর্তন নতুন ভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে চার ভাগে বিভক্ত হয়, যথা মনোহরশাহী, গরাণহাটী, রেণেটী এবং মন্দারিণী। বাংলা দেশের চিত্তভূমিতে কীর্তনের কলোচ্ছ্বাস নতুন বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। এর পাশাপাশি চলতে থাকে প্রবন্ধের পুরাতন ধারা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দিয়ে।

সুলতানী আমলের শেষে এবং ইংরেজ আমলের সূচনায় যে দুজন বাঙালী সংগীতজ্ঞ

* শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

এবং গীতিকারের উদ্ভব ঘটে তাঁরা হলেন রামপ্রসাদ এবং রামনিধি গুপ্ত। রামপ্রসাদী গানে শ্রীযুক্ত মিত্র ধ্রুপদী প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। আমাদের বিবেচনায় এই রচনা স্থায়ী, অন্তরা এবং পরবর্তী কলিগুলিতে অন্তরার সুরের পুনরাবৃত্তি দেখে এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, সুলতান হুসেন শাহের দরবারে জৌনপুরের নবাব হুসেন শর্কীর অবস্থান হয়তো একেবারে ব্যর্থ হয়নি (প্রসঙ্গতঃ ভারতের বহু আঞ্চলিক সংগীতে স্থায়ী ও অন্তরার রূপবন্ধ দেখা যায়। এ থেকে কি প্রমাণ হয় জানি না)। উত্তর বাংলার চট্‌কা নামধেয় গানের সঙ্গে হোসেন শর্কীর চুটকলার কোনো সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, যে লোকসংগীত থেকে এর উদ্ভব তার সঙ্গে চটকার সম্পর্ক বিদ্যমান একদা ছিল যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের ঝুমুর গানের পারস্পরিক সম্পর্ক। আবার গোলাম নবীর প্রায় সমকালে রামনিধি গুপ্তের দ্বারা বাংলা দেশে টপ্পা গান রচিত হওয়া আর এক ঐতিহাসিক প্রহেলিকা। নিধুবাবু তো কোনো কালে গোলাম নবী অর্থাৎ শোরী মিয়াঁর শাগিদী করেছেন বলে শোনা যায় না। টপ্পা যদি পাঞ্জাবের গান না হয়ে রাজপুতানার মঙ্গলগীতি হয় তাহলে মনে হয় সমকালে এই গীতিরীতির বাংলাদেশে আবির্ভাব অস্বাভাবিক নাও হতে পারে যেমন হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুরে দিল্লী আগ্রার ধ্রুবপদ্ধতির গান। তার প্রেরণা বাহাদুর সেন খাঁ হতেও পারেন, অথবা পুরীগামী তীর্থযাত্রী সঙ্গীতসাধক যারা পথে বিষ্ণুপুরে বিশ্রামার্থ রাজাতিথ্য গ্রহণ করতেন তারাও।

মোটামুটি দেখা গেল বাংলাদেশ চিরকাল রাগসংগীতের ব্যাপারে অবশিষ্ট ভারতের শুধু যে সহচর তাই নয়, মাঝে মাঝে নেতাও বটে যেমন কবি জয়দেবের আমলে এবং পরে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে। বাংলা সংগীত ভারতীয় সংগীত থেকে আলাদা এমন প্রত্যয় শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়—অনৈতিহাসিক এবং কতকাংশে জাত্যভিমানের পরিচায়কও বটে। কাব্যসংগীতের মত গান প্রত্যেক প্রদেশেই ছিল, এমনকি তার চেয়ে ভালও ছিল। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠত্ব রবীন্দ্রযুগে। তা থেকে একথা কিছুতেই প্রমাণ হয় না যে, বঙ্গসংগীত ভারতসংগীত থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে চলে বা চলবে। লোকসংগীত প্রত্যেক অঞ্চলেই স্বতন্ত্র নিয়মে চলে, একা বাংলা দেশ বলে কথা নেই।

ইতঃপূর্বে এই কিতাবটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। বর্তমানের কিতাবে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের কাহিনী পরিত্যক্ত হওয়াতে কিতাবের অনাবশ্যক কলেবর হ্রাস হয়েছে।

এই প্রসংগে দু'একটি ত্রুটির আলোচনা কর্তব্য বোধ করছি। ইতিহাস এখন আর রাজা-রাজড়ার অভিষেকের অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের সন-তারিখ নয় : সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক শক্তির সংঘাত এবং তাদের কারণ এবং ফলাফলের সমীক্ষা অধুনাতন ইতিহাস-প্রত্যয়ের অন্তর্গত। এই হিসাবে 'প্রাচীন বাঙলার সংগীত' পুস্তকের লেখক সম্যক ইতিহাস-বোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন এমন কথা আমরা বলতে পারছি না। দিল্লীতে সুলতানশাহী প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতীয় সংগীতের উপরে কিভাবে পড়েছিল এবং সেই প্রভাবের আওতা থেকে পূর্ব ভারতের সংগীত কেন বাইরে থেকে গিয়েছিল তার সামাজিক কারণ-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তিনি হয়তো বাঙলা দেশের গানের গণ্ডীবদ্ধতাকে অহেতুক গৌরবান্বিত করার জন্য এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুকথিত থিওরির পুনরাবৃত্তি করতেন না। আধুনিক ভারতীয় রাগসংগীতের প্রথম প্রামাণিক পুস্তক হিসাবে যেখানে সকল ইতিহাস-বিদই জয়দেবের গীতগোবিন্দকে স্বীকার করে নিয়েছেন সে ক্ষেত্রে বাঙলা গানের বিশেষতঃ মধ্যযুগে বাঙলা গানের স্বাতন্ত্র্যের বড়াই তেমন বিচারসহ বোধ হয় না। তবে ভারতীয়

সমাজইতিহাসের কেন্দ্রাতিগ প্রবণতার ফলস্বরূপ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জনপদের সংগীতেই কোনো না কোনো প্রকারের স্থানিক ব্যতিক্রম এবং রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার দ্বারা ষোড়শ শতকের আগে পর্যন্ত সংগীতবিজ্ঞানের বিচারে রাগসংগীতের সর্বভারতীয় রূপটি কোনো ভাবেই বিঘ্নিত হয় নি। নায়ক গোপাল এবং আমীর খুসরে-র কিংবদন্তীমূলক সংঘাতকে ব্যক্তিক না বলে বস্তুতঃ ভারতীয় এবং পারশিক সংগীতের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাত বলে অভিহিত করা চলে। এই সংঘাতই পরবর্তীকালে মান তোমর, মিয়াঁ তানসেন ইত্যাদির সাংগীতিক সৃষ্টিতে সংশ্লেষ লাভ করে—উদ্ভব হয় উত্তর ভারতীয় বা তথাকথিত হিন্দুস্থানী সংগীতের। দাক্ষিণাত্য এই ধারা থেকে সরে গিয়ে কর্ণাটকী সংগীতের রক্ষণশীলতার মধ্যে আত্মরক্ষা করে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এবং বিকাশের এই ডায়ালেকটিক পদ্ধতিটি শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের কাছে ধরা পড়ে নি। সেই কারণে মুঘল যুগে উত্তর ভারতীয় সংগীতের ঘটমান বিকাশ এবং বিবর্তনের স্বরূপ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে ফকীরুল্লা তাঁর পুস্তকে যেমন সেই বিপ্লবের নায়ক তানসেনকে 'আতাই' বলে ধিক্কার দিয়েছেন। শ্রীমিত্রও তেমনি তাঁর সংগে একমত। কোনো বিপ্লবের নায়ক হতে গেলেই যে সম সময়ে সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত হতে হবে এমন কোনো কথা নেই: মানসর্ট অথবা বিঠোফেন তৎকালীন জর্মনির সর্বাগ্রগণ্য সংগীতবিজ্ঞানী ছিলেন এমন প্রমাণ নেই; কিন্তু তারাই যে তৎকালের যুগান্ধর শিল্পী এবং স্রষ্টা তা নিঃসন্দেহ।

চর্যাপদের কাল অর্থাৎ খৃঃ ৮ম শতক থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বাঙলা দেশের সংগীত কোন কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে কি বিশেষ প্রকারে রূপান্তর লাভ করেছিল এবং ঐ বিকাশ এবং রূপান্তরের পেছনে সামগ্রিকভাবে বাঙালী জাতির সমবেত অভীপ্সা কতখানি প্রতিফলিত হয়েছিল বা হয়নি, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাঙলা দেশের সমকালীন সংগীতবিজ্ঞান কি কি নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংযোজনে সমৃদ্ধ হয়েছিল, তার ইতিবৃত্ত উৎসাহী জিজ্ঞাসু মাত্রেরই কৌতূহল নিবারণ করত। কিন্তু মিত্র মহাশয়ের আলোচ্যমান পুস্তক ইতিহাসচারনার সে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে—একথা দুঃখের সংগে স্বীকার করতে হচ্ছে। সংগীতের নিজস্ব ক্ষেত্রে অর্থাৎ সুরকৃতি, রূপবন্ধ, গায়নরীতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট সংবাদ দিয়ে পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে পারেন নি, বরং সংস্কৃত এবং ফারশী পুঁথির তর্জমা করে দিয়েই দায় সেরেছেন। দু'একটা দৃষ্টান্তের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পৃঃ ১১১য় তিনি লিখছেন: 'ছন্দ দ্বারা পূর্তিত্ত হলে তাকে (অর্থাৎ সেই জাতীয় গানকে) বলা হয় পূর্ণা।' তাহলে কি একথাই মেনে নিতে হয় না যে, পূর্ণেতর গীতবন্ধগুলি ছন্দদ্বারা পূর্ণ করা হত না? আচার্য নীহার রায়ের ভূমিকা (মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা) থেকে জানা যায় যে, মিত্র মহাশয় একজন সংস্কৃতজ্ঞ। জানতে বাসনা হয়—'পূর্তিত' শব্দটি কোন ব্যাকরণের বিধানে সিদ্ধ।

'লক্ষ্মণ সেনই হিন্দু রাজত্বের শেষ স্বাধীন রাজা'—পৃঃ ৭। এ কথাটি সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ নিয়ে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে' বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, লক্ষ্মণ সেনের পরেও তাঁর উত্তরপুরুষগণ বহুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন এবং পরবর্তী তিনশত বৎসরের মধ্যেও সম্পূর্ণ বাঙলা দেশ মুসলমান অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

'রাগদর্পণ' (১৬৬৩) থেকে জানা যায় যে এই রাগটি (বরাটি) তিরহুতে গাওয়া হত'—পৃঃ ৯। বরাটি অথবা বরাড়ী বৈরাটী (ভারহুত) শব্দের রূপান্তর। কেবল মাত্র

তিরহুতে গাওয়া হত এমন ধারণা তথ্যসমর্থিত নয় কেননা, উত্তর ভারতীয় সংগীত ছাড়া কর্ণাটকী সংগীতেও এর অস্তিত্ব ছিল যথা পন্তুবরালী এবং শুভপন্তুবরালী। বহু স্থানিক সুর রাগে বিধিবদ্ধ হয়ে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে; বরালী অথবা বরাটী তাদেরই অন্যতম।

'চর্যা গান কীর্তনের আদি রূপ—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক'—পৃঃ ১১। কেন ভ্রমাত্মক তার কারণ এবং ভ্রমাত্মক হলে প্রকৃত সত্যটি কি তা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মিত্র মহাশয় তাঁর আলোচনায় যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেন, প্রায়শঃ তার উত্তর না দিয়েই আলোচনা সমাপ্ত করায় সাদৃশ স্বল্পজ্ঞ পাঠক বিভ্রান্তি বোধ না করে পারেন না। এখন কেউ যদি তর্কের খাতিরে দাবি করে বসেন যে, চর্যাই কীর্তনের আদি রূপ তাহলে তাকে খণ্ডন করার মতো তথ্য এবং যুক্তি মিত্র মহাশয়ের আছে কি? বরং চর্যার সঞ্চরণশীল ধ্রুবাংশের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুমানই তো স্বাভাবিক যে, বাঙলা কীর্তন গানের আদিম রূপটি চর্যা গানের মধ্যে দিয়েই বিবর্তন লাভ করেছে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের সম্পাদিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

'এই বিবরণে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে গৌড়-পঞ্চম গ্রাম রাগে পঞ্চম স্বরটিই বর্জিত। এক্ষেত্রে কেন যে এর নাম গৌড়-পঞ্চম হল সেটি বোঝা দুঃসাধ্য'—পৃঃ ২১। এটি প্রশ্নের উত্তর নয়, বরং উত্তর দানের অক্ষমতা। নামকরণের কারণ বোঝা যদি লেখকের দুঃসাধ্য হয় তাহলে তার দায়ভাগ বেচারা পাঠকের স্কন্ধে বর্তাবে কোন যুক্তিতে? জ্ঞানী ও গবেষক লেখক গৌড়-পঞ্চমের পঞ্চমহীনতা ধরে ফেলবার ক্ষমতার অধিকারী—এইটুকু জাহির করার জন্য? কিন্তু এ খবর তো সংগীতশাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ আছে, এর দ্বারা আধুনিক পাঠকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হল কতটুকু?

'ষড়্জহীন কোনো রাগ আমাদের কল্পনায় আসে না'—পৃঃ ২৫। আমাদেরও কল্পনায় আসে না কিন্তু ব্যবহারে আসে যথা আধুনিক সরস্বতী রাগ। ষড়্জহীন অর্থাৎ যে রাগে ষড়্জের ব্যবহার এড়িয়ে যাওয়া হয়। ইমন রাগে এখনো ষড়্জকে উল্লঙ্ঘন করে যাওয়া হয় এবং এখানেই এই রাগের মজা। সুতরাং ষড়্জের অব্যবহার আমাদের আধুনিক সংগীতেও কল্পনাতীত নয়। কেতাবী বিদ্যা এবং প্রায়োগিক সংগীতে এইখানেই পার্থক্য।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র-কৃত সালগ শব্দের ব্যাখ্যা যেমন কৌতুকাবহ তেমনি অভিনব: 'যে সব গীতে শুদ্ধ পর্যায়ের সংগীতের ছায়াপাত ঘটেছে সেগুলিকে ছায়ালগ বলা হত। ধ্রুবক, মণ্ঠক, প্রতিমণ্ঠ, নিঃশারুক, রাসক এবং একতালিকা—এই সাতটি ছিল সালগ পর্যায়ের গীত। এছাড়া যতি এবং ঝুমরিকেও সালগের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে'—পৃঃ ৩২-৩৩। সালগ শব্দের প্রকৃত অর্থ ছায়ালগ অর্থাৎ যে রাগে অপর রাগের ছায়াপাত ঘটে। যে রাগের বিস্তারকালে অপর এক বা একাধিক রাগের সাদৃশ্য দেখা যায় সেই জাতীয় রাগকে ছায়ালগ অথবা সালগ রাগ বলা হত। মধ্যযুগে হয়তো কথাটির অর্থান্তর ঘটেছিল। মিত্র মহাশয় এই তাৎপর্যটুকু বুঝতে পারলে 'সালগ গীত' এবং 'শুদ্ধ সংগীত' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করতেন না। শুদ্ধ গীতি নয়—রাগ। এটি স্পষ্টতঃই সালগ শব্দের অর্থান্তরের নিদর্শন। বিচারবিবেচনা এবং বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে প্রাচীন শাস্ত্রের কণ্ডূয়নের দ্বারা সত্যকার সংগীতেতিহাস রচনা দুরূহ। প্রাচীন testimony-কেও বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা উচিত। ঝাঁপতালের ধ্রুপদ মাত্রই এক কালে সাদরা নামে অভিহিত ছিল। তালের নামে গানের পরিচয় নতুন ঘটনা নয়। যে ক'টি গীতরীতির নাম এখানে দেয়া হয়েছে তার

প্রত্যেকটিই তাল। অনুমান সংগত যে, এই সব তালাশ্রিত প্রবন্ধ গানের নামকরণ তালের দ্বারাই নামাঙ্কিত হত।

প্রাচীন বাঙলা গানের সুরকৃতি এবং গায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো সার্থক অন্বেষণ এই গ্রন্থে দেখা যায় নি। একটি গানেরও পূর্ণ গীতরূপের স্বরলিপি মিত্র মশায় করেন নি। এর ফলে এই পুস্তকটি প্রাচীন শাস্ত্রবচনের বঙ্গানুবাদের একটি নির্ঘণ্টে পরিণত হয়েছে—তৎকালীন সংগীতের প্রায়োগিক দিকটি এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। আবার ঔপপাত্তিক ইতিকথা হিসাবেও এটি অসার্থক এই কারণে যে, সামাজিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত না হতে পারার জন্য সংগীতের বিবর্তন, রূপান্তর এবং বিকাশের প্রক্রিয়াটি এর মধ্যে সম্যক বিধৃত হতে পায় নি। প্রাচীন বাঙলার সংগীত ধারা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আশা নিয়ে যারা এই পুস্তকের দ্বারস্থ হবেন তাদের ললাটে হতাশা নিশ্চিত।

লেখকের অপর পুস্তক "মুঘল ভারতের সংগীতচিন্তা" তিনটি ফার্শী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। এর মধ্যে আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আখ্‌বরী বহুশ্রুত এবং তার সংগীতাংশের অনুবাদ ইংরেজী থেকে ইতঃপূর্বে অংশতঃ কোথাও কোথাও বেরিয়েছে। ফকীরুল্লা-কৃত 'রাগদর্পণ' ("চতুরঙ্গে"ই প্রথম প্রকাশিত হয়)। তৃতীয়াংশ মীর্জা খাঁ-কৃত 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ'-এর বঙ্গানুবাদ—পুস্তকটি এই তিন অংশে সম্পূর্ণ। ফকীরুল্লার রাগ-দর্পণ প্রধানতঃ বিখ্যাত গোয়ালিয়রাধিপতি রাজা মানসিংহ তোমরের 'মান-কুতূহল' গ্রন্থের ফার্শী অনুবাদ হলেও আবুল ফজলের আইন-ই-আখ্‌বরী এবং শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকর থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংগীতবিজ্ঞান এবং প্রয়োগকৌশল মুসলমান যুগের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এক ছিল বলে অনেকের অনুমান। মুসলমান যুগে তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এই সংগীতের রূপান্তর কি ভাবে কতটুকু হয়েছিল তার ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয় উৎসাহী ব্যক্তিদের অনুসন্ধেয় হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমে মনে আসে আমীর খুসরোর কথা। খিলজী আমলের এই দার্শনিক এবং সুধী হিন্দুস্থানী এবং পারশিক উভয় সংগীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। ভারতীয় সংগীত তাঁর ভাবনা এবং প্রয়োগের ফলে বহুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং ভারতীয় সংগীত যে ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করে জ্ঞানমার্গের দিকে পা বাড়িয়েছিল, তাঁর তৎকালীন প্রচেষ্টা এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। শাসকশ্রেণীর ওমরাহ হিসাবে মুসলমানী অর্থাৎ পারশিক সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা মুসলমান আমলের প্রথম যুগের সংগীতজ্ঞদের প্রথম প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছিল যেমন হয়েছিল ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা মেকলে-আদি লেখকদের অন্যতম কর্তব্য। সমপ্রাকৃতিক রাগকে পারশিক অথবা ভারতীয় নামে অভিহিত করা এই যুগের অন্যতম প্রবণতা। সুলতান বা সম্রাটকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে এই কাজে ব্রতী হতেন। সেইজন্য যমুনা কল্যাণ অথবা মেচকল্যাণীর নাম হয়েছিল ইয়ামন; সালগ বড়ারীর নাম হয়েছিল বিলাসখানী তোড়ি ইত্যাদি। কিন্তু আমীর খুস্‌রো 'নিজেকে ভারতীয় বলে স্বীকার করতেও দ্বিধা বোধ করতেন' এমন কথা মিত্র মহাশয় কোন ইতিহাসে পেলেন জানি না। শোনা যায় তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আমি তুরুক হতে পারি কিন্তু আমিতো তুর্কিস্থান থেকে আসিনি।'। অর্থাৎ তিনি মুসলমান হলেও এই দেশেরই মানুষ।* ভারতীয় রাগসংগীত একান্তভাবে ধর্ম ও দেবদেবী-

* ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত "হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনা" দ্রষ্টব্য।

নির্ভর হওয়ার কারণে হয়তো সাংসারিক মুসলমানদের নিকট 'হারাম' বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমীর খুসরোর প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় সংগীত কাব্যনির্ভর প্রবন্ধ পর্যায়কে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ সংগীত অর্থাৎ স্বর ও রাগের চারিত্র্যনির্ভর সংগীতের দিকে পা বাড়িয়েছিল। এরই পরিণতি রাজা মান তোমরের ধ্রুপদের বিধিবন্ধকরণে। এই সময়ে এমন সংগীত সৃষ্টি হল যা অপরিহার্যভাবে পৌত্তলিক নয় অতএব অস্পৃশ্যও নয়।

মুঘল যুগে এই ধ্রুপদ গানকে আমরা সম্রাট আকবরের দীন ইলাহি তত্ত্বের বাহক রূপে দেখতে পাই মিয়াঁ তানসেনের রচনায় হিন্দুর পূর্ণ ব্রহ্ম এবং মুসলমানদের নবী করতার উভয়ের গুণগান করা হয়েছে। সম্রাট আকবর যে ঐক্যবদ্ধ ভারত এবং ধর্মসমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সংগীতে তাকে রূপ দিয়েছিলেন মিয়াঁ তানসেন। আমীর খুসরো এবং মিয়াঁ তানসেনের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাটি বিস্মৃত হলে তাঁদের সংগীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হওয়ারই সম্ভাবনা। এই আলোকে ফকীরুল্লা ওরফে সাইফ খাঁর রাগদর্পণের ভূমিকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। ফকীরুল্লার নিমকহারামি এবং অন্নদাতার পুত্র দারাশিকোহ্-এর শিরশ্ছেদের ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত তদারকির কথা ছেড়ে দিলেও (প্রসঙ্গতঃ দারাশিকোহ্ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়বাদী ছিলেন) ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক গাঁটছড়া বাঁধার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে পরবর্তী স্বার্থদ্বন্দ্বের কারণে লঘু করে দেখানো ইতিহাসনিষ্ঠা নয়। এহেন ফকীরুল্লা যখন মিয়াঁ তানসেনকে আতাই অর্থাৎ 'এলেবেলে' সংগীতজ্ঞ হিসাবে অভিহিত করেন (প্রসঙ্গতঃ মিয়াঁ তানসেনের হিন্দু নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে এবং তিনি ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান হয়েছিলেন) তখন তাকে নিছক সাংগীতিক বিবেচনা বলে গ্রহণ করতে সহজেই বাধে। মিয়াঁ তানসেন শুধু যে গোটা দশেক নতুন রাগ তৈরি করেছিলেন তা নয়, ধ্রুব সংগীতের সমস্ত ধাঁচটাকেই তিনি পালটে দিয়েছিলেন। আর প্রবর্তন করেছিলেন এক নতুন ধরনের বীণের বাজ। ভারতীয় সংগীতের পরবর্তী চার শ বছরের ইতিহাসকে এক হিসাবে বলা যায় মিয়াঁ তানসেনের পারিবারিক ইতহাস। পৃথিবীর আর কোনো দেশে আর কোনো সংগীতজ্ঞের পরিবার তদ্দেশীয় সংগীতে এত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে শোনা যায় না। জর্মনির সেবাস্তিয়ান বাখ্ অথবা অষ্ট্রিয়ার স্ট্রাউস পরিবার এর ধারে কাছেও যায় না। তানসেনের পরিবারে হিন্দু এবং মুসলমান রীতিনীতি পাশাপাশি পালিত হয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েদের দুটি করে নাম রাখা হ'ত—একটি মুসলমান অর্থাৎ দরবারী, অপরটি হিন্দু অর্থাৎ পারিবারিক। এটিও ফকীরুল্লা সাহেবের তথা ঔরঙজীবের উষ্মার অন্যতম কারণ হয়ে থাকতে পারে। কেননা, সেনী পরিবারের হোন বা শিষ্য বংশেরই হোন, প্রত্যেক মুসলমান রচয়িতাই রাধাকৃষ্ণ বিষয় অবলম্বন করে গান বেঁধেছেন। পৌত্তলিকতা বিরোধী ফকীরুল্লার এটিও অসহ্য হয়ে থাকতে পারে। তবে যে তিনি রাজা মান এবং তাঁর নায়কদের প্রশংসা করেছেন তার হেতু এই যে, সমকালীন সংগীতে তাঁদের প্রভাব সেনী পরিবারের ধারে কাছেও যেত না। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে যে কোনো বিচার ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অবশ্য লেখকের মতামতের জন্য অনুবাদকের কোনো দায় থাকবার কথা নয়। কিন্তু ফকীরুল্লার মতামত যেহেতু অনুবাদকেরও অনুমত হয়েছে সেইহেতু এত কথা বলা হল (লেখকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। তবু ফকীরুল্লার গ্রন্থে শাহজাহাঁ এবং ঔরঙ্গজীবের আমলের গীতরীতি এবং সংগীতজ্ঞদের সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তার জন্য তাঁর গ্রন্থ অবশ্যই অনুবাদযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

"সঙ্গীতচিন্তা" বারোটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত— ঐতিহাসিক পর্যায়ে চারটি প্রবন্ধ যার মধ্যে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক রেখারূপের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় নান্দনিক পর্যায়ে পাঁচটি প্রবন্ধে ভারতীয় বিবিধ সংগীত বিশেষতঃ রাগসংগীতের নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ পরিশিষ্টে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন উপলক্ষে লিখিত হলেও তার মূল উপজীব্য সংগীত। সেই কারণে একটি মূল সুরের দ্বারা প্রবন্ধগুলি একসূত্রে গ্রথিত।

বাংলা দেশের গানের যে স্বাতন্ত্র্যের প্রচারণা আমরা এযাবৎ শুনে এসেছি তার সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। প্রাচীন বাংলা গানে ধ্রুপদ গানের উল্লেখ পাওয়া যায় না সত্য কিন্তু ধ্রুবক প্রবন্ধ গান প্রাচীন বাংলার গানেও যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ চর্যাগীতি, গীতগোবিন্দ এবং কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল। মুসলমান যুগের আগে পর্যন্ত অপর ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে বাংলা দেশের গানের যে কোনো বিরোধ ছিল না তার প্রমাণ লোচনের রাগতরঙ্গিনী, শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকর এবং রাণা কুম্ভের টীকাসংবলিত গীতগোবিন্দের সংস্করণ। দিল্লীর সুলতানী আমল থেকে বাংলা দেশ বৃহত্তর ভারতের রাগসংগীতের নতুন রূপান্তরের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পিছিয়ে পড়ে। সেইজন্য দেখি দিল্লীতে বৈজু বাওরার নায়কত্বে এবং গোয়ালিয়রে রাজা মানের পৃষ্ঠ-পোষকতায় যখন ধ্রুপদ গানের প্রচলন হচ্ছে বাংলা দেশে তখন একদিকে মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রবন্ধ গানের পালা চলছে অপরদিকে মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে রসকীর্তনের প্রবল বন্যা বইছে। দুই-ই কাব্য প্রভাবিত এবং ভাবগীতি হলেও বিশুদ্ধ সংগীতের ক্রিয়াঙ্গ যথা— তেনক, পাট ইত্যাদি তার মধ্যে জায়গা করে নিচ্ছে। একে রোধ করা যায়নি কেননা, সংগীতের কতকগুলি নিজস্ব প্রবণতা আছে যাকে কাব্য বা ভাবের দোহাই দিয়ে বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। এই বিশুদ্ধ অলঙ্কারগুলিই আবার নতুন গীতরীতির জন্মদান করে। যেমন ধ্রুপদের দ্রুত গমক থেকে তানের সৃষ্টি। ধ্রুপদের আলাপ এবং কীর্তনের স্বরপ্রস্তার থেকে বিলম্বিত খ্যালের বিস্তার। বীণাজাতীয় যন্ত্রের ঝালা অংশ থেকে তেলেঁনার দ্রুত তান-কর্তব। সংগীতের রাগরাগিণী যখন প্রবন্ধ বা কাব্যের শাসন থেকে স্বাধীন হয় তখন তার একটা নিজস্ব চেহারা দেখা যায়—সৃষ্টি হয় তার রূপ নিয়ে ধ্যান এবং প্রতিকৃতিচিত্র রচনা। এই ভাবে কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সুরের নূতন নূতন মূর্তি নির্মাণ আবার সুরের এবং গীতরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গানের নূতন নূতন রূপবন্ধ। বিশেষ দ্বারা নির্বিশেষ আর নির্বিশেষের দ্বারা বিশেষ সংগীত এই রূপে যুগে যুগে পরস্পর প্রভাবিত হয়ে এবং প্রভাবিত করে এসেছে।

গ্রন্থকার কবি এবং সংগীতপ্রেমী। তিনি প্রায়োগিক সংগীতের একজন শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তিগত জীবনে রঙ্গিলা ঘরানার উস্তাদ আত্তা হুসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য। স্বভাবতঃ তাঁর সংগীতালোচনায় তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রায়োগিক অংশও গুরুত্ব লাভ করেছে। সেই হিসাবে ভারতসংগীতের সাম্প্রতিক রূপকার যথা—আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ এবং কৈসরবাঈ ও হীরাবাঈ-এর গায়নের তুলনামূলক মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভারতসংগীতের নন্দনতাত্ত্বিক দিকটির উপরেও তিনি আলোকপাত করেছেন। সমকালীন রাগসংগীতকে (খ্যালাঙ্গ) তিনি প্রধানতঃ দুই প্রবণতায় আক্রান্ত দেখেছেন—ক্লাসিক ও রোমান্টিক প্রথমটির দৃষ্টান্ত ফৈয়াজ কৈসরবাঈ, আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব প্রভৃতি; দ্বিতীয়টির

দৃষ্টান্ত আবদুল করিম, হীরাবাঈ এবং (আমার মতে) অধুনাতন আমীর খাঁ সাহেব। এই দুই মনোভঙ্গির নিয়ামক রূপে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য ভাবকে নির্দিষ্ট করেছেন। কথাটা একটু গোলমেলে। সংগীতে ভাবনার চরিত্র একান্ত ভাবময় নাও হতে পারে যথা উস্তাদ বাদল খাঁ অথবা উস্তাদ এনায়েৎ হুসেন খাঁ সাহেব। স্বর এবং সুরের প্রাধান্য দিয়েই বোধ হয় ভারতীয় সংগীতের ক্লাসিসিজম অথবা রোমান্টিসিজম নির্ণয় করা চলে। তবে একথা ঠিক রাগসংগীতে যে যত রোমান্টিক-ই হোন না কেন, ক্লাসিক বাসাটুকু কেউ-ই ছাড়তে পারেন না। কেননা, তা করতে গেলে গানের কোনো রূপই গড়ে ওঠে না। পুরোপুরি রোমান্টিক মানসিকতার বাহন কাব্যসংগীত যথা রবীন্দ্রসংগীত। এখানে সুরকারের বিদ্রোহ কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘনে পর্যবসিত হয়নি পরন্তু গানের নির্মিত ব্যক্তিক এবং একান্ত সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা আপ্লুত হয়ে কাব্য ও সুরের সমন্বয় যে গান তা বিমূর্ত সুরের প্রত্যয়কে এক বিশেষ মূর্তিতে দৃশ্যমান করে তুলেছে। আধুনিক বাংলা কাব্যসংগীতের এই বিশেষ চরিত্রটি অনেক সংগীতজ্ঞ উপলব্ধি করতে পারেননি বলেই কাব্যসংগীতে তান মারবার জেদ ধরেছিলেন (এবং অনেকে মেরেও গেছেন)। এই বৈশিষ্ট্যটুকু বোঝানোর জন্য কবিগুরুকে অনেক শ্রম করতে হয়েছিল। তাতেও আপদ চুকেছে বলে মনে হয় না। কাব্য-সংগীতের প্রকৃতি বিশেষতঃ রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ প্রকৃতি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের রচনায় ধরা দিয়েছে।

রাগসংগীতে রসের এবং ভাবের ক্রিয়া সম্পর্কে সংগীতশাস্ত্রে যা লেখা আছে তাতে অন্ধবিশ্বাস এবং তার যান্ত্রিক পুনরুক্তি আমাদের চিরাচরিত অভ্যাসগত বলা যায়। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য তাকে একটা যুক্তিসংগত সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছেন (পৃঃ ১১৪)। সংগীতরত্নাকরে 'সরীবীরেহদ্ভুতে রৌদ্রে' ইত্যাদি কথার দ্বারা ষড়জ-এর ঋষভ-এর দ্বারা বীর অদ্ভুত এবং রৌদ্ররস সূচিত হয় এবংপ্রকার আপ্তবাক্যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ছাত্রগণ স্বভাবতই সন্দেহপ্রবণ হতে পারেন। এমনকি ঋষভের প্রাধান্যও যদি বীররসের কারণ হয় তাহলে দরবারী কানাড়ার তরানাকে বীররসাত্মক বলে মানতে হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি তাই হয়ে থাকে? বিশুদ্ধ সংগীতে নাট্য-আবেগ-নির্ভর রসবাদের প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে আমূল অনুসন্ধান সংগীতের পক্ষে কল্যাণজনক হতে পারে। বিশুদ্ধ সংগীতে কোনো প্রকার ভাব বা রস হয় না এমন কথা বলা কদাচ আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ভাব বা রস হলেও তা নাট্যরসের এবং নাটকীয় ভাব-বিভাব-অনুভাবের গোলামি করবে এমন কথা জবর-দস্তির নামান্তর। বাজে-পোড়া একটা পিপুল গাছ যদি ত্রিভঙ্গিম রূপে গগনপটে দেখা দেয় তাহলেই তাকে ত্রিভঙ্গ মুরারি মনে করে তাতে অনুরূপ শৃঙ্গার রস আরোপ করতে হবে এমন চিন্তা শুধু যে গতানুগতিক তা নয়, নিছক অভ্যস্ততার পুনরুক্তি। একে একটু বাজিয়ে দেখার সময় এসেছে। নাট্যকথা না থাকলেও নাটকীয় রসসৃষ্টির কল্পনা চিন্তা-জাড্যের পরিচায়ক। অবশ্য এর জন্য দায়ী শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নন, এর জন্য দায়ী তথাকথিত বিশ্লেষণবিমুখ সংগীতবিদগণ।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকৃত পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য একটি কথা লিখেছেন যা খণ্ডন না করলে সমালোচকের কর্তব্যহানি আশঙ্কা করি। তিনি লিখেছেন, 'প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে যে সঙ্গীতের সুরু হয়ে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচ হাজার বছর ধরে এর ক্রমবিকাশের ধারা অক্ষুণ্ণ আছে তাই ভারতীয় মানসের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। এখানে কোনো বিদেশী প্রভাব এখন পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি...” (পৃঃ ৫২)। প্রথমতঃ, বৈদিক

থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচ হাজার বছর হয় না, মহেঞ্জোদারো থেকে হয় কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতা তাকি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক প্রভাব ভারতীয় সংগীতে পড়েনি একথা পুরোপুরি সত্য বলা যায় কি? মুসলমান আমলে পারস্পরিক প্রভাবের ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণ অধুনাতন ধ্রুপদী সঙ্গীত। ধর্মাশ্রিত হিন্দুসংগীত যখন কাব্য-অনির্ভর ধ্রুপদী পর্যায়ে রূপান্তরিত হল তখনি তার পিছনে বৈদেশিক ইরানীয় সংগীতের প্রেরণা ও প্রভাব অনুমান করতে হয় (এর দ্বারা অবশ্য এমন কথা স্বীকার্য নয় যে, খ্যাল গান পারশিক আমদানি অথবা ইমন রাগ পারশ্য থেকে এসেছে)। তবে একেশ্বরবাদী এবং অপৌত্তলিক উস্তাদদের হাতে পড়ে (যাদের অধিকাংশ ছিলেন ভারতীয়) ভারতীয় সংগীত এই নতুন পথে মোড় নিয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। তারই ফলে খিলজী আমলে বিমূর্ত সংগীতের চর্চা প্রশ্রয় পায়। অধুনা বাংলা কাব্য ও নাট্যসংগীতে ইউরোপীয় সংগীতের প্রভাব না হলেও প্রেরণা কি একেবারে অস্বীকার করা যায়? তাছাড়া, বৈদিক যে ভারতে বৈদেশিক সেকথাটিই বা কি করে বিস্মৃত হওয়া যায়? আর্যপূর্ব সংগীতের নিদর্শন কিছু মহেঞ্জোদারোতে এবং কিছু কোল-ভীল-সাঁওতালদের মধ্যে এখনো বর্তমান। কোনটাকে অকৃত্রিম ভারতীয় বলা যাবে? বর্তমান উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতকে একটি সমন্বিত রূপ বলে স্বীকার করে নেওয়াই অধিকতর ঐতিহাসিক বলে মনে হয়।

লোকসংগীত ও রাগসংগীতের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাটি ভাল লাগল তবে একটি কখন এবং কিভাবে অপরে রূপান্তর লাভ করে তা আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে রাগসংগীতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যথা—'অন্যপক্ষে ব্যক্তিগত অনুভূতিই হচ্ছে রাগসংগীত সৃষ্টির প্রেরণা'—এই সম্পর্কে অনেকের দ্বিমত হওয়া সম্ভব। আমাদের অনুভবে রাগসংগীতে ব্যক্তিগত অনুভূতির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। রাগসংগীত যে সব অনুভূতি নিয়ে কারবার করে তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—তাকে বলা যায় সাধারণীকৃত অনুভূতি। সেইজন্য খ্যাল বা ধ্রুপদ গানে ব্যক্তিক ভাবানুভূতির ছাপ নেই যেমন আছে রবীন্দ্রনাথ অথবা অতুলপ্রসাদের গানে।

এই রকম কোথাও কোথাও সামান্য মতদ্বৈধের অবকাশ সত্ত্বেও শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের পুস্তকটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ তিনি সংগীতের বহুতর দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি শেষ কথা বলে দিয়েছেন এমন নয় কেন না, শেষ কথা বলা সমালোচকের দায় নয়। ভাবনা ও অনুসন্ধানবৃত্তির উন্মেষ করাই সমালোচকের করণীয়। তাতে লেখক সফল হয়েছেন।

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। কথাশিল্প প্রকাশন। কলিকাতা ১২। মূল্য ষোল টাকা।
প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত—রাজ্যেশ্বর মিত্র। কথাশিল্প প্রকাশন। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।
মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা—রাজ্যেশ্বর মিত্র। লেখক সমবায়। কলিকাতা ২৬। মূল্য পাঁচ টাকা।
সঙ্গীত চিন্তা—অরুণ ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিষদ। কলিকাতা ৫০। মূল্য পাঁচ টাকা।

স মা লো চ না

The Adventurers. *By* Harold Robbins. The New English Library Limited. London. Rs. 7·50.

"কার্পেটব্যাগার্স"র লেখকের লেখা আলোচ্য বইখানি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। বইখানি পড়ে খানিকটা আন্দাজ করা যায় সাম্প্রতিক কালের য়ুরোপ-আমেরিকার পাঠক-সমাজের রুচি কোন্ পথে চলেছে। তা ছাড়া, বাস্তবতামূলক সাহিত্যের শিল্প-নিদর্শন হিসাবে এ-সব বইয়ের মূল্য যাই থাক, এতে বাস্তবতার কিছু পরিচয় অবশ্য পাওয়া যায়। কারণ, সাধারণ পাঠক সুদূর কল্পনার সঙ্গী হতে খুব উৎসুক নয়।

আমার মনে হয় "দি অ্যাড্ভেঞ্চারার্স"কে পলিটিক্যাল রোমান্স বলে আখ্যাত করলে খুব অসমীচীন হয় না। কোর্টিগুয়ে নামক দক্ষিণ আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনী এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। উচ্চতম পর্যায়ের রাজনৈতিক দাবা-খেলার এই কাহিনী ক্রমাগত ফ্রান্স আমেরিকা এবং কোর্টিগুয়ের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত চরিত্র-সমূহের মধ্যে আনাগোনা করেছে। অসাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে অসাধারণ রকমের নাটকীয় ঘটনা ঘটে; সেই সব ঘটনার চিত্রায়নকে আমরা রোমান্স বলি; যেমন ঔরংজেব-উদিপুরী-রাজসিংহ কেন্দ্রিক কাহিনীকে ঐতিহাসিক রোমান্স বলে গণ্য করা যায়। অনুরূপ কারণে আলোচ্য বইখানিকে পলিটিক্যাল রোমান্স বলব, কারণ রোমান্স এখানে এ-যুগের একটি রাজ্যের জটিল রাজনৈতিক নাটককে অবলম্বন করে কল্পিত হয়েছে। অ্যাড্ভেঞ্চারার্স নামটিও সার্থক। কারণ এই রাজনৈতিক নাটকে যারা অংশগ্রহণ করেছে তারা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক অভিযানে লিপ্ত, যদিও ভোগ অর্থ ও ক্ষমতা শিকার ছাড়া এ দুঃসাহসিকতার আর কোন লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে রবিন্স জমিয়ে গল্প বলার ক্ষমতা রাখেন। গল্পের স্বচ্ছন্দ গতি বজায় রাখার জন্য তিনি উপন্যাস রচনার অনেক পরিচিত উপকরণকে বাহুল্য বোধে বর্জন করেছেন। চারিত্রিক জটিলতা সৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা প্রাকৃতিক বর্ণনাকে তিনি এড়িয়ে চলেন। ঘটনা পারম্পর্য একটি চরম নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, এই নাটকীয় পরিণতির দিকে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ রেখে তিনি অনায়াসে ঘটনার পর ঘটনার জাল বিস্তার করেছেন। পাঠকের কৌতূহলকে বজায় রাখতে পারেন বলে তিনি যে ঘটনার এত সুবিস্তৃত জাল তৈরি করেছেন তা পাঠককে সহজে ক্লান্ত করে না। এগুলো আমাদের পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা নয় বলে, তাতে বৈচিত্র্য প্রচণ্ডতা এবং বীভৎসতার অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে বলে, তাদের দিকে সাধারণ পাঠক আকৃষ্ট হবে। লেখক নিরলঙ্কার প্রায় সাংবাদিকসুলভ ভাষা ব্যবহার করেছেন; স্থিতিশীল দৃশ্য চরিত্রের বর্ণনায় ন্যূনতম স্থান ব্যয় করে নাটকীয় সংলাপ এবং দ্রুত-গতি কর্ম-সম্পাদনার বিবরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বইখানিতে সংলাপ বাহুল্য থাকলেও কোথাও ব্যঞ্জনা-ধর্মিতা বা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের আভাস নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্থূলে অথচ

প্রচন্ড রকমের সংঘাতের পরিচয়ই সংলাপের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। গুটি কয়েক মোটা ধরনের আবেগ ও প্রবণতা—যেমন, হিংসা, লোভ, প্রতিহিংসা, কাম-তৃষ্ণা, নিষ্ঠুরতা—ঘটনা ও সংলাপের ভিতর দিয়ে প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভ করেছে। এবং বলা বাহুল্য, এইসব মোটা, অথচ ভয়ঙ্কর রকমের নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ আবেগের প্রতি সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ চিরন্তন। লেখকের ভাষায় কোথাও আড়ম্বর বা উচ্ছ্বাস বাহুল্য নেই,—ভাষাগত সমৃদ্ধি কাহিনীর দ্রুতগতিকে ব্যাহত করে। কিন্তু ঘটনার প্রাণশক্তি রয়েছে আতিশয্য এবং অতিনাটকীয়তার মধ্যে

আমার বিশ্বাস ভাষা বিন্যাস-রীতি ও উপকরণের এইসব বিশেষত্বগুলিই বেশীর ভাগ বেস্ট সেলার উপন্যাসে প্রাপ্তব্য।

আলোচ্য বইখানির মূলে অবশ্য বর্তমান কালের এমন একটি বাস্তব সমস্যার উদ্‌ঘাটন আছে যা গভীর চিন্তা উদ্রেক করতে সক্ষম। দক্ষিণ আমেরিকার অনগ্রসর দেশ কোর্টিগুয়ের যে সমস্যা তা নিছক এ-দেশের একক সমস্যা নয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ফরমোজা, কেনিয়া প্রভৃতি যে-সব পশ্চাৎপদ দেশে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের প্রাধান্য লাভ ঘটে নি,—সে সব দেশের সমস্যাও পোর্টিগুয়ের সমস্যার অনুরূপ। এ-সব দেশে যারাই শাসন-ক্ষমতা লাভ করে তারা জঘন্যতম মানসিকতার অধিকারী, তারা অবাধে লুণ্ঠন শোষণ ও বর্বর ক্ষমতা-মত্ততার রথ চালিয়ে দেশকে চরকমতম দুর্ভাগ্যের পঙ্কে টেনে নামায়। নীতিবর্জিত বেপরোয়া লোভ কাম এবং হনন তৃষ্ণা এদের চারিত্রগত বিশেষত্ব। রবিন্স এই ধরণের একটি চরিত্রের চিত্তাকর্ষক রূপদান করেছেন পোর্টগুয়ের প্রেসিডেন্ট চরিত্রের মধ্যে। পূর্ববর্তী অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক রক্তাক্ত অভিযান চালিয়ে সে শাসন-ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু ক্ষমতালাভের পর সে নিজেও লোভ ও ক্ষমতার নীতিবর্জিত অভিযানে নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে। দেশের উন্নয়নের জন্য বিদেশী রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সাহায্য সে অনায়াসে নিজের নামে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখে। সে কমিউনিস্ট-বিরোধী হলেও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি অনুযায়ী দেশে কিছু কিছু কমিউনিস্ট তৎপরতাকে প্রশ্রয় দেয়; তাদের জন্য গোপনে যে অস্ত্রশস্ত্রের চালান আসে সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্টও লিপ্ত এবং জাহাজ কোম্পানি যা লাভ করে তার অংশবিশেষের অধিকারী। নির্বিচার গোপন হত্যায় সে এতটুকু বিবেক-পীড়ন অনুভব করে না; এবং তার যৌন-কামনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন মেয়ের আবির্ভাব ঘটে প্রাসাদে। প্রেসিডেন্ট যে কতখানি সুবিধাবাদের নীতি নিয়ে চলেন তার প্রমাণ, একবার গল্পের নায়ক ড্যাক্সকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করায় সে তাকে যে সৈন্যবাহিনীর কোন অস্তিত্বই নেই সেই সৈন্যবাহিনীর কর্নেলরূপে কোরিয়া যুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে কাজ করার জন্য প্রেরণ করে।

রবিন্সের কাছে কমিউনিজম্‌-বিরোধিতা যেন একটা সর্ববাদীসম্মত চিন্তাধারার অনুবর্তনমাত্র। বইখানা পড়লে মনে হয় তিনি মার্কিনী সভ্যতার এবং মার্কিনী রাষ্ট্রচিন্তার গুণমুগ্ধ। কাহিনীর নায়ক কোর্টিগুয়ের রাষ্ট্র-প্রতিনিধি ড্যাক্স তার দেশের কমিউনিস্ট আতঙ্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মার্কিনী সাহায্য প্রার্থনা করলে, মার্কিনী প্রতিনিধি তাকে জানায় যে তাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী বিদেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমেরিকার অনিচ্ছা যে কত গভীর তার কিছু কিছু নমুনা ভিয়েৎনামের যুদ্ধে দেখা

যায়। সুতরাং মার্কিনী রাষ্ট্রাদর্শের জয়গান করার সময় লেখককে নিঃসন্দেহে তাঁর দৃষ্টিকে সংকুচিত করে আনতে হয়েছিল।

কিন্তু লেখক মার্কিনী আদর্শের স্তাবক হলেও তাঁর কাহিনীতে মার্কিনী সভ্যতার যে-চিত্র ফুটে উঠেছে তা খুব সুখকর নয়। মার্সেল নামক একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমেরিকায় এসে ধনোপার্জনের নেশার বশীভূত হল। নানা অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নিয়ে সে বিপুল বিত্তের অধিকারী হল। বিত্তের সাধনা তার কাছে ঈশ্বর সাধনার বিকল্প, সুতরাং এই সাধনায় লিপ্ত হয়ে সে সমস্ত মানবিক সম্পর্ককে ত্যাগ করেছে। অবশেষে বিপুল বিত্তের মালিক হয়ে সে জীবনের শূন্যতাকে ভরাট করার জন্য মদ্যপান এবং পণ্য-নারীর সাহচর্যকে একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুয়ি আন্ নামে অপর এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীর কাছে পুরুষ হল কামবৃত্তি চরিতার্থতার উপকরণমাত্র। তার কাছে অবশ্য পুরুষের কোন অভাব নেই; তাদের মধ্যে যাকে তার একটু ভাল লাগে, যার সঙ্গে কয়েক মাস ঘর করা যাবে বলে সে মনে করে তাকে সে বিয়ে করে। মার্কিনী কৃষ্টির এইসব নমুনার পাশে বরং ফরাসী প্রিন্স ও ব্যাঙ্কার ব্যারণ দ্য কয়েন অনেক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয়। তার মধ্যে যথেষ্ট মানবিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৃহৎ বইখানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নাৎসী বর্বরতারও কিছু চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

সুতরাং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির একটি অসুস্থ আন্তর্জাতিক চিত্র রবিন্সের বই-তে বিধৃত হয়েছে। এই বাস্তবের উদ্‌ঘাটন যদি লেখকের মূল লক্ষ্য হত তা হলে আলোচ্য বইখানিকে একটি মূল্যবান উপন্যাস বলে গণ্য করতে পারতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বাস্তবের উদ্‌ঘাটন বইখানির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। রোমান্টিক মানসিকতা যেমন জীবনের অপরূপ আদর্শায়িত সৌন্দর্যের ধ্যান করে, তেমন আবার তার আর একটা দিকও আছে। রোমান্টিক মানসিকতা জীবনের সর্ববিধ বিকৃতি হিংস্রতা অমানুষিকতার চিত্রকেও উপভোগ করে। এই উপভোগের দৃষ্টি নিয়ে বইখানিতে হিংসা লোভ ও বর্বরতার জান্তব অভিযানকে চিত্রিত করা হয়েছে। বইতে ছড়িয়ে রয়েছে নারী ধর্ষন, হত্যাকাণ্ড ও অবৈধ যৌন-মিলনের ছবি--মর্মান্তিক বাস্তব সত্য হিসাবে নয়, উপভোগ্য চিত্র হিসাবে। আগেই বলেছি—কাহিনীর নায়কের নাম ড্যাক্স; এবং সমস্ত কাহিনীটি ড্যাক্সের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বলেই ড্যাক্সের মধ্যে উদারতা, ন্যায়বোধ, পরোপকারের আগ্রহ এবং নিজের দেশের প্রতি মমতা-বোধের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু লেখক মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের রোমান্টিক নায়ক কাশানোভার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে ড্যাক্সের চরিত্র পরিকল্পনা করেছেন। সে এক যাযাবর প্রেমিক। দেশে দেশে সে বহু নারীর সঙ্গে প্রেম ও যৌন-সঙ্গম করে বেড়াচ্ছে। সে যেমন দুর্দান্ত প্রেমিক, তেমনি দুর্ধর্ষ বীর; পথে ঘাটে ছোট বা বড় কারণে দু চারটে খুন জখম করতে সে ইতস্তত করে না। ড্যাক্স সভ্যজগতের নৈতিক চিন্তার ধার ধারে না, যদিও অবশ্য তার নিজস্ব একটা নীতিবোধ আছে। বলা বাহুল্য প্রেমের এই পাইকারী ব্যবসায়ী এবং বহু দুঃসাহসিক অভিযানের এই নেতা বাস্তবকে উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে পরিকল্পিত হয় নি; সে রোমান্সমূলক আখ্যায়িকার নিত্য সহচর।

মনে হয় আলোচ্য বইয়ের অন্যতম মূল বক্তব্য—পৃথিবীর নারী সমাজের অন্য কোন কাজ নেই একমাত্র পুরুষ সমাজকে সাময়িক আনন্দ দেওয়া ছাড়া। বাহাদুরকা-খেল্-মার্কা ইয়াঙ্কী ছবিতে যে ধরণের মারপিট খুন-জখমের চিত্র থাকে এ-বইয়েও সেইরকম অজস্র ছোট বড় ঘটনা ছড়িয়ে আছে। আগাগোড়া বইখানা পড়ে একথা না ভেবে পারা যায় না যে রোম-

হর্ষক কাণ্ড কারখানাকে মূলধন করে লেখক পাঠকের মনকে জয় করতে চেয়েছেন। বাস্তব সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজনে জীবনের জান্তবতার বিস্তারিত চিত্র এতে উত্থাপিত হয় নি; বরং জান্তবতার চিত্র দেওয়ার জন্যই একটি সুনির্বাচিত বাস্তবকে উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। লেখকের এই জান্তবতা-প্রীতির জন্যই বইখানি পাঠক-মানসকে জান্তবতার ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে সক্ষম হয় নি। বাস্তবের উপলব্ধি-জাত যে স্বাধীনতা আমরা মহৎ সাহিত্যে অনুভব করি, এ বই পড়ে আমাদের সেই স্বাধীনতায় উত্তরণ ঘটে না।

পরিশেষে বলি, পাঠকের রুচির কথা স্মরণ রেখে, পাঠককে খুশী করার জন্যই বই রচিত হয়েছে, পাঠককে বাস্তব সচেতন করার জন্য নয়। বাস্তবের পঙ্কে অবগাহন করার জন্য পাঠকের মনে যে গুপ্ত ইচ্ছা রয়েছে, তাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই লেখকের এই প্রয়াস। এ বই পড়ে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের রুচির গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়; আবার লেখকের ব্যবসায়ী-সুলভ রূপটিও চেনা যায়।

অচ্যুত গোস্বামী

প্রকীর্ণ সবুজে নীলে—সুনীলকুমার নন্দী। সুরভি প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য ৩·০০।
পরিচিত মুখগুলি—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য। কলিকাতা। মূল্য ৩·০০।

বোধ হয়, কালধর্মের প্রভাবেই কথাটা মনে আসছে,—কিন্তু তা যাই হোক, বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে চেস্টারটন তাঁর একটি প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন, আধুনিক যে-কোনো পর্বের বাংলা কবিতা সম্বন্ধে যদি কোনো গুণগ্রাহীর মনে সেই অদ্ভুত ধারণা দেখা দেয়, তাহলে তাঁকে কি বিসদৃশ সাদৃশ্য-ব্যসনে অভিযুক্ত করা যাবে? চেস্টারটন অনুভব করেছিলেন যে, বৃষ্টিপাত ব্যাপারটাই এক সমাজতান্ত্রিক ঘটনা,—বৃষ্টিতে গুণী-অগুণী, ধনী-নির্ধন সকলকেই ভিজতে হয়! নিজের গোসলখানায় ব্যক্তিগত ধারাস্নান নয়,—আকাশের বাদল মানেই সর্বজনীন স্নান। নিজের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযোগে কল টিপতে হবে না কাউকে, বর্ষার ধারাযন্ত্র খোলবার ভার নিয়ে থাকেন স্বয়ং প্রকৃতি,—এবং নর-নারী-নির্বিশেষে সকলেই সেই স্নানে সুসিক্ত হন। প্রত্যেক তরু-লতার জন্যে তাতে এক পাত্র পানীয়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত। আর, একথাও চিন্তনীয় যে, মেঘে যদিচ আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, বর্ষণের ফলে মাটি কিন্তু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পথে পথে জল জমে,—এখানে-ওখানে জল,—জলে টইটম্বুর চারিদিক,—যে-দিকেই চোখ পড়ুক। সেইসব দর্পণে পথের আলো ঝল্‌মল্ করে ওঠে। বাড়িঘর, গাছ, মানুষ, দোকান-পসার সবই কম্পমান, সবই বিপরীত অবস্থান,—সব ছায়াই নিম্নমুখী,—কিন্তু ধৌত, বিগলিত, আশ্চর্য! চেস্টারটন লক্ষ্য করেছিলেন যে বর্ষণস্নাত পথের জলে জলে দিনাবসানের রূপ মনে হয় স্বর্ণাভ, আর মানুষের প্রতিবিম্ব হয় কজ্জলবর্ণ,—অর্থাৎ কালি, মসী, ভূসার রঙ!

গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা দুজন কবির এই দুখানি বাংলা কবিতা-সংগ্রহে আমাদের জাতীয় কবিমানসের যে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে, তাতে সবুজ এবং নীল ইতস্তত প্রকীর্ণ বটে, কিন্তু প্রতিকূল হিমবায়ুই সর্বাধিক অনুভূত। আলোর সেই সুগভীর ভারতীয় ঐতিহ্য এখন অদর্শন—যাতে সূর্যই ছিলেন গায়ত্রীর তুরীয় পাদ। সুনীলকুমার

লিখেছেন—

সভ্যতা উঁকি-না-দেওয়া অন্ধকারে চিৎ হলে
যে যার স্বাতন্ত্র্যে ফিরি স্বাভাবিকতায়—
লাল নীল সবুজ হলুদ যেন মেলে মেলে জেগে ওঠে
পাহাড় অরণ্যছাওয়া সহজ সুঠাম
প্রেম-হিংসা-অনুরাগে রক্তিম হৃদয়।

চেস্টারটনের সেই বর্ষা-সন্ধ্যার মতন এ যেন প্রকৃতির স্বর্ণকান্তি পটে মসীচিহ্ন মানুষ! 'রক্তিম হৃদয়' এখানে সহজ উদ্দীপনার স্বীকৃতি নয়,—কবিতার শেষ লাইনে এই 'ম্যাজিক, ম্যাজিক' কবিতায় কবি লিখেছেন—'কোথায় চলেছি ভেসে ভয়ংকর প্রসারিত আলোর উৎসাহে'। ঠিক এর পরের রচনা 'কমল-কাহিনী'তে আবার আলো-অন্ধকারের চিন্তা আছে—

সব কথা বলা যায় না
উজ্জ্বল আলোর মধ্যে, চোখে চোখ রেখে
বলা যায় না...

শেষ স্তবকে বলা হয়েছে—

অতএব, অন্ধকারে বুকের গোপন তলে
ঘটে যদি কোন এক কমল-কাহিনী
ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই, বৃথা তর্কে নামা—
সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে, সম্মুখের পথ দিয়ে
জানার সংসারে আমরা আলো অভিসারী
যে-আলোর ভিন্ন অর্থ...

এই 'ভিন্ন অর্থে' আলো কিন্তু জগতের নিয়ামক যমও নন, জ্যোতির্ময় সূর্যও নন। একালে মাত্র লোকচক্ষু আর সমাজই সেই সর্বস্বীকৃত আলো যার কঠোর এবং নির্মম নজরে থাকতে ব্যক্তিমন বিমুখ অথচ গত্যন্তরহীন,—তাই অভিনয়কুশলী। রোমান্টিক কবিমনে যথার্থ সূর্যহীন এই সমসাময়িক যন্ত্রণা অনুভব করেই সুনীলকুমার আলোর এই 'ভিন্ন অর্থ' ব্যাখ্যা করেছেন—

যে-আলোর ভিন্ন অর্থ
হৃদয়কে তুড়ি মেরে গরম বাজারে
রক্ত-মাংস-শূন্য পিন্ড ঘষে-মেজে রঙ করে
পুতুল সাজানো।

আলোর ভাবনা, আর ভিন্নতার দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিই তাঁর স্বভাব। এই 'ভিন্নতা' বোধ হয়, ব্যক্তি-অধিকারেরই সংকেত। তাঁর 'নৌকো', 'অরণ্যের ফুল', 'গোপন, তুমি আত্মমুখী', 'বন্দরের ছায়া' ইত্যাদি কবিতাগুলি এই দিকটির নজীর—যেমন পূর্বোক্ত দুটি কবিতা ছাড়া 'রটনা', 'ডাইনী বুড়ি', 'সর্প' প্রভৃতি আরো কয়েকটি কবিতায় আলোর উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর তৃতীয় আগ্রহ ছন্দের কারুকর্মে। তবে, এ-আগ্রহ কোথাও অনুভূতিকে লঙ্ঘন করেনি, সর্বত্রই অনুভূতির যোগ্য আয়োজন হিসেবে পাঠককে খুশি করে যায়, যেমন—

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ডাক দিয়ে ফের দৃশ্যে মিলায় সুন্দরী
ব্যাকুল হয়ে ঢেউয়ের চূড়ায় ভাঙছে ভেলা অসংখ্য।

নিভুক্ নিভুক্ আলোর শিলা   হাওয়ার ফুঁয়ে, আকাঙ্ক্ষা
অন্ধকারে ভগ্নজানু,   ঈষৎ উষ্ণ আলস্যে...

'হাওয়ার ফুঁয়ে' কবিতার এইসব ছত্রে ছবং 'গভীরে যেও না' কবিতাটির নিষেধবচনে কবি হিসেবে সুনীলকুমার নন্দীর সেই আত্মপরিচিতি ধ্বনিত হয়েছে যা ভাবুকের মনে একালের সর্বজনীন বিষাদ-বর্ষণের মধ্যেই ছাতা-মাথায় দেওয়া একজন আলাদা মানুষের চেহারা ফুটিয়ে তোলে। তিনি বলেছেন—

চাতুর্যে নয়ন বিদ্ধ, বিনিদ্র চেতনা
তুফানে নিমগ্ন হও, গভীরে যেওনা।

কিন্তু চেতনা যখন তেমন উন্মুখ হয়, তখন সত্যিই কি চাতুর্য রক্ষা করা যায়? রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন—হায় রে ওরে যায় না কি জানা, নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায় পায় না ঠিকানা! তবে সারল্য বা প্রগাঢ়তা যখন নিন্দিত হবার আশঙ্কা থাকে, তখন লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই চাতুর্য ব্যতিরেকে নিরুপায় বোধ করতে হয়। এবং সেই কারণেই সাধারণভাবে বলা যায়—একালের চাল-চলন অন্য রকম।

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিষাদ ব্যক্ত হতে দিয়েছেন অন্যভাবে। তাতে চাতুর্যের আবরণ নেই, আছে সরল স্বচ্ছন্দ সূত্র-সংকেত—

বিকচ পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ি ঢের,
কোথাও মধু নেই। মধুকর
কী তবে করে পান? হাওয়ায় আনে গান!
ওষ্ঠে রাখে মধু জাদুকর।

তিনিও আলো, ম্যাজিক, নদী, হিম হাওয়া এবং নানা রঙের অনুরাগী। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি স্বপ্নমোহলব্ধ বর্ষণের শেষে অনুভব করেছেন যে তিনি নিঃসঙ্গ! 'পথ নেই' কবিতাটির শেষ কয়েক ছত্রে এই যন্ত্রণার কথা আছে—

বৃষ্টি থামলো ভোরে, দেখি, সভা নেই চৌদিকে আমার
ছোট ছোট কাঁটা ঝোঁপ, পথ নেই বেরিয়ে যাবার।
পরিত্যক্ত একা আমি বিশাল প্রান্তরে।

এই নিঃসঙ্গতাবোধই তাঁর সর্বাধিক যন্ত্রণা। তিনি অনুভব করেন—'গতানুগতিক দিন। প্রতিভার নেই অঙ্গীকার!' 'একটি কবিতা'র এই ভাব তাঁর 'নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার'-এর মতন অপেক্ষাকৃত বড়ো রচনাতেও বিদ্যমান আবার 'প্রান্তর'-এর মতন ছ-লাইনের রচনাতেও ধ্বনিত। কবিতায় তিনি নানা রূপ গঠনের প্রয়াসী; 'দিনলিপি', 'দংশন : তমসা' ইত্যাদি কবিতাগুলি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রচনায় তিনি 'সেথা', 'তোরে' প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ-ব্যবহারেও অকুণ্ঠ। আবার, অশনায়া ('অন্ধকারে বয়ে যাচ্ছে নদী'), অভ্যাপাত ('দেয়াল'), বপ্রপরায়ণ ('বৃত্তান্ত') প্রভৃতি শব্দেও তাঁর রুচিমান্দ্য নেই। এসব কিন্তু অনেকটাই বাইরের ব্যাপার। গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের গভীর কবিমনের ভেতর-মহলের খবর অন্যত্র লক্ষণীয়, এবং তা অতি সাবলীল। তিনি জানেন—

সহসা একেক দিন আসে যেন সময়টা নতুন
নক্ষত্রের জন্মকাল বলে মনে হয়।

[শব্দেরা]

তাঁর মনে হয়—

আমরা কোথায় আছি? চাঁদে খাদ্য হবে কি সৃজন?
ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন—ক্যান্সারেরা নিরাময়, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ—
পুষ্টির অভাব, যক্ষ্মা, হৃদ্‌রোগ ; কবিতা, প্রেম কি হারালাম!
[নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার]

তিনি স্বীকার করেন যে আজও বাংলার কবিমনে—

আকাশে জ্বলেই যদি অন্য কোনো তারার বিস্ময়,
মাটিতে থাকবে মিশে মৃত্তিকার আকাঙ্ক্ষার রাবীন্দ্রিক নূন।
[উত্তর পুরুষ]

তাঁর পরিচিত মুখগুলি স্বভাবতই তাঁর নিজের সুখ-দুঃখের আলোছায়ায় চিহ্নিত। রোমান্টিক তিনিও। কিন্তু শুধু এই রোমান্টিক শ্রেণীসংকেতটুকু তাঁকে বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একালের নানা সংকোচে-সমস্যায় জর্জর যে ব্যক্তিমন তাঁর এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, তার যন্ত্রণা মোটেই রোমান্টিক যন্ত্রণা নয়। রক্ত-মাংসের বাস্তব ক্লিষ্টতাই এইসব কবিতার মূলে বিদ্যমান,—বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই তা বিদ্যমান। চেস্টারটনের চোখে দেখা সেই বর্ষা-সন্ধ্যার প্রাকৃতিক সমারোহে রাস্তার জলে মানুষের কালো প্রতিবিম্বের কথা মনে পড়ে আবার। বর্ষা-প্রকৃতির কথায় চেস্টারটনের যেটুকু কৌতুক ছিল সেই কৌতুকতা' বর্জন করে একালের এই সর্বজনীন বিষাদের অনুরণন তিনি যেন শোনাতে চেয়েছেন।

হরপ্রসাদ মিত্র

A Precocious Autobiography *By* Yevgeny Yevtushenko. Penguin Books. London. *4s. 6d*

তিরিশে পেঁছানোর আগেই ইভজেনি ইয়েভটুশেংকো আত্মজীবনী রচনার সাহস দেখিয়েছেন। সন্দেহ হয়, আত্মজৈবনিক কিছু রচনার পক্ষে এই বয়স হয়তো যথেষ্ট নয়। চীৎকারে-ভরা তীব্র কণ্ঠস্বর, অসম্ভব তৎপর, বিদ্যুতের মতো ইন্দ্রিয়প্রবণ, মোটেই লাজুক নন, বরং গণসমর্থন না পেলে কবিতা পড়তে পারেন না এবং প্রতি শব্দের উচ্চারিত প্রতিজ্ঞায় হাতের মুঠো তুলে ধরেন আকাশের দিকে—এই ইয়েভটুশেংকো, সব মিলিয়ে তাঁকে রুশ দেশের রাগী ছোকরা গোছের কিছু একটা ভেবে নেওয়াই সহজ।

কিন্তু, এ ধারণার পরিবর্তন হয় তাঁর আত্মজীবনী পড়ার পর। এই বয়সেই তিনি অনেক দেখেছেন, অনেক জেনেছেন, এক জীবনের অভিজ্ঞতার পক্ষে এই ভার রীতিমতো দুর্বহ! মনে হয় যেন আত্মজৈবনিক রচনার পক্ষে এই বয়সই সবচেয়ে উপযুক্ত। মনে হয়, আত্মজীবনী রচনা ভিন্ন তাঁর উপায় ছিল না। বলার ব্যাপারে অত্যন্ত অকপট তিনি, যা বলার, সে-ঘটনা যতই ক্ষুদ্র বা অনুল্লেখ্য হোক, বলে ফেলেছেন অনায়াসে, ভালমন্দ না ভেবেই, কখনো বা অত্যন্ত অগোছালভাবে, কৈশোরিক আবেগ মিশিয়ে; কিন্তু, এ-সবের মধ্যেই ধরা পড়েছে তাঁর মানবিক বোধ, কবিত্ব ও প্রজ্ঞা, দেশ ও কাল ও দেশের মানুষ সম্পর্কে

চেতনা, অনুরাগ ও ঘৃণা, সবই স্পষ্টভাবে।

বইয়ের প্রথম পংক্তিতেই অবশ্য ইয়েভটুশেংকো কিছু পুরনো কথা বলেছেন, যেমন : 'কবির আত্মজীবনী তাঁর কবিতা। বাকি সবই পাদটীকা।...কবি যদি নিজের ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তাকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা করেন, তাহ'লে আত্মহত্যাই হবে তাঁর অনিবার্য পরিণতি।' তারপরেই কিছু বহুশ্রুত ও ব্যবহৃত, ফাঁপা কথা : 'কবিতার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা যায় না...কবিতা সেই হিংসুক রমণী, যে মিথ্যা ক্ষমা করে না।'-ইত্যাদি। এগুলি সহনীয়, কেন না, এরপরেই ইয়েভটুশেংকো সরাসরি ঢুকে পড়বেন কবিতার কথায়। নিজেকে ব্যাখ্যা করার জন্য শেষ পর্যন্ত এই শিথিল আরম্ভটুকু অনিবার্য বলেই মনে হয়। তাঁর অনুযোগ অনেক, এবং সেই অনুযোগ কোথাও অনুচ্চারিত নয়; বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিপ্লবোত্তর, বিশেষত স্তালিন আমলের রুশ কবিতার বন্ধ্যত্বের বিরুদ্ধে—যে-কবিতা কবির আত্মজ নয়, যে-কবিতা বানানো, ফেনানো ও সাজানো, অর্থাৎ প্রাণহীন; এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিযোগ স্তালিনের বিরুদ্ধে।

আত্মজীবনীর পক্ষে কি এইসব অনিবার্য? না হ'লে কেন এই লেখা? ইয়েভটুশেংকো নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

Because in the West, where my poetry is unknown, newspaper articles which fall into the hands of the readers have sometimes built me up into a fantastic figure said to be in striking contrast to the greyness of the Soviet background....But I am nothing of the sort. The things I hate and fight against are just hateful to many other Soviet people. What I love and struggle for is just as dear to countless others as it is to me.

আত্মজীবনী রচনার অন্যতম শর্ত : লেখক নিজের কথাই বলেন বেশি; প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক হিসেবে আসে দেশ, কাল ও মানুষ। কিন্তু, লক্ষণীয়, ইয়েভটুশেংকো এই গ্রন্থে এ-সবের সঙ্গেই ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছেন, পড়তে পড়তে মনে হয় এই যুবক কবির যা-কিছু স্বাতন্ত্র্য তা আসলে রুশজাতীয়, যে-সকল ব্যাপারের জন্য তাঁকে অনন্য মনে হয় তার জন্ম রাশিয়ায়; একজন আমেরিকান, ইংরেজ, জার্মান বা স্প্যানিশ বা ভারতীয় হলে এই চারিত্র্য অর্জন করা সম্ভব হত না। ইয়েভটুশেংকোর আত্মজীবনী, সে-কারণে, তাঁর সমকালীন রাশিয়া ও রুশ জনগণের ইতিহাস।

কথাটা একটু বেমানান শোনাতে পারে। পারে এই জন্য যে আমরা সচরাচর এর বিপরীত কিছু শুনতেই অভ্যস্ত। কবিত্ব এমনিতেই এক ধরনের শ্লাঘা সৃষ্টি করে মনে, যার ফলে নিকট ও পরিচিত পরিধির বাইরে নির্বাসন বেছে নেন কবি, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সেই নিঃসঙ্গতার উপলব্ধিই তাঁর কাছে প্রভুত্বের সমান। হতে পারে এটাই তাঁদের চারিত্র্য, যার অভাব সৃজনশীলতার প্রতিবন্ধক; পরিচিত প্রাত্যহিকতার ভিতর কবির এই অনাত্মীয় ভ্রমণ একালের কবিদের সামান্য লক্ষণ। ইয়েভটুশেংকো তাঁর আত্মজীবনীর কোথাও এমন আভাস দেন নি, যা থেকে ধরে নেওয়া যায় কখনো, কোন এক মুহূর্তের জন্যও তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন। বরং, ক্লেশ ও প্রতিবেশের বিরোধীতা তিনিও কম সহ্য করেন নি। লেখাপড়ার, যাকে কায়েমী বিদ্যাও বলা যায়, সুযোগ হয়েছে কম, বরাবরের বাউন্ডুলে, বখাটে, কবিতা লিখে নগদ উপার্জনের উন্মাদনায় বন্ধু ও মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যান

ভদ্‌কা সহযোগে স্ফূর্তি করতে; এমন কি, স্বীকারোক্তি আছে, কবি না হলে তিনি হতেন ফুটবল খেলোয়াড়। কিন্তু, কি অসম্ভব নির্বিকার এই যুবক! নেতি নেতি আক্ষেপ নেই, নেই হতাশা; কোন প্রশ্নই তাঁর কাছে ব্যক্তিগত নয়, যে-বিশ্বাস সর্বজনীনতাকে স্পর্শ করতে পারে না, ইয়েভটুশেংকো স্পষ্টই তাকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করেছেন। 'ইন্‌টালেকচুয়াল' কথাটার অর্থও সেইজন্য তাঁর কাছে ভিন্ন—

. . . . a man's intelligence is not the sum of what he knows but the soundness of his judgement of people and his power to understand and to help them. From this standpoint some of the most educated people I met were much less cultured than ignorant soldiers, peasants, workers, and even criminals.

ইয়েভটুশেংকোর কবিতার মূলেও এই মানবিক চেতনা বিদ্যমান। নিছক নিজেকে নিয়ে কবিতা, রোমান্টিক কবিতা, হার্দ্যগুণসম্পন্ন প্রাতিস্বিক দর্শনের কবিতা—এ-সবের প্রতি তাঁর বিশ্বাস হয়তো আছে, নেই মোহ; বস্তুত, এমন কবিতা তিনি লিখেছেন কিনা সন্দেহ, দেশ, কাল, ইতিহাস ও জনসাধারণের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ নেই। তিনি আশাবাদী, বিপ্লবে তাঁর প্রচন্ড বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তাঁর অবিচল আস্থা। কবি হিসেবে তিনি বার বার নিজেকে বদলেছেন, রোমান্টিক আশাবাদ প্রত্যাখ্যান করে দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনাবোধ এ-সবকেও গ্রহণ করেছেন ক্রমশ, কিন্তু তাতে তাঁর রচনার মূল লক্ষ্য, আশা ও আস্থা, কোথাও বিচলিত হয় নি। উন্নাসিক, যৌনকাতর, প্রেম-সর্বস্ব কোন আধুনিক কবি হয়তো এই বোধের সহমর্মিতা অস্বীকার করবেন; কিন্তু, ইয়েভটুশেংকো নির্দ্বিধায় বলেছেন :

To write only of nature or women or world sorrow at a time of hardship for your countrymen is almost immoral.

মোটামুটিভাবে তাঁর পূর্ববর্তী রুশ কবিগণও একই চিন্তার অনুগামী। পুশ্‌কিন, লারমনটভ, নেক্রাসভ, কিংবা, সেই বহুবিক্ষত কবি, মায়াক্‌ভ্‌স্কি ('I want the pen to be equated with the bayonet'), ইয়েভটুশেংকোর কবিতায় যাঁর প্রভাব বিপুল, কেউই ব্যতিক্রম নন।

ইয়েভটুশেংকো, এবং তাঁর সমকালীন অন্যান্য রুশ কবি, উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন। তিনি কম্যুনিস্ট, এবং কম্যুনিস্ট বলেই গর্বিত; তিনি বিশ্বাস করেন রুশ জনগণের বিপ্লবের প্রতি আস্থাই তাদের পাথেয়, বিপ্লবই তাদের ধর্ম। এই আস্থা তাঁকে রুশ সাহিত্যের, রুশ কবিতার তৎকালীন অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস জুগিয়েছে।

ইয়েভটুশেংকো স্পষ্ট বলেছেন, তাঁদের দেশে ভাল ও মন্দ দুটোই আছে, পাশাপাশি। স্তালিনের আমলে এই সত্য স্বীকার করে নেওয়ায় বাধা ছিল। স্তালিন তাঁর একাধিপত্যের সুযোগে কম্যুনিজমের আদর্শকেই যে-শুধু কলুষিত করেছেন তা নয়, সমগ্র জাতিকে ঠেলে দিয়েছেন অসহায় আত্মরক্ষার ভিতর। এটা বুঝতে রুশ জনগণ সময় নিয়েছেন। যাঁরা আগেই বুঝেছিলেন বা ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছেন, স্তালিনের স্বেচ্ছাচারী ঔদ্ধত্য তাদের স্তব্ধ করে দিতে দেরি করে নি। স্তালিনের একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বত্র—কি জীবনে, কি শিল্পে, কি সাহিত্যে, যার ফলে দীর্ঘ সময় জুড়ে রুশ

সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই সৃষ্টি হয় নি। তখন স্তালিনের গুণগান ছাড়া কোন রচনাই সম্পূর্ণ হত না, সংবাদপত্রে দৈনিক শতবার তাঁর নামের উল্লেখ, তিনিই প্রগতি। আর এই প্রগতির দায় সামলাতে রুশ কবিতা হারালো তার যুদ্ধকালীন চমৎকারিত্ব; টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কি'র তথাকথিত উত্তরসূরীরা উপন্যাসে আমদানী করলেন সেইসব নায়ক নায়িকা, যারা ইস্পাতের গন্ধে উচ্চকিত হয়, বাড়ি তৈরী করে, চাষ করে, কিন্তু ভুলেও ভালবাসার কথা উচ্চারণ করে না। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তেমনি তাঁর আকর্ষণ, যে-আকর্ষণে গোর্কি'র মতো মানুষও আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, স্তালিনের নাম লেনিনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে রুশ জনগণ তাঁকে লেনিনের অব্যবহিত প্রতিভূ মনে করত। লেনিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধায় কৃত্রিমতা ছিল না ঠিকই, কিন্তু লেনিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্নে তিনি শুধু নিজেকেই ঠকাননি, সাধারণ মানুষকেও ঠকিয়েছেন। কারণ, যে-কম্যুনিজম লেনিনের আদর্শ ছিল, যে-আদর্শকে তিনি মানুষের কল্যাণকর স্বার্থে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, স্তালিনের নেতৃত্বে তার চেহারা দাঁড়িয়েছিল অন্যরকম। লেনিন মানুষের জন্য কম্যুনিজম চেয়েছিলেন, স্তালিন চাইলেন কম্যুনিজমের স্বার্থে মানুষকে ব্যবহার করতে। বিষয়টির চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন ইয়েভটুশেংকো :

'The magnificent words written into Stalin's Constitution, 'Work in our country is a matter of honour, valour and heroism,' were made to mean that work was more important than the people who did it. It became an image to be worshipped . . . The great and noble concept, 'Work', innocently guilty of the implications drawn from it, was cheapened and degraded by books which reduced the whole of spiritual life to problems of production.'

দীর্ঘকাল ধরে স্তালিন রুশ জনগণের ত্রাণকর্তা, রক্ষক ও প্রতিপালক। স্তালিন ভিন্ন তাদের চোখের সামনে দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই। একদিকে অন্ধ, স্তালিনের বিবশকর ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন মানুষ, অন্যদিকে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা—এই মিশ্র প্রভাবের ফল হল ভয়াবহ; স্তালিনের মৃত্যু ও তাঁর নির্বাসন সম্পূর্ণ হবার দীর্ঘদিন পরেও যার জের মেটে নি।—

'Stalin's greatest crime was the disintegration of the human spirit he caused. Of course Stalin never himself preached anti-Semitism as a theory, but the theory was inherent in his practice. Neither did Stalin in theory preach careerism, servility, spying, Cruelty, bigotry, or hypocrisy. But these too were implicit in Stalin's practice.'

১৯৫৩'র ৫ই মার্চ মৃত্যু হল স্তালিনের। রাশিয়ার সর্বত্র সেদিন শোক ও বিমূঢ়তার ছায়া। স্তালিন তাদের রক্ষক ও ত্রাণকর্তা, লোকে এই কথাই দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে এসেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দারুণ অনিশ্চিতি, এবং 'অলৌকিক' শক্তির অধিকারী স্তালিনের তিরোধানে ভেঙে পড়ল রাশিয়ার মানুষ। ইয়েভটুশেংকোও কোন ব্যতিক্রম নন। লেখকদের এক সম্মেলনে কম্পিত, ভগ্ন কণ্ঠে কবিরা পড়লেন স্তালিনকে নিবেদিত অসংখ্য কবিতা।

স্তালিন কেমন? এই প্রশ্নের রোমাঞ্চকর উত্তর দিয়েছেন ইয়েভটুশেংকো। সেদিন তাঁর কফিন দেখার কৌতূহলে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেলেন কুড়ি বছরের

তরুণ কবি। অসম্ভব ভিড়, দীর্ঘশ্বাসে ভারি বাতাস, একের পর এক জনতার চাপ এসে পড়ছে, প্রত্যেকেই চায় মহান স্তালিনের শবাধারটি বারেক চোখে দেখে নিতে। হঠাৎ লক্ষ করলেন ইয়েভটুশেংকো, তার সামনের তরুণীটি ভিড়ের ঠেলায় পিষ্ট হয়ে গেঁথে গেছে সম্মুখের আলোর থামে। কাতর আর্তনাদ করল সে, কিন্তু, জনতা ভ্রূক্ষেপহীন, তাদের দৃষ্টি অন্যত্র। দু'এক মুহূর্ত, কিছু করতে পারার আগেই ইয়েভটুশেংকো শুনলেন মেয়েটির হাড় গুঁড়ানোর শব্দ। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলেন তিনি; পিছনের চাপে এগিয়ে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটিকে খুঁজলেন একবার, পেলেন না, নিঃশব্দে কখন সে হারিয়ে গেছে হাজার হাজার পায়ের নিচে। ততক্ষণে আর একজন ট্রাফিকের থামে পিষ্ট হচ্ছে, আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছে প্রাণপণ। পায়ের তলায় নরম কিছুর স্পর্শ অনুভব করলেন ইয়েভটুশেংকো, পিষ্ট, থ্যাঁতলানো একটি মানুষের দেহ। জনতা তাঁকে ঠেলে নিয়ে চলল। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ। আর তখন, সেই আশ্চর্য নৈঃশব্দ্যের ভিতর, কনুই দিয়ে দু' পাশের মানুষকে ঠেলতে ঠেলতে, আকস্মিক কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন ইয়েভটুশেংকো : Form chains! Form chains! পাগলের মতো তিনি তখন একের পর এক মানুষের হাত জুড়ে জনতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন।...স্তালিনকে দেখা হল না।

'দেখলে স্তালিনকে?' বাড়ি ফেরার পর মা জিজ্ঞাসা করলেন। নিস্পৃহ কণ্ঠে ইয়েভটুশেংকো জবাব দিলেন, 'দেখেছি।'

'মা-কে আমি মিথ্যে বলি নি।' ইয়েভটুশেংকোর নিজের কথায়, 'আমি যা দেখেছি স্তালিন সত্যিই তাই।'

সেদিন থেকে ইয়েভটুশেংকোর জীবন ও কবিতায় পালাবদল সূচিত হল। স্তালিনের মৃত্যুর অনিবার্য ফল বিশ্বাসের অধঃপতন; অন্ধ বিশ্বাসের জায়গা নিল বিশ্বাসহীনতা। ইয়েভটুশেংকো উপলব্ধি করলেন কবি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব, বিশ্বাসহীনতা থেকে দেশবাসীকে নতুন বিশ্বাসে স্থিত করার দায়িত্ব। আর, এই বোধ থেকে সৃষ্টি হল তাঁর বিখ্যাত কবিতা, 'জিমা জংশন'। বলতে গেলে এই-ই তাঁর পরবর্তী কবিতার পটভূমি।—

I wanted to get at the very essence of what was happening. Something, I knew was breaking down. But at the same time I was touching the enormous inherent spiritual strength of the Russian people who were slowly beginning to recover their freedom.

No, Russia was not a Babylon falling in ruins!

দর্শকের ভূমিকায় না থেকে দেশের মানুষের সঙ্গে আমি যে এক সাহসী সংগ্রামে অংশ নিতে পেরেছি, এ-জন্য আমি গর্বিত, বলেছেন ইয়েভটুশেংকো। এই গর্ব কবি হিসেবে তাঁকে কতোটা উন্নত করেছে জানি না, কিন্তু, ব্যক্তি হিসেবে নিশ্চয় তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন। আর, পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও সুন্দর করে তোলার ব্যাপারে কবি ইয়েভটুশেংকোর চেয়ে ব্যক্তি ইয়েভটুশেংকোর প্রয়োজনই যে বেশি নয়, কে তা বলতে পারে!

দিব্যেন্দু পালিত

তিন তরঙ্গ—চাণক্য সেন। বাক্ সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ হয়ে উঠল। এর কারণও ছিল অনেক। বিশাল ভৌগলিক বিন্যাস, অসংখ্য ভাষা, আঞ্চলিক আচার আচরণে অসেতু-সম্ভব বিভিন্নতা, নানা ধর্মমত এবং নানা রকমের বিশ্বাস এদেশের মাটিকে আশ্রয় করে আছে। কিন্তু তা' সত্বেও, এদেশের অখন্ডতা এবং সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বাইরের জগতে এক অপার বিস্ময়ের কারণ। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নায়ক-গোষ্ঠীকে যেমন আশ্চর্য করেছে, অন্যদিকে তেমনই বিচলিত করেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সম্পর্কে নানা রাষ্ট্রের, বিশেষ করে পশ্চিম রাষ্ট্রগোষ্ঠীর, এক আপাত তুরীয় দৃষ্টি আমাদের কৃতার্থ করেছিল।

ভারতীয় রাজনীতির সব থেকে অসংলগ্ন চরিত্রেরও দেখা পাওয়া যায় এই সময়। মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একই পংক্তিতে আশ্রয় পেল রাশিয়া। দু' পক্ষেরই তখন বদান্যতার উদার হস্ত প্রসারিত। শুধু কোনো কোনো উপলক্ষে মার্কিন শাসন ব্যবস্থার কর্ণধার অবিকল স্বদেশোচিত আচরনে এদেশ সম্পর্কে তাঁদের অক্ষম অনুসন্ধিৎসা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা প্ররোচিত হয়েছেন পাশা খেলার দানে ভুল চাল দিতে। এর ফল : ভারত সমুদ্রে ঈষৎ তরঙ্গ।

তবে সে-পর্যায়ে মনে হয়েছিল, এ সমস্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য, আধিপত্য বিস্তারের চেয়ে অনেক বেশি সমীপবর্তী হওয়া। কিন্তু দীর্ঘকাল এ অবস্থা, তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল। তাই ক্রমশ, তাঁদের সম্পর্কে এ দেশে যে-সদিচ্ছার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই সুড়ঙ্গপথে তাঁরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এবং আজ তা স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ যে মার্কিন প্রভাবের শিকড় অনেক গভীরে প্রসারিত।

এই প্রয়াসকে সম্পূর্ণ করতে তাই দরকার, নানাভাবে এবং নানা বেশে ওদেশ থেকে এদেশে বহু মানুষের রপ্তানি। তাই হঠাৎ ভারতবর্ষের গ্রামে জনপদে, দপ্তরে, সরকারী প্রকল্পে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এঁদের এমন সহসা আবির্ভাব সকলের মনেই এক পরম কৌতুহলের বিষয়। সব থেকে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তাঁদের গবেষণার বিষয় নির্বাচন নিয়ে। তবে একথাও ঠিক নয় যে, মার্কিন ছাত্র মাত্রেই বিশেষ উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছেন। কিন্তু এঁদের এদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার যতোটুকু সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ইয়াঙ্কি রাষ্ট্র নায়করা তাই করে। আর তার মূল্য পরোক্ষভাবে এদেশকেই দিতে হয়। বিভিন্ন মার্কিন গ্রান্ট অনুসারে যে-অর্থ ব্যয় করা হয়, তার একটি বিরাট অংশের ভাগীদার এঁরাই।

এমনই তিনজন মার্কিন পরিব্রাজক বর্তমান উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তবে এই পরিব্রাজকেরা সকলেই কুড়ি বছরের এদিকে এবং শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এলেও আসলে শিক্ষার্থিনী। তবে এঁদেরই মন্তব্য অনুসারে বলা যায়, ইংরেজী শেখাতে তাঁদের পাঠানোর কোনো অর্থ হয় না। শিক্ষাদানের চেয়ে এদের বেশি আগ্রহ এদেশ দেখার। কিন্তু এই তরলচিত্ত বালিকারা অচিরেই যে পথ বেছে নিলেন, তা সস্তা রোমান্সের পক্ষে যথেষ্ট। আর শুধুমাত্র এঁদের জীবনের এইটুকু গ্রহণ করেই লেখক মনে হয়, মস্ত অবিচার করেছেন।

যেমন পাঞ্জাবের সেই মধুবন গ্রামের কৃষি বিদ্যালয়, যেখানে তিনটি তরঙ্গ মিলিত হল : জোয়ানা, আইরিণ ও মেরী, আমেরিকার এই তিনটি মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের আবহাওয়াকে উন্মুখ করে তুলল। ফলে যা সচরাচর দেখা যায় না, তাই ঘটল। অধ্যাপকেরা

বাচাল হয়ে উঠলেন, এবং তাঁরা, মনে হয়, এ'দের দেখে দেবদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করলেন, এবং এ'দের সান্নিধ্য প্রভু পদস্পর্শের বিপুল রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করল। নিঃসন্দেহে এমন অনুকূল পরিবেশ, গ্রাম—আখের ক্ষেত ও কৌশলা নদীর মিলিত সমারোহে মন-দেওয়া এবং নেওয়ার উপাখ্যান বেশ ভালো জমে, আর এতো আমাদেরই ইচ্ছা পূরণের কাহিনী।

স্বভাবতই এ পটভূমি, এমন পাত্র-পাত্রী এক নতুন দিগন্তের দিকনির্দেশ করবে আশা করা গিয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল, এ উপন্যাস পাঠক সাধারণের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করবে। তবে সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। লেখক আমাদের দেশের এই পরিবর্তিত প্রেমিতকে যথাযথ ধরতে পারেন নি। একটি গল্পের খসড়া তিনি মাত্র তৈরি করেছেন। এ ধরনের সাহিত্য রচনায় যাঁরা ব্রতী, তাঁরা বলবেন—এ এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু এমন প্রস্তাব কেমন করে বাতিল করে দেব যে, উপন্যাসের চরিত্র রচনায় সার্বজনীনতাই যুক্তিসিদ্ধ!

নৃপেন্দ্র সান্যাল

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

অষ্টাবিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

চতুরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৩
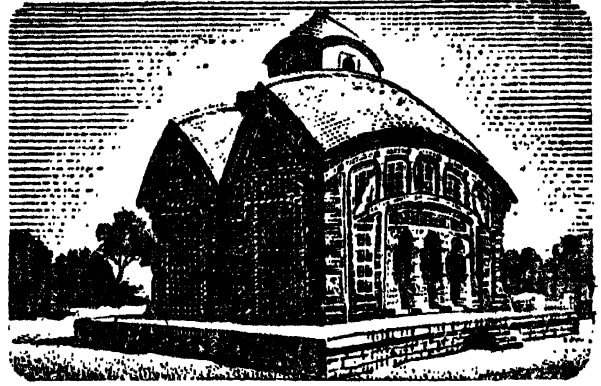
ভারতীয় ঐতিহ্য

হুমায়ুন কবির

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু এবং মুসলমানের সহযোগ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের কাহিনীই মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সত্যিকার ইতিহাস। রামানন্দ এবং কবির, চৈতন্য এবং নানক, খাজা মইনউদ্দীন এবং বাবা ফরিদের নাম এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে। বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের পারস্পরিক পরিচয় ও সমন্বয়ের ফলেই যে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদের অপূর্ব বিকাশ, একথা বিবেকবান সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। এ ধরনের সহযোগ ও সমাবেশ কেবলমাত্র ধর্ম বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সীমিত থাকেনি। পাঠান রাজত্বেই রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারে, পালাপার্বণ উৎসবে, ভোজনে বসন-ভূষণে এককথায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে এ ধরনের সহযোগ শুরু হয়েছিল, মোগল রাজত্বে সে সহযোগ ও আদানপ্রদান আরো ব্যাপক হয়ে উঠে। বসন-ভূষণে ভারতবর্ষে যে দরবারী পোশাকের প্রচলন হল, আরব অথবা মধ্য এসিয়ার প্রভাব থাকলেও তা স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য যে ভাষার উদ্ভব হল, আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে তাই অন্যতম যোগসূত্র। মধ্যযুগেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়, দুটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি পরস্পরের সহযোগিতায় নতুন সংস্কৃতির বনিয়াদ স্থাপন করেছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রায় প্রত্যেক স্তরেই সহযোগ ও সমন্বয়ের প্রয়াস স্পষ্ট। ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও চিত্রকলায়, সামাজিক রীতি ও জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসে নূতন ও পুরাতন ধারা এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তাদের বিশিষ্ট অবদানকে আজ পৃথক করে দেখা প্রায় অসম্ভব। ভারতীয় জীবনদৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু এবং নবাগত মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে যে আজ যদি কেউ নিষ্কলুষ হিন্দু অথবা অমিশ্র মুসলিম সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করতে চায়, তবে তাতে তার ঐতিহাসিক অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। বাবর ১৫২৬ সালে ভারতবর্ষে বসতি শুরু করেন, কিন্তু তখনই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় তাঁকে বিস্মিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় যে

সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র। তাই তিনি তাকে হিন্দুস্তানী জীবনদৃষ্টি বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

প্রথম দৃষ্টিতে অনেকেরই মনে হবে যে দর্শনের জগতের সঙ্গে অর্থনীতির জগতের কোনই সম্বন্ধ নাই। ভারতবর্ষে অর্থনীতির মতন দর্শনের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের সহযোগের পরিচয় পদে পদে মেলে। বর্তমানের ভারতবর্ষে সাধারণ হিন্দুর যে বিশ্বদৃষ্টি, তার কতখানি বেদ উপনিষদের দান এবং কতখানি ইসলামের আদর্শ থেকে নেওয়া—সে কথা বলা কঠিন। ঠিক একই কথা ভারতীয় মুসলমানের বেলায়ও বলা চলে। তার আচারে, বিশ্বাসে, ব্যবহারে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পদে পদে হিন্দু সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্ট। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় ধর্মদৃষ্টি ও দর্শনের প্রভাব কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকেনি। প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিম এসিয়া ও মিশরকে প্রভাবান্বিত করেছিল। যীশুখৃস্ট পাহাড়ের চূড়ায় যে নীতি-নির্দেশ করেন, অনেক পণ্ডিতের মতে সারমন অন দি মাউন্টের সে সব নীতিকথা ও গল্পের পূর্বাভাস বৌদ্ধজাতক এবং অন্যান্য নীতিগ্রন্থে মেলে। কারো কারো মতে বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায় এসিয়া মাইনরে বসবাস করতে শুরু করেন এবং কালক্রমে তাঁরাই এসিনি বলে পরিচিত হন। মধ্যযুগেও ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচিন্তা মুসলিম ধর্মচিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছে। সুফী মতবাদের ভিত্তি কোরাণে মিলবে কিন্তু তার বিভিন্ন প্রকাশে হিন্দু চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্ট। বস্তুত-পক্ষে ইসলামে যে ধর্মদৃষ্টির প্রকাশ, তার বিকাশে বাহিরের বহু চিন্তাধারা সহায়তা করেছে। খৃস্টধর্ম, নবপ্লাতনিক মতবাদ, যরথুস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানিকিয় চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে মুসলিম দর্শন গড়ে উঠেছিল কিন্তু বহিরাগত সমস্ত প্রভাবের মধ্যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতবাদ সুফী বিশ্বাসকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করেছে বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। প্রাচীনতম কাল থেকেই সমস্ত সেমিতিক ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তির স্বতন্ত্র অমরত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু সুফী ধর্মে ভক্তির প্রাবল্যে পরম ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তির অবলুপ্তি সে ধারার ব্যতিক্রম। হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতবাদের প্রভাবেই এ পরিবর্তন, একথা বললে কি অন্যায় হবে?

ভাবজগতে দানপ্রদানই বিকাশের ধর্ম। গ্রহণ করতে না পারলে দেবার সামর্থ্যও লুপ্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবে সুফী মতবাদ রূপায়িত হল কিন্তু তার ফলে হিন্দু ধর্মদৃষ্টিও নানাভাবে বদলে গেল। শঙ্কর-বেদান্তকে অনেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন, বলেন যে তা একান্তভাবে হিন্দুমানসের সৃষ্টি, তার উপরে বাইরের কোন প্রভাবের ছায়াও মেলে না। ইসলামের সংস্পর্শে ভারতীয় চিন্তাধারায় যে আলোড়ন, তার আবেগ শঙ্করকেও প্রভাবান্বিত করেছিল একথা অনেকেই হয়তো মানতে চাইবেন না কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে এ সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক ধারণাই বদলে যাবে। ইতিহাসের আদিযুগ থেকেই ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শনে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছে, নতুন চিন্তাধারা বা বিশ্বদৃষ্টির যে সমস্ত বিকাশ দেখা দিয়েছে, শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সেগুলি সবই উত্তর ভারতে ঘটেছিল। খৃস্টীয় অষ্টম শতকের গোড়ায় অকস্মাৎ তা বদলে গেল এবং ভারতীয় দর্শন ও ধর্মভাবনা উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতে চলে এল। শঙ্কর এবং রামানুজ, নিম্বাদিত্য এবং বল্লভাচার্য—এ'রা সকলেই দাক্ষিণাত্যবাসী, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের বিকাশ তখন দক্ষিণ ভারতেই হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক বিপর্যয় এসেছিল বলে সেখানে সাংস্কৃতিক জীবনে ছেদ পড়ে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বীকার করা চলে না। দক্ষিণ ভারতেও বার বার রাজনৈতিক

বিপর্যয় ঘটেছে এবং ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও বহু মেলে যেখানে রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও মানুষের সাংস্কৃতিক ও চিন্তাসাধনার সমৃদ্ধি বহুদিন অব্যাহত রয়েছে। জাতির জীবনের প্রাণকেন্দ্র অকস্মাৎ উত্তর হতে দক্ষিণ ভারতবর্ষে কেন চলে গেল তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা অনেক গবেষণা করেছেন কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। খৃস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি দক্ষিণ ভারতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং তার ফলে দুইটি বিভিন্ন ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পারস্পরিক পরিচয়, সংঘাত ও সহযোগের ফলে জাতির জীবন সেখানে নতুন তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, এ কথা স্বীকার করলে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃতির এ আকস্মিক উদ্ভাসের বিবরণ দেওয়া অনেকটা সহজ হতে পারে। জানলেও অনেকে ভুলে যান যে দক্ষিণ ভারতেই ভারতবর্ষে ইসলামের প্রথম আবির্ভাব। অষ্টম শতকের শুরুর দিকে মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুদেশ অধিকার করেন কিন্তু তার বহু বৎসর আগেই আরব বণিকেরা ত্রিবাঙ্কুরে বাণিজ্য করতে আসতেন। দক্ষিণ ভারতে আরবদের যুদ্ধ বা দেশজয়ের কোন প্রচেষ্টার ইতিহাস নেই, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তির পথে আরব প্রভাব যে কত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেকালের একটি কিংবদন্তীতেই তার পরিচয় মেলে। কেরলের জনশ্রুতি বলে যে চেরামন পেরুমল বংশের শেষ রাজা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মক্কায় হজ করতে যান। যাবার প্রাক্কালে শাসনকার্য চালাবার জন্য তিনি কালিকটে যে প্রতিনিধিকে বসিয়ে যান, তার জামরীন নাম এ কিংবদন্তীর সত্যতার সাক্ষ্য। জামরীনের অভিষেক উৎসবে একজন মোপলাই তাকে তিলক পরিয়ে দিত। প্রচলিত জনশ্রুতি এ কথাও বলে যে শঙ্করের জন্মস্থান কলাদীর রাজাও শঙ্করাচার্যের জন্মের কিছুদিন পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হ'ন। কেরল যে সে যুগে কোনদিন মুসলিম রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত বা বিজিত হয়েছিল তার কোন উল্লেখ ইতিহাসে মেলে না। রাজার ধর্মান্তরের ফলে কালিকট বা কলাদীতে যে জনসাধারণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল, তারও কোন প্রমাণ নেই। তবু যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্নই সেখানে মুসলমানের বসতি এবং কয়েকজন রাজার ধর্মান্তরের কাহিনী থেকেই বোঝা যায় যে দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে সে যুগে মুসলমান প্রভাব ব্যাপক ও গভীরভাবে দেখা দিয়েছিল।

দুটি বিপরীতধর্মী জীবনদর্শনের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে ব্যক্তির মনে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার উদয় হয়। প্রচলিত বিশ্বাসের ভিত্তি যদি একবার টলে যায়, তখন মানুষ সর্বকিছু নিয়েই প্রশ্ন করতে শুরু করে। ব্যক্তির বুদ্ধি যত প্রখর, বিচারশক্তি যত প্রবল, এ ধরনের জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন তার মনে তত বেশী হবে এটা স্বাভাবিক। অষ্টম শতকে মালাবারেও তাই ঘটেছিল এবং শঙ্করাচার্যের মতন অসাধারণ প্রতিভা যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর অসঙ্গতি দেখে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবেন, নবাগত দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষ বিচার করে নিজের প্রয়োজনে তার বিশেষ বিশেষ যুক্তি বা মতবাদকে নিজের দর্শনের অঙ্গীভূত করে নেবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। উত্তর ভারতের সনাতন ধর্মবিশ্বাস ও জীবনদৃষ্টি ভাবগম্ভীর, অন্তর্মুখী সমন্বয়ধর্মী এবং মন্থর। দক্ষিণ ভারতে অষ্টম শতকে হিন্দু সমাজে যে নূতন দর্শন ও জীবনদৃষ্টির আবির্ভাব, তার মধ্যে আবেগের প্রখরতা এবং কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি ঝোঁক সুস্পষ্ট। উত্তর ভারতের আত্মকেন্দ্রীক স্থাবর এবং বুদ্ধিনির্ভর মনোবৃত্তি বদলে দক্ষিণে যে মনোবৃত্তির বিকাশ হল, সেখানে বুদ্ধিও আবেগের তীব্র প্রবাহে বিপ্লবধর্মী হয়ে উঠল। শঙ্করাচার্যের দর্শনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে যদি আলাদা করে দেখা হয় তবে তার প্রত্যেকটির মূলই হয়তো উপনিষদে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সামগ্রিক-

ভাবে তাঁর দর্শনের বিচার করলে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার পার্থক্য এত প্রকট যে সে প্রসঙ্গে বহিরাগত প্রভাবের কথা ভাবতেই হবে। ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা স্মরণ রাখলে ইসলামের প্রথম শতকে তার যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ও শক্তি, তারই প্রভাবে শঙ্করাচার্যের জীবনদৃষ্টিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল, একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে শঙ্করাচার্যের মতন শক্তিশালী ও সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিত্ব অতি বিরল। সাধারণ মানুষের ধারণা যে তিনি একান্তভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, তাঁর মানস সংগঠনে বহিরাগত কোন চিন্তাধারা বা প্রভাবের পরিচয় মেলে না। এমনকি কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে বৌদ্ধধর্মের উদারপন্থী কিন্তু ঐতিহ্যবিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ্যধর্মের উগ্র সমর্থক হিসাবেই শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। পৃথিবী যে নশ্বর এ মতবাদ তিনি এত জোর দিয়ে প্রচাব করেছিলেন যে তার ফলে সমাজে নীতি অথবা ধর্মবোধের স্থান থাকে না। অদ্বৈতবাদকে চরম সত্য মনে করলে সংসারকে মায়া বলে বর্জন করতে হয়। এবং সমস্ত বিশ্বসংসারকে মায়া বললে পৃথিবীতে কারু কোন কাজেরই কোন মূল্য থাকে না। এ কথা স্বীকার করেন বলে বৌদ্ধ ধর্মে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা সমস্ত বাসনা কামনা বর্জন করে জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তির সাধনা করেন। শঙ্করাচার্য কিন্তু বৌদ্ধ মতবাদ স্বীকার করেন নি, মায়াবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি বৌদ্ধ জীবনদৃষ্টিকে অস্বীকার করেছেন, নির্বাণ এবং নিষ্ক্রিয়তাকে সবলে বর্জন করেছেন।

শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের জীবনকে বহুভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। বৌদ্ধদর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের খন্ডন ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে তাঁর প্রধান দান। বৌদ্ধদের মতন তিনিও বলেছেন যে সংসারের কোন পারমার্থিক সত্বা নেই, জড়বাদের চরম পরিণতিতে স্বয়ংবিরোধ অনিবার্য। সাধারণ অভিজ্ঞতায় অসঙ্গতি রয়েছে বলে বৌদ্ধ দার্শনিক সকল অভিজ্ঞতাকেই অবাস্তব বলেছেন। শঙ্করাচার্য সে কথা মানেন নি, বলেছেন যে, যে অভিজ্ঞতাকে বৌদ্ধ দার্শনিক অবাস্তব বলেছেন, তারই ভিত্তিতে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন বলে এ সিদ্ধান্ত ভুল। তাই শঙ্করের মতে অভিজ্ঞতাকে অবাস্তব না বলে অনির্বচনীয় বলাই সঙ্গত। অভিজ্ঞতাকে অবাস্তব বলে বর্জন করলে অভিজ্ঞতা হল কেন সে প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না। অভিজ্ঞতাকে কাল্পনিক বা মায়া বললেও সমস্যার নিরসন হয় না, কারণ কল্পনা বা মায়ার প্রকৃতি কি তা না জানলে এগুলি কেবলমাত্র কথায় পর্যবসিত হয়। শঙ্করাচার্যের মতে আমরা যাকে মায়া বলি, দর্শনের বিচারে তাও অনির্বচনীয় রহস্য থেকে যায়।

ন্যায় ও দর্শনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধমতবাদের যে অবদান, শঙ্করাচার্য তাকে পুরোপুরি স্বীকার করেছেন, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের নেতিবাদে সাধারণ মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায় বলে তিনি দর্শনের ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ মতবাদের উত্তর খুঁজেছেন। প্রত্যয়ই বস্তুজগত বা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তি, বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে একমত কিন্তু তাঁদের যুক্তি খন্ডন করে শঙ্করাচার্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রত্যয় নিত্য এবং সত্য, অভিজ্ঞতার নশ্বরতা ও চঞ্চলতার ভিত্তি হিসাবে প্রত্যয় অবিনশ্বর ও পরিবর্তন-হীন। প্রত্যয় মায়ার মধ্যে নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। তাই অভিজ্ঞতার সমস্ত উপাদানেরই আংশিক সত্য রয়েছে। আমরা যা কিছু দেখিশুনি, স্পর্শ করি বা ভাবি, তার প্রত্যেকেরই ব্যবহারিক সত্য রয়েছে এবং থাকবে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে আর ভেদ থাকে না, কাজেই তখন ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করে তাঁর চোখে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

বৌদ্ধ দর্শনকে স্বীকার করে সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্য বৈদিক ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকেও স্বীকার করেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য যে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাই পূজা অর্চনা বা ধ্যানধারণাকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ কিছু না দেখলে ধ্যানধারণা করতে পারে না এবং ভক্তির মধ্যে সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করে, এ মতবাদকে প্রবলভাবে সমর্থন ও প্রচার করেছিলেন বলে শঙ্করাচার্যের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তিনি সাধারণ মানুষের উপযোগী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে দেশময় ব্যাপক করে তুলতে পেরেছিলেন।

কর্ম ভিন্ন মানুষের মুক্তি নেই—এ বিশ্বাসকেও তিনি সবলে ঘোষণা করেছিলেন বলে শঙ্করাচার্যের শিক্ষার ফলে কর্মযোগ দেশময় স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর অল্পদিনের জীবনে দেশে তিনি যে বিপুল আলোড়ন এনেছিলেন তাতেই প্রমাণ হয় যে তিনি কর্মযোগ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মযোগ অভ্যাসও করেছেন। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, মায়াবাদে বিশ্বাসী বলে শঙ্করাচার্য কর্মকে বর্জন করেছিলেন। যুক্তির ক্ষেত্রেই এ ভুল দূর করা যায়, কারণ কর্মবিমুখ হলে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের কোন তফাৎ থাকত না। অথচ সকলেই জানে যে বৌদ্ধ মতবাদকে খন্ডন করেই শঙ্করাচার্য নিজের জীবনদৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শাস্ত্রে যে সমস্ত আচার-বিচারের উল্লেখ আছে, সাধনার প্রথম স্তরে সেগুলি পুরোপুরি পালন করতে হবে এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। শঙ্করাচার্যের জন্মকালে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় মতবাদেরই অবনতি ঘটেছিল। বিকৃত হিন্দু অথবা ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ জীবনদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়তার যে পরিচয় মেলে তারই প্রতিক্রিয়ায় শঙ্করাচার্য কর্মের উপর এত জোর দিয়েছিলেন এ কথা মনে করা স্বাভাবিক। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে গীতার প্রভাবেই শঙ্করমতবাদে কর্মের এত প্রশস্তি। এ সমস্ত প্রভাবকে অস্বীকার না করেও আধুনিক কোন কোন কোন পণ্ডিতের মত যে দক্ষিণ ভারতে সে যুগে ইসলামের আবির্ভাবের ফলেই শঙ্করমতবাদে কর্মের উপর এত জোর। ইসলাম একান্তভাবে কর্মনির্ভর। ধর্মদৃষ্টি এবং একেশ্বরবাদ ইসলামের জীবনদর্শনের দৃঢ়তম ভিত্তি। শঙ্করদর্শনে একদিকে অদ্বৈত-বাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অন্যদিকে কর্মজীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ তাই ইসলামের সঙ্গে তাঁর এক গভীর সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত মনে করলে অন্যায় হবে না।

সমন্বয়ের যে মনোবৃত্তি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, শঙ্করাচার্যের সমগ্র জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতবাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে তিনি একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে যে আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার ফলে তদানিন্তন ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। মনে হয় যে নবাগত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন দর্শনকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। তার মধ্যে যে সমস্ত বিশ্বাস ও আচার সনাতন হিন্দু চিন্তাধারা ও জীবনদৃষ্টির সঙ্গে খাপ খায়, তাদের গ্রহণ করে এক নতুন ও সমৃদ্ধ জীবনদর্শন স্থাপিত করেছেন। তাঁর অদ্বৈতবাদে দ্বিধা নাই, দ্বৈতবাদকে তিনি সমগ্রভাবে বর্জন করেছেন। শ্রুতি বা দৈবদত্ত শাস্ত্রের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সনাতন ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠাকেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ এবং তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা যে তিনি নিজে নতুন কোন বাণী আনেন নাই বরং সনাতন সত্যকেই নতুন যুগের উপযোগী করে নতুনভাবে প্রকাশ করছেন—এ সব কথা স্বভাবতই পদে পদে ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও জীবন দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়। শঙ্করাচার্যের জন্মের ঠিক পূর্বে মালাবারে ইসলামের

আবির্ভাব ও বিস্তারের কথা মনে রাখলে শঙ্করমতবাদ এবং ইসলামের মধ্যে এই আশ্চর্য সাদৃশ্যকে আকস্মিক মনে করা কঠিন।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্মজীবনের ইতিহাস সমন্বয় সাধনের ইতিহাস এবং শঙ্করাচার্য এই সমন্বয় প্রচেষ্টার অগ্রদূত। রামানন্দ এবং কবির, নানক এবং দাদু, চৈতন্য এবং তুকারাম —তাঁরা সকলেই এই সমন্বয় সাধনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এ সমস্ত সাধনায় পুরাতনের সঙ্গে কোথাও ছেদ পড়েনি, পুরাতনকে অস্বীকার করবার কোন চেষ্টা নেই। নূতনকে পুরাতনের সঙ্গে যে সহজ স্বাচ্ছন্দে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে, তার ফলে ভারতবর্ষের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও সাধনার ঐক্য ও ধারাবাহিকতা আজও সমস্ত বিশ্বের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, এবং এই প্রচেষ্টার অগ্রদূত হিসাবে তার গৌরব শঙ্করাচার্যের স্মৃতিকে চিরদিন অমর করে রাখবে।

[ক্রমশঃ]
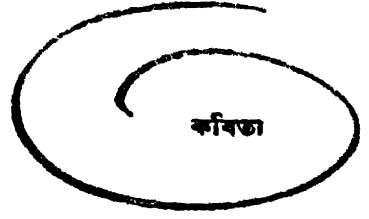
অনিবার্য

হরপ্রসাদ মিত্র

লোকসংখ্যা বৃদ্ধিশীল, অন্নও বাড়ন্ত।
তবু দেশে আসবে যাবে বর্ষা ও বসন্ত।
বিশ্বাস না থাক্, তবু বুদ্ধি মারমুখী!
এই শুধু চিরস্থির—শিশুরাই সুখী।
নানা পরিবর্তনেও একথা অটুট,
কোনো যুগে নেই এর কোনো কাটকুট।
অবুঝ শিশুর জন্যে কবিদের মন
রচনা-নিয়োগে সুখে করে টন্‌টন্‌।

শিশুদের নেতা হোন্ রাম-শাম-যদু।
প্রমত্ত শৈশবে পন্ড ফাল্গুন ও মধু।
যেই খরা বাড়ে সেই প্রচন্ড বৈশাখে
পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পড়েন বিপাকে।
অবসরহীন মর্ত, তারই এক কোনে
বেদান্তের সমর্পণ চার্বাক-চরণে।

কবি না হ'লে প'ড়ো না

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বেলা চারটের কলে জল নেই-এর মতন
—প্রেমের আজ এমনই পরিণাম—
চারটে লাইন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ল, যেন ধুঁকতে ধুঁকতে।
পরে, আর একটি ফোঁটাও পড়ে না।

কলমটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
আমার মনে প'ড়ে গেল সেই টাঙ্গাওয়ালার কথা,
আর তার ঘোড়াটাকে।
ঘোড়াটা পথের ওপরই ম'রে প'ড়ে যায়।
কে তাকে পরে সরিয়ে নিয়ে গেল, অথবা আজো গেছে কি না,
জানি না।

সেদিনও যেমন, হু হু ক'রে হাওয়া বইছে আজো দিগন্তে।
আজো, সেদিনের মতনই, আরো একটি মৃত্যু :
ঘোড়ার, অথবা কবিতার, কী এসে যায়?
না হয় সে-মৃত্যু হ'ত আমারই,
বা আমার মনের গুদামে প'ড়ে-থাকা তোমারই—
সেই আবছা, ভ্যাপসা চোখের, বিকৃত ঠোঁটের,
বহুকাল আগে উচ্চারিত দুটি-একটি শব্দের প্রায়-বিস্মৃত স্মৃতির-
তাতেই বা কী?

সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি জীবনের :
ভালোবাসতেই এসেছিলাম, পারলাম না।
এ-সূর্যাস্ত বনবনান্ত রইল কি না রইল, ইহ বাহ্য।
এই অতি-সত্য অতি-নিদারুণ বেদনাটাকে পাছে ঠাট্টা শোনায়,
তাই আগে যা বলেছি, শেষেও বলি :
কবি না হ'লে প'ড়ো না।

আর, ঘোড়ার মৃত্যুতে যেটা পারিনি, করব এইবার—
কবিতাকে স্বমস্তকে বহন ক'রে নিয়ে যাব শ্মশানে,
শেষ কৃত্য সম্পাদন করব পরম শ্রদ্ধায়,
শোকের অবশ অনুভূতিতে, শুকনো চোখের জলে।
পরে ফিরে আসব চিরাচরিতে।

জোনাকি

সুশীল রায়

এখানে অনন্ত আলো ছিল এক দিন
অন্ধকারে আজ সবই লীন।
শখের সূর্যের সঙ্গে মিতালি করেছি ঢের ঢের।
আজ সে সমস্ত কথা দূর-অতীতের।
 শীতের গভীর রাত্রি সর্বাঙ্গের আবরণ হয়ে
 হয়েছে কবোষ্ণ সঙ্গী সময়ে এবং অসময়ে।

এই ভালো, এই ভালো। আলোর প্রাচুর্য যারা চায়
নিজের আলোর পুঁজি শুনি নাকি তারাই হারায়।
 সংখ্যাহীন তারা নিয়ে, নিয়ে চন্দ্রবিন্দুর নিশানা
 অন্ধকারের স্বাদ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে জানা।
জীবনের পরমতৃপ্তি পেয়ে গেছি পরিপূর্ণতায়—
সুখে আছি, ভালো আছি, নিভৃত এ জোনাকি-পাড়ায়॥

ডাক

মণীন্দ্র রায়

বুকে চাপধরা শূন্য রয়েছে পাশেই ;
আছে ভয়ঙ্কর ফাঁকা পায়ে পায়ে ; যেন
সচল খাদের মতো ; অথবা যেমন
থাকা-না-থাকার দ্বন্দ্বে বোমারু বিমানে
নাপাম-সুইচ আর খোলা পকেটের
প্রেমিকা-ফোটোর মাঝামাঝি
যোজন যোজন নগ্ন না-মানুষ মাটি।

তবু, কী আশ্চর্য, কেন চোখ বুজলেই
মনের পর্দায় দেখি দূর গ্রামে খ'ড়ো-চাল বাড়ি ;
আর আঙিনায় তার ইলেকট্রনিকের
রেডিওতে বাংলা খবর—
একটানে মান্ধাতার নোনাধরা বুকে
ঢোকায় কায়রো-মস্কো-লাতিন মার্কিন।
সব অন্তরীক্ষে তাই সাঁকো বানাবার
সীমানা-ডিঙানো তাজা ডাক॥

যুদ্ধ বাধ্‌লে

ফিলিপ হবস্‌বম্‌

যুদ্ধ বাধলে আমার দিকে থেকো,
বলেছিলাম বন্ধুকে। ওজর তুলে সে বলেছিলো
কি নিয়ে যুদ্ধ, কার জন্য যুদ্ধ, আগে জানতে হবে,
এই সবের ওপর নির্ভর করবে তার সম্মতি।
কি নিয়ে যুদ্ধ? কার জন্য যুদ্ধ?
যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ, লড়ায়ের জন্য লড়াই, আর আবার কি?
আসল কথাটা হোলো তুমি কার পক্ষে থাক্‌ছো।

আজ তাই
তোমাকে দেখি, আর ভাবি, হে আমার প্রাণপ্রিয়া,
বহু দৈন্য শোক জর্জ্জরিতা, সন্তান প্রসবিনী,
বহু দুর্ভাবনার বলীরেখায় কলঙ্কিত আননা,
তোমাকে দেখি, আর ভাবি
সুন্দরী নারী অপ্রতুল নয় এ ভুবনে
বয়সে ছোটো, গড়নে আঁটোসাঁটো,
লোভনীয়া ক্ষণিকের নর্মসহচরী—
কোনো সাড়া জাগে না মনে। বাতিল করে দিই তাদের।
প্রেম সৌন্দর্যে নয়, সম্মোহনে নয়,
বাড়ীতে গাড়ীতে বিলাস ব্যসনে নয়।
আমার কড়া পড়া হাতে তোমার শ্রমশুষ্ক হাত দুখানি ধরি।
বার্দো, লোল্লা, লোরেনের শোভাযাত্রা দূরে পড়ে থাক।
দেখছি
আমার চোখে ন্যস্ত তোমার সুনির্ভর দুটি চোখ
সুচির বিশ্বস্ত প্রেমে পূর্ণ,
যে প্রেম
প্রেমের জন্যই প্রেম, হে আমার প্রাণ-প্রিয়া।

অনুবাদ : মণীশ ঘটক

আপনি

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনি জানেন না নীরদবাবু, আপনার কত বড় সম্পদ আমি অপহরণ করেছিলাম। আপনি জানেন না, কোনদিন কোন কালে জানতে পারবেন না। সেজন্যে আমার একটু অনুতাপ নেই, একবিন্দু আক্ষেপ নেই, কারণ আমি জানি আপনি সুখী। আপনার সুখ অপহরণ করতে আমি পারি নি।

মাঝে মাঝে অবাক হয়ে আপনার দিকে দেখেছি, আপনার চেহারাটাতেই যেন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছাপ আছে। নিজের চেহারা নিজে বোধহয় ভাল করে আয়নায় কখনো দেখেননি। আপনার নাতিদীর্ঘ কিঞ্চিৎ স্থূল দেহখানা আপনার চাকার মত গোল মুখের ওপর টম্যাটোর মত নাকটি। ছোট ছোট চিকচিকে খুশী খুশী দুটো চোখ আর সামান্য বিস্তৃত ঠোঁটদুটি দেখলে যে কোন মানুষই বলবে আপনি সুখী। জন্ম থেকেই হাসি আর খুশী আপনার মুখে মাখা ছিল। সে হাসি কখনো মেঘলা হোত না। ঝকঝকে কোট ট্রাউজার পরতেন। পায়ের জুতোটি পর্যন্ত পরিষ্কার আয়নার মত। আপনি নিশ্চয় আতর ব্যবহার করতেন। ওটা আপনার একটা সখ। আসলে আপনার সত্ত্বাটি পুরোপুরি সৌখীন আর সুখী।

দুঃখ বেদনা জ্বালা যন্ত্রণা এ সব কথাগুলো আপনার জন্ম থেকেই কে যেন জীবনের পাতায় মুছে রেখেছিল। ওসব ভাবসাব আপনার জন্যে নয়। সত্যিই আপনাকে দেখে অবাক হতাম। শুধু অবাকই বা হবো কেন? আপনাকে ভালবাসতাম।

আমি জানি এ কথাটা বিশ্বাস করতে আপনার কষ্ট হবে। তা হোক, তবু বিশ্বাস করুন আপনাকে ভালবাসতাম। কেন যে ভালবাসতাম, তাও ঠিক বুঝি না। এমনও হতে পারে যে ভালবাসা পাওয়াটা আপনার একটা স্বাভাবিক অধিকার ছিল। আপনাকে ভাল না বেসে কারো উপায় ছিল না।

হ্যাঁ, অনুপমাও আপনাকে ভালবাসত।

কথাটা জেনে আপনার অবাক হবার কথা নয়, অবাক হয়েছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, এ কেমন করে সম্ভব! বহুদিন অনেক ভেবেও ভাল করে বুঝতে পারিনি, কি করে ও আপনাকে ভালবাসতে পারল! পরে বুঝেছিলাম, ভালবাসার মানেটা আমরা যেমন একটা মাত্র ভাবে ধরি, সত্যি সত্যি তা নয়। অনেক ভাবে অনেক রকমে ভালবাসা যায়। আর সেটা সবচেয়ে ভাল করে জানে রমণীকুল।

কথাটা নিজে বুঝলেও আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। কেমন জানেন, একটা ফুলকে ভালবাসলে কি আর একটা পাখীকে ভালবাসা যায় না? অন্ধকার যেমন ভাল লাগে আলোও কি তেমনি ভাল লাগতে পারে না। সব কিছু যে একই রকমে ভালবাসতে হবে, সব আলো যে একই রঙে রাঙাতে হবে, এমন কি কথা আছে।

এগুলো আমার ভাবনা। আপনি তো মশাই ভাবনাচিন্তার ধার ধারেন না। বেশ কাটিয়ে দিলেন নীরদবাবু। সময়টা তুড়ি মেরে হাসতে হাসতে কাটিয়ে দিলেন—আর আমরা!

আপনি কিন্তু একটি কথা জানতেন না যে আপনার একটি সম্পদ আমি অপহরণ

করেছিলাম আর তার জন্যে আমার কোন অনুতাপ নেই।

নামটা বললে আমাকে চিনতে পারবেন, আমার নাম বসন্ত সেন। হ্যাঁ, আমি সেই বসন্ত সেন। যাকে আপনি রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত আপনার স্ত্রীকে পড়াতে দেখতেন। বাংলা অনার্স পড়াতাম আপনার স্ত্রীকে, কিন্তু আপনি জানতেন না যে তারও চার বছর আগে অনুপমা আমার কাছ থেকে আসল পাঠ নিয়েছিল। সেটা কলেজের পাঠ নয়, যৌবন ধর্মের পাঠ।

এতে আর অস্বাভাবিক কিছু কি থাকতে পারে, যুবক যুবতী থাকলেই তাদের কিছু বৃত্তান্ত থাকে। এও ছিল তেমনি এক অতি স্বাভাবিক চিরকেলে বৃত্তান্ত। আপনি জানেন, অনুপমার দাদা আমার বন্ধু। আমার সহপাঠী। অথচ অনুপমার দাদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব একটা গভীর ঘনিষ্ঠ তেমন কিছু নয়। ও জানত, বসন্ত সেন দরিদ্র একটি ভাল ছাত্র। একটি আদর্শ অধ্যাপক। আমিও জানতুম, ও সখের অধ্যাপক। অধ্যাপনায় ও যা রোজগার করে, তার চেয়ে অনেক বেশী রোজগার হয় ওর শেয়ারের ডিভিডেণ্ডে।

তবু বন্ধুত্ব ছিল। ও আমাকে সাহায্য করতে চাইত, আর আমি ওর সাহায্য বাইরে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলেও মনে মনে চাইতাম। হয়তো আমার মান বাঁচাবার জন্যেই ও আমাকে একটা কোন কাজ না দিয়ে সাহায্য করতে চাইত না, আর সেই জন্যে ওর বোন অনুপমার পড়াবার ভার যখন আমায় দিলে তখন আমি এম. এ. পড়ি আর অনুপমা ইস্কুলের বেড়া পেড়োবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

এ সব কথা আপনি জানেন না। অনুপমা আপনাকে কোনদিন বলেনি। আমিও বলিনি, অনুপমার দাদা বলা প্রয়োজন মনে করেনি। আপনি, অনুপমা, অনুপমার দাদা, আপনাদের ঘনিষ্ঠ স্বার্থপুষ্ট সম্পর্কের মাঝখানে আমি একটি অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছিলাম। আপনি আর অনুপমার দাদা আমাকে কিছুটা কৃপা করতেন, আর আমি সেই কৃপা সহ্য করতে পারতাম না বলেই হয়তো আপনার সবচেয়ে দামী সম্পদটি চুরি করেছিলাম।

শুধু কি তাই? না, হয়তো শুধু তাই নয়। আরও কিছু ছিল। নিজেকে বিচার করে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, বোঝা বোধহয় যায়ও না।

এমনও হতে পারে, আপনিই জিতেছেন, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি।

আমি জানি, আমি সব কথা আজ বললেও আপনি আর শুনবেন না, এখন আপনি দেখাশোনার বাইরে। তবু বলছি, নীরদবাবু আপনাকে আমি ভালবাসতাম, আর আপনার সুখকে আজ ঈর্ষা করেছি। কারণটা আপনি আন্দাজ করতে পারবেন না। বাইরে থেকে কতটুকুই বা আমাকে বুঝতেন! তাই সত্যি কথা বলি, সুখ কাকে বলে জীবনে কখনো জানলাম না।

আপনি ভাববেন, অনুপমার মত মেয়ের সঙ্গলাভ করেও যদি সুখ আমি না পেয়ে থাকি, তবে কিসে আর সুখ পাব? না, পাইনি। অনুপমার সঙ্গে আপনার চেয়ে বেশী কাল আমি মিশেছি, আপনার চেয়ে অনেক গোপনে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছি, কিন্তু সুখ পাইনি।

আচ্ছা, বলতে পারেন নীরদবাবু আপনার সুখের উৎসটা কোথায়? বোধহয় আপনার নিজেরই মনে। বাইরের কোন কিছু আপনার সুখের অপেক্ষা করেনি, বাইরের কোন বস্তু থেকে আপনি সুখ চাননি। তাই বাইরের কোন ঘটনা আপনার সুখকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

নীরদবাবু, আপনি ভাগ্যবান।

দশবছর আগে অমন রূপসী ধনী কন্যার সঙ্গলাভ করেও আমি আমার ভাগ্যকে বাহাদুরী দিতে পারলাম না। মানুষ শুনলে বলবে, এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয় হে! জন্মেছিলে তো এক কেরানী তনয় হয়ে, বাবা মারা গেল দশবছর বয়েসে। গোটা তিনেক বোন আর বিধবা মা নিয়ে উপোস করতে করতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিন কাটিয়েছ। খুব ভাগ্য তোমার যে অনুপমার মত মেয়ে তোমায় ভালবেসেছিল!

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়।

অনুপমার ভালবাসা নানা রঙের। আমার বরাতে বোধহয় কালো অন্ধকারের রঙটাই পড়েছিল। ভালবাসার এই অন্ধকার বন্ধ দিকটা আমাকে চিরটা কাল শুধু আবদ্ধ করে রাখল। ভাল করে একটা নিঃশ্বাস ফেলতেও দিল না।

অথচ আপনি জানেন, অনুপমার মত ঠান্ডা নম্র মেয়ে খুব বেশী দেখা যায় না।

ওর চোখ দুটি কি কখনো আপনি ভাল করে দেখেছেন নীরদবাবু? ওর ওই বড় বড় দুটি চোখ? ভাল করে যদি কখনো দেখতেন, দেখতে পেতেন নিথর নীল দীঘির মত চোখদুটি ঠান্ডা নিষ্পাপ। দেখে শুধু আশা মেটে না, অবগাহন করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অবগাহন করেছেন কি আপনি ঠান্ডা শীতল পাঁকে আটকে গেছেন। তারপর আর ওঠবার উপায় নেই, ধীরে ধীরে আপনার পা দুটো পাঁকের তলায় তলিয়ে যেতে থাকবে, আপনি এক ভয়ঙ্কর হতাশ যন্ত্রণায় হাত পা ছুঁড়লেও পরিত্রাণ পাবেন না। ডুবতে থাকবেন, তলিয়ে যেতে থাকবেন, আর অনুপমা অল্প অল্প হাসবে। নিষ্পাপ অমলিন সে হাসি। মনে হবে যেন কত মমতা আর নম্রতায় ভরা।

জানি না, আপনি কখনো অনুপমার চোখদুটি ভাল করে দেখেছিলেন কিনা, আমার মনে হয়, দেখেননি। দেখে থাকলে আপনি সুখের ঢেউ খেতে খেতে পান চিবোতে পারতেন না। রাত্তিরে খাওয়া সেরে আপনি একটি মিঠে পান যখন চিবোন, তখন আপনার মুখখানায় সংসারের সমস্ত আরাম সবটুকু সুখ যেন ভরে থাকে। মুখে একটু চুক্ চুক্ শব্দ করতে করতে পানটি চিবোন। বেড়ে কাটিয়ে গেলেন নীরদবাবু!

সাতের ডি গৌরী দত্ত লেনের বাড়িটাতে আমি যেদিন প্রথম গেলাম, তখন আপনি কোথায়? আপনি বোধহয় সবে ওই কোম্পানীতে এগ্‌জিকিউটিভ্ হয়ে ঢুকেছেন আর প্রাণপাত করে খাটছেন আরও-ওপরের গ্রেডে যাবার জন্যে। ছোটখাট সামান্য মেদভরা দেহটি দেখলেই মনে হয়, আপনি বড় চাকুরে স্মার্ট এগ্‌জিকিউটিভ্ হবার জন্যেই জন্মেছিলেন। আর ওই কোম্পানীর ওপরওলাদের যেমন নিস্পৃহভাবে তোষামোদ করে গেছেন, ঘরেও তাই করেছেন। আসলে আপনি নিজেকে নিয়েই নিজে সুখী, ওপরওলার গালমন্দ যেমন হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন, ঘরেও তাই। হাসা আর উড়িয়ে দেয়া। ভারী মোক্ষম দুটি অভ্যেস করেছিলেন আপনি।

সাতের ডি গৌরী দত্ত লেনের বাড়িতে আমি যখন প্রথম ঢুকলাম, অনুপমা তখন কলেজের গোড়ার ধাপে। শাড়ি পরে, কিন্তু তখনো দেখলে ছেলেমানুষ মনে হয়। শুধু ছেলেমানুষ নয় দেখলে মনে হোত, ও যেন অপরিণত নিষ্পাপ একটি স্বপ্নের মত মেয়ে। মুখখানি ভরা অনুজ্জ্বল ম্লান একটা ছায়া। ঠোঁটদুটি চাপা, দেখে মনে হোত বিষন্ন দুটি মোটা রেখা। খুব ফিকে খয়েরী রঙে আঁকা।

আপনার কি মনে হোত, আমি জানি না। জানতে ইচ্ছে হোত, কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস

করতে পারিনি।

আমার মনে চিরকাল একটা বিষণ্ন মেঘ রয়ে গেছে, হয়তো তাই আমি যেন ওর চোখে মুখে আমার মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। ওর সর্বাঙ্গে ছায়া-ছায়া শীতল ভাবটা কখনো মুছে যেত না।

বলতে কি, সেইদিনই ওকে আমার ভাল লেগেছিল। ওর দাদা আমাকে এনেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দুটো, বোনকে আমার কাছে পড়ালে তার পড়াশুনোর উন্নতির সম্ভাবনা আর পরোক্ষে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করা। তার দুটো উদ্দেশ্যই সফল হোল, কিন্তু আমার মনে জাগল একটি তৃতীয় উদ্দেশ্য। অনুপমাকে নিজের মনের মত করে দেখলাম।

কিছু মনে করবেন না নীরদবাবু। আমার উদ্দেশ্যে কোন অন্যায় ছিল না, পাপ ছিল না। অতি সাধারণ একটা যুবক যুবতীর ভাললাগার বৃত্তান্ত আর কি!

কিছুকাল কাটবার পরেও আমি ওর কাছে মুখর হয়ে উঠতে পারিনি। হয়তো কোন-দিনই পারতাম না। কেননা একটা সংকোচ আর ভয় আমার সব সময়েই ছিল। নিজেকে ওর যোগ্য মনে করতে পারছিলাম না।

অনুপমা কোনদিনই মুখর নয়, শুধু এক একটি কথা বলে কখনো কখনো, কিন্তু যা বলে সেটা অনেক ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে। কেমন জানেন, একটা নিথর দিঘীতে টুপ করে একটা মাটির টুকরো ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে যেমন অনেকগুলো বৃত্তের মত ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি।

সেদিন রোদের তেজটা ছিল খুব। বাতাস দিচ্ছিল আগুনের হল্‌কার মত। দুপুরেই ওকে পড়াতে এসেছিলাম। ঘরের জানলা দরজা ভেজান ছিল, পাখাটা জোরে চলছিল।

এত গরমেও অনুপমা যেন সেই ছায়া-ছায়া শীতল একখানি দেহ। বড় বড় চোখদুটো বিনম্র মমতায় ভরা।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে কিছুক্ষণ।

অনুপমা সামান্য একটু হাসল। আস্তে জিজ্ঞেস করল,—আচ্ছা, আপনি মাঝে মাঝে কি ভাবেন বসন্ত দা?

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম,—তোমার কথাই ভাবি।

না, নীরোদবাবু, এ কথা শোনবার পরে যে কোন মেয়ের মত অনুপমার মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল না। ও একটুও সংকুচিত হোল না, চোখ নামাল না। তেমনি তাকিয়ে রইল আমার দিকে, দুটি নিষ্পাপ বিষণ্ন চোখ। মুখের হাসিটা তেমনি অনুজ্জ্বল। বলল,—আমিও তো মাঝে মাঝে আপনার কথা ভাবি।

তখন আমার মুখটাই বোধহয় রক্তাভ হয়ে উঠল। কানদুটো গরম হয়ে উঠল। হঠাৎ যেন নিজের মনটাকে নিজের হাতের মুঠোয় পেলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার অনুপমাই বলল,—ঠিক যে ইচ্ছে করে ভাবি তা নয়, ভাবতে ভাল লাগে।

তাহলে বুঝুন, নীরদবাবু, আমার কি দোষ? এরপরেও কি আপনি আমাকে দোষারোপ করতে পারেন?

সত্যি বলতে কি, দোষ অনুপমারও নেই। আসলে অনুপমা কি চেয়েছিল, ও নিজেও জানত না। কেই বা জানতে পারে? আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনাকে দেখে মনে হয়, আপনি কখনো তেমন করে কিছু চান নি, তাই জানবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর এও

একটা কারণ যার জন্যে আপনাকে না ভালবেসে পারা যায় না।

অনুপমার কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, এমন একটি নিষ্পাপ সরল স্বীকারোক্তি আমি কখনো কারো মুখে শুনিনি। ও কত সহজে কত অনায়াসে বলতে পারল, আপনাকে ভাবতে ভাল লাগে, তাই আপনাকে ভাবি।

আর কি বলবে? অনেক বলেছে, প্রায় সবই বলেছে আর এত নিঃসঙ্কোচে বলেছে যে আমার ভেতরের সঙ্কোচটাও অনেকখানি মুছে দিয়েছে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কত ভাল অনুপমা। মনের সঙ্গে মুখের পথটা কত সহজ সরল করে রাখতে পেরেছে। অনুপমার উপমা নেই।

আপনি হাসতে পারেন নীরদবাবু। কথাটা যে কতখানি ভুল, তা জানবার জন্যে আমাকে আরও অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এখন আমারও হাসি পায়।

এরপর স্বাভাবিকভাবে সম্পর্কটা দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেরী হোল না। দেরী হয়ও না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানালে আপনি অবাক হবেন, অনুপমা আমাকে কখনো 'তুমি' বলেনি। তখনো আপনি বলত, এখনো আপনি বলে। সম্বোধনটা কোনমতেই ও 'তুমি'তে নামাতে রাজী হয়নি।

কত বলেছি,—এর পরে আপনি বলে ডাকলে কথার উত্তর দোব না।

অল্প অল্প হাসত, তাকাত গভীর মমতা নিয়ে।

—বলো, তুমি বলো।

বার বার পীড়ন করতে করতে দেখতাম চোখদুটো ওর বিষণ্ণ হয়ে উঠত, মুখের ছায়া-ছায়া ভাবটা গাঢ় হোত। খুব আস্তে বলত,—কি করব, পারিনা যে!

—কেন পারো না? আমার চেয়ে আপন তো তোমার কেউ নেই?

চোখদুটো মেলে তাকাত। দীঘির মত নিথর শান্ত দুটি চোখ। কোন ভাবের তরঙ্গ নেই।

বলত আবার,—কি জানি, পারি না।

চোখদুটো দেখে বড় মমতা হোত, নিবিড় স্নেহের একটা টান অনুভব করতাম। ভাবতাম, সত্যি যখন পারে না তখন আর জোর করে লাভ কি? তুমি বলতে ও কিছুতেই পারে না। কেন পারে না, নিজেও জানে না। থাক, তবে আর এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করে কি লাভ?

আজ আমি আপনাকে হলপ করে বলতে পারি নীরদবাবু, ও ইচ্ছে করেই আমাকে কখনো কোনদিন তুমি বলেনি। কারণটা যে কি সেটা ও জানত বিশ বছর আগে আর আমি আজ জানলাম।

আপনার সঙ্গে বিয়ের কয়েকমাস আগে একদিন সন্ধ্যায় ওকে পড়াচ্ছিলাম, তখন আমি সবে অধ্যাপনা করছি আর ও বি. এ. পড়ছে অনার্স নিয়ে।

মাসটা বোধহয় শ্রাবণ। হ্যাঁ, তাই হবে, কেননা মাঘ মাসে আপনার বিয়ে হোল। আপনার বিয়ের মাস ছয়েক আগের একটি সন্ধ্যায় অনুপমা প্রথম নিজেকে সমর্পণ করল এবং যুগপৎভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল।

আকাশটা মেঘলা। বৃষ্টিও ছিল না, বাতাসও ছিল না। গুমট হয়ে ছিল ঘরটা। অনুপমা সহজে ঘামে না। ওর স্নিগ্ধ মসৃণ কপালে সেদিন বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। পড়া হয়ে গিয়েছিল। বেশীক্ষণ পড়াতে সেদিন ভাল লাগছিল না, অনুপমারও বোধহয়

পড়তে ভাল লাগছিল না।

বললাম,—চলো, একটু ছাতে যাই।

—চলুন।

—ছাতে বসে তোমাকে নাটকের প্রশ্নটা বুঝিয়ে দেব।

অনুপমা তেমনি ঠাণ্ডা, শান্ত। অল্প একটু হাসল।

ছাতে এসে বসলাম, কিন্তু সেখানেও হাওয়া নেই। মেঘলা আকাশটা দেখে মনটা শুধু একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে।

মনটা আমার ভাল ছিল না, কথাটা ওকে বলা দরকার। কিছু আলোচনা করা দরকার। বুঝতেই পারছেন, ওর বিয়ের কথা। ওর যে বিয়ের কথাবার্তা চলছে, এটা আমার কানে এসেছিল।

ছাতে গিয়ে আলসের ধারে বসলাম। অনুপমাও বসল।

কোন ভূমিকা না করেই বললাম,—শুনলাম, তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে?

ও তাকাল। না, ওর চোখে কোন ভাবান্তর নেই। বলল,—হ্যাঁ।

ঠিক এ ধরণের উত্তর আশা করিনি। ও অনেকগুলো কথা বলবে বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু একটা মাত্র কথায় ও ছেদ টানল।

আবার বললাম,—কিন্তু আমাদের তো কিছু করা দরকার।

প্রচলিত প্রেমের রীতি লঙ্ঘন করিনি নীরদবাবু। ঠিক এই কথাটা বলেই ওর একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিলাম, ও কোন কথা বলল না। হাতখানা ওর বেশ গরম। ওর হাতের তাপটা ভাল লাগছিল।

গলার স্বরটা আমার কাঁপল।—আমার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হতে পারে না?

অনুপমা তেমনি ঠাণ্ডা। স্নিগ্ধ মুখখানা সরল নিষ্পাপ, বলল,—না।

এবারও উত্তরটা একটি মাত্র শব্দে ও শেষ করবার চেষ্টা করল। মুখে কিন্তু ওর কোন ভাবান্তর নেই। সহজ সরল চাউনীটা তেমনি স্থির শান্ত। ওর এই জবাবটায় আমি একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম। ঠিক এমনি সময়ে উত্তপ্ত না হলে চলে না। প্রেমের রীতি একটুও লঙ্ঘন করিনি। অনুপমা আমার আবেগে একটুও বাধা দেয় নি।

ওকে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম।

আশ্চর্য যে আমি চেষ্টা করতে না করতেই ও নিজে নিজেই যেন আমার বুকের ওপর ঢলে পড়ল। আমি মুখটা নীচু করতে না করতে অনুপমাই দুহাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেল। সেই প্রথম চুম্বনের স্বাদ আজও আমি ভুলতে পারিনি। তাকে আপনি বিষের চেয়ে অবশকারী বলতে পারেন। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখবেন নীরদবাবু, প্রথম চুম্বনের জন্যেও দায়ী আমি নই।

ওর নরম দেহটা তখন আমার দু হাতে জড়ান।

আমি তখন আবেগে চাপে কিছুটা বিহ্বল, বিভ্রান্ত। বললাম,—তোমাকে আমি জোর করে বিয়ে করব।

ত্রস্ত চোখদুটোয় ওর শান্ত নরম চাউনী। আস্তে বললে,—তা কি হয় বসন্ত দা?

—কেন হবে না?

—এ বিয়েতে কারো মত হবে না যে।

সরল শিশুর মত মুখখানা ওর। কথার আওয়াজ ক্ষীণ। কিন্তু কম্পিত দ্বিধাজড়িত

নয়। সহজ সরল।

—মত যদি নাই হয়, তবে তোমাকে নিয়ে আমি পালাব।

হেসে ফেলল অনুপমা। সুন্দর অল্প একটু হাসি। হাসিতে একটু মালিন্য নেই। ছায়া-ছায়া স্নিগ্ধ মুখখানা আমার মুখের কাছে এগিয়ে এনে যেন আপন মনেই বলল,—কি যে বলেন আপনি!

আমি যথারীতি বললাম,—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব কি করে?

শান্ত গলায় ও বললে,—আমি আর যাচ্ছি কোথায়? আমি তো থাকব। ছাড়তে হবে কেন?

এরপরে আর কি বলব বলুন? আর কি কিছু বলা যায়, না জোর করা যায় নীরদবাবু? আপনি নির্লিপ্ত, সুখী, বুদ্ধিমান, আপনি বিচার করে দেখুন, আমার কি দোষ, আমি তো বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। আর ওর দাদাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে তাকে রাজী করাতেও পারতাম। ওর দাদা এ যুগের মানুষ। সে তার বাবা মাকে বুঝিয়ে যেমন করে হোক আমাদের বিয়ের চেষ্টা করতে পারত। আমার পৈত্রিক সম্পদ আপনাদের মত ছিল না ঠিকই, কিন্তু নিজের উপার্জনের ক্ষমতা ছিল। এ বিয়েতে তেমন একটা বিশেষ আপত্তি কারো হোত না। আমার স্পষ্টই মনে হয়, আসল আপত্তিটা ছিল অনুপমার। কেন যে অনুপমার আপত্তি আমি কোন মতেই বুঝে উঠতে পারিনি।

আপনি কি অনুপমাকে কোনদিন পুরোপুরি বুঝেছিলেন? না, আপনি যে বোঝেননি তার প্রমাণ আমি—বসন্ত সেন। তবে একটা কথা মানতে হয় যে আপনি বোঝবার কোন চেষ্টাও বোধহয় কখনো করেননি। তা যদি করতেন, তবে আপনার প্রাণের সুখের ফসলে ঘুঘু চড়ত। আপনি ঘুঘুকে আসবার কোন সুযোগই দেন নি। নিশ্চিন্ত সুখের একটি প্রাচীর আপনার মনটাকে সবসময় ঘিরে রাখত। অনুপমাও সে প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি। —আপনার কাছে অনুপমা কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে আর তাই বোধহয় নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছে, সে আপনাকে ভালবেসেছে।

তবে কি আমাকে অনুপমা কখনো ভালবাসেনি? ঠিক বুঝিনা। অনুপমার ভালবাসার অনেক রঙ, নানা ভাবে নানা দিকে তার ভালবাসার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। তাই ভালবাসা কথাটার যে মানে আমরা চিরকাল করে এসেছি, সেটা যেন অনুপমা মিথ্যে প্রমাণ করেছে।

আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় নীরদবাবু। আমরা ভালবাসার যে চিরকেলে একটা ধারণা ধরে বসে আছি, এটা বোধহয় ঠিক নয়। ভালবাসলে একজনকে প্রাণমন সমর্পণ করতে হবে, মন একজনকেই দেয়া যায়, একজনকে মন দিলে সে মন আর অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে না পেলে ব্যর্থ হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো বোধহয় বার বার শুনতে শুনতে আমাদের একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হতে পারে হয়তো ভালবাসার এই একমুখীনতার প্রচার মানুষের শক্তির জন্যে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ভালবাসা তো প্রয়োজন মানে না নীরদবাবু? একই সঙ্গে একই সময়ে একটা মানুষ যদি বাপকে ভালবাসতে পারে, মাকে ভালবাসতে পারে আবার সন্তানকে ভালবাসতে পারে, তবে দুজন নায়ক অথবা নায়িকাকে ভালবাসতে পারবে না কেন?

অনুপমাকে দেখেই আমার কথাগুলো মনে হয়েছিল।

সাধারণ প্রেম বৃত্তান্তের রীতি অনুযায়ী আপনার সঙ্গে অনুপমার বিয়ের সময় আমার কিছুকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলা উচিত ছিল। কিছুকাল বিরহ যন্ত্রণায় ছটফট করবার

পর একটা বিয়ে করে বসা উচিত ছিল, কিন্তু তা হোল না।

আপনি জানেন, কিছুকাল পরেই অনুপমার দাদা আবার আমাকে আপনার ওখানে নিয়ে গেল, অনুপমাকে পড়াতে। অনুপমা একটা বছর নষ্ট করবার পর বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে বলে নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সিদ্ধান্তটা কার আমি জানি না। অনুপমার, না আপনার, নাকি অনুপমার দাদার?

আমি গেলাম। প্রথমে একবার ভেবেছিলাম যাব না। কিন্তু অনুপমার ওই সরল বিষণ্ন মস্ত মস্ত চোখদুটোর কথা মনে পড়তেই নরম হয়ে গেলাম। কিছু অভিমান, কিছু আক্ষেপ যা জমে উঠেছিল মনে, তা যেন মুছে যেতে লাগল। না গিয়ে পারলাম না। প্রত্যাশা তেমন কিছু যে ছিল তা নয়, তবু ওর কাছাকাছি কিছু সময় অন্ততঃ থাকতে পারব, এটাও তখন কম লাভ বলে মনে হোল না।

আপনাকে আগেই দেখেছিলাম, আরও ভাল করে দেখলাম সেদিন।

আপনার কি মনে আছে নীরদবাব, সেদিন আমি আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারিনি। কেমন একটা সঙ্কোচে কিছুটা জড়সড় হয়েছিলাম।

আপনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।—আসুন, আসুন।

আপনি বড় বেশী ভদ্র নীরদবাবু।

আপনি অর্থবান, শিক্ষিত, পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচির মানুষ। মস্ত একটি চাকরি করেন। জীবনের কোন একটা ডালপালাতেও আমি আপনার চেয়ে বেশী পুষ্পিত হতে পারিনি, তবু নিজের সম্পর্কে আপনি একটুও সজাগ নন। সফলতা আর অসফলতা এ দুটো আপনার কাছে যেন জীবনের কোন প্রশ্নই নয়, এমনিভাবে আপনি বরাবর হাসতেন, কথা বলতেন।

অনুপমার দাদা বলল,—আমার বন্ধু। বসন্ত সেন। ইনিই অনুপমাকে পড়াবেন।

আপনি যেন মহা খুশী।—বেশ তো! কি জানেন, অধ্যাপনা আর অধ্যয়ন, এর মূল্য টাকায় মাপা যায় না। তবু—অনুপমা মাসে মাসে দুশ' টাকা করে প্রণামী দেবে আপনাকে।

আপনি বড় বেশী বিনয়ী আর নিজের সুখে মশগুল। আমি কি করি, কোথায় থাকি, কদিন পড়াব, কিছুই জানবার প্রয়োজন মনে করলেন না। আর অবাক হলাম, অনুপমার দাদা একবারও জানাল না যে আমি অনুপমাকে আগে পড়াতাম। তারপর আপনি শুরু করলেন, সেবারের গানের কনফারেন্সের কথা, আলতু ফালতু গল্প। জমজমাট আড্ডা, হাসি আর আনন্দ এ যেন আপনাকে ঘিরে থাকত সব সময়। আপনার হাসি খুশীর প্রাচুর্যে এক মুহূর্তে সব অন্ধকার আলো হয়ে উঠত, আপনার সর্বাঙ্গে আলো, অন্ধকারের সাধ্য কি আপনাকে গ্রাস করে।

আপনি কিন্তু জানতেন না, আমি একটি গোপন অন্ধকার বুকে করে নিয়ে আপনার বাড়িতে এসেছিলাম। সে অন্ধকার অনুপমার মনে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা নিজের অজ্ঞাতেই করেছিলাম। কিন্তু ফল হোল উলটো।

প্রথম ক'দিন আমি অনুপমার সঙ্গে পড়ার কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলিনি। পড়াতাম আর দেখতাম ওর চোখদুটি সেই একই রকম। শান্ত, স্তব্ধ, স্নিগ্ধ মমতায় ভরা। কোন ভাবান্তর নেই। মাঝে মাঝে ভাবতাম অনুপমা কি মানুষ, না একটা ঠাণ্ডা শীতল ছায়া মাত্র! ওর ভেতর কোন উত্তেজনা, অবসাদ, বিক্ষোভ, আক্ষেপ, কিছুই আসে না? বড় অদ্ভুত লাগত। ঠিক বুঝতে পারতাম না। তবে মনে হয়, ওর মনের বিষণ্ণস্নিগ্ধ ছায়ায় ও

জীবনের যে কোন তাপকে গ্রাস করে লুকিয়ে ফেলতে পারত। কোন তাপ কোন জ্বালা ওকে বিভ্রান্ত করতে পারত না।

অনুপমা মানুষ ঠিকই, কিন্তু আরও কিছু বেশী—অনুপমা মেয়েমানুষ। একটি পরিপূর্ণ মেয়েমানুষ।

মাস ছয়েকের ভেতরে মাত্র একটা কথা বলেছিলাম আপনার সম্পর্কে।—আমি যে তোমাকে আগে পড়াতাম, নীরদবাবু কি জানেন?

অনুপমা তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—না।

—বলোনি কেন?

—এমনি।

—আমার মনে হয়, বলাই বোধহয় ভাল।

অনুপমা ওর নিষ্পাপ সরল চোখদুটো তুলে তেমনি তাকিয়ে রইল।—কাল বলব।

একটু ভেবে আবার বললাম,—থাক দরকার নেই বলে।

—তবে থাক।

ব্যস্। এই কটি মাত্র কথা আপনার সম্পর্কে বলেছিলাম। আর কখনো আপনার সম্পর্কে কোন কথা ওকে জিজ্ঞেস করিনি। কিছুটা সঙ্কোচে, কিছুটা জ্বালায়, কিছুটা বা ভয়ে জিজ্ঞেস করিনি, জিজ্ঞেস করলে ও যদি আপনার খুব প্রশংসা করে। হয়তো সহ্য করতে পারব না যদি আপনার নিন্দে করে, তাও বোধহয় সইবে না। কেননা আমি তখন আদর্শ প্রেমিকের মত চাইছিলাম, অনুপমা আপনাকে নিয়ে সুখী হোক।

তার মানেই আদর্শ প্রেমিকের মতই ধরে নিয়েছিলাম যে ও সুখী হতে পারে না, আপনাকে সুখী করাও ওর পক্ষে অসম্ভব। আর আপনাদের ভেতর সেই বেদনা জ্বালাটাই আমার কাম্য ছিল, তাই বার বার নিজের মহত্বকে নিজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে মনে মনে বলতাম, অনুপমা সুখী হোক, নীরদবাবু সুখী হোক। আমি আর ওদের সম্পর্কে কোন কথা বলে ওদের জ্বালা বাড়াব না।

শুধু দেখতাম, লক্ষ্য করতাম, আর ভাবতাম।

দেখে অবাক হতাম, আপনার মুখে কখনো একটু বিষণ্ণ মেঘ দেখলাম না। চাকার মত গোল মুখখানা আপনার সব সময়েই উজ্জ্বল, খুশীতে ভরপুর। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতাম আপনাকে, আপনি মানুষটা নিশ্চয় গবেট, বোকা বোকা ধরণের। কিন্তু তাও অপ্রমাণিত হতে লাগল। বুদ্ধিতে রুচিতে আপনি কারো চেয়ে একটু কম নন। নইলে অত বড় একটা চাকরি করছেনই বা কি করে? আর সর্বত্র সকলের ভালবাসা আদায় করছেন কি করে? প্রথমে ভাবতাম আপনি চতুর, তারপর আরও ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, আপনি নিস্পৃহ।

সব খেলাতেই আপনি আছেন, কিন্তু সব সময় একটু তফাতে, তাই খেলাতে জড়িয়ে পড়েন না। অথচ খেলার চাল ভাল দিতে পারেন সকলের চেয়ে নির্ভুল। খেলাটা বুঝতে পারেন সকলের চেয়ে ভাল।

একটা কথাই শুধু বুঝলাম না, আপনার স্ত্রীর খেলাটা কি কখনো আপনি ধরতে পেরেছিলেন? ধরতেই যদি পেরে থাকেন, তবে কিছু করেন নি কেন? আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন নি কেন? আপনার স্ত্রীকে বাড়িতে বন্ধ করে রাখেন নি কেন? হতে পারে, আপনি হয়তো অনেক বেশী বুদ্ধিমান, তাই নীরবে শুধু লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন। তাছাড়া আর কিছু আপনার করবারও ছিল না।

না, তবু মনে হয়, আপনি জানতেন না নীরদবাবু। আপনি জানতেন না যে কোন সময়ে কখন আমি আপনার সব চেয়ে বড় সম্পদ অপহরণ করেছিলাম।

কিন্তু সত্যি কি আমি অপহরণ করেছিলাম? বলতে যেন বাধছে।

সময়টা রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে পোনে এগারোটা। বুধবার। আপনি তখন মাদ্রাজে অফিসের কি একটা কাজে দুদিনের জন্যে চলে গেছেন। আমি পড়বার ঘরে চৌকির ওপর বসে রয়েছি, অনুপমা একটা কোচে।

আটদশমাস কেটে গেছে। অনুপমার কাছে আসছি যাচ্ছি, কিন্তু সব মিলিয়ে নিজের শূন্যতাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলছি। তবু কিছু বলতে পারছি না। কিছু জানাতে পারছি না। তা পারবও না কোনদিন। অনুপমা সুখী হোক—কামনাটা আমার মহত্বের অহঙ্কারকে বেশ বাড়িয়ে তুলেছে তখন।

একটা হাঁই তুলে নেহাৎই হঠাৎ বলে ফেললাম,—আমি বিয়ে করব বলে ভাবছি। কি বলো অনুপমা!

অনুপমা নোটের খাতাটা দেখছিল। তাকাল আমার দিকে।

—ভাবছি একটা বিয়ে করলে কেমন হয়।

আশা করেছিলাম অনুপমা কথাটা শুনে খুশী হবে। নিজে মেয়ে দেখবার প্রস্তাব করবে, হাসবে, উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা বলবে। কিন্তু অনুপমা কিছুই করল না।

নিথর নীল গভীর দিঘীর মত শান্ত চোখদুটো মেলে বলল,—কেন বসন্তদা?

—এমনি। তুমি কি বলো?

—না। বিয়ে করতে পারেন না। বিয়ে করা চলবে না।

তাকালাম ওর দিকে। শিশুর মত যেন জেদ করছে অনুপমা। অবুঝ মিষ্টি একটা জেদ। কিন্তু কেন? বোধহয় কোন কারণ নেই। সহজ মনের একটা খেয়ালের মত মনে হয় কথাগুলো।

মুখটা নীচু করে বসেছিলাম। তারপর জানলার দিকে তাকালাম।

ঘরটা হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে চমকে উঠলাম। একটা শব্দও বোধহয় আমার মুখ থেকে কিছু বেরিয়েছিল।

একটু সময় পরেই অনুভব করলাম, নরম দুটো হাত আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আর ওই হাতই একটু আগে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল অনুপমা।

—আপনাকে বিয়ে করতে আমি দেব না বসন্তদা। কেন আপনি বিয়ে করবেন।

নিবিড় অন্ধকারে চোখভরা বিস্ময় নিয়ে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু অন্ধকার।

আর আপনি শুনতে চাইবেন না নীরদবাবু। আপনাকে এর চেয়ে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

তারপর তো কত কাল কেটে গেল। এখন আমাকে দেখলে আপনি চমকে উঠবেন। আমার দু কানের পাশে সব চুল পেকে গেছে। কপালে মোটা ত্রিবলী রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে অম্বলের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। আমার চোখে আর আগের মত দৃষ্টি নেই। দৃষ্টিটা আমূল পালটেছে। অন্য এক দৃষ্টিতে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজকাল। মাঝে মাঝে আমার চোখদুটো ঝাঁপসা হয়ে আসে। আমি কাঁদি। লুকিয়ে রাত্তিরে বসে বসে কাঁদি।

আপনার জন্যে কাঁদি। আমার জন্যে কাঁদি।

আপনাকে আমি ভালবাসি নীরদবাবু। আপনি আর একবার আমার সামনে আসতে পারেন না?

না। পারেন না। আপনাকে শোনালাম সব কথা। আপনি কি শুনতে পেলেন?

কি জানি। কান দিয়েই তো মানুষ শোনে—তবে আপনি কি করে শুনবেন নীরদবাবু?

দু'বছর আগে আপনার দেহটা পুড়ে যাবার সময় আমি ছিলাম—হ্যাঁ, অনুপমার পাশে ছিলাম। আপনি মরে গেলেন। মরে আর গেলেন কোথায়? আপনার মনও কি মরে গেল? আপনি কি আমার কথাগুলো মনেমনে শুনতে পারেন না?

আপনার ছেলেদুটি কেঁদেছিল—আপনার ছেলে? হ্যাঁ, আপনারই ছেলে। সংসার জানে ছেলেদুটির জনক আপনি। আপনিও তাই জানতেন। তাই জানুন। আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে—সুখ সবটুকুই আপনার। কিন্তু আমি কি পেলাম নীরদবাবু?

আমি ভেবেছিলাম, আপনার সব চেয়ে বড় সম্পদ আমি অপহরণ করেছি। কিন্তু আপনি নিঃশব্দে হাসতে হাসতে আমার সর্বস্ব অপহরণ করে বসে আছেন। আমার স্ত্রী—আমার ছেলে—সব আপনি অপহরণ করে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

আমি একেবারে একা। আমার বলে যাদের জেনেছিলাম, তারা আমার হোল না। সবাই আপনার রইল চিরকালের জন্য। আমার কোন অধিকার নেই, না। কেউ আমার অধিকার মানবে না।

সরু কাল পেড়ে শাদা শাড়ি পরে বিষণ্ণ বড় বড় চোখদুটো অনুপমা বলল,—আপনি আর এখানে আসবেন না বসন্তদা। আপনার না আসাই ভাল।

একটু হেসে আবার বলল,—নীরদকে আমি ভালবাসতাম। আমি যা করেছি, নীরদের জন্যেই করেছি। আর আপনি আসবেন না। আপনার না আসাই ভাল।

এরপরেও কি বলবেন আমি আপনার সম্পদ অপহরণ করেছি? নাকি আপনিই আমার সর্বস্ব অপহরণ করেছেন। ভাগ্যিস আপনি আমাকে আর দেখতে পাবেন না। নইলে দেখতেন নীরদবাবু, আমার চোখের কোলে চামড়া কুঞ্চিত হয়েছে। আমার হাতের শিরাগুলো দড়ির মত পেঁচিয়ে আছে হাতের হাড়কে। চোখে আমি ভাল দেখতে পাই না নীরদবাবু। মাঝে মাঝে চোখ ঝাঁপসা হয়ে আসে।

বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি ভালবাসি নীরদবাবু।

একটি অভিধান

অমলেন্দু বসু

এমন একটি অভিধান ঢাকার বাঙলা একাডেমি প্রণয়ন এবং প্রকাশ করছেন—"পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান"—যার প্রতি যাবতীয় বঙ্গভাষাপ্রেমীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালীর পক্ষে শ্রদ্ধাপ্লুত গৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় দিন, এই দিনটিতে পূর্ববঙ্গের বাঙালী আপন রক্তের অক্ষরে প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁদের মাতৃ-ভাষা থেকে তাঁদেরকে বিচ্যুত করার শক্তি কারুর নেই। এই মাতৃভাষা-নিষ্ঠা পূর্ববঙ্গের বাঙালীর কাছে কেবল আবেগের বিষয় নয়, বুদ্ধিদীপ্ত শ্রমসিক্ত সৃষ্টিশীল গবেষণার বিষয়ও বটে। তাঁদের নিরলস কাজের ফলে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা অধুনা এমন মৌলিকতা এবং সার্থকতার স্তরে পৌঁছেছে যে ইংরেজি ফরাসী জার্মান রুশ প্রভৃতি কয়েকটি ইওরোপীয় প্রাগ্রসর ভাষা বাদ দেওয়ার পরে অন্য যে কোনও ভারতীয় ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা সূক্ষ্মতর, সমৃদ্ধতর এবং মৌলিকতর সম্ভাবনাশীল। বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় মহৎ পথিকৃৎ ছিলেন গ্রিয়রসন সাহেব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ সেন, বিজয় মজুমদার, এবং অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর সৃজনবিচিত্র স্পর্শে বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির যাবতীয় দিকই আলোকিত হয়েছে। বিভক্ত বঙ্গের পশ্চিম অংশে এখনো দুই দিকপাল আছেন, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং সুকুমার সেন মহাশয়। পূর্ব বাংলায় আছেন অশীতিপর শহীদুল্লাহ্ সাহেব। বিগত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভাষা-তত্ত্ব (লিংগুইস্টিক্স্) একটি প্রকাণ্ড জটিল ক্রম-বর্ধমান শাস্ত্রে উন্নীত হয়েছে, এই শাস্ত্র আর শুষ্কং কাষ্ঠং নয়, ম্যাকস্ মূলারের কালে যে সাদৃশ্য-নির্ভর ইচ্ছাসুখপরায়ণ শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, সেই তত্ত্ব নয় (যে তত্ত্বের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে একদা এক সাহিত্য-সম্মেলনে জনৈক হাকিম-ভাষাতাত্ত্বিক ঘোষণা করেছিলেন যে কর্ণাট-বঙ্গ সংশ্লিষ্ট সেন বংশ অবশ্যই ইওরোপের নরোয়ে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন : প্রমাণ, ইবসেন, ব্যর্ণসেন, আমুণ্ডসেন প্রভৃতি নাম!) ইংরেজিতে দেখা যায় পিয়র্সল স্মিথ, এরিক্ পারট্রিজ, সিমিয়ন পটার, আইভর ব্রাউন প্রভৃতি পণ্ডিতের সরলরচিত শব্দতাত্ত্বিক গ্রন্থগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হয়ে হাজার হাজার কপি বিক্রীত হচ্ছে, শক্ত মলাট এবং কাগুজে মলাট, দু'রকম বইয়ের রূপেই। আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে শব্দার্থ-রহস্য রোমাঞ্চ-রহস্যের (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় থ্রিলার) চেয়েও অধিকতর মনোগ্রাহী।

কিন্তু বাংলায় শব্দার্থ-রহস্যের আলোচনা এখন পর্যন্ত অতীব সীমিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের বইখানায় আমাদের কৌতূহল বর্ধিত হয়, পরিতৃপ্ত হয় না। অন্য যে দু'তিনখানা বই দেখতে পাই তাতেও পরিতৃপ্ত হয় না। মনে হয় বাঙালীর ভাষাচেতনায় আবেগ যতটা প্রবল, মস্তিষ্কের প্রেরণা ততটা নয়। যে সকল পরলোকগত এবং অধুনা-বর্ষীয়ান পণ্ডিতের নাম উপরে উল্লেখ করেছি, তাঁদের পরবর্তী কালে শব্দার্থ-রহস্য নিয়ে স্মরণযোগ্য আলোচনা বিশেষ কেহই করেন নি। এককালে "প্রবাসী" পত্রিকায় বাংলা শব্দের মূল এবং বিবর্তন নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করতেন যোগেশচন্দ্র রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিত, সেরকম আলোচনা ইদানীং কোনো সাহিত্যপত্রিকায় প্রকাশিত হয় বলে

জানি না, কেবল "পরিচয়" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৪ সংখ্যায় শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক-রচিত একটি প্রবন্ধ দেখলাম বাংলা ভাষার স্ল্যাং সম্পর্কে, যারা পেশাদার ক্রিমিনাল্, চুরি খুন জোচ্চুরি প্রভৃতি অপরাধই যাদের পেশা, তারা কেবল দলের চৌহদ্দির মধ্যে সীমায়িত অভিধা-সম্পন্ন যে সব শব্দ ব্যবহার করে, সে সব শব্দ সম্পর্কে আলোচনা। 'স্ল্যাং' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে?—'ইতর বুলি', 'অশিষ্ট বচন'? সমাজের নিচের তলায় অপরাধী-জগতে প্রচলিত এসব শব্দ আজ পর্যন্ত কোনো অভিধানে গৃহীত হয়েছে বলে জানি না। এই অপরাধী জগতে 'উপ্পু' মানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া; 'বিধবা' মানে যে ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই; 'সর্দিকাশি' মানে নোট এবং রেজগি; 'ব্যাপারী' মানে ঘুষগ্রহণকারী পুলিশ; 'বেণী' মানে মহিলা; 'ম্যালেরিয়া' মানে পুলিশ। এসব বিশিষ্ট অভিধা কোনো অভিধানে পাওয়া যায় না তার কারণ এসব শব্দের লিখিত ব্যবহার আমাদের ভাষায় পাওয়া যায় না, মৌখিক ব্যবহার সংকীর্ণ সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমায়িত। অথচ 'স্ল্যাং' যে কোনো কালেই লেখায় প্রযুক্ত হবে না এমন কথা বলা যায় না। ইংরেজি ভাষায়, এলিজাবেথী সাহিত্যে (বিশেষত নাটকে এবং বাদবিতণ্ডাঘটিত গদ্যরচনায়) 'স্ল্যাং'-এর প্রয়োগ অন্তহীন। যিনি শেক্স্পিয়রের শব্দপ্রয়োগ অধ্যয়ন করেন তাঁকে মুহুর্মুহু স্ল্যাংয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যে নিষ্ঠা ও সততাসম্পন্ন হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মানদীর মাঝি" লিখেছিলেন, সে সততা ও নিষ্ঠা বাংলাভাষী অপরাধী জগৎ সম্পর্কে কোনো বাঙালী লেখক আজ অবধি প্রয়োগ করেন নি। ভাষাচেতনার দৌর্বল্যে এবং জীবনবীক্ষার একদেশদর্শিতায় সৃষ্টিশীল বাংলা সাহিত্য এখনো পীড়িত। এই একদেশদর্শিতার ফলে আজ অবধি বাংলা ভাষায় কোনো উদার, নিরপরিগ্রহীত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, প্রায়-সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত হয় নি।

অথচ কলকাতায় এহেন অভিধান-প্রস্তুতির পক্ষে অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা ছিল। সেই উইলিয়ম কেরীর কাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার অভিধান রচিত হয়েছে বেশ কয়েকটি। ভাষাতত্ত্বের চর্চাও এখানে হয়েছে দীর্ঘকাল যাবত, বিশেষত হয়েছে শব্দসংগ্রহের এবং শব্দার্থ-বিবর্তন সন্ধানের কাজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাল থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এমন এক সম্ভ্রমযোগ্য প্রতিষ্ঠান যাঁরা বাংলা ভাষায় অভিধান-প্রস্তুতির কার্যে প্রবৃত্ত হতে পারতেন। আজ কয়েক শতাব্দী যাবত কলকাতা বাংলা দেশের বাণিজ্য ও কায়কারবারের কেন্দ্র হওয়ার দরুণ এই নগরীতে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা-ভাষীর সমাগম হয়েছে, বাংলা ধ্বনির বিচিত্র মোজেইক রূপ এখানে প্রকট। এসব এবং আরো অন্যান্য কারণে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান-প্রস্তুতির কাজ কলকাতায় শুরু হওয়া উচিত ছিল আধুনিক পন্থায়, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় তা হয় নি, হওয়ার কোনো লক্ষণ দৃষ্টিসাধ্য নয়।

২

অভিধান-প্রস্তুতির আধুনিক পন্থা বলতে কী বুঝব? অভিধান-সংগ্রহের ইতিহাস বহু শতাব্দী বিস্তৃত। গ্রীক ভাষার প্রথম অভিধান লিখিত হয়েছিল অ্যান্টিক্লাইডিস্ নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারা, তিনি ছিলেন মহান আলেকজান্ডারের সমসাময়িক। প্রাচীন কালেই গ্রীক ভাষায় শব্দ-সংগ্রহ রচিত হয়েছিল অন্তত পঁয়ত্রিশটি। লাতিন ভাষার প্রথম অভিধান প্রস্তুত হয়েছিল ১২৮৬ সনে। আধুনিক ইওরোপীয় ভাষাগুলিতে অভিধান-

প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় অনেক পরে। প্রাচীন অভিধানগুলি শুধুই শব্দ-সংগ্রহ, শব্দ সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যসম্বলিত নয়। এসব অভিধান হয় word-book মাত্র নয় তো glossary। আমার বাল্যবয়সেও আমাকে ইংরেজি word-book পড়তে হয়েছে, তাতে জীবন ও জগতের বিভিন্ন উপকরণগুলি শ্রেণীবিভক্ত হত, এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হত কিছু শব্দ। পশু, পাখি, গাছ, ফুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানারকম পেশা, চিত্তবৃত্তি, গুণ, ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে শব্দগুলি সাজানো হত। এহেন শ্রেণীবিভাগই ছিল অধিকাংশ প্রাচীন অভিধানের পন্থা। ষোল থেকে আঠারো শতক অবধি ইওরোপের অধিকাংশ অভিধানেই শব্দ-সংগ্রহের বিন্যাস হয়েছে এহেন শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতিতে। বর্ণমালা-অনুসারী (alphabetical) যে বিন্যাসে আমরা আজকাল অভ্যস্ত সে বিন্যাস-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৫ সনে ডক্টর জনসনের বিখ্যাত অভিধান প্রকাশের পরে। বর্ণমালা-অনুসারী বিন্যাস আধুনিক অভিধান-প্রস্তুতির অন্যতম লক্ষণ।

প্রাচীন অভিধানগুলি যে glossaryর রূপ নিত তার কারণ সহজ। যে কালে লাটিন ও সংস্কৃত ভাষা আর চলতি ভাষা রইল না অথচ ধর্মগ্রন্থের ভাষা হিসাবে সম্মান পেতে থাকল, সেই কালে পুরোহিতদের পক্ষে এসব ভাষা শিক্ষা আবশ্যক হল। পুরোহিত-ছাত্রগণ যাঁর যাঁর গ্রন্থের (তালপাতার বা কাগজের পুঁথির অথবা মুড়ে-রাখা দীর্ঘ পত্রের) পাশে দুই ভাষার সমার্থজ্ঞাপক শব্দগুলি লিখে রাখতেন। এইভাবে অভিধানের প্রথম কর্তব্য যেমন ছিল শব্দ-সংগ্রহ, দ্বিতীয় কর্তব্য হল অর্থনির্দেশ।

বাংলা ভাষার অভিধান এই সুপরিচিত ঐতিহাসিক প্রণালীতেই যাত্রা শুরু করেছিল। যখন নবাবী আমলে উত্তর ভারতের ব্যবসায়ী বাংলা দেশে আসত, তারা কাজ চালাবার মতো বাংলা ভাষা শিখে নিত, হয়তো যে যার প্রয়োজন মতো সংক্ষিপ্ত গ্লসারি প্রস্তুত করত, কিন্তু এমন কোনো অভিধানিকার নিদর্শন আমাদের কাল পর্যন্ত পৌঁছয় নি। ইংরেজরা যখন এলো, বাংলা ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তির প্রয়োজন তাদের হল চারটি কারণে : প্রথমত, এদেশে বসবাস করতে গেলে জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই স্থানীয় ভাষা (তার শব্দ, উচ্চারণ, শব্দশৃঙ্খলার রূপ অথবা সিন্ট্যাক্স্, বাক্যরূপ) অল্পবিস্তর শেখা দরকার; দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক কারণে শিখতে হল; তৃতীয়ত, পাদ্রীগণের পক্ষে বাংলা শেখা আবশ্যক হল; চতুর্থত, ইংরেজরা যখন দেশশাসনে লিপ্ত হল তখন স্থানীয় ভাষার জ্ঞান ব্যতীত তাদের কাজ চলতো না। উইলিয়ম কেরী তাঁর অভিধান প্রস্তুত করলেন। এদিকে দেশে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন হল, ইংরেজি অভিধানের সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরিচয় ঘটল, অভিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাঙালী উত্তরোত্তর সচেতন হতে থাকলেন, কয়েকটি উৎকৃষ্ট অভিধান প্রণীত হল (যাদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, রাজশেখর বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত অভিধানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)।

৩

বাংলা অভিধানগুলি সম্বন্ধে আলোচনায় দুটি বিষয় গোড়াতেই নজরে পড়ে।

১। শব্দচয়ন সম্বন্ধে একদেশদর্শিতা। এই বিষয়টির উল্লেখ পূর্বে করেছি। এতাবৎ বাংলা অভিধানের শব্দসংগ্রহে একটা অনুচ্চার জাতিবিচার অনুসৃত হয়েছে। শ্লীল-অশ্লীল, ভদ্র-অভদ্র, সুসংস্কৃত-গ্রাম্যতাদুষ্ট, নাগরিক-আঞ্চলিক, সাহিত্যিক-লৌকিক, এহেন

একটা ব্যবধান-জ্ঞানের বিচারে কতকগুলি শব্দ অভিধান থেকে বর্জিত হয়েছে, তার ফলে বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ শব্দসম্পদ সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু ধারণা অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় dialect, বাংলার সেই আঞ্চলিক উপভাষা আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক ও অভিধানকার উভয় কর্তৃকই অবজ্ঞাত হয়েছে। অথচ বাংলা ভাষার ভাষাভিত্তিক ঐশ্বর্যের অন্যতম প্রধান আকর তার উপভাষাগুলিতে। অন্যান্য ভাষার অনুপাতে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষার বৈচিত্র্য অসামান্য, কী শব্দসংখ্যায়, বাক্‌রীতিতে, প্রবাদসম্পদে, বাক্‌প্রতিমায়, উচ্চারণধ্বনির বিভিন্নতায়। শব্দচয়ন সম্বন্ধে এই একদেশ-দর্শিতা, আমার বিবেচনায়, একটা বিশেষ আঠারো-উনিশ শতকী ইংরেজী মনোভাব অনুসরণের পরিণাম। ইতিহাসের বিধানে যে ইংরেজ বাংলা দেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল, সে ইংরেজ শেক্‌স্‌পিয়র—রলে—সিড্‌নি—বেকন প্রভৃতির তুল্য রেনেসাঁস-সন্তান নয়, সেই পরবর্তী শতকের সন্তান যাকে নেপোলিয়ন বলেছিলেন জাত-দোকানদার। এই আঠারো-উনিশ শতকী ইংরেজ ছিল পিউরিটানিজ্‌ম্‌-এর নীরক্ত গোত্রজ, যার চিত্তে টেন্‌ কমান্ডমান্ড্‌স্‌ যতটা কার্যকরী ছিল যীশুর সদর্থক অনুপ্রেরণা ততটা ছিল না। ব্যাপটিস্‌ট্‌, ইউনিটেরিয়ান, ইভান্‌জেল সম্প্রদায়গুলির ক্রীশ্চান (এঁরাই অধিক সংখ্যায় বাংলা দেশে এসে-ছিলেন সেকালে) ছিলেন শুচিতাবায়ুগ্রস্ত, সামাজিক আচরণের লেনদেনে class-conscious শ্রেণী-সচেতন। মনে রাখা ভালো যে এই যুগেরই জনৈক পণ্ডিত টমাস্‌ বোড্‌লার ১৮১৮ সালে একটি Family Shakespeare সম্পাদনা করেন, সেক্‌স্‌পিয়রের রচনা থেকে যাবতীয় 'অশ্লীল' এবং 'কে-জানে-হয়তো-বা-অশ্লীল' শব্দ বর্জন করে। শব্দ সম্বন্ধে এই শুচিতা বাঙালী সমাজেও প্রবেশ করেছিল। এবং তারই ফলে বাংলা শব্দাবলীর একটা বিশাল অংশ, 'অসাধু' 'ইতর' অংশ, বাংলা অভিধান থেকে বর্জিত হয়ে গেল। অথচ শব্দের চরিত্রে তো কোনো শ্লীলতা অশ্লীলতা থাকতে পারে না, শব্দ একটা প্রতীক মাত্র, একটা উচ্চারণ মাত্র, শ্লীলতা অশ্লীলতা (যদি এই 'গুণ'গুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনি কৌতূহলী হয়ে থাকেন) বরং পাওয়া যেতে পারে শব্দ যার প্রতিনিধি সেই বস্তুটিতে। একটি পণ্ডিতী সমালোচনা-গ্রন্থে পড়েছি যে রামনিধি গুপ্তের গানে নিয়ত-ব্যবহৃত 'প্রাণনাথ' শব্দটি নাকি গ্রাম্যতোদোষদুষ্ট। শব্দ হিসাবে প্রাণনাথ, ডার্লিং, হানি (honey) একই পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়, কেবল সামাজিক ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে বলা হয় ডার্লিং বা হানি অন্য পর্যায়ে বলা হয় আর্যপুত্র এবং আরো অন্য পর্যায়ে বলা হয় প্রাণনাথ। যিনি বলতেন প্রাণনাথ তিনি কোনো অশ্লীল ইঙ্গিত করতেন না, যিনি বলেন ডার্লিং তিনিও কোনো ঐশ্বরিক পবিত্রতার মালিক নন।

অতএব বাংলা ভাষার যে অভিধান ভবিষ্যতে প্রণীত হবে, তাতে কোনো ছুঁৎমার্গ অবলম্বিত না হওয়া একান্ত আবশ্যক।

২। বাংলা অভিধানগুলি একক পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, পরিশ্রমের ফল। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রমাণ হবে যে প্রতিটি অভিধানে অভিধানকারের ব্যক্তিত্বের, তাঁর রুচির, তাঁর কুশলতার, আবার তাঁর ত্রুটির ছাপও সুস্পষ্ট। আমরা জানি যে ডক্টর জনসনের অভিধানে-দেওয়া শব্দার্থগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্য উদারতা ও সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন বহন করে। বাংলা অভিধানেও আভিধানিকের ব্যক্তিত্ব অনুরূপভাবেই প্রতিফলিত, যদিও কদাচিৎ ডক্টর জনসনের ব্যক্তিত্বের মোহনীয়তা-সম্পন্ন। ইদানীং (মানে অন্ততপক্ষে এক শতাব্দী যাবত) ভাষাবিজ্ঞানের এমন প্রসার হয়েছে যে কারো পক্ষে একক সাধনায় অভিধান-প্রস্তুতিতে লিপ্ত

হওয়া সম্ভব নয়। অভিধান প্রস্তুতি, বিশ্বকোষ রচনা, ইতিহাস আলোচনা, প্রভৃতি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মই আজকাল লেখক-সমবায় দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। স্যার জেম্‌স্‌ মারে যখন বিগত শতাব্দীতে 'নিউ ইংলিশ ডিক্‌শনারি' (যার নাম আজকাল 'অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারি') সম্পাদনা করতে শুরু করেন তখন শুরুতেই দুহাজার স্বয়ংব্রতী ইংরেজ পাঠক তাঁর অফিসে পঞ্চাশ লক্ষ তথ্য পাঠিয়েছিলেন। আমি দেখেছি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কটিশ উপ-ভাষার অভিধান প্রস্তুত হচ্ছে এবং লীডস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রস্তুত হচ্ছে (দুটি পরিকল্পনাতেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবে ত্রিশ চল্লিশটি বৃহদাকার খণ্ডে), এহেন বিশাল উদ্যোগ কখনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হতে পারে না, হতে পারে একটি প্রতিষ্ঠানের, একগোষ্ঠী নিরলস কর্মীর দায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে থাকবে সমগ্র জাতির সামূহিক সহযোগিতা।

অতএব বাংলা ভাষার যে অভিধান ভবিষ্যতে প্রণীত হবে, তাতে প্রতিফলিত হবে সমগ্র বাঙালী জাতির ভাষাচেতনা, তা সাধিত হবে অনেকের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

৪

বাংলা ভাষায় অভিধানের এই নূতন প্রয়োজন চরিত্র ও কর্তব্য স্মরণ রেখে আমি এই প্রবন্ধের গোড়ায় ঢাকার বাংলা একাডেমির ক্রম-প্রকাশমান আঞ্চলিক বাংলা অভিধানের উল্লেখ করেছি। অনুরূপ এবং তুলনীয় কোনো কাজ পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে না। আমি যতদূর জানি, অন্য কোনো ভারতীয় ভাষাতেও হচ্ছে না। এমনকি যে হিন্দী ভাষার প্রসারের জন্য আজ কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে সেই ভাষাতেও হচ্ছে না, শুধু খড়িবোলির জন্য একটি পরি-কল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছিল, পরিকল্পনাটি এতাবৎ চিঠিপত্রের সীমানা ছাড়াতে পারে নি। বাংলাভাষী হিসাবে ঢাকার এই প্রচেষ্টায় আমাদের আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলা একাডেমি প্রথমে "আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহ" নাম দিয়ে একটি পুস্তিকায় তাঁদের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা বিজ্ঞাপিত করেন। যে উপদেষ্টা-উপসঙ্ঘ এই পরিকল্পনা চালিত করবেন বলে স্থির হয় তার শীর্ষে আছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, যাঁর বয়স আশী কিন্তু সাহস ও উদ্যম আঠারো বছরের। "পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম অংশ ('অ' থেকে 'আন্দুর্‌' পর্যন্ত শব্দাবলী সংগৃহীত হয়েছে) আমি অধ্যয়ন করে চমৎকৃত হয়েছি, আমার নিজ ভাষা সম্বন্ধে আমার গর্ব বেড়ে গেছে। একা-ডেমির সম্পূর্ণ কল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি আদর্শ বাংলা অভিধান প্রণয়ন করা, এই অভিধান তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে—দ্বিতীয় (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) ও তৃতীয় খণ্ড (সাহিত্যকোষ) এখনো শুরুই হয় নি, শুধু আঞ্চলিক ভাষার অভিধানটির কাজ শুরু হয়েছে ১৯৫৮ সন থেকে। ইংল্যান্ড বা ইওরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় যে-প্রণালীতে ডায়ালেক্‌ট্‌ অভিধান প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সমস্ত প্রণালী একত্র করে, পূর্ববঙ্গের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করে বাংলা একাডেমির ডায়ালেক্‌ট্‌ অভিধান প্রস্তুত হচ্ছে। এঁরা জেলায় জেলায় শব্দ সংগ্রাহক নিযুক্ত করেছেন, সংগ্রহের জন্য সংগ্রাহকগণ দক্ষিণা পেয়ে থাকেন। জীবিকা অনুসারে সংগ্রাহকদের সংখ্যার অর্ধাংশ হচ্ছেন অধ্যাপক ও শিক্ষক, এক-চতুর্থাংশ হচ্ছেন ছাত্র, অপর চতুর্থাংশ হচ্ছেন বিভিন্ন কর্মজীবী। সংগ্রাহকগণ যে সব আঞ্চলিক শব্দ একাডেমির নিকটে পাঠিয়েছেন সে সব শব্দ কয়েকটি আলোচনা সভায়

বিশ্লেষিত হয়, বিশ্লেষণের ফলে কিছু শব্দ বর্জিত হয়. অপরগুলির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও শব্দার্থ নিরূপিত হয়ে সেগুলি অভিধানে স্থান পায়। অর্থাৎ অভিধানটি শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের পাণ্ডিত্যের ফল নয়, সর্বসাধারণের সহযোগিতার ফল। এই সংগ্রহে কি প্রকার সূক্ষ্ম শব্দার্থ নিরূপিত হয়েছে তার দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব।

'জোয়ালের সঙ্গে লাঙ্গল বাঁধবার টানা দড়ি'—এই দড়ির নাম একেক অঞ্চলে একেক রকম : ঢাকা সহর-দক্ষিণে একে বলে নাংগইল্‌লা; কক্সবাজারে বলে গুঁল; বাগেরহাটে বলে শরা। সব কয়টি শব্দই অভিধানে স্থান পেয়েছে।—ধান মাড়াবার সময় যে বংশদণ্ড দিয়ে ধান ওল্টানো হয় তাকে খুলনাতে বলে কানোল, বাগেরহাটে বলে উফোই। দুটি শব্দই অভিধানে গৃহীত হয়েছে।—হুক বাঁধানো লাঠির সাহায্যে খড় বিচালি জড়ো করা, তাকে পাবলা জেলায় বলা হয় অ্যাকান্‌; মাটি দিয়ে লেপা বাঁশের বেড়া, তাকে রংপুর জেলায় বলে আছড়া; কলাগাছের ভিতরকার সরু নরম অংশ তাকে কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় বলে আইল্‌কা, এমন অসংখ্য সূক্ষ্ম অর্থজ্ঞাপক শব্দ।

শব্দগুলিকে বিষয় হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে : (১) আত্মীয়-স্বজন বোঝাবার জন্য শব্দাবলী (যথা, বাবা, মা, ভাই, বোন, বড় বোন, ছোট বোন, ভাইয়ের ছেলেকে মেয়েরা যা বলে, ভাইয়ের মেয়েকে মেয়েরা যা বলে, ইত্যাদি); (২) সম্বোধন (নানা সম্পর্কের লোককে কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ শব্দে সম্বোধন করা হয়); (৩) শরীরের নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; (৪) সামাজিক রীতিনীতি (যথা, কনে দেখা, বিয়ে, তালাক, নাক বেঁধানোর অনুষ্ঠান ইত্যাদি); (৫) পোশাক পরিচ্ছদ; (৬) গৃহসামগ্রী ও গৃহকার্য—এই বিভাগে ৩১৫টি বস্তু বোঝাবার জন্য আলাদা আলাদা শব্দ আছে (যথা, ঘরে ওঠার জন্য মাটির তৈরি সিঁড়ি, চাল ছাওয়ার সময় বাঁধ তোলবার জন্য বাঁশের সছিদ্র চটি, এক মুখবিশিষ্ট উনুন যাতে কেবল একটি হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করা যায়, দুই মুখবিশিষ্ট উনুন যাতে দুটি হাঁড়ি বসানো যায়, ভাঙা হাঁড়িতে কাদা লেপে যে আল্‌গা উনুন তৈরি হয়,—এসব বস্তুর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা শব্দ বিদ্যমান আঞ্চলিক ভাষায়; (৭) কৃষিকার্য—এই বিভাগে ২৯৪টি শ্রেণী।—এইভাবে ১৫টি বিভাগ ও তাছাড়া সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি অন্যান্য ব্যাকরণিক বিভাগও আছে।

এই বিরাট ক্রম-প্রকাশ্য অভিধানের যে প্রথম অংশটি অধ্যয়ন করার সুযোগ আমি পেয়েছি সেটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৪ সনে। 'অ' থেকে 'আন্‌দুর্‌' পর্যন্ত শব্দাবলী এই অংশে স্থান পেয়েছে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০; মোটামুটি হিসাবে এই ৮০ পৃষ্ঠাতে শব্দ সংখ্যা প্রায় ৩২০০; সর্বসমেত সম্পূর্ণ অভিধানটিতে প্রায় এক লক্ষ শব্দ স্থান পাবে বলে মনে হচ্ছে। ইংরেজি ডায়ালেক্‌ট্‌ অভিধানের তুলনায় বাংলা ভাষার আঞ্চলিক শব্দসম্পদ ঐশ্বর্যবান। এইসঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হয় তাহলে এবং এইসব আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে যদি সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী যোগ দেওয়া যায় তাহলে বাংলা ভাষার শব্দসংখ্যা অনায়াসে কয়েক লক্ষে দাঁড়াবে। শুধু যে সংখ্যায় প্রাচুর্য লক্ষ্য করি তা-ই নয়, এই আঞ্চলিক শব্দের কতকগুলি যে অভিধায় অদ্বিতীয়, এদের কোনো সুষ্ঠু প্রতিশব্দ নেই, সে কথাও বিচার্য। জীবনানন্দর একটি কবিতায় তিনটি সুন্দর পূর্ববঙ্গীয় শব্দ পাই : ধূপের ধোঁয়ার মত **ধলা** সেই পুরীর ভিতর; শরীরে ননীর **ছিরি**,—ছুঁয়ে দেখো—**চোখা** ছুরি,—ধারালো হাতীর দাঁত! ('পরস্পর')—কবিতার সুরের সঙ্গে চমৎকার মিলে গেছে। এখনকার বাঙালী কবি সুযোগমত কাব্যে আঞ্চলিক শব্দপ্রয়োগের কথা ভেবে

দেখলে পারেন। এই অভিধানের কয়েকটি শব্দে আমি আকৃষ্ট হয়েছি : অতিল্ (একটু সময়; এক তিল থেকে উদ্ভূত), অন্‌বোলা (যার ভাষা নেই), অপর্‌রাবি (স্ত্রী ছাড়া অন্যকে যে ভালোবাসে), অবোত (মিথ্যা গুজব), আইমুশা (দীর্ঘ নিঃশ্বাস), আউগারি (অনর্থক যে বেশি কথা বলে), আত্‌কা (আচমকা, অকস্মাৎ), আক্‌শি বাক্‌শি (নানা জাতীয় জিনিস), আচাভুয়া (নির্বোধ), আজাড়া (অমূলক কথা) ইত্যাদি।

এইসব আঞ্চলিক শব্দের সাহায্যে, বিশেষত কতকগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে আমাদের সাহিত্যিক ভাষা সমৃদ্ধ হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা। ভাষার জীবন তার প্রবহমানতায়। যে ভাষা শিলীভূত, স্তব্ধ, প্রসারবিমুখ, সে ভাষা মৃত অথবা মরণোন্মুখ। বাংলা ভাষার প্রবল প্রবাহ প্রবলতর হবে যদি আমরা আঞ্চলিক শব্দের দিকে নজর দিই। ম্যাক্সমুলার সত্যি কথা বলেছিলেন, The real and natural life of a language is in its dialects।

পূর্ববঙ্গের ডায়লেক্‌ট্‌-এর শব্দসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভূমিকায় বলেছেন : 'আশা করি আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধানের প্রথম খণ্ড "আঞ্চলিক ভাষার অভিধান" সমস্ত বাংলা-ভাষামোদীর নিকট সমাদরে গৃহীত হইবে।' অশীতিপর বঙ্গভাষাসাধকের এই আশা আমাদেরও আশা, আশারও বড়ো, বিশ্বাস।

নাথিং ডুইং

অমিয়ভূষণ মজুমদার

মার্চের মাঝামাঝি হ'তে দু'চারদিন বাকি আছে। অর্থাৎ যা হ'লে ঠিক পুরোটা হয় তার চাইতে কিছু কম। সিজন ফ্লাওয়ারের হিসাবে কিন্তু পুরোপুরিটা পার হ'য়ে কিছু ঢলে পড়া। সিজন ফ্লাওয়ার এখনও ফুটছে অজস্র, অথচ বড় বড় দলগুলোকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেগুলোর প্রান্তগুলো গরমে ঝলসে যাচ্ছে। দুপুরে একটা রুক্ষ গরম সকাল আর বিকালের শীত শীত ভাবটার মাঝখানে ঢুকে পড়ে। ধুলো বেড়েছে, পথের ধারের গাছগুলোর পাতায় লক্ষ্য করলেই তা ধরা পড়ে। সেই ধুলো উড়িয়ে কখনও কখনও বাতাসের ছোটখাট ঝাপটা লাগে। ক্যাসিয়ার গোড়ায় ঝড়া ফুলও কিছু কিছু ওড়ে ধুলোর সঙ্গে। সব মিলিয়ে রংটার মোট ফল লোহিতাভ মনে হয়। কিম্বা এদিকে বসন্তকাল এরকমটাই হ'য়ে থাকে।

পথটা খুবই লম্বা। জাতীয় সড়ক নামে এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে যাওয়ার বাঁকে এ জেলার ও জেলার সদর এবং একটু ঘুরে বেঁকে দুএকটা মহকুমা শহরকে ছুঁয়ে যায়। সব জায়গায় সমান নয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই জেলা সদরের কাছাকাছি এসে বেশী চওড়া, বেশী দুরন্ত, বেশী হট্টগোলে ভরা। কিন্তু যখন রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে, এমন কি ছোটখাটো পাহাড়ী ঢেউগুলোর উপর দিয়ে এ চাবাগান থেকে ও চাবাগানের দিকে এগোয় তখন কোথাও পাখির ডাক শোনা যায়, কোথাও শীত শীত ক'রে ওঠে পথের দুপারের বনের ছায়ায়, আধ ঘণ্টা ধ'রে সামনে পিছনে কোন সহযাত্রী নেই, অন্য কোন গাড়ির সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। কোথাও পথের ধারে ন্যাড়া মাঠ তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে হাঁপাতে থাকে। পথ থেকে নেমে গিয়ে দূরে দূরে গ্রামের নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। কখনও গ্রামের কোন দলছুট ঘর পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রাম আধুনিকতার দিকে এগিয়েছে মনে হবে। কিম্বা এর চাইতেও বড় নমুনা পাওয়া যায় : পাশাপাশি গুটি চারপাঁচ আধময়লা দোকান, একটি ছোট চালের কল, পুরনো টায়ার ছড়ানো জংধরা গাড়ির কঙ্কাল সমেত একটা গ্যারাজ, কিম্বা বেশ নির্জন জায়গায় একটা পেট্রোল পাম্প। সেটা যদি একটা গ্রামও হয়, সড়ক বরাবর তার দৈর্ঘ্য যদি দু চারশ' মিটারও হয়, বিস্তার সড়ক থেকে কোথাও পঞ্চাশ গজের বেশী হবে ব'লে মনে হয় না।

সাদা প্লিমাউথ গাড়িটা বেশ বেগেই চলেছে। অজ্ঞাতসারে তার অবস্থিতি এরকম একটা গ্রামের কাছাকাছি। গাড়িটা বেশ লম্বাটেও বটে। অবশ্য একেবারে নতুন নয়। তা বোঝা যায় থামলে রিমগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে, এখনও অবশ্য আপহোলস্ট্যারির দিকে নজর দিলে। ব্যবহার করা। খানিকটা অভিজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে সেকেন্ডহ্যান্ডই কেনা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ যত্নে রাখা। যার ফলে সরু চিক্কন স্টিয়ারিং হুইলটা স্পর্শসাধ্য, ড্যাশবোর্ডে সাজানো গ্যাজেটগুলো কর্তব্যরত। স্পীডোমিটার থেকে সেজন্য বেশ বোঝা যাচ্ছে গাড়িটা বেশ ফাস্ট চলেছে। চল্লিশ থেকে প'য়তাল্লিশ কিলোমিটার বটেই।

হ্যাঁ সেকেন্ডহ্যান্ডই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে এটা কি এক রকমের কার্পণ্য যে সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কেনা হয়েছে? মিসেস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট চট ক'রে মন্তব্য করে না,

কারণ এ বিষয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বয়স এবার একচল্লিশ হ'লো। নিউ আলিপুরে জমি কেনা হয়েছে। বাড়ি তুলবার তোড়জোর করতে হয়। একটি ছেলে মানুষ করতে হবে, মেয়ে দুটি বড় হ'লে তাদের বিয়েতে কোন না বিশ পঁচিশ হাজার ক'রে বেরিয়ে যাবে। তা ছাড়া গাড়িটা যে অবশ্য প্রয়োজনের তাও বলা যায় না। জেলার মধ্যে ঘোরাফেরার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের একের বেশী সরকারি গাড়ি আছে। সেগুলো মিসেস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ব্যবহার করতে পারে। আর ব্যবহারের খুব বেশী দরকারই বা কি হবে? অবস্থিতিটাই এমন যে বিনা কারণে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ানো চলে না। গাম্ভীর্য রেখে চলতে হয়। গুরুত্ব বজায় রেখে যেটুকু দোকানে যাওয়া, কটাই বা দোকান থাকে জেলার সদরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহিনীর উপযুক্ত, অথবা কোন ডেপুটির বাড়িতে যাওয়া, কজন ডেপুটিই বা থাকে একটা জেলার সদরে, তার জন্য নিজের গাড়ি কেনা দরকার করে না। নিজের গাড়ি রাখার অসুবিধাও আছে। পেট্রোল খরচ না হয় কমিয়ে রাখা গেলো ব্যবহার কম ক'রে। কিন্তু একজন সোফার এবং ক্লিনার রাখতে হবে। গাড়ির ব্যবহার নাই করো, তাদের মাইনা ত্রিশ দিনের জন্যই দিতে হবে। কাজেই গাড়ি কেনার ঝোঁকটা যখন এসে গেলো তখন সেকেন্ডহ্যান্ডই কেনা হয়েছে। আর সোফার ড্রাইভার রাখা হয়নি। রামলগন ম্যাজিস্ট্রেটের খাস আর্দালি। বছর খানেকের মধ্যে রিটায়ার করবে। তার ছেলে রামভকত। মিসেস তাকেই বহাল করেছে ক্লিনার হিসাবে পঞ্চাশ টাকায়। ছেলে যদি এইভাবে মেমসাহেবকে খুশী করতে পারে ভবিষ্যতে আর্দালির চাকরিতে তাকে কে রুখবে। আঠারো উনিশ বছরের ছেলেটা বাজার করে, ফাইফরমাস খাটে, গাড়ি ধোয়ামোছা করে, এমনকি কিছু ড্রাইব করাও শিখে নিয়েছে।

আর নিজে গাড়ি চালানোই বরং আজকাল প্রথাসিদ্ধ। যেমন এখন সে নিজেই চালাচ্ছে। রামভকত উর্দি পরে পিছনের সিটে। উর্দিটা অবশ্য জাল। তার বাবার কাছে ধার নেয়া। অন্যদিকে পিতলের বোতাম বসানো সাদা পাগড়ি সমেত এই সাদা জিনের লিভারিতেই ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির ড্রাইভারকে মানায়।

অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের জেলার বাইরে অন্য জেলার মহকুমা সদরের পাশে বড় রেলওয়ে জংসনে যেখানে রামভকত গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো সেখানে মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট পরিচিত নয়।

কিন্তু ছেলেমেয়েদের কথাই ভাবছিলো সে। তিনটি। বার, আট আর চার বছর বয়স হ'লো। আর নিউ আলিপুরে জমি কিনে রাখা হয়েছে। গত বছর বাড়ি শুরু করার কথা উঠে আবার প'ড়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বাড়িতে বাস করার সুযোগ কবে হবে তাদের?

ব্রিজগুলোকে আর একটু চওড়া করা উচিত। স্টিয়ারিং-এ মন একাগ্র করলো মিসেস।

বারো বছরের ছেলে দেখে বলা যায় না কি হবে। আর তা ছাড়া আজকাল ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির চাইতে প্রাইভেট ফার্মের চাকরিগুলো বরং ভালো। কিন্তু দেখো এরই মধ্যে ছেলেটা বারো বছরের হ'য়ে গেলো।

আর তারপর দুই মেয়ে। লক্ষ্য করো প্রায় আধ ঘণ্টার উপর হ'য়ে গেলো আর একটি গাড়িও তার সামনে পিছনে দু'শ' মিটারের মধ্যে দেখা যায়নি। গাড়িটা এখন পঁয়ত্রিশ কে এম্ যাচ্ছে। তার মানে এই নয় সব গাড়িকে সে চিরকালের জন্য পিছনে ফেলে এসেছে। আর তাই যদি হয় যে গতি সকলকে পিছনে ফেলতে পারে তা কাউকে কাউকে ওভারটেক করবে। এটা বরং এই সড়কটারই বৈশিষ্ট্য। কোথাও কোথাও এমন নির্জন যে গা ছম্ ছম্

করে। তাই ব'লে ভয়েরও কিছু নেই। প্রায় নিজের ঘরের মেঝের মতোই। ঠিকানায় পেঁ'ছে যেতে কারোই অসুবিধা হয় না।

বড় মেয়েটা কলকাতার স্কুলে পড়ছে, তাকে দেখতে কলকাতায় যাওয়া। ছোট মেয়েটাকে বাপের কাছে রেখে গিয়েছিলো।

কোন কোন অনুভূতি শরীরেও বুঝতে পারা যায়। ছোট মেয়েটার কথা মনে হ'তেই এখন যেমন হ'লো। কোলের কাছে বুকের নিচে খালি মনে হ'লো।

নাঃ, ওই তো একটা গাড়ি। কিম্বা গাড়ি নয় ঠিক, একটা জিপ্। তা হ'লে বন থেকে বা দূরের চা-বাগান থেকে যে ছোট ছোট পথ এই সড়কটাতে এসে মিশেছে মাঝে মাঝে তারই কোন একটা দিয়ে জিপটা হঠাৎ এসে পড়েছে। কেমন লাফাতে লাফাতে চলছে না জিপ্‌টা? তার নিজের প্লিমাউথ সেকেন্ডহ্যান্ড হ'লেও, আদৌ লাফাচ্ছে না। তা থেকে বোঝা যায় পথের তারতম্য নয়, জিপ্‌টারই বরং কিছু স্প্রিং অকেজো। মৃদু নিঃশব্দ হাসি ফুটলো মিসেসের মুখে।

এখন বিকেল হ'য়ে আসছে। কিছুদূরে পথের ধারে ক্যাসিয়ার হলুদ ফুলের স্তবকে বিকেলের আলো পড়েছে। মৌমাছি আছে নাকি এই ফুলেও? কিন্তু বিকেল হ'য়ে আসছে আর জেলার সদর এখনও প্রায় ষাট মাইল। অ্যাক্‌সিলারেটরে চাপ দিলো তার পা। প'য়তাল্লিশ কে-এম, এমনকি কাঁটাটা প'য়তাল্লিশ পঞ্চাশের মধ্যে কাঁপছে।

লোকে বলে গাড়িগুলোর একরকম নেশা ধরে। সামনে গাড়ি দেখলে পিছনেরটির গতি বেড়ে যায়। মিসেসের হাল্কা গোলাপী রংকরা পাতলা ঠোঁট দুটো একটু চাপা দেখালো। নেশাটা নাকি ধ্বংসমুখী। পঞ্চাশে কাঁটাটা থর্ থর্ করছে। তার পক্ষেও এটা খাটে নাকি? জিপ্‌টা খুব লাফাচ্ছে বটে, ধোঁয়া ছাড়ছে, কিন্তু পিছিয়েও পড়ছে। দূরত্ব কমছে তা হ'লে। অবশ্য এর অন্য বর্ণনাও আছে : যৌবনসুলভ নির্দয়তা।

চার বছর বয়সে তার সব ছেলেমেয়েই কোল থেকে নেমে যায়। ছোটটাও তা গিয়েছে। বার বার তিনবার। প্রবাদের মানে কিছু নেই। নতুবা ধরতে হয় তিনবার যা হয়েছে প্রতি-বারেই তা হবে। সাইকেল যদি বলো চার বছরের। কারো কারো দু বছরের হয়। অর্থাৎ চার বছর পর পর তার নিজের সাইকেল।

জিপ্‌টা এবার হার মানছে। একটা চওড়া নিঃশব্দ হাসি দেখা দিলো মিসেসের মুখে। জিপটা পুরনো, হুডটা জীর্ণ, ধুলোয় ধূসর। খানিকটা বুনো। এটা কি নেশা যে জিপ্‌টাকে পিছনে ফেলবার চেষ্টা করছে সে? নাকি যৌবন বিবশতা? এমন নেশা কি তাকেও ধরতে পারে?

জিপটা খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লো। আহা বেচারা, ক্লান্তই দেখাচ্ছে। জিপের ভিতরটা চোখে পড়ছে এখন। হোলড্অল, টিফিন কেরিয়ার, বন্দুক, একটা চওড়া পিঠ, মরচে রংয়ের চেক শার্ট, ধুলোয় ভরা চুল। হুডের উপরে পাতা পল্লবও রয়েছে যে। একটা বুনো হাতি যেন বন ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু তা হ'লেও—হর্ন দিলো মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট—। পিছিয়ে তো পড়ছেই। এখন পথ না পেয়ে গতি আবার ত্রিশে নেমে এসেছে প্লিমাউথের। যদি বলো যৌবনসুলভ—মিসেসের হাসিটা বিস্তারে কমে বরং গভীর হ'য়ে ঠোঁট দুটোতে ফুর্ ফুর্ করছে। নতুবা রেলে চেপেও তো সদরে নামা যেত। কলকাতা থেকে জেলার সদরে ফেরার পক্ষে এই সড়কটা অপরিহার্য নয়। প্লিমাউথটাকে ব্যবহারের সুযোগ?

সামনের আয়নাটায় চোখ পড়লো তার। ছোট সাদা কপালের উপরে কয়েকটি কাটা চুল উড়ছে। পাড়ছাড়া নীল সিফনের শাড়িতে জড়ানো আটসাঁট শরীর। ফ্যাকাসে গোলাপীতে রঙানো পাতলা ঠোঁট দুটো সানগ্লাসের নিচে, হুইলের উপরে রাখা প্রবাল রঙের সুচলো নখ সমেত মসৃণ হাত দুখানা।

হর্ন দিলো সে। উপায় কি? যতই ক্লান্ত দেখাক জিপটাকে, ঘণ্টায় পঁচিশ কে, এম্ চ'লে যদি সে পথ বন্ধ ক'রে রাখে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতেই হবে। জিপটাও বুঝতে পেরে পথ ছেড়ে দিলো।

যৌবন যদি বলো—। লেডি মেডিক্যাল অফিসার কথাটা বলেছিলো।

বেশ লাল হ'য়ে ওঠে তার মুখ এখনো। যদিও সে এত ফর্সা এবং বরং দীঘল গড়নের যে তাকে দেখে এত সুস্থ রক্তের অধিকারিনী ব'লে মনে হয় না।

কথাটা উঠেছিলো আজকাল যেমন প্রায়ই ওঠে সেকেলে ফ্রয়েড্ এবং সেক্সের বদলে পরিকল্পনা নিয়ে। কিন্তু তখন লেডি মেডিক্যাল অফিসার যে ইঙ্গিত করেছিলো তাতে এই বোঝা যায় তার এখনও সাবধান হওয়া উচিত যদিও তার কোলের মেয়েটির বয়স চার বছর। আর সাবধান হওয়া মানে পরিকল্পনার যান্ত্রিক ও ভৈষজ্য দিকগুলোই নয়, মনও বটে। সাইকেল শুধু শরীরকে নয় মনকেও নিজের অজ্ঞাতেই প্রস্তুত করে। যার ফলে কোন পরিকল্পনার কথাই মনে থাকে না। মেডিক্যাল অফিসাররা যা বলে তা সারাৎসার না হ'তে পারে, কিন্তু—। কিছুদিন থেকে সে কোলটাকে খালি অনুভব করছে বটে। এটা মানে এই বোধটাই কি কোন আকাঙ্ক্ষার সূচনা হ'তে পারে?

সামনের আয়নাটায় আবার খানিকটা লাল দেখালো মিসেসের মুখ। না, জিপ্-আরোহীর মুখটাও একবার দেখা গেলো। কপালের উপর থেকে চুলটা অনেকটা উঠে গিয়েছে। রোদে পোড়া—। জিপ্‌টা গতি বাড়িয়েছে নাকি? তা ক'রেই বা কতদূর? দেখতে দেখতে সেটা পিছিয়ে পড়লো। বন্য এবং সহিষ্ণু চেহারা নিশ্চয়ই স্ট্রিমলাইন্ড গতির সমকক্ষ নয়।

অন্য অনেকে যতই আস্থা রাখুক যন্ত্রের অক্লান্ততার উপরে আমার তেমন আস্থা নেই। পয়ত্রিশ কে-এমে যেতে যেতে হঠাৎ প্লিমাউথের এঞ্জিনটায় বিদঘুটে রকমের দু-একটা শব্দ শোনা গেলো, তারপর হঠাৎ চুক্ চুক্ গর্ গর্ শব্দ ক'রে উঠে ভুস্ ক'রে থেমে গেলো।

হন্তদন্ত গাড়ি থেকে নামলো রামভকত। গাড়ি থেকে নামলো মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট। এটা আর ব'লে দেয়া দরকার হবে না প্লিমাউথ অন্তত বেশ কিছুক্ষণের জন্য অচল হয়েছে। সেকেন্ডহ্যান্ড ব'লে? নতুন হ'লেই বা কি? যন্ত্র তো। রামভকত যা জানে তা সবই করলো। কিন্তু গাড়ি চালানো আর গাড়ি সম্বন্ধে জানা এককথা নয়। উপায় এখন? জেলার সদর এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার। প্রকৃতপক্ষে এ জায়গাটা ভিন্ন জেলা, ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ারের বাইরে। এখন অন্য কারো সাহায্য দরকার। কিন্তু ধারে কাছে কে আছে? সড়কের এ অংশটা একেবারেই গ্রাম্য। সামনে পিছনে পথের দুপারে ন্যাড়া ন্যাড়া উঁচুনিচু মাঠ। এ অবস্থায় সাহায্য দিতে পারে এমন কেউ যদি আসে সে আসবে অন্য কোন গাড়িতে। কিন্তু তেমন গাড়িই বা কোথায়।

রামভকত পরিস্থিতিটাকে এরকম ভাবেই বিশ্লেষণ করলো এবং মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট মনে মনে স্বীকার করলো এটাই প্রকৃত বিশ্লেষণ। তা করতে গিয়ে মনের মধ্যে কিছু একটা শির শির ক'রে উঠলো। একমুহূর্তের জন্য হ'লেও তার মনের মধ্যে এরকম একটা কথা

উঠলো—রামভকতের মতো এরকম এক আনাড়ি ড্রাইভারকে নিয়ে, যে প্রকৃতপক্ষে ড্রাইভারই নয়, এরকম লম্বা পথে পাড়ি দিতে চেষ্টা করা যথেষ্ট বেহিসেবী ব্যাপার। গাড়িতে উঠে ব'সে মিসেস আশঙ্কার কারণই দেখতে পেলো। যদি সাহায্য না আসে, যদি বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, তারপরে রাত হ'য়ে যায়। দিন পড়ে আসছে। বিউটি প্রোভোকেথ থিপ্ স্নার দ্যান গোলড্।

পথের উপরে দাঁড়িয়ে রামভকত গাড়ি আসছে কিনা লক্ষ্য করতে লাগলো। জিপ্টাই সব চাইতে কাছের গাড়ি এই পথের উপরে, যদি ইতিমধ্যে সেটা কোন গেঁয়ো পথে ঢুকে না গিয়ে থাকে।

শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বটে একটা গাড়ির। ওই তো জিপ্টাই। বেশ দ্রুতই আসছে। আগের মতোই লাফাতে লাফাতে। এখন থেমে যাওয়া প্লিমাউথের তুলনায় বেশ সজীবই।

রামভকত হাত তুললো। চিৎকার ক'রে কিছু বললো। কিন্তু গোঁয়ারের মতো খানিকটা ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে জিপ্টা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো। কি অভদ্র! ভাবলো মিসেস ম্যাজিস্ট্রেট।

নিপ্-টে অভদ্র হওয়াও আজকাল কঠিন। দ্বিতীয়বার চিন্তা ক'রে আজকাল অনেক সময়েই প্রথম ঝোঁকটাকে শুধরে নেয়া হ'য়ে থাকে। অথবা জিপ্টার ব্রেকটাতে কিছু দোষ ছিলো। এগিয়ে গেলেও একশ' মিটারের মধ্যে জিপ্টা থেমেছে দেখা গেলো। এমনকি জিপের আরোহী পথে নেমেছে, পিছন দিকেই দেখছে। রামভকতই দেখতে পেলো।

রামভকত তার দিকে খানিকটা এগোতেই সেও রামভকতের দিকে এগিয়ে এলো। শিস্ দিতে দিতে, কিছুই হয়নি, যেন এই সড়কটা তার বোঠকখানা। প্লিমাউথের গায়ের কাছে এলো লোকটি। পকেট থেকে চামড়ার থলে বার ক'রে তামাক নিয়ে সিগারেট পাকাতে সুরু করলো। রামভকত বোনেট খুলে কি বোঝাতে গেলো। লোকটি ঔৎসুক্য দেখালো না। বরং ধীরে সুস্থে সিগারেটটা পাকিয়ে নিয়ে ধরালো। খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিয়ে সেটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে বললো,—ওসব আমি কমই বুঝি। দু' তিন শ' মিটারের মধ্যে একটা পেট্রোলপাম্প আছে, সেখানে ঠুক্ঠাক্ মেরামতের কাজও করে। গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে পারো যদি—

গাড়ি থেকে নামলো মিসেস। লোকটির দিকে একটু এগোলো, গাল দুটোয় এক ঝলক লাল উঠে পড়লো, কথা গুলিয়ে গেলো যেন। রামভকত মাঝখানে এলো। সে বললো,—ভারি গাড়ি, একা ঠেলা যায় না। লোকটি রামভকতকে দেখলো, মিসেসকে দেখলো, সাদা গাড়িটাকে দেখলো। চোখের ভারি চেহারার গগল্স্ খুললো। আবার রামভকতকে দেখলো, সাদা গাড়িটাকে দেখলো, মিসেসকে দেখলো। যেন রামভকতের সাদা উর্দির বোতামের চকমকানি, প্লিমাউথের শ্বেতত্বের অকৃত্রিমতা, মিসেসের গায়ের রঙের কিম্বা তার পরনের সিফনের প্রকৃত সেড্টা যাচাই করা চাই। তারপর আবার গগ্লস্টা আঁটলো। একটু বিব্রত যেন দেখালো তাকে। কিছুই করা যাবে না এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো। কিছু না ব'লেই জিপের দিকে চ'লে গেলো।

রামভকত হতাশ হ'য়ে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। মিসেস বিপন্নমুখে স্বগোক্তি করলো ঃ আশ্চর্য! কিংবা আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। রামভকতকে গোপন ক'রে হাতঘড়িটাকে দেখলো সে।

আধমিনিট পরে মিসেস বললো,—রাম—

—জি?

—কি করবে?

রামভকত পথের ধারে থেকে একটা ঘাসের ডাঁট তুলে নিয়ে কামড়াতে সুরু করলো। মিনিটটাক পরে সে বললো,—জিপ্‌টা বেক্ করতে আছে, দেখি।

জিপ্‌টা ব্যাক্ ক'রে এলো। প্লিমাউথের সামনে এসে থামলো। খানিকটা মোটা দড়ি বার ক'রে দিয়ে লোকটি রামভকতকে বললো প্লিমাউথকে জিপের পিছনে বেঁধে দিতে।

অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারা যায়—এই সড়কে পেট্রোল, ডিজেল বা মবিলের যেমন হঠাৎ দরকার হতে পারে বেহিসেবী চালকের, হিসেবী চালকেরও তেমন হঠাৎ ছোটখাটো মেরামত দরকার হ'তে পারে। সুতরাং সড়কের ধারে পেট্রোল পাম্প আছে। এটা থেকেই আমরা গোড়াতে এদিকের বসন্তকালের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে থাকবো। সাদা দেয়ালের দোতলা বাড়ি। পেট্রোল ব্লক আর বাড়িটার মাঝখানে কালো রাস্তা। গাড়ি যাওয়া আসার এই পথ ছেড়ে সামনে খানিকটা সিজন ফ্লাওয়ারের বেড্। ক্রিসান্থিমাম, ডালিয়া, হেলিও ট্রোপ, বেশ বড় জাতের, বেশ রংদার, কিন্তু পাপড়ির ধারগুলো রোদে শুকনো তা আগেও বলা হয়েছে। বাড়িটা সাদা দোতলা, সামনে সরু ধরনের একটা বারান্দা, মেঝে লাল, আর সরু সরু থাম-গুলো সবুজ-কালোয় মোজেক করা। বারান্দায় খানকয়েক বেতের চেয়ার দরজাগুলোর এপারে ওপারে। একটা কাঠের ইজিচেয়ার। অফিসঘরের মধ্যে যেখানে মবিলের টিনগুলো সাজানো তারই কাছে কাছে কিছু স্পেয়ার পার্টস্।

জিপ্ থেকে নেমে লোকটি অফিসে গিয়ে কিছু বললো। তেলকালি মাখা হাপ্‌প্যান্ট গেঞ্জিপরা এক ছোকরা স্প্যানার নিয়ে বেরিয়ে এলো। লোকটি রামভকতকে বললো,—তোমার মেমসাহেবকে বরান্দায় উঠে বসতে বলো। গাড়িটাকে ওরা গ্যারাজে নিয়ে যাক।

বারান্দার মাঝামাঝির চাইতে বরং বাঁ ঘেষে একটা চেয়ারে বসলো মিসেস। জিপের আরোহী অফিসে ঢুকলো, অফিস থেকে বেরিয়ে এলো, পিছনে গ্যারাজে গেলো, ফিরে এসে অফিসে ঢুকে কিছু বললো তারপর কিছু করার না থাকায় বারান্দায় এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। তামাকের থলে বার ক'রে সিগারেট পাকাতে সুরু করলো।

এখন একটা দরজার খোলা পাল্লার দুপাশে দুখানা চেয়ারে দুজন, মিসেস আর জিপের লোকটি। এখানে যেমন চেয়ার হ'তে পারে। একেবারেই সাধারণ। একখানা কাঠের, একখানা বেতের। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

মিসেস মনে মনে বললো, যে রকম লাফাচ্ছিলো তা থেকে বোঝা যায় জিপ্‌টারও মেরামত দরকার।

জিপের লোকটি অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে চেয়ে সিগারেটের কাগজ ঠোঁটে ঘ'ষে সিগারেট পাকানো শেষ করলো।

ফুলের বেড্‌গুলোর উপরে দিনের আলোর প্রখরতা কমেছে এখন। ফুলগুলো বেশ বড় বড়, পরিপূর্ণ, হয়তো একটু বেশী ফোটা কিন্তু আকর্ষণীয়।

একটা মৃদু শব্দ গোড়া থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ছিলো। লোকটি সিগারেট ধরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে কারণটা বুঝতে পারলো। মিসেস যেদিকে বসেছে, তার চার পাঁচ হাতের মধ্যেই কমলা রঙের ফুল সমেত একটা লতা দেয়াল বেয়ে উঠেছে। তার কাছাকাছি মৌমাছি উড়ছে। কিন্তু সংখ্যায় যেন অনেক। তারপরই বেশ একটু চমকে উঠলো লোকটি। লতাটির কাছাকাছি বারান্দার কংক্রিটের বরগা থেকে একটা মৌচাক ঝুলছে। বেশ বড়ই,

অনেক ব্যস্তসমস্ত মৌমাছি বিজ্‌বিজ্‌ করছে।

দু-তিনটি মৃদু অস্পষ্ট খাঁকাড়িতে গলা সাফ ক'রে লোকটি বললো,—ওদিক থেকে উঠে আসা ভালো। মাথার উপরে মৌচাক দেখছি।

মিসেস চমকে উঠলো। তার মুখ থেকে সব রক্ত স'রে গেলো। এদিক ওদিক চাইলো, মৌচাকটাকে দেখতে পেলো। উঠে দাঁড়ালো। দরজাটা পার হ'য়ে লোকটি যেদিকে বসেছিলো সেদিকেই স'রে এলো। এদিকের একটা চেয়ারের সামনে দাঁড়ালো। চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে যেন অবলম্বন নিলো।

লোকটি বললো,—মেরামতের দেরি হবে। বসা যেতে পারে।

মিসেস পাশের চেয়ারেই বসলো। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো। এ কিছুই নয় এরকম এক ভঙ্গিতে তার পাতলা ঠোঁটদুটো একটু ছড়িয়ে গেলো।

দু তিন মিনিট—এর মধ্যে একটা মৌমাছি লতা থেকে অফিসের দরজা পর্যন্ত ভোঁ ক'রে উড়ে গিয়ে খোলা দরজার পাল্লায় ঠক্‌ ক'রে গুতো খেলো।

লোকটি বললো,—বিশেষ ক'রে যদি স্পেয়ার পার্টস দরকার হয়, এদের কাছে সব গাড়ির উপযুক্ত পার্টস থাকে না, অনেক দেরি হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু এই দীর্ঘ পথে একা কেন? সঙ্গের ওটা যে গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানে না তা দু'কথাতেই বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু কথাটা কি ভালো হ'লো। বরং একটু অপ্রতিভই হ'ল লোকটি।

মিসেস ইতস্তত করলো। কোলের উপরে হাত ব্যাগটার গায়ে হাত বুলালো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। তার কানের কাছাকাছি কিছু হাল্কা আরক্ততা দেখা দিলো। মুখ ফিরালো। লোকটির বরং কাঁধের কাছাকাছি দৃষ্টি রেখে বললো,—ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা হয় নাকি আজকাল?

—না।

যে মেরামতের কাজ করছিলো সে অফিসঘরের দিকে এলো।

জিপের লোকটি জিজ্ঞাসা করলো,—কি রকম লাগছে?

—সুবিধার নয়, সার, কিছু অদলবদল দরকার হ'লেও হ'তে পারে। রাত হয়ে যাবে।

মিসেস বললো—তা হ'লে?

মেকানিক ছোকড়া অফিস থেকে একটা মবিলক্যান নিয়ে ফিরে গেলো। জিপের লোকটি বললো,—এখানে ধারে কাছে এমন রেস্টুরেন্ট নেই যে চা খাওয়া যায়। অথচ এক-জনের ক্লান্তি হওয়া স্বাভাবিক।

অনেক সময়ে প্রথমপুরুষে কথা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। ক্রিয়াপদগুলোর জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হয়।

মিসেস বললো—এখান থেকে জেলার সদর কতদূর কেউ জানে? কোন রকমে রাত আটটাতেও পোঁছানো যায় না? সেটাই ডিনার টাইম।

—মেরামত যদি সময় না নেয়, অর্থাৎ যদি এক ঘণ্টায় হয়। অবশ্য চায়ের একরকম ব্যবস্থা করা যায় না এমন নয়।

—জিপের চেহারা, পোশাক, বন্দুক, এসব দেখে ধারণাটা হয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্ট-মেণ্টের কেউ হ'তে পারে।

মিসেস সানগ্লাসের বাঁয়ের কাচটিকে স্পর্শ ক'রে সেটাকে লাগসই ক'রে নিলো।

—সাতদিনের ছুটি ভোগ করা। দোতালাটা কি জন্য করেছিলো জানা যায় না।

হয়তো মালিকরা থাকতো। কিন্তু ওখানে এখন খানিকটা রেস্টরুমের মতো। বাথরুম আছে। গড়ানোর মতো ইজিচেয়ার, এমন কি দরকারে একটা ঘুম দেবার মতো খাট। আমার সঙ্গে চায়ের বন্দোবস্ত আছে।

মিসেস কথা বলার আগে ভাবলো। খুব মৃদু খাঁকড়ি দিয়ে গলা সাফ ক'রে নিলো। বললো,—কিন্তু সদরে যাওয়ার কি উপায়? তারপর গলা আর একটু নামিয়ে বললো,—তুমি নিজে একটু দেখবে কি হয়েছে গাড়িটার।

আবার তার মুখ থেকে বেশ খানিকটা রক্ত স'রে গেলো।

লোকটির রোদে পোড়া মুখ লালচেই দেখায়। সে বললো,—গাড়ি সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। রেস্টরুমের চাবি আনবো?

—কি হবে?

—স্নান করবে। শাড়ি পাল্টাবে। চা করবে।

মিসেস চুপ ক'রে ব'সে রইলো। দিককানা একটা মৌমাছি চাকের চৌহুদ্দি ছাড়িয়ে ভোঁ ক'রে উড়ে গেলো। বেশ শুকনো খটখটে কবোষ্ণ দিন-শেষ।

লোকটি উঠলো। অফিস ঘরে গেলো। রেস্টরুমের চাবি এনে মিসেসের কোলের উপরে আলতো ক'রে ছেড়ে দিলো। গ্যারেজের দিকে চ'লে গেলো তামাকের থলে থেকে হাতের তেলোর উপরে তামাক মাপতে মাপতে।

দুহাতে একটা বড়সরো বেতের চ্যাঙারি নিয়ে সে ফিরে এলো। রামভকত এলো তার আগে আগে। লোকটি বেতের চ্যাঙারি রাখলো। রামভকত দাঁড়ালো ভক্তের মতো।

—দেরি হবে। অনেক অনেক দেরি হোবে।

—কি হয়েছে। বললো মিসেস।

—হাইড্রলিকের ডারাম চোট খেয়ে টোল ভি খেয়েছে।

কিছু ভাবলো মিসেস।

—আচ্ছা, রাম, এদিকে কোথাও বড় গ্যারাজ নেই? মানে এটার চাইতে বড়। কোথাও না কোথাও থাকবেই দেখো। বড় না থাকলেও এমন থাকতে পারে যেখানে এরা যা পারছে না তা পারতে পারে।

রামভকত চ'লে গেলো।

অনেক সময়ে একটা সাধারণ কথা অনেকগুলো বাক্যে বিশদ ক'রে বলতে গেলে কথাটা শেষ ক'রে মৃদু মৃদু হাঁপাতে হয়। নিঃশব্দে হ'লেও একটু জোরে জোরেই নিঃশ্বাস নিচ্ছে মিসেস।

কিছুক্ষণের মধ্যে জিপ তার পিছনে বাঁধা প্লিমাউথ নিয়ে রামভকত আর তার মতোই ছোক্‌ড়া মেকানিক বারান্দার কিছু দূরে দাঁড় করালো। দুটো থেকেই নিজেরা বুদ্ধি ক'রে ভারি মালগুলো নামিয়ে রাখলো। এ অবস্থায় এই তো স্বাভাবিক। যেমন স্বাভাবিক অচল প্লিমাউথকে টেনে জিপটারও যাওয়া যেমন স্বাভাবিক দুটো স্টিআরিং ধরার জন্য দুজন লোক।

জিপের আরোহী নিঃশব্দে হাসলো। এ রকম অবস্থায় তা না হেসেও পারা যায় না। বললো,—ওরা কি বুঝে নিয়েছে কে জানে।

মিসেস বললো,—না, না। মানে হাইড্রলিকের ড্রাম কি বলছিলো।

—মনে হচ্ছে সেটা উপসর্গ। তাতে ব্রেকের অসুবিধা হ'তে পারে। এখানকার

মেকানিক আর রামভকত আমার মতোই পটু। আসল রোগ ধরতে পারে নি, তাতে সন্দেহ নেই।

মিসেস উঠে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত করলো। পাশের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে চাইলো। একটা সিঁড়ি দেখা যায় বটে, আর সেটা হয়তো দোতালার সিঁড়ি।

জিপের আরোহী উঠলো। দরজা দিয়ে সেই আগে ভিতরে গেলো। দোতলার সিঁড়িতে পথ দেখালো। ঘরের চাবি খুললো মিসেস। জিপের আরোহী বললো,—তুমি ব'সো। ব্যবস্থা ক'রে আসি।

লোকটি নেমে এলো। ভারি মালগুলোকে অফিসের জিম্মায় রেখে, মিসেসের স্যুটকেস্, নিজের ঝোলা ব্যাগ, আর চায়ের চ্যাঙারি নিয়ে রেস্টরুমে ফিরে গেলো।

—বাথরুমের দরজা পেয়েছো? নাকি আগে চা করবে?

গলাটাকে শান্ত ক'রে আনলো মিসেস,—বসো। কথা বলি বরং।

—বেশ কথা। চায়ের জল ফুটতে ফুটতে কথা বলা যাবে।

লোকটি চ্যাঙারির পেট থেকে নানা আকারের কৌটা বার ক'রে টেবলে রাখলো। একটা মাঝারি চেহারার স্পিরিটল্যাম্প বার ক'রে ধরিয়ে দিলো। বাথরুমের ট্যাপ থেকে ছোট একটা কেটলি ভ'রে এনে স্টোভে চাপালো। চেয়ারে ব'সে তামাকের থলে বার করলো সিগারেট পাকাতে।

মিসেস বললো,—সাতদিনের ছুটি ভোগ করছো মানে? শীকার?

লোকটি হাসলো। বললো,—এ পর্যন্ত আমার বন্দুকে, এই পাঁচ সাত বছরে একটা ফেজ্যান্ট ছাড়া কিছু মরে নি। আর তখন আমি চব্বিশ ঘণ্টার অনাহারী ছিলাম।

মিসেস টেবলে হাতের ভর রেখে দাঁড়ালো।

কেট্‌লিতে মৃদু শব্দ হচ্ছে।

মিসেস বললো,—দু এক কথায় উত্তর দিলে কথা চালিয়ে যাওয়া শক্ত। অনাহারী ছিলে কেন?

—জঙ্গলে পথ হারিয়ে। তখনও জিপ্‌টা যোগাড় হয় নি। বনের অলিগলি ধ'রে পায়ে পায়ে চলতাম। এদিক দিয়ে জিপ্ রক্ষা-কবচ। একটু বড় পথ ছাড়া চলে না। আর বনের বড় পথ মানেই তার কোথাও না কোথাও বনবিভাগের বাংলো না হ'ক, চালাঘর থাকবেই। সারা দিন ফুর্তিতে হেঁটে সন্ধ্যায় বুঝলাম পথ গুলিয়ে ফেলেছি। রাতটা মশা আর পোকামাকড়ের জ্বালায় ঘুমের ঝোঁকে পশুদের ডাকাডাকি শুনে সহজেই কেটে গেলো। পরের দিন দুপুর নাগাদ চন্‌চনে ক্ষিধের মুখে দেখি ফেজ্যান্ট। ভাবি নি পড়বে। তা পড়লো। বড্ড সহজে ওরা মরে কেন যে—

—কিন্তু বন—

—এদিকের সব বনই এমন যে পথ যতই হারাক ক্রমাগত মাইল তিনেক চললেই কোন না কোন বড় পথের উপরে গিয়ে পড়বে। অবশ্য পথের আড়াআড়ি যদি বড় নদী না দেখা দেয়। তা হ'লে সময় বেশীই লাগবে, ঘুরে গিয়ে নদীটাকে এড়াতে হবে ব'লে।

মৃদু মৃদু হাসলো জিপারোহী।

—এইসব ক'রে বেড়াও নাকি আজকাল?

—না, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বছরে দুতিনবার ছুটি নেই। অন্য সময়ে চাকরিই করি।

—জানতাম শীকারীরাই বনবাদাড়ে ঘোরে; নতুবা তারা ফরেস্টের লোক।

—ঠিক নয়। আরও আছে। চায়ের জল ফুটবে? ছেলেমেয়ে ক'টি?

—এক ছেলে, দুই মেয়ে। বললো মিসেস,—মুখময় ধুলো। হাতে মুখে জল দাও। বনে তো বাঘও থাকে।

—বেশ কথা। তাদের আমি মারতে গেলাম কেন? বাঘ খাওয়া যায় না।

বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলো লোকটি।

স্টোভে জল ফুটে উঠলো।

মিসেস বললো,—বিয়ে করো নি?

—আলবৎ।

কিন্তু কথাটা কি রুক্ষ আর জোরে বলা হ'লো। মিসেসের মুখের দিকে তাকালো লোকটি। মিসেসের হাতের পিঠে আলগোছে হাত রাখলো। বললো,—কিছু মনে করো না।

জল দেখে নিয়ে কেট্‌লিতেই চা ভিজালো মিসেস। সে স্নানঘরে গেলো হাতমুখ ধুতে। সে ফিরে এলে নিজের হাতের তোয়ালে মিসেসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,—আমার হাতে তৈরী স্যান্ডুইচ্ আছে। বুনো বুনো লাগবে, মন্দ নয়।

চা করলো মিসেস। চ্যাঙারি হাতড়ে কাপ প্লেট বার করলো মিসেস। লোকটির সামনে চায়ের কাপ দিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসলো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মিসেস বললো,—এক রাত এই রেস্টরুমে—

—বিচিত্র নয়।

—সারা রাত না হ'ক, মাঝ রাত অবধি।

—খুবই সম্ভব। একমুখ স্যান্ডুইচ্ কামড়ে লোকটি বললো,—গাড়ি কিভাবে সারানো হ'য়ে থাকে তা আমার জানা নেই। সানগ্লাসটাকে খুলছো না কেন?

একটু পরে লোকটি বললো,—স্নানও করবে? নাকি, শাড়িটা পালটে নাও বরং। ঝরঝরে লাগবে। তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তোমার ছেলেমেয়ে বড়সরো হয়েছে।

—আর একটু বসি। এই ব'লে মিসেস জানালার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। গ্রিলের খানিকটা লোহাকে চেপে ধরলো হাত বাড়িয়ে।

আবার একটা সিগারেট পাকালো লোকটি। চেয়ার ছেড়ে মিসেসের দিকে এগিয়ে গেলো। মিসেস ফিরে দাঁড়ালো। লোকটির কাঁধের নিচে বুকের একটা পাশে হাত রাখলো একখানা।

—আচ্ছা সত্যি রাত হ'তে পারে নাকি, অন্তত মাঝ রাত অবধি, কিন্তু তা হ'লে লোকে কি বলবে? মিসেস থেমে থেমে প্রশ্ন করলো।

লোকটি হেসে বললো,—এখানে কেউই নেই জিজ্ঞাসা করার মতো। এদের ক্যাশিয়ার আছে। তাকে পরে এক সময়ে বলে দেবো আমার ওয়াইফ্। আর সেটা এদের সকলের কাছে অ্যাবস্যেলুটলি বিশ্বাসযোগ্য হবে। জিপ আর প্লিমাথ যেমন গাঁট ছড়ায় বাঁধা। আমি দেখেছি সাধারণ লোকে এসব প্রতীকত্বকে সত্যের প্রমাণ ব'লে মনে করে।

জানালার গ্রিলে বাহু রেখে তার উপরে কপাল রাখলো মিসেস। কিছুক্ষণ বাইরে চেয়ে রইলো। বললো,—শাড়িটা পাল্টাবো ভাবছি।

—হ্যাঁ। ঝরঝরে লাগবে। ক্লান্তিটাও কমবে।

স্নান-ঘরের দরজা একটু ফাঁক ক'রে মিসেস বললো,—সাবানটা দাও তো, আনতে ভুলে গেলাম।

নিজের ঝোলা-ব্যাগ থেকে লোকটি সাবান বার ক'রে দিলো।

লোকটি ইজিচেয়ারে টান হ'য়ে ইতিমধ্যে আর একবার তামাকের পাউচ বার করেছে।

এ শাড়িটা হাল্কা কমলা রঙের কিংবা সাদা চৌখুপী হওয়ার ফলেই তেমন হাল্কা দেখায়। অথবা আলোটাই তেমন।

মিসেস ইজিচেয়ারটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললো,—গাড়িটা সেকেন্ডহ্যান্ড বলেই—

—টাট্, টাট্, একেবারে নতুন গাড়িতেও ব্রেকডাউন হ'তে পারে। কিন্তু সেকেন্ডহ্যান্ড কেন?

—আবার সেই কথা? দুহাজার টাকা এমন কিছু বেশী উপার্জন নাকি? তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

—দুটি ছেলে। আচ্ছা! একেই মানে এই আলোকেই বলে নাকি?

—কি?

—ক'নে দেখা আলো?

একটু দূরে রাখা চেয়ারটায় বসলো মিসেস। বললো,—আলোটা জ্বালবো? আচ্ছা এদের ক্যাশিয়ারকে যে বলবে—অবশ্য আমি এ ব্যবস্থা করতে পারবো যে কোনদিনই ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এই পেট্রোল পাম্পে আসতে হবে না, অথবা ম্যাজিস্ট্রেট একাও আসবে না। সেটা করা আদৌ শক্ত নয় বুঝেছো। আর, দু বছর পরে ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হ'য়ে মিদনাপুর কিম্বা পুরুলিয়া যেতে পারে। অর্থাৎ পরে কোনদিনই—

নিটোল ক'রে সিগারেটটাকে পাকিয়ে নিলো লোকটি।

—কিছুদিন আগে পিসিমা বলেছিলেন তাঁর বাড়ির কাছেই নিউ আলিপুরে জমি রেখেছো তোমরা।

—বাড়ি হয়নি। আমি মনে করি কলকাতার রাইটার্স বিল্‌ডিংএ এখনি গিয়ে বসতে পারবে না ম্যাজিস্ট্রেট। এখনও অনেক জেলার সদরে ঘুরতে হবে তাকে। এদিকেও মুস্কিল বাড়ির কায়দা অবিরত বদলাচ্ছে, পাঁচ বছরেই ডাহা সেকেলে হ'য়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের কলকাতায় বসবার সময় হ'তে হ'তে এখনকার তোলা বাড়ি অসহ্য রকমে আউট অব ডেট হবে না? মিসেস হাসলো। বললো,—আলোটা জ্বালি? তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করার কথাও ভাবতে হবে। বারো বছরের ছেলে দেখে বলা যায় না কি হবে। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে কবে ম্যাজিস্ট্রেট হয়? আর তা ছাড়া আজকাল ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির চাইতে প্রাইভেট ফার্মের চাকরিগুলো ভালো।

গলার কাছে কি একটা জমে উঠেছিলো। সেখানে হাত রাখলো মিসেস।

লোকটি বললো,—কিন্তু ওটা তো সান গ্লাস। আলো জ্বালাবার আগে খুলবে না।

মিসেস উঠে দাঁড়ালো। পায়ে পায়ে গিয়ে গোল টেবলটার পাশে দাঁড়ালো সে। টেবলের উপরে পিতলের বড় একটা টেবলল্যাম্প।

লোকটি উঠলো। বললো,—বসো, আমি জেবলে দি।

টেবল ল্যাম্পটাকে জ্বালালো লোকটি। ফিরে এসে ইজিচেয়ারে টান হ'লো আবার। উঠে বসলো। একটু ঝুঁকে প'ড়ে মিসেসের একখানা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিলো। ইজিচেয়ারটাকে বরং মিসেসের আসনের দিকে ঠেলে নিলো।

একটু ফিস্ ফিস্ ক'রে মিসেস বললো,—রামভকত কি গাড়ি মেরামত করিয়ে এখনই

ফিরতে পারবে?

আমি জানি না এদিকে অন্য কোন ভালো গ্যারাজ আছে কিনা; থাকলেও সেটা কোথায় এবং কতদূরে, অথবা তারা প্লিমাথ মেরামতের—

—রামকে পাঠিয়ে দেয়া তা হ'লে বিনা কারণে হয়েছে?

—অবাক লেগেছিলো। পরে ভেবে দেখলাম তুমি তো চিরদিনই সাহসী ছিলে।

—আচ্ছা—

—কি?

আলগোছে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো মিসেস। উঠে দাঁড়ালো। কিছু ভাবলো। এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো। সানগ্লাসটাকে খুলে রাখলো টেবলের উপরে। চোখ নিচু ক'রে হেঁটে গিয়ে জানালার গোড়ায় দাঁড়ালো।

ইজিচেয়ার থেকে উঠলো লোকটি। পায়ে পায়ে গিয়ে মিসেসের পাশে পেঁাছালো। ফিরে দাঁড়ালো মিসেস। দুই হাত উঁচু ক'রে লোকটির ঘাড়ের পিছনে জড়ো করলো। লোকটির মাথাটা নুয়ে এলো। মিসেসের চোখে টেবলল্যাম্পের আলো পড়লো যেন ঝিক্‌মিক্ ক'রে। একপলক পরে হাতদুটি নামিয়ে নিলো সে।

অবান্তরভাবে বললো, মৌচাকটা বোধ হয় এই জানালাটারই ঠিক নিচে। আর এই অবান্তর কথা বলার জন্যেই যেন অপ্রতিভ হ'য়ে হাসলো।

ঘরের মেঝেটা পার হ'লো মিসেস। ধূসর বেডকভারে ঢাকা খাটের একপাশে বসলো সে।

লোকটি জানলা থেকে স'রে এলো। পায়ে পায়ে সেও ঘরের মেঝেটা পার হ'লো। মিসেসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। দুনিমেষ পরে ফিরে গিয়ে ইজিচেয়ারটাতেই বরং বসলো সামনের দিকে ঝুঁকে।

মিসেস বললো,—আচ্ছা—

—কিছু বললে?

—তোমার ছেলে দুটি কি ঠিক তোমারই মতো দেখতে?

লোকটি ভাবতে লাগলো।

মিসেস বললো,—আমি কিছু দিতে চাই। যা অনেকদিন ধ'রে থাকে তোমার ছেলেদের সঙ্গে। আমার দেয়া এমন কিছু যা জড়িয়ে থাকে। একটা এনডাওমেন্ট। একটা প্রেজেন্ট।

লোকটা ইজিচেয়ার থেকে সামনের দেয়াল, দেয়াল থেকে ইজিচেয়ার অবধি চ'লে বেড়ালো। থেমে দাঁড়িয়ে কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলো।

—রাত আটটা হ'লো। এই বললো।

মিসেস বললো,—কি ক'রে সময় কাটে তা বোঝাই যায় না। তা ছাড়া এর আর কোন প্রতিকারই নেই, না? নাথিং ডুইং।

—যদিও এমন সুযোগ আর কখনই আসবে না।

—বোধ হয় তাই। তোমার ছেলেরা ঠিক তোমার মতো হবে এমন কথা নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলেরাও—একটু থেমে আবার বললো মিসেস,—কিন্তু, আচ্ছা, আমি যদি আমার কোন মেয়ের নাম তোমার নামে মিলিয়ে রাখি?

—রাখবে? একটু পরে লোকটি বললো আবার,—কিন্তু তাতেই বা কি লাভ?

—লোভ হচ্ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এক সময়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের মধ্যে অন্য দুজনের যুক্ত-সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আঙুলের ডগায় সরু ক'রে আঁচল জড়ালো মিসেস। গালে হাত রাখলো যেন ভর রাখতে। আঁচল জড়ানো আঙুলটা চোখের পাশে ছুঁয়ে গেলো। মৃদু হেসে বললো,—নাথিং ডুইং কথাটা বেশ, নয়?

লোকটি বললো,—কতদিন পরে বলো তো? প্রায় দশ বছর। ভাবা গিয়েছিলো? কিন্তু ওটা কি গাড়ির শব্দ না মৌমাছির?

লোকটি জানালার কাছে স'রে গেলো। তার অসংখ্য সিগারেটগুলোর আর একটাকে পাকাতে সুরু করলো। বললো,—গাড়িই যে দেখছি। আগে প্লিমাউথ পিছনে জিপ্‌টা।

—কেন? মিসেস বললো।

লোকটি ফিরে দাঁড়ালো। বললো,—এগারোটার মধ্যে সদরে পৌঁছে যেতে পারবে।

মিসেস জানালার কাছে স'রে এলো, পাশে দাঁড়ালো, বললো,—রামভকত আসবার আগেই কি নেমে যাওয়া দরকার?

—তাই চলো।

পাশাপাশি চ'লে ঘরের মাঝখানে পৌঁছে তারা মুখোমুখী দাঁড়ালো। লোকটি হাত বাড়িয়ে মিসেসের কোমড় বেষ্টন করলো। মিসেস মুখ তুললো, হাসলো অপ্রতিভের মতো, তার ঠোঁট দুটো ফুরফুর্ করলো।

ফিস্‌ফিস্ ক'রে মিসেস বললো, -আর একটুও দেরি করা যায় না বোধ হয়, তাই নয়?

—তুমি আগে চলো, আমি তোমার সুটকেশ নিয়ে নামছি। টেবলের উপরে তোমার সানগ্লাসটা--

—এর আর কোন প্রতিকারই নেই, তাই নয়?

লোকটি বললো,—নাথিং ডুইং কথাটা তোমার একবার পছন্দ হয়েছিলো।

ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক ক'রে একটু হাঁপালো মিসেস। কিছু একটা বলতে গিয়ে সেটাকে গিলে ফেল্‌লো। তার গলার উপরে একটা ছোট ঢেউ খেলে গেলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মিসেস বললো,—জানো নিউ আলিপুরে জমি কেনা আছে বটে, বাড়ি হ'য়ে উঠছে না।

লোকটি বললো, -ও তাই নাকি? ও তাই তো। তোমাদের সকলের শরীর ভালো যাচ্ছে তো? পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো নাকি এর মধ্যে?

মিসেস বললো,—তোমার সাতদিনের ছুটি কবে ফুরাবে? পিসিমা ভালো আছেন। এটা একটা রেলওয়ে ওয়েটিং রুমও হ'তে পারতো।

নিচে নামতেই প্লিমাউথও ঢুকলো পেট্রোল পাম্পে।

মিসেস বললো,—গাড়িতো চলছেই দেখছি। তারপর একটু হেসে বললো,—এবার তোকে একটু মেকানিকের কাজ শিখে নিতে হবে রামভকত।

—জি হুজুর।

প্রথমে প্লিমাউথ বেরুলো। বেশ মসৃণ দ্রুতগতিতেই। তখন একটা ম্যাটমেটে আলো দেখা দিচ্ছে। অন্ধকারটা হাল্কা হচ্ছে।

জিপ্‌টা অনুসরণ করলো। সেটা এখনও লাফাচ্ছে। কোন কোন গতি খাপছাড়া হ'য়ে থাকে। মেরামতে শোধরায় না। সব কিছুরই প্রতিকার থাকে না।

শব্দের খাঁচায়

।লক্ষ্মীপুর।

অসীম রায়

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের যেসব তরুণ 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে রাস্তায় নেমে মিছিল করেছিল সুব্রত তার মধ্যে অন্যতম। তখন এক প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে পুলিসের লাঠি খেয়েছে, বার দুয়েক জেলেও গিয়েছে কিন্তু সেই উদ্দীপনার জ্যোৎস্নায় রাস্তার পাশের আবর্জনাও মনোহর। এই রাস্তায় নেমে মিছিল করার সঙ্গে রুশ বিপ্লব, চীনের বিপ্লব একাকার হয়ে গিয়েছিল অনেকের মতো সুব্রতর মনেও। তার বাবাকে সে বলত 'ব্লাডি কেরীয়ারিস্ট', নির্মলকে বলত 'কাওয়ার্ড', আশেপাশের লোক যারাই আগামী বিপ্লবের পদধ্বনি শুনবার জন্যেই কানখাড়া করে নেই তাদের সকলকেই মনে হোত ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। পৃথিবী দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক ভাগে সুব্রত ও সুব্রতর মতাবলম্বী লোকজন আর অন্য ভাগে আছে সেই সব মানুষ যারা এখনও ঠিক মানুষ নয়, যাদের মানুষ করতে হবে।

তবে গত দশ-বারো বছরে ভারতবর্ষের সাম্যবাদ আন্দোলন নানান ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় এ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যেও অনিবার্য কারণে নানারকম পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে যাঁরা ভাল ছাত্র তাঁদের কেউ কেউ সওদাগরী অফিসে ঢুকে কর্মদক্ষতাই যে শেষ-পর্যন্ত সাম্যবাদ আনতে সাহায্য করছে এই বিশ্বাসে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছেন। কেউ কেউ হয়েছেন বিষণ্ণ বিরক্ত, ছিবড়ানো লেবু, যৌবনেই বৃদ্ধ, হাসিটা মুখের কোনে এখনও জোর করে জিইয়ে রাখেন। আর কিছু কিছু কর্মীর জীবনের ধার এখনও আছে, শুধু তাঁরা টিঁকে আছেন এমন নয়। রাজনৈতিক উত্থান-পতন, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তাঁদের যে আঘাত করে নি তা নয়, তাঁদের অনেককেই তা গুরুতরভাবে জখম করেছে কিন্তু তারা যেন রাজনৈতিক শাঠ্য মেনে নিয়েছেন এমনভাবে যেমন দার্শনিকেরা গরল ও অমৃতের অবিভাজ্য মিলনকেই গ্রহণ করেছেন মানুষের জীবন ব্যাখ্যায়।

ভিড়ে-ঠাসা বাসটার এক কোনে বসে সুব্রত তার নতুন আস্তানার কথা ভাবে। বাইরে লালমাটি, রুক্ষ রাঢ়ের ধানকাটা মাঠ। নিজেকে সে প্রশ্ন করে, সে কি কাউকে বাস্তবিক ঈর্ষা করে—তার ছোট ভাই নান্টুকে কিংবা নির্মলকে? নান্টুকে তার বাবা এক জাঁদরেল ব্যারিস্টার বানাতে চান তাতে তার ক্ষোভ কি? আর নির্মলের মতো রাজনীতি থেকে পালানোও সে বোঝে না। মানুষের যে পারিবারিক জীবন তাতে গন্ডগোল নেই? তাহলে পার্টি সংগঠনেও গন্ডগোল থাকবে না কেন? আর তাই বলে পার্টি ছাড়তে হবে?

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী শহর থেকে আসতে আসতে রাস্তার দুধারে শালবন আগাগোড়া তাদের বাসের ওপর এক লম্বা ছাতার মতো ছায়া ফেলে আসছিল। সুব্রত সেদিকে চেয়ে চেয়ে মাথা নাড়ায়—না, নান্টু সে হতে পারবে না। নির্মল হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব। গত দশ-বারো বছরে তার সমস্ত যৌবনের উষ্ণতা দিয়ে সে রাজনৈতিক পার্টি সংগঠনকে আঁকড়ে ধরেছে। এর হয়তো অনেকখানি 'মেক্ বিলিভ্' যেরকম নির্মল বলে, অনেকখানিই হয়তো মিথ্যের সঙ্গে আপোষ কিন্তু বাবার মতে মত দিয়ে নিখাদ ব্যারিস্টার হয়ে মস্ত পশার ফাঁদিয়ে কলকাতায় আরও একটা মস্ত বাড়ি করে' ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রাণত্যাগ করলেই কি সত্যের পথে থাকা হবে? অথবা নির্মল যেমন বড় চাকরী করবার জন্যে তাল করছে তা কি তার পক্ষে সম্ভব? নির্মলের সাহিত্য অধ্যাপনা কিংবা জীবনচর্চায় আত্মসচেতনতা বজায় রাখার সমস্যা তো একক মানুষের সমস্যা। সব ব্যাপারে সচেতন চেষ্টায় দর্শকের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তো সম্ভব না। নির্মল যে নিরপেক্ষ মোহহীন দৃষ্টির কথা বলে তার তো আসলে কোন মানে নেই। নাঃ। পার্টি পার্টি পার্টি! মরুক বাঁচুক পার্টি! একলা মানুষের চেষ্টার কি দাম?

সুব্রত বিড়ি ধরায়। পাশেই রাখা এক ঝাঁকা পাকা কুমড়োর চাপা গন্ধে হঠাৎ তার গা ঘুলিয়ে ওঠে। একটা খালি পিঠের চাপে তার ছোট রোগা শরীরটা চেপ্টে যায়। পুরু ফ্রেমের চশমা ঝাপ্সা লাগে। চশমা মুছে সুব্রত ভাল করে তাকায়। পাশে খালি গায়ের লোকটার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে আরাম করে আরও ঠেস দেয় সুব্রতর গায়। সামনের লম্বা সীট জুড়ে কয়েকটা সাঁওতাল মেয়ে। চুলে শিমুলের ফুল। সামনে ঝুঁকে পড়ে কি শুনছে। সামনের সীটে একটি যুবক। সুব্রত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে এই খালি গা আর আধময়লা ধুতির ভিড়ে ছেলেটার পরণে চোঙ্গা প্যান্ট আর টেরেলিনের বুশশার্ট। হঠাৎ একটা চাঁছাছোলা গলার চীৎকার ভেসে আসে, 'গুড্ লেংথ বল, গুড্ লেংথ বল, ও মারভেলাস্ ড্রাইভ।' সুব্রত চম্‌কিয়ে এই ট্রান্‌জিসটারমালিকটির দিকে তাকায়। তারপর রূঢ় গলায় বললে, 'আপনার গুড্ লেংথ বলটা থামান তো। এখানে ওটা কেউ বুঝবে না। আপনিও বোঝেন কিনা ভগবান জানে।'

সুব্রতর তীক্ষ্ম গলায় একটু ভয়ে ভয়ে তাকাল ছোকরাটি। তার শ্রোতাদের মধ্যে সাঁওতাল মেয়েগুলোও অবাক হয়ে তাকাল। সেদিকে চেয়ে সুব্রত আস্তে আস্তে বললে, 'চালান চালান। সারা দেশটাই ছেয়ে গেছে। আপনি আর কি দোষ করলেন।'

'ইডেন গার্ডেনে আমিও স্যর খেলা দেখেছি',

'বাঃ! কদ্দুর পড়া হয়েছে?'

ছোকরাটি এতক্ষণে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বস্তুত তার আত্মবিশ্বাস না থাকবার কারণ নেই। গাঁয়ের সবচেয়ে সম্পন্ন ঘর তারা। বললে, 'পড়াশোনায় আজকাল কি হয় স্যর। আমাদের সঙ্গে সোনামুখী হাইস্কুলে পড়ত বারীন ব্যানার্জী। সব সাবজেক্টে ফাস্ট। এখন ফ্যা ফ্যা করছে।'

'কি করেন?'

'ও'রা তিলি গো, তেল বেচেন বটে।' পাশেই বসা লোকটা ফস করে বলে উঠল। এবার কে একটু সরে বসতে সুব্রত ভালভাবে তাকে দেখে। এক হাঁটু ধুলো, বাবড়ি চুল। শক্ত কালো কুচকুচে চেহারা।

'সে বাবারা দেখে,' ছোকরাটি বেজারভাবে জবাব দেয়।

'মানে বাবা জ্যাঠারা বলছে গো। তাঁরা তো প্যান্ট পরবে, রেডিও বাজাবে, ঘানি দেখবার ফুরসুত কই।' কথাটা বলেই লোকটি আবার একমুখ ধ'ুয়ো ছাড়লে।

'মদন, আর কদ্দিন ঘরে ভাত আছে রে তোর?'

'মদন বাউরীর ঘরে কদ্দিন ভাত থাকে? তুমি কি একবার কলকেতা ঘুরে শহরের লোক হলে নাকি হে?' মদন এবার তার ধুলোমাখা বাবড়ি ঘুরিয়ে তাকায়। বোধহয় একটু তাড়িস্থ। সুব্রতর দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বললে, 'নবীনের সাকরেদ নাকি? কোথায় যাও?'

গত তিন-চার বছরে সংখ্যাতত্ত্ব সন্ধানে কয়েকটা জেলা ঘুরেও এসব ক্ষেত্রে আড়ষ্ঠতা কাটিয়ে উঠতে একটু দেরী লাগে সুব্রতর। 'লক্ষ্মীপুর', আস্তে আস্তে বলে।

মদন বললে, 'আমাদের গাঁয়ে চললে যে! মাছ মারবে নাকি তো বলো, ভাল চার জানি।'

নবীনও উৎসাহিত হয়ে বললে যে মাছ ধরার আয়োজন সেও করতে পারে। তাছাড়া যদি শিকারে যেতে চায় সে তাহলে তার কাকার একটা রাইফেল আর একখানা শট্ গান আছে। গাঁ থেকে তিন মাইল দূরে আমতলার ঝিলে জল আছে। হাঁস পাওয়া যাবে।

প্রত্যেকবারের মতোই তার কাজটা ঠিক কি তা বোঝাতে মুস্কিলে পড়ে। তাদের ইন্স্টিটিউট সরকার থেকে সাহায্য পায় বটে তবে সরকারী প্রতিষ্ঠান তাকে কিছুতেই বলা যায় না। কমিউনিটি ডেভালাপমেন্টের কাজ করতে যাচ্ছে না, খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়, কিসান সভার নেতা নয়, আবার মাছ ধরতে কিংবা হাঁস মারতেও যাচ্ছে না, তবু সে গ্রামে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই গাঁয়ের লোকদের বোঝাতে পারে নি।

আর শুধু গাঁয়ের লোক কেন, তার নিজের পার্টি কর্মীদের কাছেও এভাবে গাঁয়ে যাওয়া এক ধরনের সৌখীনতা। তাদের কলেজের গৌতম তাকে বলে 'রিভিশানিস্ট'। অর্থাৎ এভাবে গাঁয়ের খবর সংগ্রহ করতে তার বাবা প্রবোধ সেনেরও যেমন আপত্তি তার রাজনৈতিক বন্ধুদেরও আপত্তি। সুব্রত আগেও ভেবে দেখেছে তাদের যে জীবনের ধারা তাতে বিলেত যাওয়া বরং সহজ, কিন্তু বজবজের কোন কারখানায় আসা প্রায় অঘটন।

মদনের কালো ধূলোমাখা মুখ থেকে তার হলদে চোখজোড়া তাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে। তারপর মদন বলে, 'গবমেন্টের লোক তো বটে?'

'তা তো বটেই,' সুব্রত কিছু বলবার আগেই নবীন উৎসাহ দেখায়। তার উৎসাহ সুব্রত সরকারী লোক কি না তা নয়। চেহারায় কথাবার্তায় একজন শিক্ষিত বাবু চলেছে তাদের গাঁয়ে। সেই বাবুদের মতো সেও হতে চায়। যে বাবুদের মতো হতে পারলে সে আর কিছু চায় না। তাদের দুখানা ঘানি, শ' তিনেক বিঘে জমির স্বাচ্ছল্য, গাঁ জুড়ে লাল মোরামের আঁকাবাঁকা রাস্তা, গাঁয়ের চারপাশে বৃত্তাকারে প্রবাহিত শালী নদীর তীরে তীরে সেচের কাজে লোহার বাগ্দী মেয়েপুরুষের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কলরব—তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। তার মতো আরও গাঁয়ের অনেক যুবকের সাধ হয় সেই ট্রামের হাতলে-ঝোলা, ফ্ল্যাটে-থাকা, সিনেমা-দেখা, খবরের কাগজে মশগুল কলকাতার বাবু হতে। আর বাউলের গান নয়, সাঁওতালী নাচ নয়, প্রকৃতি নয়, গ্রামীন কর্ম নয়, বাবুদের জীবনযাত্রার চিত্রকল্পই নবীনদের পাগল করেছে।

লালধুলোয় তামাটে ঝাপড়া দুটো শ্যাওড়া গাছের সামনে বাস থামে। যারা নামল তারা হন্ হন্ করে এগিয়ে সামনে শরবনের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার রাস্তায় মিলিয়ে গেল। চারদিকে হঠাৎ খুব চুপচাপ। সুব্রত পকেট থেকে ম্যাপ্ বার করে। যে রাস্তা সামনে তা টেস্ট রিলিফের রাস্তা, ম্যাপের ভাষায় টি. আর. রোড। আর মাইল দেড়েক গেলেই গন্তব্যস্থল লক্ষ্মীপুর, সেখানে সম্পন্ন চাষী রতন মুখার্জীর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা। পেছন থেকে এতক্ষণ একটা লোক তাকে লক্ষ করছিল সে খেয়াল করে নি। লোকটা হেঁড়ে গলায় হেসে উঠল ম্যাপের দিকে চেয়ে। বললে, 'এখন তো বাবু জলে নামবার হবে। সাঁতার জানো নাকি গো?'

'সাঁতার!' সুব্রত আকাশ থেকে পড়ল। কাল রাত্তিরে ট্রেনে ঘুম হয় নি, সকালে

প্রাতঃকৃত্য হয় নি। বাসে ভিড়ে চেপ্টে বসে মাজা ধরে গেছে। এখন রতন মুখুজ্জের বিছানায় গা এলাবার জন্যে মন করছে। আবার ম্যাপটা মেলে ধরে সুব্রত। পরিস্কার টি. আর. রোড লেখা।

মদন হেঁকে উঠল, 'আমার কথা বিশ্বেস না হয় তো রাত কাটাও শালীর এপারে।' তারপর প্রায় ছিনিয়েই সুব্রতর বগল থেকে তার ছোট বিছানাটা টেনে নেয়। 'আমি পার করে দিচ্ছি। সাঁতার না জানো তো হাঁড়ি জোগাড় করে দেব? হাঁড়ি চেপে মাগীদের মতো নদী পার হও না কেনে!'

আরও মাইল খানিক দূরে শালী নদী গ্রাম বেড়ে রয়েছে। সারা বছর চর আর পাথর। বর্ষার গোড়াতেও পায়ের পাতা ডোবে না। এখন বর্ষার শেষে নদীর চেহারা পাল্টে গেছে। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ হাত চওড়া লাল জল ক্রমাগত ঘূরপাক যাচ্ছে, আছড়াচ্ছে। তিনটে মাটির জালাতে কয়েকটা বউ আর ক্রন্দনরত শিশুদের ঠেলে ঠেলে পার করাচ্ছে বাউরীরা। পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই ট্র্যানজিস্টারের মালিক তার নীল চোঙা প্যান্ট ছাড়ছে, পাশে সাইকেল।

'তোমার সাইকেল?' সুব্রত বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে।

'ওরা সব পার করে দেবে, কিচ্ছু ভাববেন না। দেখছেন তো পাড়াগাঁয়ের কি অবস্থা! এখানে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে!'

'তোমার বাপ ঠাকুর্দাদা পারত গো। তোমরা তো লোতুন ভন্দরলোক। তোমরা তো পারবে না বটে,' আবার মদনের কর্কশ গলা শোনা যায়।

মদন মাথায় সুব্রতর বেডিং নিয়ে সাঁতরে চলে। নবীনের সাইকেল দুজন আধিয়ার জলের ওপর এক হাতে তুলে আর এক হাতে সাঁতরিয়ে চলে। দুতিন খেপ্ হাঁড়ি পারাপার হোল। আর সকলের মতো ধুতি পাঞ্জাবী পাগড়ী করে মাথায় বেঁধে জাঙিয়া পরে জলে নামে সুব্রত। জলটা যত তড়পাচ্ছে ততখানি বিপজ্জনক নয়। খানিকদূর বুক জলে হেঁটেই পায়ের নীচে জমি পায়। পারে গেঞ্জি আর সাদা ধবধবে কাঁচিধুতি পরনে, পায়ে সাদা রবারের চটি পরে এক ঢ্যাঙা ফর্সা লোক কিছুক্ষণ থেকে সুব্রতর দিকে চেয়েছিল। লোকটির চেহারা স্থানীয় লোকজন থেকে স্বতন্ত্র। সে যে হুকুম তামিল করে না, হুকুম করে তা তার স্থির-দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে স্পষ্ট।

ভেজা গায়ে সুব্রত পারে উঠতেই একটা আনকোরা নতুন তোয়ালে তার দিকে বাড়িয়ে রতন মুখুজ্জে বললেন, 'নিন, গা মুছে ফেলুন। যতো পাপের শাস্তি। আপনাদের কি এসব জায়গা আসা পোষায়। আপনাকে তো বলেছিলাম সোনামুখীর ডাকবাংলোয় উঠতে। এ গাঁয়ের যা খবর তা তো আমার মুঠোর মধ্যে।'

কাপড় পরে গাঁয়ের পরিচ্ছন্ন লাল রাস্তায় পা দেয় সুব্রত। তার মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে' রতন মুখুজ্জে বলেন, 'বেশ ছবির মতো, না? বাইরে থেকে যারাই আসে তারাই বলে। কমিউনিটি ডেভালাপমেন্টের রাস্তা। কয়েক বছর মোরাম পড়ে নি, জলে ধুয়ে যাচ্ছে। আর চার-পাঁচ বছর পর এলে হয়তো দেখবেন গাঁয়ের লোক যেমন আল ভাঙত তেমনিই আল ভাঙছে।'

তারপর খানিকদূর হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'তবে গাঁয়ের উন্নতি অনেক হয়েছে। রেডিও এসেছে গাঁয়ে। বাড়িতে বাড়িতে সাইকেল। গাঁয়ের ইয়ংম্যানদের হাতে ঘড়ি।...... বাউরিদের কিচ্ছু হোল না।'

'কেন হোল না?'

'কুঁড়ে কুঁড়ে!' ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

সুব্রত অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল, একবার ঠোক্কর খায়। দুপাশে রুক্ষ রাঢ়ের ধানকাটা মাঠ বিকেলের হলুদ আলোয় আরও রিক্ত সর্বস্বান্ত লাগে। লোহার বাউরীদের সম্পর্কে অপবাদ সুব্রত আগেও শুনেছে কিন্তু তার অর্থনীতির জ্ঞানে তা মেনে নিতে পারে নি। প্রায় শূন্যে জেগে থাকা একটা ঝোপ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নেয় সুব্রত। পাতাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে এক অস্থিরতাবোধ করে যার আশু কোন সমাধান নেই।

'কী ভাবছেন?' রতন মুখুজ্জে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'নাঃ, কিছু না।' আবার দুজন চুপচাপ পথ চলে। যদ্দিন বাংলাদেশের চাষবাসে লাখ লাখ বাউরি লোহার সমাজের অন্ত্যজ লোক তৈরী থাকবে অতি নীচু দরে তাদের শ্রম বিক্রির অপেক্ষায় তদ্দিন উন্নত চাষ মানে সোনার পাথর বাটি। কিসের তাগিদ রবিশস্যের জন্যে, ফার্টিলাইজারের জন্যে, সেচের জন্যে যদি অন্ত্যজদের বিশাল সৈন্যসামন্ত নিয়ে একবিঘত খোঁড়া মাটিতে ধান ছিটিয়েই লাভ হয়?

সুব্রত চশমা মোছে। বিকেলের আলো পড়ে আসছে। গ্রাম সামনে। দুটো কুকুর একসঙ্গে ডাকতে থাকে। তাড়ির গন্ধ হাওয়ায়। তিন চারজন লোক এসে নমস্কার জানায় রতন মুখুজ্জেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতকেও। গাঁয়ের একমাত্র কোঠাবাড়িতে উঠে আসে তারা। সামনের উঠোনে ধান ঝাড়াই হচ্ছে। এবার রতন মুখুজ্জে সরকারের 'কৃষকপণ্ডিত' খেতাব পেয়েছেন। বিঘে প্রতি অবিশ্বাস্য আঠারো মণ ধান তুলেছেন। ধানের আঁটিগুলো সুব্রতর মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে পাশে গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আঁটি গোনার এক সুরেলা গুঞ্জণ ওঠে। বিকেলের আলো পড়েছে বাগদী লোহার মেয়ে পুরুষদের মুখের ওপর।

'আপনার কোন ভাবনা নেই। স্যানিটারী প্রিভির ব্যবস্থা আছে।' সুব্রত চমকে উঠল রতনবাবুর কথায়। একটা নতুন চুণকামকরা ছোট দোতলা বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ফর্টি থাউসেন্ড পড়ল সব মিলে। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের যা দাম! যখন চাষ করব ঠিক করলাম বামুনের ছেলে হয়ে তখন আত্মীয়-বন্ধুরা মুখ দেখত না। এখন তাড়াতে পারলে বাঁচি।......ঐখানে জলের কলসী। বিছানা পাতা আছে। কোন দরকার ছিল না বেডিং আনার।'

সুব্রত চুপচাপ তক্তপোষখানার ওপর বসে থাকে। বাইরের ধানের আঁটি গোনার গুঞ্জন ছাপিয়ে হাঁস ডাকে। জানলার গায়েই পুকুর। সে কি ফের তিরিশ সালের গান্ধীবাদী যুবকদের রাস্তাতেই চলেছে যে কথা তার কলেজের সহকর্মী গৌতম বলে? সুব্রত আবার একটা বিড়ি ধরায়। গত দশবারোটা বছর আসলে সে একটাই চাকরী করেছে, সেটা হোল বিপ্লবের চাকরী। আর সেই চাকরী করতে করতে বিপ্লবটা যেন কোথায় সরে গিয়েছে। গত কয়েক বছরে রাজভবনের সামনে একটার পর একটা মিছিলের সেও ছিল অন্যতম উদ্যোক্তা। সেই গলা ফুলিয়ে বিপ্লবের জয়গান, সেই একরকমভাবে রিপোর্টাররা নাক খুঁটতে খুঁটতে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করবে আর কিছুক্ষণ পর কোন রাজনৈতিক নেতা কোন মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে এসে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করবেন কেমনভাবে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। এর মাঝখানে একআধবার পুলিশের লাঠি চার্জ হবে। আর ফুটপাথের ঠিক যেখানটায় রক্তস্নাত হয়ে কাল কোন ছাত্র হাঁসপাতালে গিয়েছে আজ সেখানেই পা বাড়িয়ে উদাসীন পথচারী জুতো পালিস করছে। এ বিপ্লবের আদি বোধহয় ১৯৪৭

সালের ১৫ই আগস্ট কিন্তু এর বোধহয় কোন শেষ নেই। বিপ্লবের এই কাদামাখা ঘোলা জল শহরের জীবন বছরে একবার দুবার আরও কর্দমাক্ত করে তুলবে। কিন্তু কোনদিনই ভাসিয়ে স্নানস্নিগ্ধ করে তুলবে না। সুব্রত বিপ্লবের এই অনড় খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, তার জন্যে সে গান্ধীবাদী হবার ঝুঁকি নিতেও রাজী। শেষ পর্যন্ত হয়ত এত চুপচাপ, এত শান্ত, এত অতীতের সঙ্গে সংপৃক্ত জীবন থেকে পালাবে। হয়ত আসানসোলের কয়লার খনি অঞ্চল কিংবা নতুন শিল্পনগরী দুর্গাপুরে লোহা কারখানার মজুরদের মধ্যে তার বিপ্লবের কর্মস্থল খুঁজে নেবে। ভারতবর্ষের যা চেহারা দাঁড়াচ্ছে তাতে হয়ত আরও অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীদের মতো এই সমাজবাদী বিপ্লবের মায়াবী হরিণের পেছনে সারাজীবনই দৌড়তে হবে। কিন্তু এইখানেই সে নির্মলকে কখনও বোঝাতে পারে না। তাদের দৌড়তে হবেই। এটাই তাদের কালের সবচেয়ে বড় কথা।

সুব্রত সে রাত্তিরে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। সোনামুখী থেকে বাসে মাছ আনিয়ে রতন মুখার্জির চিংড়ির মালাইকারীটা মাঠেই মারা গেল। ভদ্রলোক সুব্রতর হাবভাবটা বিশেষ বুঝতে পারলেন না। হয় তার অসম্ভব উৎসাহ অথবা হঠাৎ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ায় এইরকম একটা মনোভাব বাসতলা থেকে আসতে আসতে লক্ষ করেছিলেন তিনি। ঘাড় ধরে কয়েকবার ঝাঁকিয়েও দিলেন। কিন্তু সুব্রত অঘোরে ঘুমোয়। পাশেই একটা টিনের চালে নাম-না জানা একটা গাছ থেকে সারা রাত্তির ধরে দুড়ম দাড়ুম করে কি একটা ফল পড়ার শব্দ আসে। সুব্রত এক একবার চমকে চমকে ওঠে, আবার ঘুমোয়। সকালে মুখে রোদ্দুর পড়ায় তার ঘুম ভাঙল।

দুই

প্রচুর মুড়ি নারকেল আর কলাইকরা বাটিতে তিনবার চায়ের সঙ্গে জলযোগ সাঙ্গ করে সুব্রত চন্দ্র বিছানায় গা গড়াচ্ছিলেন এমন সময় মুখুজ্জে ঘরে ঢুকেই বললেন, 'চলুন, চলুন, বেরোবেন, বেলায় ঘুমোবেন না।' সকালবেলার শিশির আর ঠান্ডা হাওয়ায় ভদ্রলোকের চেহারাটা আরও সতেজ দেখায়। রতন মুখুজ্জে আলুর ক্ষেত তদারক করে ফিরলেন।

সুব্রত বাইরে আসে। একটা মস্ত ঝাড়াল শ্যাওড়া গাছ আর কাঁঠাল বন পার হয়ে ফাঁকায় এসে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সুব্রত। তারে ঢাকা দুকাঠা মতো জায়গায় কয়েকটা পুরুষ্ট রোড আয়ল্যান্ড আর লেগহর্ন ঘুরছে।

'এটা একটা চেষ্টা মশাই। দেখা যাক কদ্দুর কি হয়,' মুখুজ্জে বলেন।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে চেয়ে সুব্রত বললে, 'আপনারা যে কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন তা পাড়াগাঁয়ে থেকে বুঝতে পারবেন না। শহরের লোকেরা চেঁচাচ্ছে, বক্তৃতা দিচ্ছে, বড় জোর মিছিল করছে। কিন্তু আমেরিকান গম দিয়ে তো দেশকে দাঁড় করানো যাবে না।'

রতন মুখুজ্জে সলজ্জ হাসেন। 'আমাদের ফ্যামিলি জানেন খুব পুরনো। আমরা যে কেউ চাষ করব কেউ কল্পনাও করতে পারত না,' ভদ্রলোক তাঁর কাপড়ের খুঁট থেকে কি একটা বার করতে করতে বলেন।

'সেটাই তো আনন্দের কথা। অফিসের চাকরী বা আমাদের মতো মাস্টারীর আন্-প্রোডাক্‌টিভ্ লেবার ছেড়ে আপনি দেশের প্রোডাক্‌টিভ্ ফোর্সকে জোরদার করছেন।'

সুব্রতর কথা তাঁর কানে ঢুকছিল কি না ঠিক বোঝা গেল না। তিনি এতক্ষণ তাঁর

খুঁট থেকে বের করা একটা হলদে রঙ্‌জ্বলা পাকানো কাগজকে সযত্নে সোজা করবার চেষ্টা করছিলেন। চোখে যেন তাঁর পিতৃস্নেহ। তুলোট কাগজখানার কোণগুলো ধীরে ধীরে সোজা করে দিতে দিতে বললেন, 'এসব জিনিস এই অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে কে বুঝবে বলুন।... এইখানটা দেখুন এগারশো বাহান্ন বঙ্গাব্দ শ্রীউপেন্দ্রদেব শর্ম্মণঃ প্রায় দুশো বছর আগের কথা।'

মাঠের ওপাশে ফুটন্ত শিমুল গাছে এক ঝাঁক টিয়া এসে বসে। তারপরেই শাল কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে। শালবনের পেছনে সকালের অল্প কুয়াশা ভেদ করে শীতের নবীন সূর্য এতক্ষণ পর মাথা তুলেছে।

'চলুন যেখানটা সেচের কাজ হচ্ছে সেদিকটা দেখে আসি,' সুব্রত সেদিকে চেয়ে বললে।

তার কথা মুখুজ্জের কানে যায় না। বলেন, 'তাহলে দেখুন কি অবস্থায় আছি। এখানে আপনি কোথায় আর সোসাইটি পাবেন, মনের খোরাক পাবেন। থাকার মধ্যে তো খালি বাগদী আর লোহার। তাড়ি খাওয়ান আপনার পায়ে পড়বে আবার পয়সার দরকার হলে আপনার বাড়িতেই সিঁদ কাটবে।'

হঠাৎ যেন গোবরে সুব্রতর পা গেড়ে যায়। সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহের কাজ নিয়ে যে কটা গ্রামে গিয়েছে গত কয়েক বছর একই ব্যাপার চোখে পড়েছে। যাঁরা নতুন চাষ করার কথা ভাবছেন, কৃষিতে ফলন বাড়াচ্ছেন তাঁরা মেজাজের দিক থেকে আর গ্রামে নেই। এদিক থেকে দিনাজপুরে এক মুসলমান তামাক চাষীকে তার ভাল লেগেছিল। লোকটির নামে তখন অবশ্য তিনটে খুনের মামলা ঝুলছে। কিন্তু সেই সম্পন্ন চাষীটির তামাক বাগানটাই তার সব। সে তার ছেলেকে বড় চাকুরে বানাবে না, শেষ জীবনে শহরের উপকণ্ঠে বাড়ি বানাবে না। সে তার আজীবন তামাক বাগান সমৃদ্ধ করে এই বাগানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। বিঘে প্রতি আঠারো মণ ধান তোলার নায়কের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুব্রত একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

'ক্যানালে জল এল, আর তাইতে জমির ফলন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ল। আপনি কাল বলছিলেন না? সবই ভাগ্য মশাই। ছেলেটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দিয়েছি। এখানে থেকে কি করবে বলুন।'

তুলোট কাগজখানা সুব্রতর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একবার দেখবেন না?'

'কী দেখব?' একটা চাপা অসহিষ্ণুতা এতক্ষণে ফেটে পড়ল। 'আপনার পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে আপনি আমার কাছে অনেক কাজের লোক। তাঁদের অনেক জমিজমা ছিল। কিন্তু তাঁরা কি আপনার মতো দাঁড়িয়ে থেকে চাষ করিয়েছে? এরকম জমির ফলন বাড়িয়েছে? দেউড়িতে হাতী বাঁধা থাকত কি না ভেবে ভেবে অনেক ফতুর হয়েছি রতনবাবু।'

শিশিরে ভেজা ন্যাড়া রুক্ষ রাঢ়ের মাঠে হাঁটতে হাঁটতে সুব্রত চাঙ্গা বোধ করে। হয়ত এইভাবে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামজীবনের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে করতে তার নিজের জীবনের একটা দিকও খুঁজে পাবে।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রতন মুখুজ্জে থমকে দাঁড়ান। 'আপনার কথা খানিকটা বুঝছি, খানিকটা বুঝছি না। বাসে যে ছোকরা দেখলেন নবীন, তার বাপকাকারাও এখানকার স্বচ্ছল লোক। তারাও বিঘে প্রতি তেরো চোদ্দ মণ ধান তুলেছে এবার।'

'তাহলে তো একটা কূল পাওয়া গেল মশাই। আমাদের আর ভিখিরীদের মতো আমেরিকার কাছে হাত পাততে হবে না।'

রতন মুখুজ্জে মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'তাই বলে আপনি নবীনের বাপ আর

আমাকে এক লাইনে দাঁড় করাবেন?'

'এক লাইনে কিন্তু আপনার স্থান সে লাইনের প্রথমে।'

'সেটাই আমার একমাত্র পরিচয়?' রতন মুখুজ্জের গলা কেঁপে উঠল।

'নবীনের বাপকে আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী কাজের লোক। নবীনের বাপও বোধহয় তাই।'

'কিন্তু সেটা তো হোল কাজের কথা!' ভদ্রলোক তবু বললেন।

'তাছাড়া আর কি কথা আছে? তাছাড়া আর কি কথা থাকতে পারে? এখানে আলু ছিল না আপনারা আলু করছেন, নতুন আনাজ করছেন, ধানের ফলন বাড়াচ্ছেন। আপনি বলুন, এর চেয়ে কি ভাল কাজ থাকতে পারে?'

রতন মুখুজ্জে তাঁর আলুর ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। ডান হাতে সাত আট বিঘে জুড়ে ঘন কালচে সবুজের সারি, তার মাঝে মাঝে সর্ষের জ্বলজ্বলে হলদে ফুল মাথা তুলেছে। রতন মুখুজ্জে সেদিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় আর্তভাবে বললেন, 'কিন্তু আমাদের কালচার?'

'আপনি আলুর ক্ষেত দেখুন। আমি সেচের কাজটা দেখে ফিরছি।' সুব্রত পেছনের দিকে না ফিরে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

সারাটা দিনই সুব্রত রতন মুখুজ্জেকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। সেচের কাজ দেখে বাগদী পাড়াতে একবার ঢুঁ দিয়ে আসে। প্রত্যেকবারের মতোই তার কাজ গাঁয়ের লোকদের কৌতূহল সৃষ্টি করে। তাকে কেউ কেউ ভাবে ব্লকের লোক, কেউ কেউ ভাবে পুলিশের লোক। দুপুরেও খেয়েদেয়ে বেরিয়েছিল। সন্ধেবেলা তিলি পাড়ায় ল্যাংচা ক্লাবেও ঘুরে নবীনের রেডিওতে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর উদাত্ত বক্তৃতা শুনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। সেদিন মাঝ রাত্তিরে বিশ্রী চেঁচামেচিতে সুব্রতর ঘুম ভাঙে। বাইরে উঠোনে ঝলমলে চাঁদনিতে ধান স্তূপাকার। ওপাশে পরিচ্ছন্ন মুখুজ্জের মরাই। তারপর ঠিক কারখানার গায়ে কুলি লাইনের মতো রতনবাবুর মজুরদের কয়েকখানা শীর্ণ খড়ের চালা। রতনবাবুর মাইনে করা লোকজন ধান করে, রবিশস্য করে, গুড় করে। কমিউনিটি ডেভোলাপমেন্ট প্রোজেক্টের টাকায় একটা 'লিটারেসি সেন্টারের' জন্যে আটচালাও বানান আছে। সেখানে অবশ্য কিছু হয় না। চেঁচামেচি সেদিক থেকে আসছে।

সুব্রত সেদিকে যাচ্ছিল। রতনবাবুর পুরনো লোক যে দাওয়ায় শুয়ে ছিল সে উঠে আসে, 'ওদিকে যাবেন না স্যার, মাতালদের ঝগড়া। এখনই থেমে যাবে। ওই মদনটা আছে, দাগী আসামী।'।

'মদন বাউরি?'

'হ্যা স্যর। মাতাল রাঁড়খোর লোক। সব ব্যাপারে বাগড়া দেবে। গাঁ তো আর আজ-কাল পেছনে পড়ে নেই গো। সব ব্যাপারে এগুচ্ছে। তিলিদের মধ্যে তিনটে ছেলে কলেজ গেল? তবে?'

রতনবাবুর এ লোকটির নাম গনু। সেও বাউরি। ছেলেবেলায় বাপকাকাদের সঙ্গে পালকি বয়েছে, জমি নিয়ে বাবুদের জন্যে একটু আধটু লাঠিবাজিও করেছে। এখন দু বিঘে জমি রতনবাবুর কাছ থেকে পাওয়ার পর সেও অন্যান্য বাউরি ক্ষেতমজুর থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করে। সারা দিন গনু উসখুস করছিল কলকাতার এই আগন্তুক ভদ্রলোকের

সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে।

'রতনবাবুর ছেলে স্যর ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে', সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধানের আঁটি ছড়ানো উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গনু বললে।

'শুনলাম,' সুব্রত বেজারভাবে বলে।

আবার চেঁচামেচির রোল উঠল। এবার একটা স্ত্রীলোকের কান্নাও শোনা যায়।

'শালা পিটছে বৌটাকে। একটা চাঁড়াল বটে।' গনু বললে।

অস্বস্তি নিয়ে সুব্রত ঘুমাতে গেল। তক্তপোষে এপাশ ওপাশ করেও ঘুম আসছিল না। শেষ পর্যন্ত তন্দ্রার মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলে সুব্রত। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তাদের আমহার্স্ট স্ট্রীট কলেজ বিল্ডিং-এর রং ওঠা পানের পিক্ ছিটানো দেয়াল। তার সামনে মাস্টারদের ঘরের কাছে টুলের ওপর মদন বসে, তার পরনে নীল চোঙা প্যান্ট আর ঘিয়ে টেরেলিনের বুশ শার্ট। কালো চোয়াড়ে দাড়ির খোঁটায়ভরা খরখরে গাল মাঞ্জা দিয়ে সে ফ্যাকাশে বেগুনী করে ফেলেছে। হলুদ চোখের দৃষ্টি পাল্টায় নি, কিন্তু পাল্টেছে বাবড়ি। ধুলোমাখা ঝাঁকড়া চুল এখন চৌরঙ্গী অঞ্চলে আধুনিক পাঞ্জাবী মেয়েদের 'স্কাই স্ক্র্যাপার' কেশবিন্যাসসদৃশ। আর মদন যেন ভীষণ আত্মসচেতন পাছে চুড়োটা খুলে পড়ে। হাতে তার গোল্ড ফ্লেকের টিন। বোধহয় কলেজ ছুটি হয়েছে। গোটা বাড়িটা খাঁখাঁ করছে। খালি মদন আর সুব্রত। আর সুব্রতর প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক গেলাস জলের জন্যে পর্দা সরিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে আছে। মদনের সিগারেটের টিনের দিকে চেয়ে তার মুখে কথা ফুটছে না অথচ তেষ্টায় ছাতি ফাটছে।

তিন

কার্তিক মাস পার হতে চলল তবু সারা আকাশ জুড়ে মেঘের দামামা। মদন বাউরি দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে তাকায় আর সুর করে বলে, 'আমায় রাজা বানাবে গো, আমায় রাজা বানাবে। আমার ঘরের চাল ছাওয়াবে, টিপ কলের জল দেবে, নেকাপড়া শেখাবে। আমরা নেকাপড়া শিখে বাবু হব গো শালা।' অশ্রাব্য গাল পাড়ে মদন। তারপর এক খাবলা থুতু ফেলে সামনে।

ফের বিড়বিড় করে, 'কোন কেষ্টঠাকুর এসে হালধরবে গো বাবু? বাপঠাকুর্দার ব্যবসা তো খেতে বসেছো। এখন বলে কিনা হাবুকে ইস্কুলে দাও। শালারা তিলি পাড়ায় যাক না। সব তো ব্যাঙের ছাতার মতো বাবু গজাচ্ছে সেথায়। আরে শালা তোর বাপের পিঠ কেটেছে আখের চোঁছায় আর তুই বাঞ্চোৎ পাউডার মাখছিস, বগলে সাবান ঘসছিস। থুঃ!' মদন আবার থুতু ফেলে।

হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে উঠল। গট গট করে ঘরের ভেতর যায়। অন্ধকারে মাদুরে তার সদ্যোজাত ছেলে ঘুমোচ্ছে। এক পাশে পাঁচ ছটা নানা আকারের মাটির হাঁড়ি। মদনের পা লেগে দু তিনটে উলটে যায়। মদন আবার গাল পাড়ে। 'থাকতে দিলে না ভাতকাপড়, শালা মরে করবে দানসাগর,' রাগে আর তাড়ির ঝোঁকে বাবুদের বাড়িতে শোনা একটা ছড়া নির্ভুল আওড়ায়। সামনে দড়িতে কি ঝুলছে, মদনের নাকে লাগে। একটা ফুলকাটা আর্ট সিল্কের তেলচিটে ব্লাউস্। ফোকরের মত ছোট জানলা দিয়ে যে একটুকরো আলো আসছিল সেই আলোতে ব্লাউসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে

ওঠে মদন। তারপর তার শক্ত আঙুল দিয়ে ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলে ব্লাউসটা। আবার বিড় বিড় করতে থাকে, 'শালী রোজ বুক চিতিয়ে যায় তিলিপাড়া। কেন রে, এ পাড়ায় তোর মরদ জুটল না! এতগুলো জোয়ান থাকতে! থুঃ!' মদন টলতে টলতে অন্ধকারে তার ছেলের ঘাড়েই পড়ে যাচ্ছিল। একটু একটু আলো এসে পড়েছে ছেলেটার মুখের ওপর। কালো মোটা সোটা গড়ন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। পরম বিদ্রূপে মদন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছেলেকে দেখতে থাকে। 'নাঃ, শালা আমারই ছেলে বটে। কি করবি বাছাধন? হাল টানবি না পাউডার মাখবি, অ্যাঁ?' তার কথাটা নিজের কানে ভয়ানক ভাল লেগে যায়। এতক্ষণের থম্‌থমে মেজাজটা হঠাৎ স্ফূর্তিতে জ্বলে ওঠে। মদন প্রবল হাসতে থাকে তারপর তার ঘুমন্ত ছেলেকে প্রচণ্ড ঠোনা দেয়, 'কিরে শালা, বল না?'

ছেলেটা হা হা করে কেঁদে উঠল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে মদন। তার খেয়াল হয় তার বউ গিয়েছে তেলিপাড়ায় মুড়ি বেচতে। হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, 'চোপ্।' এবার তার ছেলের চীৎকারে ঘর উঠোন তোলপাড়। হয়ত একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিত এমন সময় দুহাতে গোবর, খালি গা, খাকি হাফপ্যান্ট পরা একটা আটদশ বছরের মেয়ে তার গোবরশুদ্ধ হাতে মদনকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় নয় বোধহয় গোবরের গন্ধে মদনের হুঁশ হয়। 'তুই আছিস বেটি, যাক বাবা!' মদন হাঁফ ছাড়ে। ঘর ছেড়ে আবার দাওয়ার দিকে আসতে থাকে। তারপর চৌকাটে এসে তার খেয়াল হয়। তার খোঁয়ার অনেকটা কেটে এসেছে। ছেলের চীৎকারে আর গোবরের গন্ধে আমেজটা কেটে আসছে। এবার পেছন ফিরেই মদন গট গট করে সোজা চালের হাঁড়িটার কাছে চলে আসে। পায়ের পাতা দিয়ে নাড়া দেয় হাঁড়িটা। এখনও একটু ভার আছে। নিজের মনে মনে মদন বলে উঠল, 'আজ আর বেরুচ্ছিনে বাবা।'

দাওয়ায় নেমে নবীনদের পাড়ায় কলের গানে যে রবীন্দ্রসংগীত আজকাল খুব চলছে তারই এক কলি সে নিজের মত করে গাইতে থাকে, 'পাগলা হাওয়া শালা বাদল দিলে, শালা বাদল দিলে, ঘরের মধ্যে মেয়েটি এতক্ষণ চাপড়াচ্ছিল মদনের ছেলেকে। সে খেঁকায়, 'চুপ করো।' মদন হঠাৎ চুপ করে যায়। আকাশ ঝলমল করে আলোয়। ফুরফুরে হাওয়া দেয়। মদনের দাওয়ার পাশে অযত্নে গজানো শিউলি গাছটার নীচে ছাই আর গোবরের গাদায় ছিটানো ফুলগুলোর গন্ধ এখনও মরে নি। তার সঙ্গে খেজুরের রসের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। কোথায় যেন ঢাক বাজছে। পুজো আসছে নাকি, না জমির নীলাম? আর এক পাত্তর চাপাবে কি না মদন মনে মনে তাল করছিল এমন সময় গ্যাঁড়া আসে।

গ্যাঁড়ার হয়ত এককালে কোন নাম ছিল। এখন তা সবাই ভুলে গিয়েছে যেমন অনেকের নাম ভুলে গিয়েছে লোকে বাগ্‌দী পাড়ায়। বেঁটে খয়া, দাঁতের দুপাটিতে পানের ছ্যাৎলা, গ্যাঁড়া এসেছে এই সকালে মদনকে পটাতে। যদি কোনরকমে সে তার বোন টগরের সঙ্গে গ্যাঁড়ার একটা বিয়ে ঘটিয়ে দিতে পারে।

গ্যাঁড়াকে দেখেই মদন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। 'তোমার হবে না সাফ বলে দিচ্ছি। আমার ওসব হুজ্জোত ভাল লাগে না। মরদ হোস্ তো সোজা গিয়ে বল্ না।'

গ্যাঁড়া দাওয়ায় উঠে আসে। বাগদীদের মধ্যে তার অবস্থা অবিশ্বাস্যরকমের ভাল কারণ তার চার বিঘে জমি আছে। বছর দুয়েক হোল ক্যানালে জল ছাড়ার পর থেকে সেও আলু তুলছে তার জমি থেকে। ডেভালাপমেন্টের বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সার দিয়েছে জমিতে। কিন্তু টগরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ভিরমি খায়।

মদন হঠাৎ তার লালচে খোঁয়ারী চোখ তুলে গ্যাঁড়ার দিকে চায়। 'সিলকেট ব্লাউস দিতে পারবি, গায়ে দিলে গন্ধ ছাড়ে?'

হাবার মত গ্যাঁড়া তাকায়। সিলকেট ব্লাউস্ সেও জোগাড় করতে পারে। সোনামুখীর ব্যাপারীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। কিন্তু ব্লাউস গন্ধ ছাড়ে এরকম কথা সে আগে শোনে নি। তবে হতেও পারে। রাতারাতি যখন বন কেটে লোহা কারখানা তৈরী হচ্ছে তখন সবই সম্ভব।

'বউয়ের যন্ত্রআত্তি গ্যাঁড়া ঠিক পারবে মদনদা। তুমি একটু বলে করে দাও।' গ্যাঁড়ার রোগা রোগা হাত পা। নীল লুঙ্গির ওপর আনকোরা নতুন গেঞ্জির তলায় ছোট্ট শরীর-খানার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাকুতি করে।

'বিঁড়ি দে।' মদন হাত বাড়ায়।

গ্যাঁড়া খুঁট থেকে এক বান্ডিল বিঁড়ি আর দেশলাই মদনের সামনে রাখে। সে নিজে পান ছাড়া কোন ব্যাপারে আসক্ত নয়। বিশেষ করে খেজুরের রসের মত সুস্বাদু জিনিসেও তার অনীহা মদনকে মাঝে মাঝে ভয়ানক বিরক্ত করে। আজও তার ভক্তের মত বিড়ি আর দেশলাই মেলে ধরায় মদন জ্বলে ওঠে, 'শালা, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। বাপ ঠাকুর্দা তাড়ি খেয়ে মানুষ। তুই বেটা তাড়ি খাবি না, একটা বিড়িও খাবি না। আমার হাবু যেদিন মাঠে যাবে আধবান্ডিল ওড়াবে। তুই মরদ নোস, হিজড়ে হিজড়ে। হাতে তালি মার, ঘুঙুর পরে নাচ শালা।'

গ্যাঁড়ার চোখদুটো করুণ দেখায়। তার এই একটা জায়গায় প্রচন্ড দুঃখ—তার শারীরিক দুর্বলতা। তার বাপ ম্যানেজার বাউরীর শারীরিক শক্তির খ্যাতি ছিল। পাশের গাঁয়ের জমিদারবাবুদের পাইক হয়েছিল, জমিদারবাবুরা তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করত না সেজন্যে গাঁয়ের লোকের মধ্যে ম্যানেজার বাউরী নামে সে চালু ছিল। ঠিক জায়গায় ঠিক মত লাঠি চালাবার পুরস্কার হিসেবে তিন বিঘে জমি পেয়েছিল গ্যাঁড়ার বাপ। সেই বিশাল লম্বাচওড়া শক্তিমান লোকটার ছেলে গ্যাঁড়া গাঁয়ের আর পাঁচটা ঠাট্টার মত একটা ঠাট্টা।

গ্যাঁড়া চুপ করে থাকে তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'জন্মের ওপর কি মানুষের হাত আছে দাদা?'

'হাত নেই তো যেখানে সেখানে হাত দেওয়া কেন?' মদনের উল্লাস হয় খর্বাকৃতি লোকটাকে অপদস্থ করতে।

'মরদ হয়েছিস কেন? ঘুঙুর পরে নাচ আর......'

'আমি উঠলাম মদনদা,' গ্যাঁড়া উঠে পড়ে।

'বোস।' মদন প্রচন্ড ধমক দেয়। 'টগর আজকাল সন্ধেবেলা তিলিপাড়া যায়। কেন যায় তোরা থাকতে? বাউরীর পো মাগীদের পায়ে হাত দিয়ে সাধে না, বুঝেছো শালা। চুলের মুঠি ধরে টান মেরে নিয়ে আসে। পারবি?'

'তুমি রাগ করবে না? তবে শ্যামাপদকে বলি।'

'অ্যাই কোন শ্যালার কম্ম নয়। তুই বেটা লোক লাগিয়ে আমার বোনের ইজ্জত মারবি?'

মদন আসলে মারাত্মক কিছু লোক না। সে নিজেই জানে সে একটা ঢোঁড়া সাপ। 'বাউরীরা আজকাল সব ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেল রে।' মাঝে মাঝে সে খেদ জানায়। কিন্তু

হঠাৎ এখন রুখে দাঁড়িয়ে ওঠায় গ্যাঁড়ার কাছে তার মুখচোখ বিকট লাগে। মনে হয় এখনই বুঝি তাকে দুচার ঘা লাগিয়ে দেবে।

'মদনদা, মেরো না মেরো না। আমি মরে যাব।' গ্যাঁড়া হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে যে তাড়িতে তার কোষ্ঠতারল্য হয় সেজন্যে তাড়ি খায় না, বিড়িতে হুঁফ ধরে।

'তবে বিয়ে করবি কি রে শালা। বিয়ে করে গলায় দড়ি দিবি?'

গ্যাঁড়া চলে যাবার পরও মদন উত্তেজিত হয়ে থাকে। আসলে বোধহয় সে গ্যাঁড়াকে ঈর্ষা করে তার চার বিঘে জমির জন্যে। তার বাবারও জমি ছিল না, তার নিজেরও নেই। চার বিঘে জমি থাকলে সে বাবুদের ইস্কুলে যেত। গ্যাঁড়ার মত নতুন ঘর তুলত, পাকা গোয়াল বানাত। জমি থাকলে বোধহয় বোনটা ওরকম বজ্জাত বনত না। তবে বিয়ে হবার আগে মেয়েরা একটু আধটু রং করে। তাতে কিছু ভাবার নেই। তবে মুস্কিল বাধে, মারপিট দাঙ্গাও হয়। গ্যাঁড়া সেদিক থেকে ভাল। কিন্তু যতবারই গ্যাঁড়ার সরু সরু হাতের নলি মনে পড়ে ততবারই টগরের পাশে তাকে ভাবতে মদনের মন দমে যায়। তার চেয়ে কালীর সঙ্গেই ঘর করুক টগর। চালের সের যখন চার পয়সা ছিল তখনও তারা পেট চাপড়েছে, এখন যখন টাকা টাকা তখনও পেট চাপড়াবে। মদন গ্যাঁড়ার বাণ্ডিলটা থেকে আর একটা বিড়ি ধরায়। আবার ঝলমলে রোদ্দুরের মধ্যে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকতে থাকে। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মদন গজরায়, 'সার দেবে, জাপানী কায়দায় ধান বানাবে। তাতে আমার কি রে? আমার তো সেই পাঁচ সিকে।'

মদন এতক্ষণ নজর করে নি। গোবরের গাদার পাশে শিউলি তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে কিছুক্ষণ থেকে। লোকটার খুব চড়া রং, এরকম গৌরবর্ণ লোক মদন বেশী একটা দেখে নি। তাছাড়া এসময় তাদের পাড়ায় এরকম ভদ্রলোকের আবির্ভাব ঘটনা বটে। এখন যেসব হাফ-হাতা বুশশার্টপরা সরকারী অপিচার বাবু যাতায়াত করছেন ইনি সেরকম নন আবার গাঁয়ের ইস্কুলমাস্টার মশাইদের সাম্প্রতিক অভাবী চেহারাও এঁর নয়। জমিদার নয় নিশ্চয়, সৌম্য শান্ত মুখ, দাড়ি থাকলে মিশনের সাধু বলে বোধ হত। মদন ফাঁপরে পড়ে। ভদ্রলোকদের সে ভয় করে। তার জীবনে তিনবার ভদ্রলোক তার উঠোন পাঁড়া দিয়েছে, ঠিক ঐভাবে শিউলি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসেছে। আর তিনবারই তাদের পাড়ার কোন সর্বনাশ হয়েছে। প্রথম জন ছিল পাশের গাঁয়ের জমিদারের জ্ঞাতি। মদন তখন ছোট। গাঁয়ের সাধারণ মানুষ নাকি তাঁর খুব ভাল লাগত, তাদের নিয়ে সে গল্প লিখত। তারপর দেখা গেল তিনি এসেছিলেন এ পাড়ায় মেয়েমানুষের সন্ধানে। তাঁকে নিয়ে একটা দাঙ্গা মতনও হয়েছিল, কয়েকজন বাউরীর কয়েদ হয়েছিল। মদন চিত্রার্পিতের মত শিউলি গাছের তলায় দাঁড়ানো লোকটির দিকে চেয়ে চেয়ে দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কথা ভাবে। তিনি এসেছিলেন কোন মিশনের তরফ থেকে, তাদের জীবনের ভার হাল্কা করতে। একটা ফ্রি ডিস্‌পেন্‌সারীও খোলা হয়েছিল। তারপর যেমন ভূতের মত আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি ভূতের মতই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল লোকটা। মাঝখান থেকে পাড়ার যে কয়েক-জন কমবয়সী লোক আশায় বুক বেঁধেছিল তাদের আশা ফুৎকারে মিলিয়ে গেল। অনেকের মত সেও মদ্য নিবারণী সভার পাণ্ডা হয়েছিল। সভা ভেঙে যাবার পর তারা আরও পাঁড় হল। তারপর কিষাণ সভার লোকও এল। ইংরেজী জানা ভদ্রলোকের ছেলেগুলো তাদের সঙ্গে ভাত আর পাটপাতা খেয়ে দিনের পর দিন বেশ কাটিয়ে দিল। তারপর অবশ্য পাশের

গাঁয়ে জমি নিয়ে দাঙ্গা বাঁধল। গুলি চলল। শক্তির দাদা মারা পড়ল। তার বৌটা এখনও রেলস্টেশনে ভিক্ষে করে। মদনের হঠাৎ খেয়াল হয় ইনি হয়ত ভোটবাবু। কিন্তু গতবছরই তো এরা এসেছিল। সারা বাগদী পাড়ায় উৎসব পড়ে গিয়েছিল, তাড়ির গন্ধে শেষে তারই মত নেশাখোরের গা গোলাত। মদনরা গিয়েছিল লরী চেপে নতুন কাপড়-জামা পরে ভোট দিতে কোন এক বাবুকে। সে নাকি মিনিস্টারও হয়েছে। তবে? আবার এসব উপদ্রব কেন? মদন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। 'তুমি কে নাগর বট?'

লোকটি তেমনি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। তার হাসি দেখে মদনের হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। 'হাবু কোথায়?' লোকটি এগিয়ে আসতে আসতে বলে। গেরুয়া পাঞ্জাবী দেখে মদন বিড়বিড় করে, 'শালা কোন কোম্পানী? মিশন না ভোট?'

'হাবু কোথায়?' লোকটি এবার স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করে।

'তাতে তোমার কি?'

'আমার কিছু না, তোমরা সবাই মিলে ঠিক করলে গাঁয়ে ইস্কুল হবে, ছেলে দেবে। তারপর সব জোগাড়যন্ত্র করা হল। এখন ছেলে না হলে স্কুল চলবে কেমন করে?'

'রাখালীটা তুমি করে দিয়ে যাবে? রাখালী করে দুগণ্ডা পয়সা আনে, এক বেলা খাওয়াটা দেয়। সেটা কেড়ে নেবে?'

ভদ্রলোক মাটির দাওয়াতে এসে বসলেন।

মদন তেড়ে এল, 'তোমাদের মতলব কি বল তো?...ও দাঁড়াও, তুমি তো ডেবলপমেন্ট কোম্পানীর বড় অপিচার গো! তালডাংগায় বক্তিমা দিলে। সোনামুখীতে থাকো না? এখানে কোথায় উঠেছো? বড় গায়েনদের বাড়ি তো? হ্যাঁ, ও বাড়িতে মাছ পাবে। আমার গাঁয়ে সোনামুখীর মত ল্যাংচা এসেছে গো। তোমাকে দিয়েছে? দ্যায় নি? সে কি!'

'খোঁয়ারে আছো মনে হচ্ছে।'

'তোমার বাপের পয়সায় তাড়ি খাই নি বাবু।......তোমরা আসলে কী বাবু? গাঁয়ে একটা ইস্কুল বানালে। সেখানে আমাদের ছেলেদের খেদিয়ে নিয়ে হাজির করেছো—ইংরেজী শেখাবে। প্যান্ট পরে আর তোমার মতো পাঞ্জাবী চাপিয়ে বাগালী করবে আমাদের ছেলেরা? কি গো! চুপ করে আছো? একটা চাটাই আছে ঘরে, এনে দেব?'

ভদ্রলোক স্থানুর মত বসে থাকেন। মদনের কথায় চটেছেন মনে হয় না। কিন্তু কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে লোকটা। তিন বছর আগে যখন তিনি এ গাঁয়ে এসেছেন ঠিক এই এক কথা শুনেছেন। গ্রামজীবনের বিপ্লব, কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট প্রোজেক্ট, গ্রামে গ্রামে নতুন জীবনের সূত্রপাত, একক বিচ্ছিন্ন কপাল চাপড়ানো চাষীর বদলে সমস্ত গ্রাম মিলে যৌথ অস্তিত্ব, যৌথ দায়ীত্ব। সোনামুখীর মত ছোট্ট শহরেও এগুলো শুনতে ভাল লাগে। সবচেয়ে ভাল লাগে কলকাতায় বসে মন্ত্রীদের মুখে মুখে শুনতে কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যখন প্ল্যান্ চার্ট ম্যাপের সাহায্যে ইন্স্ট্রাক্শন দেন। কিন্তু বাউরীপাড়ায় এসে পেটের ভেতরটা কেমন খালি হয়ে যায়।

'বিয়ে থাওয়া হয়েছে না বৈরেগী?'

ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন। মদনের ছেলে হাবু ইস্কুলে পড়তে পারে না কারণ সে রাখালী করে আর এক বেলা খেতে পায়। আর সেই ইস্কুলই টিঁকবে যেখানে এক বেলা খাবার ব্যবস্থা আছে। নইলে লেখাপড়া হবে না, তাতে দুঃখ কিসের?

মদন যেন বুঝতে পারে সোনামুখীর এই অফিসারটির মনের কথা। একটু মায়াও

পড়ে। যাই হোক, বাবু তো, কি মতলব আছে, ভগবান জানে। তবে জমিদার পাইক নয়, ভোটের জন্যেও আসে নি। কিন্তু পরক্ষণেই মদনের সন্দেহ হয়। বলে, 'আচ্ছা বাবু, একটা কথা বলো তো, তোমরা ভোটের লোক?'

'না বাপু, আমরা ভোটের লোকটোক নই। কেন, আমাদের লোকজন তোমাদের এখানে কিছু বলে নি?'

'ট্যাক্সর লোক?'

ভদ্রলোকের মুখ বেজার হয়।

'তোমাদের মতলবটা কি বল বটে। ট্যাক্স লিবে না, ভোট লিবে না, তবে কি লিবে?' তার কাঁচাপাকা দাড়ির খোঁটা ভর্তি গাল ভরে হঠাৎ হাসি ফোটে। 'মেয়েমানুষের সাধ আছে? বল না বাবু, লজ্জা কি গো!' তারপর আগন্তুকটিকে মদন সহানুভূতি দেখায়, 'বয়েস হলে দাড়ি গজায়, তাতে লজ্জা কি বাবু? দেখে মনে হচ্ছে মাগ্-উদাসী মন বাবু তোমার!'

লোকটি উঠে পড়ল। মদন বললে, 'কি গো, উঠে পড়লে, চটে গেলে বাবু! তা আমরা ঐরকম, তোমার ইস্কুলে পড়ি নি তো! গরুর চারটে ঠ্যাং আছে বলি। দুটো ঠ্যাং কেমন করে বলি বাবু, যা দেখি নি কেমন করে বলব! তোমরা হাবুকে শেখাবে গরুর দুটো ঠ্যাং। সেটা শিখলে তো আর রাখালী শিখবে না!'

'তুমি তাহলে আর ছেলেকে পাঠাবে না ইস্কুলে,' লোকটি শেষ চেষ্টা করে। মাস্টারী-সুলভ গাম্ভীর্য দেবার প্রয়াস আনে গলার স্বরে কিঞ্চিৎ অবসাদের সঙ্গে। তার আদর্শবাদী মুখের দেদীপ্যমান ভাবখানা মদনের আস্তানায় আধঘণ্টা থাকার মধ্যেই টাল খেয়ে গেছে।

কিন্তু মদনের বলতে গেলে এতক্ষণ পর মেজাজ খুলল। সে এখন বাউরীপাড়ার ছোটখাটো সুখদুঃখের কথায় তেমন মজা পায় না। তার এখন মজা লাগে বাবুদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে। এরকম সুবিধে তো সবসময় পাওয়া যায় না। এরকম একটা শুভ মুহূর্ত এসেছিল। সেটা এখন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাবে বাবু? গায়েনপাড়া তো দু' মাইল। এখন রোদ চড়ছে, বসেই যাও বাবু। আমার আজ মাহিন্দারি নেই, খাওয়াও নেই। তুমি থাকলে বাবু বৌটা উনুন ধরাবে। দু মুঠো চাল যদি আনতে পারে তবে মুলোর শাক......কি গো উঠেই পড়লে!'

লোকটি উল্টোমুখে হাঁটতে শুরু করল। আর মদনের পুলক জাগে তার পলায়নে। 'এসো না, পুকুরে গিয়ে দিব্যি চ্যান্ করি। ভাত না খাও এক পাত্তর......'

'কি গো পালালে...বা শালা!' পলায়মান ভদ্রলোকটির পেছনে পেছনে যেতে মদনের গলা দিয়ে বিকট আওয়াজ বেরোয়।

চার

খালের জল নামছে। উত্তুরে হাওয়া দিতে শুরু করতেই শালীও শুকোতে আরম্ভ করেছে। বাসের রাস্তা পার হয়ে বরাবর যে বাঁধ গিয়েছে তার মাইলখানেক পার হলেই খোয়াইয়ের শেষে পানকৌড়ি উড়ছে বিস্তীর্ণ আমতলির ঝিলে। কোনদিন এখানে মস্ত আমবন ছিল। এখন একটা গাছও চোখে পড়ে না। শুধু খোয়াই শরবন। অনেককাল আগে এখানে এক সৌখীন ইংরেজ এসেছিলেন বেড়াতে। স্ত্রী হার্টের অসুখে টপ্ করে মারা যাবার পর সে সাহেব শাজাহানের মর্মর সৌধের মত এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এক বাগান

বানান। এখানে এসে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নির্জনে স্মরণ করতেন কিংবা পাখী শিকার করতেন এ নিয়ে মতান্তর আছে, কিন্তু সে স্মৃতির কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শুধু কয়েকটা মরকুটে সোনাঝুরি এখনও এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে আছে। তাদের ডাল থেকে লম্বা লম্বা হলদে ফুলের নোলক এখনও হাওয়ায় দোলে।

মদনদের গাঁ থেকে চোখে পড়ে পিল্‌ পিল্‌ করে পিঁপড়ের মত বাউরীদের মেয়েরা বাঁধ থেকে নামছে। তাদের হাতে কারুর ঝুড়ি, কারুর কাঁধে পোলো। দু' চারজনের হাতে খ্যাপলা জাল। গেরি মাটির গা থেকে কালো কালো বিন্দুগুলো জলের চারপাশ বেড়ে নামছে।

তাদের আলাপ হাওয়ায় ভেসে আসে। আদিবাসী মেয়েদের বিশেষ করে এ অঞ্চলের সাঁওতাল মেয়েদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে যেমন কলকল কলকল জলের শব্দের একটানা সুরেলা আওয়াজ ওঠে বাউরী মেয়েদের কথাবার্তায় সেই আওয়াজ নেই। হঠাৎ নিস্তব্ধতা খান্‌ খান্‌ হয়ে যায়, 'দূর মাগী, ধাম্‌সী! তুই পারবি না। তোর গতর লড়ে না। টগর, চাপা দে, চাপা দে!'

যে মেয়েটাকে ডাকা হোল তার বয়স কম, মজবুত চেহারা। কালো পুরুষ্ট গড়ন। হাঁটু অবধি গেরুয়া কাদার সঙ্গে লেপ্টে আছে তার গায়ের ধুলোয় রাঙানো কাপড়। ক্ষিপ্র-গতিতে সে হাতের পোলো নিয়ে এগিয়ে আসে। জল এখনও এদিকটায় তেমন নামে নি। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা বক তার প্রিয় জায়গা ছেড়ে ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে উড়ে যায়। চামারদের শুয়োরটা শরবনে এতক্ষণ কাদা শুঁকছিল। সে বেরিয়ে পড়তেই পেছনের কয়েকটা ছুঁড়ি সোরগোল তোলে।

'দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌, কি গতরওয়ালা ট্যাংরা,' গ্যাঁড়ার দিদি ফের চেঁচিয়ে উঠল। এক ঝাঁক সরেস ট্যাংরা শরবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে গভীর জলের দিকে এগোচ্ছে।

'কি রে টগর, হাঁ করে কি দেখছিস?'

'ভিমরতি!' টগর জল থেকে উঠে আসতে আসতে বলে। তারপর বারো তেরো বছরের যে মেয়েটা তার পাশে একমনে গুগলি কুড়োচ্ছিল তাকে ডাকে। মেয়েটা টগরের সঙ্গে ঢোকে শরবনে গামছা নিয়ে। শরে হাত ছাড়ে টগরের। জলে একটা অর্ধচন্দ্রাকার বেড় দিয়ে তারা ডাঙ্গার দিকে উঠে আসে। অত বড় ঝাঁকাটার অনেকখানি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তবু হাতখানেক জলের ভেতর থেকে দেখা যায় ছ' সাতটা বড় জাতের ট্যাংরার সঙ্গে দু' তিনটে চিংড়ি উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটোছুটি করছে।

'টগরের কপাল ভাল,' কালোর মা সখেদে বলেন।

গামছাটা ওপরে তুলেই মুঠো চালিয়ে তুলতে চায় মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় হাতে হাত চেপে ধরে টগর। গ্যাঁড়ার দিদি চেঁচিয়ে উঠল, 'গ্যাল, গ্যাল।' সঙ্গে সঙ্গে একপাশ কাৎ হওয়া গামছা থেকে নীচে পড়েই মাছগুলো অদৃশ্য হয়। হাতে চেপে থাকা দুটো মাছ তার সঙ্গিনীর মুখে অকস্মাৎ ঠুসে দিতে দিতে টগর চেঁচিয়ে উঠল 'খা, খা।' মেয়েটা টগরের ঠেলায় পিছলে পড়ে তারপর গাঁ গাঁ করে কাঁদতে থাকে।

চিল পাখসাট খায়। রোদ বাড়ে। বাউরী মেয়েদের গায়ের অনাবৃত অংশ রোদ্দুরে চিটমিট করে। মুখ আরও তামাটে কালচে দেখায়। এবার ধোপাদের পাতিহাঁসগুলো শর-বনের গভীরে ঢুকে পড়ে। পানকৌড়ি, বক, কাদাখোঁচা একে একে উড়ে যায়। সকালবেলার মৃদু বাতাসে শান্ত ঝিলের পাশে মেয়েদের কথা, গুগলি তুলতে তুলতে ছোট ছোট মেয়েদের

ছুটোছুটি সমস্ত ছাপিয়ে এখন একটা রুক্ষ পরিশ্রমের ছবি ফুটে ওঠে। হাতপাগুলো যন্ত্রের মতো চলে। ক্রমান্বয়ে তিন ঘণ্টা পরিশ্রমেও বিশেষ পড়তা থাকে না মেয়েদের। প্রত্যেক ঝুড়িতে সামান্য কটা চিংড়ি আর পুঁটি।

এমন সময় টগর পিঠ চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ঘামে ভেজা চুলগুলো লেপ্টে আছে কপালে। বাহার করে একটা টিপ লাগিয়েছিল, সেটা গলে গেছে। হাঁটু আর কনুই পর্যন্ত কাদা। তার সঙ্গিনী কিছুক্ষণ কাঁদাকাটা করার পর আবার গুগলি তুলছে। টগর তার হাত ধরে পোলো ঝোলাতে ঝোলাতে বাঁধের ওপর উঠতে থাকে।

'কোথায় চললি পোড়ারমুখী?' পেছন থেকে কালোর মা ডাক দেয়।

'এখানে দিনটা কাটালে হবে?' মুখ না ফিরিয়ে টগর জবাব দেয়।

মেয়েরা এবার দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রবীণারা, গ্যাঁড়ার দিদি, কালোর মা, ঝিলেই মাছ ধরতে থাকে। আর টগরের নেতৃত্বে পনেরো বিশটা কমবয়সী মেয়ে বাঁধ থেকে আরও আধমাইল এগিয়ে যায় সরকারী সেচবিভাগের মজাপুকুরে। যেতে যেতে টগর বললে, 'আমাদের পাড়ায় এক বাবু এয়েছে, সে বুকের ফটো নেয়।'

'বুকের ফটো নেয়,' পেছনের মেয়েগুলো হাসিতে ফেটে পড়ে। 'হ্যাঁ, কালোর মায়ের ওখানে বলেছে। আমাদের এখানেও আসবে।'

'কে এমন বুকের ডাক্তার গো। আমার বুক যে কন্‌কন করছে তোমার কথা শুনে,' টগরের এক সম্পর্কের পিসী বললে।

'সে ডাক্তার নয়,' টগর মাথা নাড়ায়।

'তবে? কি মতলবে এয়েছে?'

'সে বলছে সরকারী লোক নয়, ভোটের লোক নয়, ডাক্তারে যেমন বুকের ফটো নেয় তেমনি আমাদের......

টগরের কথাগুলো গুলিয়ে যায়। সুব্রত দুদিন আগে কালোর-মার বাড়িতে বুকের ফটো তোলার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছিল সে এসেছে ডাক্তারদের রোগ নির্ণয়ের মত গাঁয়ের সঠিক অবস্থা জানতে। 'কি জানি বাপু, ও'দের কথা বুঝি না,' টগর তার হাতের ডানা ঝাঁকি দেয়। হাত পাল্টে পোলো নেয় অন্য হাতে।

এবার তারা একটা অর্ধসমাপ্ত পুকুরে নামে। পুকুরটা সরকারী সেচবিভাগের তরফ থেকে বছর তিনেক আগে কাটা শুরু হয়েছিল। তারপর কি কারণে কাটা বন্ধ হয়ে গেল গাঁয়ের লোক তা জানে না। এক হাঁটু কাদায় টগরের দল খলসে আর ঝিঁঝে কই ধরতে থাকে। উৎসাহে টগরের চোখ নাচে। একবার পা হড়কে পোলো শুদ্ধ কাদায় গড়িয়ে পড়ে। কনুই দিয়ে গালের কাদা পোঁছে। চোখের পাতায় তার কাদা কিন্তু চোখদুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করে। উঁকি মেরে দেখে তার কাদামাখা ছোট চুবড়িটার প্রায় অর্ধেকটা সবুজ আর লালের নক্সাকাটা ঝলমলে খুদে মাছে ভরে গিয়েছে। মেয়েগুলোর মাজা ধরে যায়, পরিশ্রমে হাঁপায়। ঘামে কাদায় কাপড় গায়ে সেঁটে থাকে। কারুর চুল সামলাতে চুলে কাদা লাগে। টগর হাতের পাতা আড়া দিয়ে সূর্যের দিকে তাকায়। ঝলমলে নীল আকাশে আলো চোখ ধাঁধায়। মাথার ওপর খাড়া সূর্যের দিক থেকে চোখ ফেরাতে ফেরাতে টগর হিসেব করে—সূর্য আর একটু এদিকে থাকলে অন্তত বারো আনায় বেচতে পারত মাছগুলো। কিন্তু এখন বাসতলায় বাজার উঠলেও আট আনা নির্ঘাত সে পাবে। আট আনায় কী আনবে? দু পয়সার নুন, দু আনার তেল, বাকীটুকু চাল? তাহলে একটুকরো সাবান

কেনার যে সাধ ছিল তার কি হবে? অনেকদিন তারা মাছ খায় নি। চুবড়িটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এক খাবলা মাছ নিজের অজান্তে সে কখন তুলে রাখছিল কচুপাতায় আলাদা করে রাখবে বলে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার চুবড়ির মধ্যে সেগুলো রেখে দেয়। পিঠ টান্ করে দাঁড়ায় টগর। দূরে বাঁধের ওপর দিয়ে কালোর মা-রা ফিরছে।

পাঁচ

দুদিন সুব্রতর একটা চিঠি পড়েছিল সোনামুখী পোস্ট অফিসে। তিনদিন হল শালী নদীতে জল বেড়েছে। একখানামাত্র চিঠির জন্যে জল সাঁতরে গাঁয়ে যেতে পোস্টপিওন গররাজি। দিন দুই পর জল কমলে চিঠিটা গাঁয়ে পেঁছিল।

এ দুদিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারে নি সুব্রত। শুধু জল কাদার জন্যে নয় কারণ এ অঞ্চলের কাদা মারাত্মক নয়। অন্তত একটা ব্যাপারে কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট ব্লকের কাজ প্রশংসনীয়। অনেকগুলো রাস্তা বেরিয়েছে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। নুড়ি সুরকি না পড়ায় ইতিমধ্যেই অযত্নের ছাপ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকট হলেও মোটের ওপর গাঁয়ের লোকেরা আল ছেড়ে রাস্তায় হাঁটতে সুরু করেছে। মানুষের এই অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য হেরফের, তার অভ্যাসের কিছু পরিবর্তন সুব্রতর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আগে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এই ছোটখাটো পরিবর্তন চোখে পড়ত না। কিন্তু এখন এদিকে তার নজর প্রখর। গত দুবছরের সংখ্যাতত্ত্বের কাজও সুব্রতকে এই খুঁটিনাটির দিকে আরও টেনেছে।

গাঁয়ে আসার পর ছ' সাতদিনে বিশ পঁচিশ ঘর পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছে সুব্রত। সে যেখানে আছে তার গা দিয়েই ঘরগুলো। এখানে প্রায় প্রত্যেক ঘরে সে দেখেছে সাইকেল। বাড়িতে টাইম পিস্ ছাড়াও কারুর হাতে ঘড়িও দেখেছে। নবীন তো তার ট্র্যান্‌জিস্‌টর রেডিও মারফত গাঁয়ে প্রায় বিপ্লব এনেছে। কুয়োতলায় মহিলামহলে, বাসতলার নতুন লেংচা রেস্টুরেন্টের খোড়ো ঘরে, এমনকি সন্ধ্যায় আখমাড়াইয়ের কলে গিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইংরেজী আনুপূর্বিক বিবরণ, রবীন্দ্র সঙ্গীত মায় আধুনিক কবিতার মজলিশও সে শুনিয়ে এসেছে। এতে কি হচ্ছে ভগবান জানে! আগের মত সুব্রত এসব ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসতে রাজী নয়।

উপসংহার সে টানবে কিন্তু আজ নয়, দু বছর পর যখন সে আবার এই গ্রামে ফিরে আসবে। এখনকার তথ্য এবং তখনকার তথ্য মিলিয়ে সে গ্রামজীবনের পরিবর্তনের ছবি আঁকবে যাতে তার ছবির সত্য অনস্বীকার্য হয়। সে যদি তার সমাজ এবং দেশের রাজনৈতিক কাঠামো পাল্টাতে নাও পারে, যদি তার দেশের সম্পর্কে তথ্যই জোগাড় করে যায় তাহলে কি সেটা খুব হেলাফেলার কাজ হবে? সুব্রত এই ধরনের চিন্তাতেই বস্তুত এই তথ্যসংগ্রহের কাজে মেতেছে।

সকাল এখনও মেঘলা। ক'দিনের আকাশে যে ঝলমলে ভাবখানা ছিল তা নেই। সুব্রত দাওয়ায় তক্তপোষখানায় এসে বসে। সামনে দুটো বেঁটে ঝাপড়া কাঁঠাল গাছের নীচে ছায়া বেশ ঘন। সেখানে শুকনো কাদামাখা পাতাগুলোর পাশে চিমড়ে একটা পেঁপে গাছের নীচে এক ফালি জমি। পুরুষ্ট পাটকেলি একটা মোরগ তার লাল ঝুঁটি নাচিয়ে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে পোকা খাচ্ছে। সুব্রত দাওয়ায় বসেই ঘামতে সুরু করে। হাওয়া নেই, বোধহয় আবার বৃষ্টি নামবে।

গাঁয়ের এই চুপচাপ ভাবখানার সঙ্গে সুব্রত এখনও নিজেকে ধাতস্ত করে নিতে পারে নি। কুচবিহারে যখন প্রথম বেরিয়েছিল 'গাঁয়ের লোকের বুকের ফটো নেবার জন্যে' তখন ছিল অঘ্রাণ মাস। এক সম্পন্ন চাষীর টালিতেছাওয়া বাইরের কোঠা ঘরে সে থাকত। তার ঘরের নীচেই ধান ক্ষেত। ধান ক্ষেতে হাওয়া দিলে যে অবিশ্রাম শব্দ ওঠে পড়ে সে সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না আগে। এখন এই শব্দে চারপাশের নৈঃশব্দ্য যেন আরও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। সে জায়গা ছেড়ে গাঁয়ের বাজারের কাছে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন জায়গায় একটা কাঠের বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়েছিল। নীচে ছিল সস্তা হোটেল। একটু দিশী মদেরও ব্যবস্থা ছিল। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত খদ্দেরদের আলাপ, চীৎকার আর রাত্তিরের দিকে ভাঙাগলায় হিন্দি ফিল্মের গান ভেসে আসত। কিন্তু তাতে সুব্রতর ঘুমের ব্যাঘাত হোত না। ধানক্ষেতের শব্দে বরং তার ঘুম আসত না।

এ গ্রামটা সেদিক থেকে ভালই লাগছে। চুপচাপ খুবই কিন্তু গত দুদিন খুব হৈ হৈতে কেটেছে। একজন গ্রামসেবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সুব্রতর। বরিশালের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার ছিল লোকটা। তারপর কয়েকবছর এসপ্ল্যানেডে লজেন্স বিক্রি করেছে। ব্লকে বছর দুয়েক হল লেগেছে। গান বেঁধেছে রাস্তা বাঁধার। সুব্রত একটা সিগারেট ধরায়। বাড়ির ভেতর থেকে মদনের ছেলে হাবু কাঁসার বাটিতে করে চা আর কাঁদাউঁচু থালাভর্তি মুড়ি নারকেল রেখে যায়। তারপর তার কোঁচড়ের ভেতর থেকে একটা মুড়ানো খাম তক্তপোষের এক কোণে রেখে বলে, 'বাবু আপনাকে দিতে বললে।'

'বাবু কোথায়?' সুব্রত ভুরু কুঁচকে দুমড়ানো খামটার দিকে এক নজর চায়। আবার কলকাতা তার করাল হাত বাড়িয়েছে তাকে টেনে নেবার জন্যে যেমনভাবে সমস্ত পশ্চিম বাংলাটাকে গিলে ফেলেছে গত কয়েকটা বছরে, একটা প্রকাণ্ড অজগরের মতো। আর গিলে হাঁস ফাঁস করছে। সুব্রত আঁচ করে ওটা নির্মলের চিঠি। নিশ্চয় তাদের কলেজের কোন কেচ্ছার কথা জানিয়েছে কিংবা তার বাবার নতুন বাড়ির কথা অথবা সুব্রতর গ্রামে আসা নিয়ে ঠাট্টা। হঠাৎ সে নির্মলের ওপর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। সে তার কাকাকে বুঝতে পারে, এমনকি তার নিজের বাপকেও, কিন্তু নির্মলকে একদম না। এরকম দুনৌকোয় পা দিয়ে চলা সে বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। যদি সে একটা সোজা চাকরী করতে চায় করুক। তার জ্যাঠামণির সঙ্গে দহরম মহরমের মাত্রা যদি বাড়িয়ে দেয় তাহলেই তো সিধে সড়ক। 'মেটাল বক্স', 'বার্মাশেল', 'বার্ড' কোথাও না কোথাও একটা মোটামুটি ভাল চাকরী হয়ে যাবে। নিদেনপক্ষে কোন দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদকটাও তো হতে পারে। কিন্তু তাকে টানা কেন? সে নিজে আট দশ বছর আগে ছাত্র-আন্দোলন করে পুলিশের ঠেঙ্গানি খেয়ে যে রাজনীতি করেছিল সে ধরনের রাজনীতি আজ করে না, করবেও না। কিন্তু তাই বলে ফোতো কাপ্তেন সে হতে পারবে না। সুব্রত একটানে খামটা ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে। নির্মলের চিঠি :

> সেদিন আমাদের কলেজে সুনীলের টি পার্টি হয়ে গেল। বেচারী ডি.ফিল.-টার জন্যে বড্ড হামলাচ্ছিল। বরেনকে বলেছিল, দুশ্চিন্তায় চুল পাতলা হতে সুরু করেছে। এখন তাকে চেনা দায়। টাই পরে ছবি তুলেছে বাংলা কাগজে। ডি.ফিল. হলেই পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ার প্রস্তাবটা এ মাস থেকেই চালু হয়েছে। সুনীল দিলদরিয়া। এন্তার কাটলেট আনাচ্ছে। বরেনের ডি.ফিল. পার্টিতে সেই পচা প্যাস্ট্রির কথা মনে আছে?
>
> তুই বেশ দেখালি যা হোক। দশ বচ্ছর রাস্তায় নেমে চেঁচালি, 'চলবে না, চলবে না'

তারপর যখন তোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও বিপ্লবে নামব ভাবছি তখন তুই কাট মারলি। আর ইকনমিক্স তো পরম ব্রহ্ম। জ্যাঠামণি যে তোড়ে অ্যাসেম্ব্লিতে সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন করেন তাতে ধারণা হয়েছিল সংখ্যাতত্ত্বে তোর এলার্জি হবে। শেষকালে তুইও সংখ্যাতত্ত্বের কাজ বৈপ্লবিক কাজ বলে রাজনীতি থেকে মুখ ফেরালি? কলেজে বলাবলি করছে যদি প্ল্যানিং কমিশনে দরখাস্ত করিস তাহলে তোর যা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড আর কয়েক বছরের ফিল্ডওয়ার্ক—সব মিলে একটা মোটা মাইনের এক্সপার্ট বনে যাবি। আমি সীরিয়াসলি বলছি। বেশীর ভাগই তো ভুসি মাল। তোর মতো ছেলেদের খুব চাহিদা। আমি তো কলেজে তোকে একটা ছোটখাটো জীনিয়াস্ বলে চালাই।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা দুজনে কি আবার আমাদের বাপ জ্যাঠার ভূমিকায় নামব? বাবার যত বয়স বাড়ছে ততোই তাঁর আদর্শবাদ ভোঁতা হবার বদলে চোখা হচ্ছে। কখনও কখনও ভয় হয় মেরেই বসবেন বুঝি আদর্শের ঝোঁকে। শরীর ততোই খারাপ হচ্ছে। বিনেপয়সার রুগীর ভিড় বাড়ছে আরও। আর যখন হাঁফ ধরে তখন বালিগঞ্জ প্লেসে যাই। বুলবুলির সঙ্গে ব্যাগাটেলি খেলি। আর দেখি জ্যাঠামণি উত্তরোত্তর খ্যাতির শিখরে উঠছেন। আমরাও কি এই দুই বিপরীত পথেই হাঁটব?

সুব্রত চিঠির আধখানা খামে পুরে তক্তপোষের কোণে ছুঁড়ে দেয়। তারপর ভুরু কুঁচকে চীৎকার করে, 'কই তোর বাবু কোথায়?'

ছেলেটি চমকে উঠে বললে, সে তো আগেই বলেছে সোনামুখীর এক দাড়িওয়ালা বাবু এসেছে। তার সঙ্গে আছে। ব্যাখ্যা করলে, 'খুব সোন্দর, গোরা, অপিচার বটে।'

'আমাকে জাগালি না কেন?'

'আবার আসবে ঘুরে। আমাকে বললে ইস্কুলে যেতে। ব্লক বাবু তো। অমনি বলে।'

'যাস না কেন?' চিঠিটা পড়ে যে বিরক্তি জমেছে তার মনে সুব্রত এখনই তা উদ্গার না করতে পারলে প্রাণে শান্তি পাচ্ছে না। 'কিরে জবাব দিচ্ছিস না কেন? হাবা হয়েই থাকবি? লেখাপড়া শিখবি না?'

ছেলেটি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'বাবা বলে......'

'কী বলে মদন?'

'বাবা বলে, আমরা হাবা, হাবাই থাকব।'

'কেন?'

সুব্রতর তীক্ষ্ণ স্বরে ছেলেটিকে বিশেষ বিচলিত দেখায় না।

'চালাক হলে পেট চলবে কি করে বাবু? এক বেলা খেতে দিলে ব্লকবাবুদের কথা শুনব।' ছেলেটি গোটা দুটো বাক্য গড়গড় করে বলে গেল।

'তুই এখন যা,' সুব্রত আবার সিগারেট ধরায়। এখনও সস্তা ব্রান্ডে নামতে পারছে না ভেবে তার মেজাজ খিজড়ে যায়। সে বুঝতে পারে বৃষ্টি নামলে আরও মেজাজ খারাপ হবে। কিছুক্ষণ ধরে ঝুঁটি-খওয়া একটা কুচকুচে নধর কালো মুরগী মোরগটার পিঠ চুলকোচ্ছিল ঠোঁট দিয়ে। সেদিকে একটা ঢিল মেরে সুব্রত উঠে পড়ল। উঠতেই চোখে পড়ে মুখার্জীর সঙ্গে ফিরছেন হাবুবর্ণিত সেই দাড়িওয়ালা ব্লক বাবু। সুব্রত চমকে উঠল। আরে এযে নিতাই! সুব্রত চীৎকার করে ওঠে, 'নিতাই!' এতক্ষণ যে অবসাদের ঘোর নেমেছিল সে এক চীৎকারে তা কাটিয়ে তোলে।

'তুমি এখানে কি মনে করে ব্রাদার?' সুব্রত এগিয়ে যায়।

'আমারও তো সেই প্রশ্ন,' প্রশান্ত ভদ্রলোকটি বললে। 'আমি এখানে ব্লক ডেভোলাপ-মেন্টের কর্তা। তুমি কলেজে ছিলে না?'

'হ্যাঁ সেটাও আছে। এখানে এসেছি একটা ইকনমিক সার্ভেতে।'

নিতাই উৎসাহিত হয়ে বললে, 'ভালই হল। আমাদের কাজে তোমাদের মতো লোকের দরকার সবচেয়ে আগে। আমাদের ক্যাম্পে এসো আজ সন্ধেবেলা দিল্লী থেকে আমাদের বড় কর্তা মিস্টার দে আসছেন।'

'তোমরা ব্যাপারটা কী করছো বলতো?'

'ব্যাপারটা ঠিক কী তা এখনও ধরতে পারছি না। বোধহয় মিঃ দে ভালভাবে বলতে পারবেন। তুমি এসো ঠিক—এখন আমার তাড়া আছে। আরও দু একটা জায়গায় যেতে হবে।'

তারপর কথা থামিয়ে হঠাৎ লোকটা সুব্রতর আপাদমস্তক একবার দেখে নেয়। যেন তাকে বলা যায় কি না ভেবে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে। চোখদুটো তার বেশ বড় আর চোখের পেছনে কি পদার্থ আছে বোঝা না গেলেও এক দৃষ্টিতে সে যখন চেয়ে থাকে তখন বেশ জাঁকাল দেখায়। সুব্রতর মনে হচ্ছিল আর একটু রং-এর জেল্লা থাকলে আর সের দশেক ওজন কমালে "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয়কালীন যুবক রবীন্দ্রনাথের মতো দেখাত নিতাইকে।

তার দ্বিধা কাটিয়ে নিতাই বললে, 'তুমি জানো কি না জানি না। মিশনে ঢুকেছিলাম। এই টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি—এর থেকে দূরে থাকব ভেবেছিলাম। দেখলাম, ওখানে ঐগুলোই আছে, আর কিছু নেই। তারপর এ লাইনে এসেছি। যদি সত্যিই ইচ্ছে থাকে. অনেক কিছু করবার আছে এখানে।......তবে ঠিক বুঝতে পারছি না।......যদি কয়েকটা রাস্তা আর ইস্কুল বাড়ি তৈরীর জন্যে আমাদের রাখা হয়ে থাকে তবে পি. ডবলিউ. ডি. কী দোষ করল? তুমি এসো কিন্তু। কথা হবে।'

ছয়

গাঁয়ের একমাত্র কোঠাবাড়ি মুখুজ্জের সদ্যনির্মিত টিনের চালওয়ালা পাকা তকতকে গোয়ালে সভা হয়। দুটো পেট্রোম্যাক্সের আলো, লালনীল কাগজের ছিকলি, খোলকরতাল নিয়ে গানের পার্টি সব মিলে জাঁকাল পরিবেশ। নবীন আর তার সাকরেদরা পাখসাট খাচ্ছে বুকে ব্যাচ্ লাগিয়ে। একটা ছোট ডায়নামো ভট্ ভট্ করে আওয়াজ দিচ্ছে। সেখানে বাগদী লোহার চাষীর ভিড়। গ্রাম প্রায় ভেঙে পড়েছে। নতুন চুণকামের গন্ধে, চাপা গরমে গলগল করে ঘামছে লোকগুলো। সুব্রতর মনে হল এখনই বুঝি হারানো ছেলের জন্যে আর্তনাদ সুরু হবে মাইকে : বুলু, তোমার কাকা আমাদের অফিসে অপেক্ষা করছে। ধুতির চাঁদোয়ার তলায় মিষ্টি, চা, পানের দোকান—পাখা বেলুন বিক্রি হচ্ছে। একজন ব্যাপারী যে সস্তা বিস্কুট কটকটে সবুজ আর লাল লজেন্স আর 'খোকা খেলবে পাখী, খুকু খেলবে পাখী' খেলনা নিয়ে কেঁদুলী থেকে শান্তিনিকেতনের পোষ মেলা পর্যন্ত সর্বত্র দোকান দিয়ে বেড়ায়, সেও দুচারটে তোরঙ্গ খুলে বসেছে। দুজন বাউলও গাঁজার কলকেতে দম দিচ্ছে। সভা সুরু হলেই হয়।

একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিঃ দে সভায় ঢোকেন। হাতে জড়ানো জরিমোড়া বেলফুলের মালা। সঙ্গে নিতাই, কমিউনিটি ব্লকের এক বড় অফিসার, কলকাতার কোন বিখ্যাত দৈনিকের বিশেষ প্রতিনিধি, সোনামুখীর উচ্চপদস্থ সরকারী ও পুলিশ কর্মচারী। আসার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ পড়ে যায়। মিঃ দে তাঁদের জন্যে সামনে রাখা চেয়ারে না বসে শতরঞ্চিতে বাগদী চাষীদের মাঝখানে পা দুমড়ে বসে পড়েন। সরকারী কর্মচারীরা

ইতঃস্তত করেন। খবরের কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি চেয়ারে বসেই উঠে পড়েন। অনেক ইশারা সত্ত্বেও পাশ থেকে চাষীরা একে একে দাঁড়িয়ে উঠল। নিতাই গলদ্‌ঘর্ম।

মিঃ দে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। 'উড্‌ ইউ শেয়ার মাই বার্ডন?' বলে গড়ে ফুলের মালাটা সংবাদপত্রের প্রতিনিধির দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সে ছোকরা 'থ্যাঙ্কস্‌' বলে সেটা লুফে নিল। তারপর নেহরু যেমন অপারিসীম আত্মবিশ্বাসে দুঃশীল জনতার মাঝখানে নিজেকে ছুঁড়ে দিতেন তেমনি আত্মবিশ্বাসে চাষীদের কাঁধ ধরে ধরে কখনও হেসে কখনও ধমকে তাদের বসিয়ে দিতে লাগলেন। খালি গা লোকগুলো ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে পড়তে আরম্ভ করল। তারপর ভদ্রলোক রুমাল বার করে চশমা মুছলেন। হাসিমুখে যখন এবার শতরঞ্চি ছেড়ে চেয়ারে এসে বসলেন তখন নিতাই কেন, ব্লকের অন্যান্য কর্মচারীরা সকলেই তাঁর দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে।

উদ্বোধন সঙ্গীত কি হবে তাই নিয়ে গানের দুই দলের একটুক্ষণ আগেই বচসা হয়ে গেছে। একদল বাঁয়াতবলা নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করেন গাঁয়ে। তাঁরা একটা ধ্রুপদী সঙ্গীত সুপারিশ করলেন। কিন্তু ব্লকের লোকজনদের চাপে রবীন্দ্রসঙ্গীত করাই ঠিক হল। কোন গান হবে তা নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তারপর বোধহয় দিল্লী থেকে আসা মিনিস্টার সাহেবের জন্যে খোলকরতালে গান হল : ঐ মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে। মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

মিস্টার দে-র বয়স পঁয়তাল্লিশও হতে পারে পঁয়ষট্টিও হতে পারে। প্রথম নজরে ভাবা যেতে পারে এক বুড়োটে তরুণ। নামটা বাদ দিলে বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ নেই। লম্বা ধারাল গড়ন, বাদামী শরীরখানার সঙ্গে খদ্দরের ধপধপে সাদা মিলেছে চমৎকার। যাঁরা তাঁর পেছনের ইতিহাস জানে, যেমন নিতাই কিংবা সুব্রত, তাদের কাছে এ ধরনের চেহারা যেন কর্মদক্ষতার বারতা নিয়ে আসে। লণ্ডন স্কুল্‌ অফ্‌ ইকনমিক্সে ল্যাস্‌কীর প্রিয় ছাত্র, যিনি ইয়োরোপে দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানচর্চায় তিনি ঠিক মন্ত্রী নন, সরকারী কর্মচারী নন, তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। এমনকি সুব্রতরও মনে হতে থাকে যে এই ধরনের নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবির প্রয়োজন যাঁরা কেবল গড্ডলিকাপ্রবাহে নিজের জীবন ও দেশকে ঠেলে দিতে চান না। এই ধরনের ভদ্রলোক নিজের এলেমের জোরেই বোধহয় আসন করে নিয়েছেন। সুব্রত উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। নিশ্চয় তার বাবার অ্যাসেমব্লী বক্তৃতা থেকে আলাদা কিছু বলবেন মিঃ দে।

কিন্তু মুস্কিল হল বক্তৃতা নিয়ে। মিঃ দের বেশীর ভাগ জীবন কেটেছে পাঞ্জাবে। বাংলা একেবারেই বলতে পারেন না। তাঁর বিশেষ দক্ষতা ইংরেজীতে। আর বরার্ট ক্লাইভ ইংরেজী ভাষার মারফত ভারতবর্ষ জয় না করলেও স্বাধীনতার পর আর একবার বোধহয় দেশ জয় করা যায় ইংরেজী ভাষার মারফত। কিন্তু সেদিক থেকে মিঃ দে-কে একপেশে বলা যায় না। তিনি উর্দুঘেঁষা চোস্ত হিন্দিতে বলতে লিখতে পারেন। বলা যায়, সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি।

মিঃ দে দু এক মিনিট ইতঃস্তত করে খবরের কাগজের বিশেষ প্রতিনিধির দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে সুরু করেন :

'History is a corelation of forces The modern world witnesses a gigantic clash between socialism and capitalism, between the overpowering dehumanised control of the State and the anarchy of private

enterprize. India wants to strike a balance, to achieve a synthesis. The Community Development Project must be viewed from that perspective.'

ভদ্রলোক আবার তাঁর চশমা ঠিক করেন। আবার তাঁর ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে ঝিকিয়ে ওঠে চশমার ভেতর দিয়ে। আর সুব্রতর চোখে পড়ে বাগদী লোহার লোকগুলোর দিকে যারা হাত জোড় করে উবু হয়ে বসে আছে। একদিকে নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ যত জোরালভাবে কানে বর্ষিত হতে থাকে তত যেন উবু হয়ে বসে থাকা লোকগুলোর হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকে যায়। হঠাৎ মাইকের সামনে দাঁড়ানো তার বাবার ছবিটা মনের মধ্যে খেলে মিলিয়ে যায় : আজ ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যে সৃষ্টিযজ্ঞ চলেছে...... ...এবার সুব্রতর কানে আসে : The hammers of Five Year Plans are crushing to pieces the poverty of the people, India's No. I enemy. Simultaneously, the development works will carry on a bloodless revolution in villages. Here we don't need spectacular machines but men, men who matter, the toiling millions of India. মিঃ দে আঙুল বাড়িয়ে দেন কুণ্ডলী-পাকানো মানুষগুলোর দিকে।

এরপর তাঁর চোস্ত হিন্দিতে বলে গেলেন, কেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছে জনতারাজে। জনতারাজে জেলাশাসকদের চারপাইয়ে বসে গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতে হবে। জনতারাজ একটা মামুলী বাত নয়। বোধহয় হাফিজের কয়েকটা লাইন জুতসইভাবে লাগালেন কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই তার মর্ম ঠিক বুঝলে না। নবীন আগে থেকে তৈরী করে রেখেছিল ছোকরাদের। বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তুমুল হাততালি দিলে।

সুব্রতর বোধহয় সে স্বপ্ন দেখছে। নতুন চুণকামের গন্ধ, কার্বাইড আলোর নীচে সারি সারি খালি গা আর সামনে যেন রঙ্গমঞ্চের ওপর মাইকের পেছনে ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব মিঃ দে হাত পা নাচিয়ে কথা বলছেন। তাঁর বাবার ইংরেজী উচ্চারণ এমন পরিষ্কার নয় কিন্তু বাংলায় তাঁর ঝেঁকে ঝেঁকে বলার ঢং অবিকল এক : 'আমরা যা বলছি তা বৈজ্ঞানিক-ভাবেই পরীক্ষিত। আলুর চাষ আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার চাইতেও বাড়িয়েছি।' সুব্রত নিজের চিন্তাকে জলের কলের প্যাঁচ এঁটে বন্ধ করে দেয় হঠাৎ। এভাবে সে চিন্তা করবে না, আবার নিজেকে সচেতন করে। এ চিন্তার দাম কী? আজ দশ বছর এ চিন্তা তাকে কী শিখিয়েছে? রাজভবনের কাছে একদল বিহ্বল রোদ্দুরে পোড়া শুকনো চিমড়ে রেফিউজি মেয়েপুরুষ কিংবা উপযুক্ত কর্মের অভাবে কতগুলো উচ্চকণ্ঠ যুবকের মিছিল তৈরী করতে সাহায্য করেছে। কতবার পুলিশের কর্ডন ভাঙতে সে নিজেই মন্ত্রণা দেয় নি? কতবার তারা পুলিশকে বাধ্য করেছে গুলি চালানোয়? কিন্তু তারপর? তারপর দিনই কান খুঁটতে খুঁটতে চিনেবাদামভাজাওয়ালা সেই রণক্ষেত্রেই চিনেবাদাম বেচেছে, বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে ট্রামবাস করেছে। বিপ্লবকে কান ধরে এমনি আনা যায়?

বাবার সঙ্গে তার যে বিরোধ তা কোন ইডিওলজির জন্যে নয় বরং ইডিওলজি না থাকার দরুণই বিরোধ। সুব্রত খালি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছে তার বাবা এত তাড়াতাড়ি ইংরেজভক্ত, গান্ধীভক্ত, নেতাজীভক্ত, রামকৃষ্ণভক্ত, রবীন্দ্রনাথভক্ত হয়ে পড়লেন কি করে? তার কাকা-যখন বৃদ্ধবয়সে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে চেঁচান, নোনাধরা স্যাঁতসেতে ঘরের দেয়াল-

গুলো কাকীর ঠাকুরদেবতার গুচ্ছের ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখেন, বাগবাজার বস্তির বাসিন্দে আর গরীব বাউণ্ডুলেদের বিনে পয়সার চিকিৎসায় মাসের শেষে ধার করে উঠতে বসতে মিনিস্টার ভাইয়ের শ্রাদ্ধ করেন তখন তাঁর মনের গড়ন সুব্রতকে অবাক করে না। বোধহয় তার বাবার নিজেকে ছাড়া কোন কিছুর ওপরেই বিশ্বাস নেই। গান্ধীজিকে আগে বলতেন, 'গেঁধে বেটা', সুভাষ বোসকে বলতেন মাথা মোটা, মন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত নেহরুকে বলেন, 'সোশ্যালিস্ট নবাব' আজকাল ইংরেজদের এফিশিয়েন্সির কথা খুব বলেন কিন্তু সুব্রতর বিশ্বাস সেটা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংক্রামক কুসংস্কার। তা থেকে তার বাবাও মুক্ত নন। তা ছাড়া তিনি নিজেও কি খুব এফিশিয়েন্ট? সে ব্যাপারেও তাঁর ছেলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রায় বলা যায় তালে গোলে মিনিস্টার বনে গেছেন যেমন আর পাঁচজন লোকও মন্ত্রী হয়েছেন। সুব্রতর আপত্তি সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী আর তার বাবা সাম্যবাদ-বিরোধী বলে নয়। তার আপত্তি তার বাবা কেরীয়ারের এমন ব্রহ্মে পেঁাছে গেছেন যেখানে সমস্ত বাদ একাবার। আর সে মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যায় এই ভেবে এই সব 'এফিশিয়েন্ট' লোকজনের জয়ই তো সর্বত্র যারা কোন সংকটকেই সংকট না ভেবেই রায় দিতে পারেন, তাঁদের জয় কি কোন একটি রাজনৈতিক দলেই সীমাবদ্ধ?

সুব্রত তাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে মিঃ দের কথায়। এখানেও সেই 'সায়লেন্ট ব্লাডলেস্ রেভিলিউশ্যানের' জয়গান এসব কথা কাকে বলা হচ্ছে? সেদিন এক জায়গায় পরিসংখ্যান জোগাড় করতে সুব্রত ক্রমাগত একই সমস্যার মুখে পড়ছিল। এখানকার এত দাঁত-বের-করা দারিদ্র যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানের অর্থ নেই। অনেক বাগদী লোহারের বাড়ি একটা চাটাই আর মাটির হাঁড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। নিতাইয়ের দল শিক্ষা শিক্ষা করে খুব চেঁচাচ্ছে, ছোকরা গ্রামসেবকেরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে লোকজনদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। কিন্তু সুব্রতর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই গুরুসদয় দত্ত উদ্ভাবিত 'চল, আয় কচুরী নাশি'-র পর্যায়ে। ইংরেজ আমলে জেলা-মহকুমা শাসক বছরে একদিন খাকি হাফ-প্যান্ট পরে কচুরীপানা তুলে গ্রামের লোকজনদের মধ্যে উৎসাহসঞ্চারের চেষ্টা করতেন। এখন মন্ত্রী অফিশিয়ালরা জনসাধারণকে রক্তহীন বিপ্লব এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গুণগান শোনান। সুব্রত চমকে ওঠে। আবার পুরনো খাতে তার চিন্তাকে বইতে দিচ্ছে। গত দশ বছর থেকে কি সে কখনও মুক্তি পাবে না? অথবা, বলা যেতে পারে, বাংলাদেশ মুক্তি পাবে না? সেই লোকজনকে উত্তেজিত করে রাস্তায় নামাতে হবে পুলিশের কর্ডনের সামনে, সেই নাক চুলকাতে চুলকাতে পুলিস-অফিসারের সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নির্বিকার গল্প জুড়ে দেবে, ঘাম চপচপে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে চীৎকার দিতে হবে, 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ', আর ইন্‌ক্লাব তখন ওপরে নীল আকাশে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসবে।

'কি মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?' নিতাই সুব্রতকে ঝাঁকি দিল। 'ফাস্টক্লাস বলেছে মশাই, ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এইরকম এক্সপার্টদের আজ সবচেয়ে দরকার।'

মিঃ দে কী এক্সপার্ট কথা বললেন বোঝা গেল না। কিন্তু যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এসেছিলেন জমায়েতে তাদের মধ্যে কথাটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল। সবাই বলতে লাগলেন, 'সাবজেক্টের ওপর ভদ্রলোকের অসামান্য গ্রাস্প,' কিংবা 'সিচ্যুয়েশনটা ঠিক অ্যাসেস্ করতে পেরেছেন' কিন্তু মুস্কিল বাধালে মদন বাউরী। সেই কোলকুঁজো মানুষের

কুণ্ডলীর মধ্যে হঠাৎ লোকটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, 'এসব ইংরেজী বাত তোমাদের নিজেদের মধ্যে কর। আমরা জল পাব? কি গো, আমরা জল পাব?'

কৃষি দপ্তরের উচ্চপদস্থ এক অফিসার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'পাবে, পাবে, সব পাবে। বোস বোস।' ইতিমধ্যে মদনের আশেপাশে আরও কয়েকটা খালি-গা উঠে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে একটা বিজবিজনি ফুসফুসানির মধ্যে সভাটা হঠাৎ ভেঙে যায়।

নিতাই কিন্তু উত্তেজিত। সে মিঃ দে-র জ্বলজ্বলে ব্যক্তিত্বের ঝলকে উত্তপ্ত। তার মনে হয় স্বাধীনতালাভের অ্যাদ্দিন পরে একটা কাজের কাজ হয়েছে। আর সে স্থির করে ফেলে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রামোন্নয়নে লেগে যাবে। মিঃ দে তাকে আরও দম দিয়েছেন। তার মুখচোখ দেখে বোধ হচ্ছিল ভারতবর্ষের বুকের ওপর দারিদ্রের যে জগদ্দল পাথর বহুযুগ ধরে চেপে বসে আছে তা এখন নড়তে সুরু করেছে। নিতাই ভাবছিল, অ্যাদ্দিন ধর্ম ধর্ম করে সে কি অদ্ভুত খেপে উঠেছিল, কি অযথা সময় নষ্ট করেছে। আর মনে মনে স্থির করে ফেলে সে সব রকম আত্মত্যাগ করতে রাজী, তার জন্যে তার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়ও যদি ভুল বোঝো তবু পিছপা হবে না। সে শুধু অফিসার নয়, সে কর্মী, সে হাত লাগিয়েছে ভারতবর্ষের বুকের ওপর থেকে দারিদ্রের পাথর নামাতে। এর চেয়ে কি মহৎ কাজ হতে পারে? তার দৃঢ় ধারণা হয়, রাজনৈতিক নেতা নয়, তাদের মতো এই সব অখ্যাত লোকেরই প্রয়োজন যারা জনসাধারণের মনে উৎসাহের সঞ্চার করবে। আজ এই পেট্রোম্যাক্স আর কার্বাইডের কম্পিত আলোর নীচে সারি সারি খালি গায়ের সভায় সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে ভারতবর্ষ বলে একটা কিছুর উপস্থিতি। হয়ত মিঃ দে ঠিক বলতে পারেন নি, হয়ত ইংরেজীতে বলা উচিত হয় নি, হয়ত কেন নিশ্চয়ই সরকারী কর্মচারী ও চাষীর মাঝখানে ব্যবধান এখনও দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু এই পাঁচিলে ফাটল ধরাতেই হবে। নিতাইয়ের ফর্সা মুখখানা উত্তেজনায় লাল থমথমে দেখায়।

'চল, আমাদের ক্যাম্পে চল,' সুব্রতর হাত ধরে নিতাই।

সুব্রত চমকে তাকায় নিতাইয়ের দিকে। নিতাইয়ের হাতটাও কেঁপে উঠল তার হাতে। 'আবার বক্তৃতা?' সুব্রত ক্লান্ত গলায় বলে।

'তুমি রেভুল্যশানারী না? তোমারও বক্তৃতায় ভয়?'

সুব্রত ক্লান্ত গলায় বলে, 'সেইজন্যেই তো ভয়। বিপ্লবটা বক্তৃতাতেই সব বেরিয়ে গেল। চাষীদের জন্যে আর কিছু থাকল না।'

'এতটুকু মন নিয়ে তুমি গাঁয়ে এসেছো?' নিতাই তেতে উঠে বললে।

'হ্যাঁ, আমার এতটুকু মন। আমার বাবার মতো, তোমার নেতার মতো এত দরাজ কি করে হব? আমি শুধু একটা কথাই বুঝতে চাই, সেইজন্যেই গাঁয়ে এসেছি। আমি জানতে চাই, কত ধানে কত চাল।'

'এসব হেঁয়ালী রাখো।'

'আসলে তুমি ভালভাবে চাকরী করতে চাও,' সুব্রত ফস্ করে বলে ফেলল। ঠিক এই ধরনের কথা বলবে না বলেই সুব্রত প্রতীজ্ঞা করেছে। সেই তীর্যক তীক্ষ্ন ভঙ্গী, সেই 'পলেমিকের' মেজাজ, তাতে কিছু হবার নয়। সুব্রত জানে, তাতে শেষপর্যন্ত রাস্তায় নেমে গুলি খেয়ে মরতে হয়।

আর ঠিক যে ভাবে ঘা দিতে চেয়েছিল ঠিক সেই ভাবে কথাটা বাজে নিতাইয়ের মনে।

নিতাই চীৎকার করে ওঠে, 'আইডিয়ালিজম তোমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি, না? কী স্যাকরিফাইস্ করেছো? কী ছেড়েছো ভাই? বাপ মিনিস্টার হলে ছেলে যদি তার পোঁ না ধরে তাহলেই ধন্যি ধন্যি পড়ে যায়। আমার বাবা মিনিস্টার নয়, ইস্কুলমাস্টার। আমরা সারা পরিবার ইংরেজের জেল খেটেছি। কখনও পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করি নি। চাকরী করব ভাবলে মিশন করতাম না, এই পাড়াগাঁয়ে অ্যাদ্দিন পড়ে থাকতাম না মাটি আঁকড়ে।'

'চল, চল তোমাদের ক্যাম্পে। গেঁয়ো লোকরা ঠাট্টাও বোঝে না।'

নিতাই জল হয়ে যায়। বলে, 'চাষবাস সম্পর্কে তোমার অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। থাকাই তো উচিত। আমিও তো ভাই তোমার মতো আগন্তুক। আমাদের শ্যামবাবু আছে—ডিস্ট্রিক অ্যাগ্রিকাল্‌চার অফিসার। তুখোড় লোক ভাই। তুমি তার কাছ থেকে সব পাবে।'

সভা শেষ হবার পর গুঞ্জনমুখর জনতা ভেঙে ভেঙে বাইরে চাঁদনীতে ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘস্বরে এক একটা ডাক ভেসে আসে, 'রজনী, ও রজনী……'। মদনের বাজখাঁই গলা কানে আসে, 'বাবু মশাই, তোমরা জলের একটা পাকা ব্যবস্থা করো গো।' তারপর সেই চাঁদিনীতে মিলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই চারদিক ফাঁকা লাগে। ধপধপে জ্যোৎস্নায় খোলা গরুর গাড়ির সামনে মুখুজ্জের দুটো বলদ পরম নিশ্চিন্তে জাবর কাটে। একটু দূরে এখনও একটা ভিড় কার্বাইড আলোর চার পাশে। দোতারার সঙ্গে গানের আওয়াজ উঠছে।

'বাউল,' নিতাই বললে। তারা দুজন থমকে দাঁড়াল ভিড়টার পাশে। সুব্রত ঘাড় উঁচু করে দেখে দোতারা বাজাচ্ছে মাঝবয়সী একটা ফকির। তার চোখদুটো মঙ্গোলীয়, চাপা, চিবুকে সামান্য একটু পাতলা ছাগলের দাড়ি। পরনে ফাটা গোলাপী রেশমের আলখাল্লা, গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা। লোকটা তার মস্ত বড় মুখ ব্যাদান করে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে গায়, ঘুরে ঘুরে নাচে। সঙ্গে নীল হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জীপরা, মাথায় ধুতি পাগড়ী করে পরা আট ন বছরের একটা ছেলে সঙ্গত করে। তারা যা গান করছিল তাতে নিতাই আর সুব্রতর চিন্তাসূত্রের হঠাৎ ছেদ পড়ে। আসতে আসতে তারা জমির 'ইল্ড' কি করে বাড়ানো যায় আলাপ করছিল কিন্তু সেসব কথা ভুলে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।

'বড্ড ডিপ্রেসিং না?' নিতাই ফিসফিস করে বললে সুব্রতকে। কিন্তু সেও এক অযৌক্তিক আকর্ষণে শুনতে থাকে। বাউল নিজের মনে হাসে। মাথার ওপরে দোতারা দুহাতে তুলে পাক খেয়ে লাফ মারে আবার গায় :

হৃদয়ের ইস্টিশানে
বসে খোদ মহাজনে,
চালায় কল রাত্রিদিনে যেখানে মন চলে।
ও মরি মরি কুলকুণ্ডলিনী মহারাণী
তিনি বিরাজ করেন চতুর্দলে।

নিতাই তার সম্মোহ কাটাবার জন্যে বিড় বিড় করে, 'আবার সেই দেহতত্ত্ব, সেই ভুসি মাল। দেশটা যে এগিয়ে যাচ্ছে, এরা কিছুতেই মানবে না, কিছুতেই মানবে না।'

শেষকালে দোতারার ঝমঝম আর পায়ের মলের ঐক্যতানে, ছেলেটার তালে তালে প্রেমজুড়ির সঙ্গতে গানটা জমকালো হয়ে ওঠে। আর একটা খুব সহজ সত্য, মানুষের জন্মমৃত্যুর অনাদ্যন্ত কাহিনী জ্যোৎস্নালোকিত ধানকাটা রুক্ষ রাঢ়ের মাঠে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নিতাই তার ঘোর কাটাবার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব পুরনো গান ছাড়।

একটা সামাজিক কিছু গাও। একটা সোশ্যাল কিছু।'

বাউল তার দোতারা থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে একবার চেয়ে থাকে নিতাই আর সুব্রতর দিকে। পাশে তার গেরুয়াপরা একটা বুড়ো, বোধহয় তারই দলের কেউ, তাকে কি বলে। পানসে চোখ মেলে দেখে আগন্তুকদের। পেছন থেকে একটা মুনিষ চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্লক বাবু, ব্লক বাবু।' বাউল একবার সেলাম করে নিতাই আর সুব্রতর দিকে। তারপর দোতারা সজোরে বাজতে থাকে। নিতাই অস্পষ্টভাবে বলে, 'ক্যাম্পে খাওয়া আছে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অ্যাগ্রিকাল্‌চার অফিসারও থাকবে।' আবার গান সুরু হয়, আবার সেই কখনও ফিসফিস করে, কখনও গলা চড়িয়ে, দু হাত তুলে, দোতারা ঝমঝমিয়ে, যেন বাবুদের কথাগুলো তার কানে যায় নি, কিংবা গেলেও সে মনে রাখে নি :

অনুরাগ না জাগিলে হৃদ্‌কমলে
প্রেম কি কথায় মেলে!
কৃষ্ণ প্রেম কি ছক্‌ড়া-নক্‌ড়া
কুড়িয়ে নেবে যারা তারা,
সাধিতে সাধিতে উদয় হবে
শুভযোগ পেলে।
প্রেমের গাছে প্রেমলতা
জগৎ জুড়ে তার পাতা
পাতায় পাতায় পরশমণি
তার বুকেতে দোলে।

'চলো চলো, অনেক হয়েছে,' নিতাই সুব্রতর হাত ধরে টান দেয়। তারপর চাঁদিনীতে আল ভাঙতে ভাঙতে বলে, 'শুধু প্রেম দিয়ে কিছু হয় না।' আবার তারা জমির 'ইল্ডে' ফিরে আসবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন জমে ওঠে না কথাবার্তা। মাঠের মাঝখানে আবার এক জায়গায় পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলো চোখে পড়ে। অর্ধসমাপ্ত স্কুলবাড়িটা থেকে লুচিভাজার গন্ধ আসে।

আরও কিছুদূর আসতেই মিঃ দের শেরোয়ানী আর চশমা চোখে পড়ে। মিঃ দে আর সেই বিখ্যাত সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি কি বিষয়ে একটা তর্ক করছেন। নিতাই এ ভোজসভার উদ্যোক্তাদের একজন। রান্নার তদ্বির করার জন্যে সে 'কিচেনে' ঢোকে। কোন কোন অফিসার সস্ত্রীক এসেছেন এ ভোজসভায়। সোনামুখীর দু' তিনজন বড় ব্যাপারীও আছেন।

সুব্রত এক কোণে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকদের কথাবার্তা শোনে। কতগুলো কথা বারে বারে ভেসে আসে, 'ভিলেজ পোটেনশিয়াল,' 'অ্যাগ্রিকালচারাল বেস্‌,' 'চেঞ্জেস্‌ ইন অ্যাটিচিউডস্‌' ইত্যাদি। খানিকক্ষণ কথা চলার পরই সাংবাদিকটি জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে আপনি বলছেন, অ্যাদ্দিন যা হয়েছে তা ঠিক হয় নি?' অমনি 'নট্‌ এক্‌জ্যাক্টলি' বলে' মিঃ দে যেখান থেকে সুরু করেছিলেন আবার সেখান থেকেই আরম্ভ করেন। প্রায় মিনিট পনেরো এই লুকোচুরি চলতে থাকে। কেউ ঠিক ধরা দেন না।

সুব্রতর মনে হল শেষকালে সাংবাদিকটি হাল ছেড়ে দিলেন। তাঁর চাঁছাছোলা উদগ্রীব মুখখানার ওপর ক্লান্তির ছায়া নামে। তাঁর বোধহয় গ্রামে আসার পরিশ্রমটাই মাঠেমারা গেল কারণ তেমন কিছু লেখার নেই। যদি মিঃ দেকে দিয়ে কোনক্রমে বলানো যেত যে

অ্যাদ্দিন পর্যন্ত যা হয়েছে তা কিছু হয় নি তাহলে নিশ্চয় প্রথম পাতায় দুকলম জুড়ে জাঁকিয়ে বসত খবরটা। কিন্তু তা হল না। সুব্রত আঁচ করে মিঃ দের গ্রাম সম্পর্কে উৎসাহ মূলত 'চেঞ্জেস্ ইন্ অ্যাটিটিউডস্' বা 'ব্লাডলেস্ রেভল্যুশান' ইত্যাদি কতগুলো জুতসই কথা ব্যবহার করার উৎসাহ তেমনি খবরের কাগজের প্রতিনিধির এই লক্ষ্মীপুর গ্রাম সম্পর্কে আগ্রহ আসলে ভাল 'কপি'-র জন্যে আগ্রহ। আর যদি সেই আগ্রহ না মেটে তাহলে এই গোটা লক্ষ্মীপুর গ্রাম সম্পর্কেই আগ্রহ হারিয়ে যায়। দুজনের কাছেই এই বৃত্তাকার শালী নদীর পারে তিলি-বাগদী-লোহার এতগুলো মেয়েপুরুষের কয়েক শতাব্দী ধরে বাস, তাদের অসোয়াস্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁচার সান্ত্বনা, এখানকার বিভিন্ন ধরনের জমি, আর বিভিন্ন ঋতুতে তাদের ওপর স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া, এখানকার আবহাওয়া মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরে বিশেষ ধরনের উন্নতি আবার বিশেষ ধরনের রোগ, এখানকার মানুষদের সরকারী যেসব প্রতিষ্ঠান সে সম্পর্কে মনোভাব অথবা তাদের ভূত-প্রেত-বাউল-কিংবদন্তীর জগত – এক কথায় এই কয়েক হাজার মানুষের অঞ্চল সম্পর্কে তাঁদের যে উৎসাহ তাতে বোধহয় এক মাইল রাস্তার কয়েক ইঞ্চি পর্যন্তই যাওয়া যায়।

'এই যে তোমাকেই খুঁজছিলাম,' ঘামে ভেজা উত্তেজিত নিতাইয়ের মুখখানা কাছাকাছি মানুষগুলোর মাথার ওপর ভেসে ওঠে। 'কোথায় এতক্ষণ ছিলে?' ...এই যে শ্যামবাবু, বলেছিলাম না? ব্রিলিয়েন্ট লোক। চাষবাসের ব্যাপার একেবারে নখদর্পণে।'

শ্যামবাবুর পরনে ধূসর পেন্টুলুন। তার ওপর খদ্দরের সাদা বুশশার্ট, মোটা ভুরু, লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা, বড় বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চোখ, চেটাল হাতের থাবায় স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত। শ্যামবাবু মৃদু হাসেন। বোঝা যায় এভাবে পরিচয়ে তিনি অভ্যস্ত। মোটা থাবাটা নিতাইয়ের মুখের সামনে নাড়িয়ে বলেন, 'এখানকার আসল ব্যাপারটা তো হল ল্যাটারাইট সয়েল। এটা মনে রাখলেই আর কিছু ভাববার দরকার নেই।'

সুব্রত উৎসুক চোখে ভদ্রলোকের কেজো মুখখানার দিকে তাকায়। ভদ্রলোক বলেন, 'যেটা গ্যান্জেটিক সয়েলের অসুবিধে এখানে তা নেই। এখানে দুটো কাজ—বান্ড্ আর টেরাস্ কাল্টিভেশান—যা গ্যানজেটিক ক্লে সয়েলে সম্ভব না। তাই এখানে একটু ইমাজিনেশান্ খাটালেই ট্রিমেন্ডাস্ পসিবিলিটি।'

'আপনি যেসব কথাগুলো বলছেন সেগুলো হচ্ছে? চাষীরা আপনাদের কথায় চাষ করছে?'

সুব্রতর প্রশ্নে শ্যামবাবু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'একি আর একদিনের ব্যাপার মশাই! আমাদের মতো ব্যাক্ওয়ার্ড কান্ট্রিতে করে কোন জিনিষ লোকে আগবাড়িয়ে নিয়েছে! বিদ্যেসাগর মশাই তো বিধবাবিবাহ চালু করলেন। কটা ইয়ংম্যান বিধবাবিবাহ করছে মশাই?'

এরপর কথা চলে না। শ্যামবাবু বিশদভাবে বোঝান যে এসব প্রচেষ্টায় ঠিক ব্যাপারীর বুদ্ধি নিলে চলবে না। এ ধরনের প্রোগ্রামের পেছনে দরকার হলে কোটি কোটি টাকা ঢালতে হবে। তা থেকে এখনই কী লাভ হবে, সঙ্গে সঙ্গে চাষের ইল্ড কত বাড়বে এভাবে দেখার পেছনে যে বুদ্ধি তা পাটোয়ারী বুদ্ধি। তা দিয়ে দেশ এগোয় না। 'সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা পার্সপেক্টিভ্ দিতে হবে,' শ্যামবাবু এতক্ষণে সমস্ত সংশয় দূর করতে পারলেন এভাবে কথা শেষ করেন।

এরপর আবার বক্তৃতা। বোধহয় এই লুচি মাংসের ভোজসভাকে একটা 'পার্সপেক্টিভ'

দেবার চেষ্টা। এর উদ্যোক্তারা যেন বলতে চান এটা মামুলি ভোজসভা নয়, এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আলোচিত হবে, দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণের চেষ্টা হবে। যাতে সমাগত অতিথিবর্গের লুচিমাংস সদ্ব্যবহারে বিবেকদংশন না থাকে। যাতে তাঁরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় এই ভোজসভায় যোগ দিতে পারেন।

বক্তৃতায় মিঃ দে বলেন আত্মত্যাগের কথা। দেশের চারদিকে সৃষ্টিযজ্ঞ চলেছে—খামারে কারখানায়। ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। ব্যাপারী যেমন লাভ ছাড়বে, যিনি সরকারী কর্মচারী তিনিও আত্মত্যাগ করবেন। 'মনে রাখবেন, কমিউনিটি ডেভোলাপমেন্টের মারফত যদি সত্যিই গ্রামের উন্নতি করতে হয় তবে তা শুধু চাকরী করে হবে না।'

মিঃ দের বক্তৃতা শেষ হবার পরই সুব্রত আশ্চর্য হয়ে দেখে নিতাই দাঁড়িয়ে পড়েছে মিঃ দের পাশে বক্তৃতা করার জন্যে। সকলেরই খিদে বাড়ছে, ভাল ঘিয়ের গন্ধে তা এখন আরও তেজাল। এখন একটা বক্তৃতা, বিশেষ করে স্থানীয় ব্লক অফিসারের কাছ থেকে বক্তৃতা, কারুর বরদাস্ত নয়। কেউ কেউ অপ্রসন্নভাবে, কেউ করুণামিশ্রিত কৌতূহলে তাকায় নিতাইয়ের দিকে। সুব্রত আশ্চর্য হয়ে দেখে প্রবল উত্তেজনায় থম থম করছে নিতাইয়ের মুখ। চোখ জলে ভরা, গলা ধরা। দু' তিনবার কাশবার চেষ্টা করে কাঁপা গলায় নিতাই বললে যে সে তার মাইনে থেকে মাসে মাসে একশো টাকা কম নিয়ে ভলান্টিয়ারদের মাঝখানে বিলি করবার ব্যবস্থা করবে তাদের কাজে আরও উৎসাহ দেবার জন্যে। নিতাই যেমন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তেমনি ধপ করে বসে পড়ে পাশের চেয়ারে।

নিতাইয়ের থমথমে ভাবখানা সমবেত মানুষগুলোর মাঝখানে হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ তাঁদের কুঁচকানো ভুরু, ফোলানো নাক, কিংবা করুণামিশ্রিত হাসির মারফত এই নাটকীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। তাঁদের অবস্থা থেকে বোধহয় যেন কোন দিগ্বীজয়ী বিজনেস ফার্মের বোর্ড মিটিংয়ে একটা নেংটা পাগল ফস্ করে ঢুকে পড়েছে। একটু একটু ভয়ও করে সকলের। কেউ আড়ে আড়ে মিঃ দের দিকে তাকান তাঁর মুখের ভাবখানা বুঝবার জন্যে। মিঃ দে নীচু গলায় নিতাইকে ভর্ৎসনা করেন, 'আপনার স্ত্রীকে বলতে হবে আপনার পাগলামির কথা।' আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের লোকজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। একজন এই বেকায়দা অবস্থাটা কাটাবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এক সার বসিয়ে দাও এখন। আবার জলকাদায় ফিরতে হবে।' নিতাইয়ের মুখে কেউ এক পোঁচড়া কালি লেপে দেয়। তার সেই রাঙা উদ্ভাসিত মুখখানা হাসির অভিনয়ে ভীষণ কাঁদো কাঁদো বোকা দেখায়।

এরপর সভা জমে ওঠে। বেশী পদ হয় নি সত্যি কিন্তু এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে পাকা বাড়িতে বসে ভাল ঘিয়ের লুচি মাংস খাওয়ায় আরাম আছে। তারপর মিঃ দে-র উপস্থিতিতে এই মামুলি খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। মিঃ দে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে অথচ নীচু গলায় বলতে থাকেন কবে পণ্ডিত নেহেরু তাঁকে কি বলেছেন। 'নেহেরুও আমার সঙ্গে একমত হলেন।' কিংবা 'নেহেরু আসলে আমার আপনার ওপরেই নির্ভর করে আছেন। আমরা কি করতে পারি গ্রামে তার ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ,' বা 'গত বছর জেনেভাতেও ল্যাংগে—জানেন তো ওদের সবচেয়ে বড় এক্সপার্ট—আমার সঙ্গে একমত হলেন,' —মিঃ দে-র এই ধরনের আলাপে আশ্চর্য এক কুহক সৃষ্টি হয়। আর এ কুহকের রাজ্যে সমবেত অফিসারবৃন্দ ব্লক কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অজ্ঞাতসারেই নিতাই সুব্রত ঘুরে বেড়াতে থাকে। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চল এক আলোকিত রঙ্গমঞ্চ আর সেখানে মিঃ দে যাদুকরের মতো ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন কথায়। সে রঙ্গমঞ্চে শত শত কোটি টাকার

ফার্টিলাইজার তৈরী হয়। হাজার হাজার মেগাওয়াট আলোকে প্লাবিত করে গ্রাম-গ্রামান্তের ঝুপড়িকেও। আর ঝুপড়িই থাকছে না যেমন শহরে বস্তি থাকছে না, থাকছে না মহাজন, থাকছে না ভারতবর্ষের কৃষকদের শত শতাব্দীব্যাপী ঋণ ও দারিদ্র্য।

হঠাৎ সংবাদপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি বলে উঠলেন, 'এসব যা বলছেন সবই ঠিক। তবে আপনাদের প্রহিবিশান পলিসি আমি সাপোর্ট করি না। ফাঁকা আদর্শবাদ দিয়ে তো আর ডেভালাপমেন্ট হয় না। আপনারা কত কোটি টাকা রেভেনিউ লস্ করেছেন ভাবুন তো।'

'ইকনমিক প্লেনে অবশ্য এ পলিসি টেঁকে না। ইউ আর রাইট,' মিঃ দে বলেন।

'আরে মশাই স্বাধীনতা পেয়েছি বলে আমরা তপস্বী হব না কি? আমরা ভাল খাব-দাব, কাপড় জামা পরব, এরই নাম তো স্বাধীনতা।'

জেলাশাসক এক ছোকরা আই. এ. এস. অফিসার। তিনি সামলে দেন, 'ডন্ট বি টু হার্শ অন হিম্। মদ খাবার জন্যে স্বাধীনতা কি না, দ্যাটস্ এ ম্যাটার অফ্ ওপিনিয়ন। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের গেস্টকে......'.

শ্যামবাবু সাংবাদিকটিকে লক্ষ্য করে তাঁর জোরাল গলায় বললেন, 'আমাদের অনেকেরই স্যর মাঝে সাঝে দু এক পাত্তর ভালই লাগে। বাট্ ইউ ডোন্ট নো ভিলেজেস্। তাড়ি খেয়ে শালারা পড়ে থাকল।'

আবার আলাপটা ঠিক পথে পাক খেয়ে চলে এল। 'সো ইউ সি' বলেই মিঃ দে আর একটা উৎসাহের বোতল খুলে ফেললেন। আর গলগল করে সেই সফেন উৎসাহ সবাই পান করতে থাকেন। শ্যামবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আসল ব্যাপারটা তো স্যর ল্যাটারাইট সয়েল...।' জেলাশাসক ভুরু কুঁচকালেন কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত জমে গেলেন।

জমল না খালি দুটো লোক। তারা দুজনে সভা ভাঙবার একটু আগেই উঠে পড়েছিল। তারপর যেমনভাবে এসেছিল তেমনিভাবে জ্যোৎস্নালোকিত আলের ওপর দিয়ে ফিরে যায়। ধবধবে আলোতেও নিতাইয়ের করুণ মুখখানা মালুম হয়। বিশাল বুক চিতিয়ে হেলে দুলে চলনের বদলে মাথা হেঁট করে সুব্রতর পেছনে পেছনে সে এগোয়। আর সুব্রত তার এই নতুন বন্ধুত্বে তৃপ্ত হয় না। গত দশ বছর ধরে, বলা যায় তার গোটা যৌবন ধরেই তো তার এই বন্ধুত্ব—যে বন্ধুত্ব দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবাদের ওপর। নিতাইকে সে যেমন দেখেছিল এই গ্রামে সেই উৎসাহিত ব্লক অফিসার রূপেই সুব্রত দেখতে চায়। সে তো গ্রামে এসেছে এই প্রতিবাদের ভূমিকা ত্যাগ করবে বলে। যে অশান্ত গুঞ্জণ গত দশ বছর ধরে তার কানে বেজেছে তাকে শান্ত করবে বলে। ভারতবর্ষের কি কোথাও কোন জায়গা নেই যেখানে সৎ হয়েও কার্যকরী হওয়া যায়, যেখানে তার বাবার মতো, মিঃ দে-র মতো, কিংবা (যা সুব্রতর কাছে আরও ভয়ংকর) তার নিজের পার্টির কোন কোন নেতার মতো শুধু কথার ফানুস উড়িয়েই জীবন শেষ করতে হবে না?

একটা ঢ্যাঙ্গা মতো লোক আসছে আলের উল্টো দিক থেকে। নিতাই হাঁক দেয়, 'কে?' 'আমি মদন, ব্লকবাবু নাকি?'

'ওটা কী?' মদনের বগলে কী একটা লক্ষ করে নিতাই বললে।

মদন হাসল। কিরকম টেনে টেনে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বের করল গলা থেকে।

'মহুয়া! এক কাগজের নোক এয়েছেন গো কলকেতা থেকে।...চৌকিদার ধরেছিল। কলকেতার সাহেব বলতেই ছেড়ে দিলে।...চলবে?'

'ভাগ্ এখান থেকে।' নিতাই চেঁচিয়ে উঠল।

কয়েক পা এগোতে এগোতেও তারা মদনের হাসির আওয়াজ শুনতে পায়।

সাত

পাথরে কোপ মেরে কি লাভ? নির্মল বলেছিল সুব্রতকে। যা লোকে নিতে চাইছে না তার জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার পেছনে কী লোকনীতি? যদ্দিন পর্যন্ত ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মানুষ উত্তেজিত হয় নি তদ্দিন কি ছটফটিয়েছে বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়! গুপ্ত সমিতি স্থাপন, বোমা বানানো, পিস্তল ছোঁড়া, তারপর মরীয়া হয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। আজ সেই তরুণদের আত্মবিসর্জন এক চমকপ্রদ ঘটনা, বড়জোর খবরের কাগজে রোববারের পাতায় রোমাঞ্চ কাহিনী বা জনপ্রিয় ফিল্ম। কিন্তু আজ এই আত্মবিসর্জন রাজনৈতিক নেতাদের গলাকাঁপানো বক্তৃতা ছাড়া আর কি কাজে দেবে?

সুব্রত অবশ্য এ যুক্তি মানে না। রাজনীতিতে যে রাস্তায় সাফল্য সেই রাস্তাই একমাত্র নয় তার মতে। আর সাফল্য কী? গান্ধী ভাঙিয়ে দশ পনেরো বছর চলছে, তারপর নেহেরু ভাঙিয়ে আরও পনেরো বছর কি তারও বেশী। তারপর? তাদের জীবনে না আসুক প্রকৃত সমাজবাদ ভারতবর্ষে আসবেই।

কিন্তু তাদের তাত্ত্বিক বিরোধ থাক, নির্মলকে সে সুবিধেবাদী বলে যতই ঠাট্টা করুক, তার এই সুবিধেবাদই সুব্রতকে আকর্ষণ করে। নির্মল ঠিকই লিখেছে, তারা কি তাদের বাপ কাকার ভূমিকা পুনরাবৃত্তি করবে না? নির্মলের চিঠি পড়ে সে চটেছিল কিন্তু বরাবরই সে এইরকম ঠাণ্ডাভাবে তাদের সামনের সমস্যাগুলো ধরবার চেষ্টা করেছে। সুব্রত যখন রাজনৈতিক উত্তেজনায় আলোড়িত হয়েছে, একটার পর একটা কলকাতার রাস্তায় মিছিল সংগঠিত করেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্টির ঘরোয়া মিটিংয়ে আত্মসমালোচনা করে করে মুখে ফেনা তুলেছে তখন নির্মল একটাই বক্তব্য রেখেছে বছরের পর বছর : রাজনীতি সে ঠিক বোঝে না। সুব্রতর কাজের সে কোনদিন সমালোচনা করে নি, তারিফ করে নি। পক্ষে কি বিপক্ষে তার কোন উত্তেজনা নেই। নিজের সীমা সে বেঁধে ফেলেছে। তার জ্যাঠামণি প্রবোধবাবু সম্পর্কেও সে তাঁর ছেলের মত পোষণ করে না। প্রবোধবাবুর কথা ও কাজের মধ্যে যে ফারাক তাঁর ছেলেকে পীড়া দেয়, নির্মলের কাছে তা অবশ্যম্ভাবী। 'তুমি যদি ঐ চেয়ারে বসতে তোমাকেও ঠিক ঐরকম কথাই বলতে হোত। তোমার অর্থনীতির জ্ঞান আরও প্রখর থাকায় আরও হয়তো কায়দা করে কথাগুলো বলতে। আর তা ছাড়া মিনিস্টারদের কি করণীয় আছে—সেক্রেটারীরা যা লেখে তাতে সই দেওয়া ছাড়া?'

কথাটা সুব্রত একেবারে উড়িয়ে দিতে আজকাল পারে না। যদি প্রচন্ড মতবিরোধ ঘটে তাহলে পদত্যাগ করতে পারেন বাবা মন্ত্রীত্ব থেকে। কিন্তু তা না হলে নির্মলের কথা মতো সই মারা ছাড়া কিংবা গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া কি করণীয় আছে? কিছু আছে, যেমন ভবেন গাঙ্গুলীদের চাকরী করে দেওয়া কিম্বা বুলবুলির স্বামীর মতো কিছু লোক-জনের ট্র্যান্সফার সুপারিশ। এখানেও তো ক্ষমতা সীমাবন্ধ। হতেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, কিছুটা করার ছিল। দিশী বিলিতি ফার্মের আয়কর ফাঁকি দেবার কমিশন বাবদ দু' তিন হাজারী কয়েকটা চাকরী দেবার ক্ষমতাও হাতে থাকত। 'শালারা আমাদের পাত্তাই দেয় না।' কোন সাহেবী ফার্ম সম্পর্কে তার বাবার সখেদ উক্তি সুব্রতর মনে পড়ে।

নির্মলের এই নিরুত্তেজ সতর্কস্বভাব তার সঙ্গে একেবারে না মিললেও মাঝে মাঝে

এই বৈপরীত্যই তাকে আকর্ষণ করে। সেইজন্যেই লক্ষ্মীপুরে আসার আগে নির্মলের এক কাণ্ড দেখে সুব্রত আশ্চর্য হয়েছিল। কাণ্ড মানে ছেলেমানুষী কাণ্ড! যা অতি সহজেই সাবালকমানুষ ভুলে যায় কিন্তু নির্মল সেই ছেলেমানুষীতে মেতে উঠেছে। সুব্রত যতবারই স্মরণ করে নির্মলের আত্মসচেতন মুখে সেই চাপা লজ্জা ততবারই সে মজা পায়। আসলে নির্মল যে এখনও ছেলেমানুষ ও 'সেন্টিমেন্টাল' সে বিষয়ে সুব্রতর সন্দেহ থাকে না।

ব্যাপারটা কিছুই না। সুব্রতর কাছে একেবারে এলেবেলে ব্যাপার। তাদের যশোরের বাড়ির পাশে এক মুসলমান উকিলের বাস ছিল। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল। তারপর দেশভাগ হবার পর সেই ভদ্রলোক ক্ষমতার শিখরে উঠলেন পাকিস্তানে। সুব্রতর ঠিক খেয়াল নেই তবে কাগজে দেখেছেন সে ভদ্রলোক কখনও মুসলীম লীগ, কখনও আওয়ামী লীগ, কখনও অন্য কোন লীগের নেতা এবং ক্রমান্বয়ে ঢাকা ও করাচীতে কখনও মন্ত্রী, কখনও স্পীকার,—আবার কখনও অ্যাম্বাসাডর। কখনও এই শোনা গেল তাঁর নামে হুলিয়া, আবার কদিন পরই গভর্নর তাঁকে আপ্যায়ন করছেন। অর্থাৎ তার বাবার চেয়েও প্রাতঃস্মরণীয় এক রাজনৈতিক নেতায় উন্নীত হয়েছেন তিনি। আর তাঁর ছোট মেয়ের সঙ্গে নির্মলকুমারের পেরেম চলছে।

পেরেম বলে ঠাট্টা করেও সুব্রত স্থির থাকতে পারে না, কারণ যেটা হচ্ছে সেটা কিছুই না। একটা কমবয়সী মেয়ের মতিভ্রম। ছেলেবেলার স্মৃতি সবমানুষেরই ভাল লাগে। দশ-বারো বছরের মেয়েটিকেও বোধহয় কয়েকবার নির্মলচন্দ্র সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে ঘুরিয়েছে। সে মেয়েটির এক দাদাও নির্মলচন্দ্রের সহপাঠী। তিনিও করাচীতে কোন দৈনিক কাগজের মুখ্য সম্পাদক। 'দ্যাখ কাণ্ড!' বলে সলজ্জ হেসে নির্মল কয়েকখানা নীল কাগজে লেখা চিঠি দেখিয়েছিল সুব্রতকে। সেই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিছুই পায় নি সুব্রত। 'বাচ্চা মেয়ে,' সুব্রত অপ্রস্তুতভাবে বলেছিল দু একবার। কিংবা 'দেশভাগটা সত্যিই মেয়েটার বড্ড লেগেছে' বা 'ওর কলকাতায় পড়বার খুব ইচ্ছে ছিল।' কিন্তু এসব কোন কথাই সুব্রতর মনে হয় নি চিঠিগুলো পড়ে। 'নিউরটিক', সে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নির্মলের মুখের দিকে চেয়ে বলতে পারে নি। একটু রূঢ়ভাবে বলেছিল, 'দেশভাগ নিয়ে প্যান্ প্যান্ করে কি লাভ?'

'সেটাও বা কম কি।' নির্মল সতর্কভাবে জবাব দেয়।

'তুমি কি ওকে বিয়ে করবে ভাবছো?'

'কি সব বাজে কথা বলছো। শি ইজ জাস্ট এ পেন্ ফ্রেন্ড,' নির্মলের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'অতো চটছো কেন?'

'না না চটছি না, চটছি না।'

আট

দু'তিন বছর হল মুখুজ্জের গোয়ালের পাশে সার ও বীজ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পরেশ বলে' যে ছোকরাটি সেখানে তদারক করে সে খুব উৎসাহী, রবীন্দ্র সঙ্গীত করে, নজরুল দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান গলা ছেড়ে গায়, কিন্তু সার কি বীজ চেনে না। আলুর সার কিছুদিন এসে পড়ে আছে। বেচারী খেয়াল করতে পারে নি। এদিকে আলুর

জমি তৈরী করার সময় চলে গেল। মুখুজ্জে সোনামুখী গিয়েছিলেন মামলার তদ্বিরে। পরেশকে ফিরে এসে ধমকালেন। তারপর সার বিতরণ হল। ফলে এ বছর আশানুরূপ ফসলের সম্ভাবনা কম।

এতদিন গুড় বানানোর কাজও থমকে ছিল। মুখুজ্জের আর নবীনদের কলেই গাঁয়ের আখ মাড়াই হয়। কাল রাত থেকেই আখ মাড়াইয়ের শব্দ, মেয়েপুরুষের কোলাহল বচসা, বাতাসে গুড় জ্বালের মিষ্টি গন্ধ। সুব্রত খেয়েদেয়ে গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছিল। আকাশে মেঘ নেই তবু ফর্সা আকাশে গুড় গুড় করে একটু আধটু আওয়াজ উঠছে, ঠাণ্ডা বাতাসও দিয়েছে। হয়তো দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে।

ক্যাপস্টেন সিগারেটের একটা টিন হাতে মুখুজ্জে ঘরে ঢুকলেন। চালে মাথা ঠেকবে বলে মাথা নীচু করে মুখখানা বাড়িয়েই বললেন, 'আপনি এখনও আছেন! আমি ভাবলাম ভেগেছেন অ্যাদ্দিনে।'

তারপর সুব্রতর মুখের আশ্চর্য ভাবখানা লক্ষ করে বললেন, 'কি, ঠিক বলি নি? সখ করে গরিবিয়ানা কদ্দিন চলবে?'

সুব্রত ভুরু কুঁচকায়। মন্ত্রীর ছেলে পরিচয়টা কি তাহলে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় গরম খবরের মত বেরিয়ে পড়েছে? আগেও ঘটেছে এ ব্যাপার। সমীহ, কিঞ্চিৎ দ্বিধামিশ্রিত ভয় আর স্তাবকতার ঢল ঢল ভরা ভাদরে সে বার কয়েক ভেসে গিয়েছে। মুখুজ্জের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সুব্রত ভাবে, কালই ভোরে তল্পিতল্পা গুটোতে হবে নাকি? সেরকম বিপদ নেই বোধ হয়। মুখুজ্জে খোলা টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এটা আপনার কাছেই রাখুন।'

'বেশ তো আছি। কেন এসব করছেন?'

'ওসব বলবেন না স্যর। কলকাতার লোক গাঁয়ে এসে বাস করছেন......তা প্রায় দিন পনেরো তো হল......এ কি চাট্টিখানি কথা! গ্রাম উজোড় করে লোক শহর যাচ্ছে, পুকুর উজোড় করে মাছ চলেছে কলকাতায়। আচ্ছা মশাই, এই কলকাতা যাওয়াটা বন্ধ করতে পারেন না? গ্রামদেশেও তো মানুষটানুষ থাকবে, না কি?'

তারপর পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে বললেন, 'দেখলেন তো, কয়েক ঘণ্টা দে সাহেব এসে কেমন ভেল্কি দেখিয়ে দিলেন সারা গাঁয়ে।'

'ভেল্কিটা কি?'

'এই এত লোক, এত কথা। এখানে তো সব মশাই মরে আছে। দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে। দিন হচ্ছে, রাত হচ্ছে। এর মধ্যে দে সাহেবের মত লোকজন এলে প্রাণে বল পাই। যখন শুনি সারাটা দেশ হৈ হৈ করে এগোচ্ছে......

'শীতে কি বুনলেন এবারে?'

'পছন্দ হল না বুঝি কথাগুলো?'

'পছন্দ হবে না কেন? দে সাহেব পণ্ডিত লোক। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'বলুন, পারেন না?' মুখুজ্জের চোখ উৎসাহে জ্বলে ওঠে। তারপর তাঁর কি মনে পড়ে যায়। তাঁর ঢোলা কামিজে পকেট নেই। কামিজের নীচে কাপড়ের খুঁট থেকে এক-টুকরো মোচড়ানো কাগজ বার করলেন। পরিপাটি করে ভাঁজ খুলতে খুলতে সলজ্জ হেসে বললেন, 'দেখুন তো, এটা ঠিক আছে কি না।'

সুব্রত অবাক হয়। ইংরেজীতে ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসারের কাছে লেখা এক

আর্জির ওপর আনমনে চোখ বোলাতে বোলাতে বলে, 'ঠিকই তো আছে।'

'না না, ইংরেজী ঠিক আছে? আমি বলছি মানে ভাষা ঠিক আছে? দেখবেন স্যর।' ভদ্রলোক একটু অধীর হয়ে বললেন।

সুব্রত অপটু হাতের ডেগা ডেগা অক্ষরগুলোর ওপর আবার আনমনে চোখ বোলাতে বোলাতে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে।'

'না না, আপনি দেখছেন না, দেখছেন না.' ভদ্রলোক হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর অত্যন্ত আত্মসচেতন মুখখানা নীচু করে বিনীত ছাত্রের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সুব্রতবাবু, 'ইফ্'এর পরে কি 'দেন্' হয়?'

সুব্রত বোকার মতো মুখুজ্জের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সে খেয়াল করে মুখুজ্জের মুখে প্রার্থনার করুণ ভঙ্গী। তার এই জিজ্ঞাসার জন্যেই যেন এই দুপুরে তার ঘরে এসে ঢোকা, এমনকি বোধহয় এরই জন্যে সিগারেটের টিন।

'ইফ্ এর পরে কি দেন্ হয়?' গলা খাঁকারি দিয়ে মুখুজ্জে আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'কেন? হয় কি না হয় তাতে আপনার কী এসে যায়?' সুব্রত উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'খুব এসে যায় স্যর, খুব এসে যায়,' মুখুজ্জে শান্ত গলায় বললেন। 'সোনামুখীতে একজন আমায় বললেও, আমার সব কিছুই ভাল কিন্তু ইংরেজীটা......মানে ঠিক ইস্কুলে তো পড়ি নি ভালভাবে...নইলে আমার এক কাকা ধরুন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশানার সাউথ, আর এক আত্মীয়......'

সুব্রতর কানে আর কিছু ঢোকে না। হঠাৎ লক্ষীপুরে থাকাটাই কেমন আলুনি লাগে। কলকাতার সেই অকারণ গর্বিত অহসায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভূত এই রাঢ় বাংলার মানুষকেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এছাড়া এ দেশের মানুষের কি নিজস্ব কোন ছবি নেই? কোন ভবিষ্যৎ নেই?

সুব্রত তার হাত তুলে বললে, 'আপনি আঠারো মণ ধান করেছেন, আলু তুলছেন, সমস্ত গ্রামের আপনি আদর্শ। একটা ফোকোটিয়া কে আপনাকে কি বললে তাই আপনি ভাবছেন?' উত্তেজনায় গলা কাঁপতে থাকে সুব্রতর। আর মুখুজ্জে আরও কাঁচুমাচু করুণ হয়ে পড়েন।

'আমরা কি করব স্যর বলুন। আমাদের তো কাজ করতে হবে। ইংরেজী জানলে কাজের সুবিধে হয় তাই বলছি।'

'চাষীকেও ইংরেজী শিখতে হবে? চাষীর ঘরেও বাবা ব্ল্যাক্ শিপ, হ্যাভ্ ইউ এনি উল? আমাদের দেশ বলে কি কিছুই থাকবে না? সব ফোতো, ফরফর কাগজের ফানুস?'

'না না মশাই, আপনি চটে যাচ্ছেন মিছিমিছি। নিন, সিগারেট খান।' মুখুজ্জে কৌটো খুলে সিগারেট বার করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি তো রেগেই খালাস। আমাদের তো রাগলে চলবে না। যেদিকে দেশের হাওয়া সেদিকে আমাদেরও চলতে হবে।'

'দেশের হাওয়া যদি আমাদের বাঁদর বানায়। আপনিও বনবেন?'

'এসব কি বলছেন?'

সুব্রত আত্মগতভাবে বললে, 'আপনারা নিজেরাই জানেন না কি বড় কাজ করছেন। প্রত্যেক বছর আমরা ভিখিরীর মত হাত পাতছি বিদেশের কাছে আমাদের ভাতরুটির জন্যে।

আপনারা আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। আপনারাও যদি ইফ্ এর পরে দেন করেন তাহলে দেশটা কোথায় যাবে?'

'কি সব বলছেন! নিন, বিশ্রাম করুন। আমাদের গুড়ের কাজ সুরু হয়েছে। দেখেছেন ওদিকটা?'

ভদ্রলোক যেমন সন্তর্পণে মাথা নীচু করে ঢুকেছিলেন তেমনি বেরিয়ে যান সন্তর্পণে।

নয়

গুড়ের কাজ পুরোদমে সুরু হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় দুটো বড় আটচালার নীচে নারীপুরুষের সমাবেশ। তিনটে পেল্লাই কড়াইয়ে আখের রস জ্বাল হচ্ছে। আশেপাশে বিশ্রাম করছে মুখুজ্জের মুনিষ জলধর, শক্তি আরও কয়েকজন। মদনের ছেলে হাবাও জুটে গেছে। তদারক করে বেড়াচ্ছে নবীনের দুই কাকা। একপাশে নাগরীর স্তূপ। পাশের চালায় আখ মাড়াই চলেছে। আবছা চাঁদের আলোয় দশ বারোজন লোককে একরাশ আখের আঁটির পাশে জিরোতে দেখা যায়। জনাপাঁচ বাগদী মেয়ে অপেক্ষা করছে। গুড়ভরা নাগরী মাথায় করে শালী নদীর ওপারে বাস্‌খোলায় পেঁৗছে দিতে হবে। পার খেপ্ আট আনা।

জলধরের বয়স হয়েছে। শক্ত বেঁটেখাটো গড়ন, মাথাভর্তি টাক। ঠিক মালুম হয় না বয়স। সে প্রসঙ্গ নিয়েই আলাপ হচ্ছিল।

'বলে কি বয়স কতো? আমি বলি তিরিশ চল্লিশ। লোকটা কে বটে?'

'পুলিশ হবেন,' শক্তি ফুটন্ত রস নাড়তে নাড়তে বলে।

'ফের বলে সেবার ঝড়ে বাধাগোবিন্দ মন্দিরের চুড়ো পড়ল তখন আমার বয়স কত। আমি তখন হাবার মত। শুনে শালা বলেন, আমার ষাট বয়স।'

হাফপ্যান্টপরা শক্তিকে বয়সের তুলনায় ছোট লাগে। সে বলে, 'কি জানি, কি ফিকিরে ঘুরছেন। হয়ত পুলিশের লোক। বয়স বেশী শুনলে ভিটেই ক্রোক করবেন।'

এক চিলতে চাঁদের আলো কড়ার হাতলে পড়ে চকচক করে। সেদিকে চেয়ে জলধর বললে, 'আবার বলে, কটা ছেলে? কটা ছেলে আমি কি তা জানি! বললাম, তুমি কি আমার বাপের ঠাকুর? ছেলে কটা মানুষ করবে?'

উনুনে চেলাকাঠ ভরতে ভরতে হাই তোলে জলধর। নিজের মনে বিড়বিড় করে। 'কি অসুখ করেছিল আমি কি তা জানি। আপনার হেল্থ সেন্টারের ডাক্তার এসেছিল?... কেউ হাগতে হাগতে মরল, কেউ বকতে বকতে মরল। আমি তা কি জানি!'

'তোমার রতন মরেছে গাছ থেকে পড়ে,' শক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়।

'রতনটা গেছে বটে পা পিছলে। সোনামুখী নিয়ে গেলাম। হাড় ভাঙলে না কি হল, মরেই গেল।'

'কবে মরল ছেলেটা?'

'যেবার কালুর গরুটা মারা গেছে।'

'মানুষ মরেছে কি বাঁচছে, ভগবান জানে।'

'হ্যাঁ!'

এরপর তারা এমনভাবে আলাপ করে যেন মৃত্যু তাদের পড়শী যে পড়শীর সঙ্গে

নিজেদের সরাসরি মোলাকাত না হলেও যার উপস্থিতি তারা হামেশাই অনুভব করে। বস্তুত জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর কোন তফাৎ নেই শক্তি জলধরের কাছে। এ দুয়ের উপস্থিতি নদীর জলের মত সর্বদা তাদের গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। সুব্রতর সংখ্যাতত্ত্ব তাদের কাছে দুর্বোধ্য। কার কটা ছেলে, কে কি করেছে করে নি, কে কিভাবে মরেছে এগুলো অপ্রাসঙ্গিক। সবাইকে এই ধরণীতে কয়েক দিনের জন্যে ধুলো খেলতে হবে, তারপর বিদায় নিতে হবে। তারমধ্যে কেউ রতনের মত গাছ থেকে পা পিছলে পড়ে হঠাৎ বিদায় নেয়, তাই মনে থাকে। নইলে এসব ঘটনা এত স্বাভাবিক, এত দৈনন্দিন যে মনে রাখার মত নয়।

'টগর কি বলছে? জলধর আবার হাই তুলতে তুলতে বলে।

'এ বছর হবে নাই, ঘরে পয়সা নাই একটা।'

'ঐ লেংড়াটাই নেবেন ওকে।'

'বললাম, আমরা একটা ঘর দেখি। দুজনে খাটব, খাব।...শালী বিবি হবেন।'

'বয়স আছে তো।' আখের গাদায় ঠেস দেয় জলধর। 'বয়স থাকলে সবাই বিবি, সবাই বাদশা। আমরা তো বুড়ো হয়ে গেলাম।' তারপর বাইরে চাঁদের আলোয় ধবধবে সাদা ধানের গোলাটার দিকে চেয়ে বললে, 'তোর টগরের মত তিনটাকে রেখেছি।'

শক্তি চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাদের বয়সের সময় গম খেত লোকে?'

'দূর!'

'আধপেটা খাঁইয়ে থাকত?' শক্তির গলা চড়ে যায়।

'দূর! দূর!'

'তোমার সময় হলে দশটা রাখতাম, দশটা!' শক্তি বুক চাপড়ে বলে।

জলধর এখন তাড়িস্থ। এ অবস্থায় সে মেয়েমানুষ রাখার গল্প করে। যখন অন্নের এত হাহাকার ছিল না তখন আরও অনেক সহজ ব্যাপারের মত মেয়েমানুষ রাখাও সহজ ছিল, এই তার বক্তব্য। সে বক্তব্যে মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে চটে যায়। বিড়বিড় করে, 'ঐ লেংড়া নেবেন টগরকে! হ্যা!'

'শক্তি হঠাৎ গলা খাটো করে বলে, 'ল্যাংড়ার কাছ থেকে শ দুই টাকা নাও। তোমায় বাবা বলব। একটা সাইকেল রিক্সা করব সোনামুখীতে। এমনি খুঁজে খাঁজে খাব কদ্দিন?'

'তুই টগরকে নিয়ে ভাগবি? তোকে দেবেন কেন বটে?'

শক্তি একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জলধরের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'একটা বচ্ছর কিছু বলব না। একটা বছর গ্যাঁড়ার কাছে থাকুক। তারপর আমি আসব।'

জলধরের নেশা কাটতে সুরু করেছে। তার চকচকে চাঁদিতে জ্যোৎস্না। চোখদুটোও ঝকঝক করছে ঘুমন্ত ভাব কেটে গিয়ে।

'তারপর?'

'তারপর দেখা যাবে,' শক্তি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

'মদন কি বলবে?'

'বেটা ঢোঁড়া সাপ, তাড়িখোর। পারবে না কিছু করতে।'

জলধর বিঁড়ি ধরায়। গুড় দানা বাঁধছে। সুঘ্রাণ উঠছে। জলধর বিঁড়িতে টান দিতে দিতে বলে, 'আচ্ছা বলব।'

ওদিকে যখন গুড় জ্বাল দেওয়া হয় তখন টগর, কালোর মা, গ্যাঁড়ার দিদি আরও

টগরের দু'তিনজন সাকরেদ অপেক্ষা করে গুড়ের নাগরী বাসতলায় নিয়ে যাবে বলে। দূরে একটা মশা পোঁ পোঁ করে।

'ওঁরা সবাই অমনি। ওই যে বসে আছেন জলধর ওখানে উনিও অমনি।' কালোর মার স্বরে আক্ষেপ নেই। এ যেন জল হাওয়ার মত স্বাভাবিক ঘটনা। কালোর মা বহুকাল কালোর বাবার সঙ্গে থাকে না। কিন্তু বিপদে পড়লেই লোকটা আসে। সেই গল্প করে কালোর মা। কালো যখন পেটে এসেছিল সেই সময় কালোর বাবা তার বউ রেখে পাশের গাঁয়ে তারই বয়সী এক বিধবার সঙ্গে ভেগে গেল। তারপর যখন বসন্ত হল, কেউ দেখল না তাকে, তখন উঠে এল তার যন্ত্রণা নিয়ে কালোর মা-র ঘরে।

সন্ধ্যের পর নাগরীগুলো একটার পর একটা সাজানো হয়। চাঁদ আছে, চলতে অসুবিধে নেই। মেয়েদের দলটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। টগর ওঠে গড়িমসি করে। দূর থেকে আগুনের আঁচে জলধরের মুখখানা দেখা যাচ্ছে। শক্তির গলা পাওয়া যায়। টগরের মনে হতে থাকে ওরা আসলে একটাই লোক। শক্তি ওকে বলেছে, সোনামুখী কিংবা দুর্গাপুরে উঠে যাবে। সাইকেল রিক্স ধরবে। যদি না পোষায় বাসের কন্ডাক্টারি করবে। কিন্তু সেই ঘর বাঁধার প্রতিশ্রুতির পেছনে আর একটা লোক যেন বসে আছে জলধরের মত যে বৌকে ছেড়ে গেছে। পুরুষ মানুষের সেই দ্বৈতরূপ—একদিকে তার প্রবল আগ্রহ অন্যদিকে তার অনাসক্তি বা নতুন আসক্তি টগরের মনের মধ্যে এক অস্পষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। মাথায় বেড়িটা ঠিক করে এক ঝটকায় গুড়ের নাগরী তুলে নেয়। কাঁখে আর একটা তোলে। তারপর অভ্যস্ত পদক্ষেপে আলো আঁধারের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে কি একটা উবু হয়ে বসে আছে আলোর ওপর। টগর থমকে দাঁড়ায়। গুড় নাগরীর ভেতর ছলকে ওঠে। টগর ভুরু কুঁচকায়। সামনের রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে বাসতলির দিকে। কালো-র মা-দের দেখা যায় না। ম্লান আলোয় পথের বাঁকে কয়েকটা অর্জুন গাছ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

উবু হয়ে বসা লোকটা উঠে দাঁড়ায়। সেই বেঁটে মানুষটার বেঁকে দাঁড়ানো হঠাৎ টগরের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ঠোঁট কামড়ায় টগর। পিচ্ করে থুতু ফেলে।

গ্যাঁড়া ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে টগরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভয়ে সে প্রায় কাঁপছে। ভয়ার্তভাবে ফিস ফিস করে ওঠে, 'শক্তির সঙ্গে যাসনে, যাসনে টগর। ও তোকে পথে বসাবে। তোকে রেললাইনের বস্তিতে তুলবে। তারপর ভাগবে।...টগর, টগর...'

গ্যাঁড়া উত্তেজনায় বসে পড়ে টগরের পায়ের কাছে। টগর চীৎকার করে ওঠে, 'ওঠ্।' এক জায়গায় ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতের ডানা ধরে ওঠে। গ্যাঁড়া দাঁড়াতেই টগর কাঁখের নাগরীটা তার হাতে তুলে নেয়। তারপর অভ্যস্ত আঙুলে নাগরীর ঢাকনাটা চাপ দিয়ে খুলে ফেলে। গ্যাঁড়া মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কিছু ভাববার আগেই এক খাবলা গরম গুড় তুলে নিয়ে টগর মুহূর্তে লেবড়ে দেয় গ্যাঁড়ার মুখে। তারপর আর এক ঝটকায় নাগরীটা টেনে নিয়ে পাশ কাটিয়ে শন্ শন্ করে এগিয়ে যায়। গ্যাঁড়ার গাল জ্বালা করে কি না সেদিকে খেয়াল থাকে না। সেই চন্দ্রালোকিত অর্জুন গাছের তলার সামনে রাস্তার বাঁকে অপসৃয়মান আবছা নারীমূর্তির দিকে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

দশ

ভাষা কী? ভাববিগ্রহ না ভাবের ঘরের চুরির সবচেয়ে সার্থক ষড়যন্ত্র? আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতন্দ্র ক্রিয়ায় আমাদের যে ভাবতরঙ্গ মস্তিষ্কের গর্ভগৃহে আছড়ায় শয়নে জাগরণে ভাষা কি বাস্তবিক তাকে রূপ দেবার জন্যে? অথবা সে ভাব ইস্পাতের কোন দৃঢ় রেখায় অঙ্কিত করার সাধ—এক আকাশচারী কল্পনা? বরং মানুষের জীবনচর্চায় ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত তুলে তুলে কি বলা যায় না ভাবের বিপরীত পথে চলার নামই ভাষা?

প্রেমিক যখন বলেন, 'আমি তোমায় ভালবাসি। তার মানে কী? তার মানে কি তোমার অবয়বে এমন কিছু আছে যেমন হয়ত, আয়ত চোখ, মসৃণ ত্বক, উত্তুঙ্গ বুক অথবা এগুলোর কোনটাই না, শুধু ঘাড়ের রেখা, দাঁতের পাটি মেলে হঠাৎ হেসে ওঠা, স্থিরভাবে তাকানো অথবা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত গড়ন—এগুলো আমার কাম সঞ্চার করে? এই সমস্ত অঙ্গের ক্রিয়াকলাপে আমি উষ্ণতাবোধ করি, আমার রক্তে বেগ জাগে?

কিম্বা আমি তোমায় ভালবাসি তার কারণ তুমি আমার জীবনের প্রায়শ্চিত্ত। আমি তো জীবনে কিছুই করতে পারলাম না, পারবও না। এখন তোমার সঙ্গে মিলনে যদি সেই আত্মদৈন্যের পাপ, সেই গ্লানির অসহনীয় একাকীত্ব কিছুটা কাটে। তোমাকে ভালবাসি কারণ তোমার কথা চালচলন, আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আমাকে আত্মপ্রতারণায় সাহায্য করে এ জীবন কিছু পরিমাণ সহনীয় করে তোলে।

অথবা আমি তোমায় ভালবাসি কারণ তোমার দুচোখে আমার সর্বনাশ নয় আমার সন্তানের দুই চোখ দেখি। আমার এই নশ্বর দেহ মিলে যাবে পঞ্চভূতে যেমন আমার বাবা ঠাকুর্দাদা তার বাবা-বাবারা মিলে গেছেন পঞ্চভূতে তাদের অসংখ্য কলরব গুঞ্জরণের ইতিহাস পেছনে রেখে। আমরা কেউ আলবার্ট আইনস্টাইন নই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নই, লেনিন নই। আমাদের এই ধরাধামের ভালবাসার কোন বিমূর্ত রূপ নেই, কোন কালাতিরিক্ত স্বাক্ষর নেই। তাই তোমার কাছে আসি। তোমাকে ভার্যাভাবে পেতে চাই। যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে তখন আমার অস্তিত্ব, এই আমি সমস্ত সৌরজগতের খেলায় খেলবে এই বোধের প্রশান্তি আমার মন ভরায় না। আমার তখন মনে হতে পারে কোন্ শূন্য থেকে এসে আমি কোন্ শূন্যে মিলিয়ে যাব। তার বদলে আমি আরও সীমাবদ্ধ এক স্বপ্ন, ধরা-ছোঁয়া যায় এমন ভাবনা ভাবতে চাই—আমার পুত্র প্রপৌত্রদের ঘরকন্না যার মাঝখানে আমি বেঁচে থাকব যেমন আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহরা আছেন আমার মধ্যে।

আমি তোমায় ভালবাসি এ কথায় এই তিনরকম কেন, আরও তিরিশরকম ভাব থাকতে পারে। কিন্তু এই তিনটি শব্দের খোলে আমরা এত ভাব কিভাবে ঢোকাব? তাহলে তো তিনটি খোলই বিরাট আওয়াজে ফেটে যাবে। এতগুলো ভাবনার আক্রমণে যে ভাষা বেরোবে তা প্রায় অসংলগ্ন অর্থহীন, তা বড় জোর মনস্তাত্ত্বিকের কাঁচামাল হতে পারে কিন্তু ভাষার দিক থেকে তা মৃত। তাই ভাষা মানেই বেশ কিছু পরিমাণ আপ্তবাক্য, অথবা একটা বিশেষ পায়রার খোপ যে খোপে সেঁধিয়ে আমাদের ভাববাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমরা তখন সে ভাবের সৌকুমার্য তার বিশেষ ছাঁদ, তার অপূর্ব শক্তির তারিফ করি। কিন্তু আসলে ভাবের প্রচণ্ড রূপকে সে হারিয়ে ফেলেছে। সে ঠিক সত্যের চেহারা আমাদের সামনে রাখতে পারছে না। বরং সত্যের চেহারার নামে সে আমাদের ইচ্ছা পূরণের সহায়ক।

রাজনীতিতেও কি ভাষার এই প্রবল অসহায়তা আমাদের জীবনে দৈনন্দিন প্রকট নয়?

তোমরা দেশের জন্যে এগিয়ে এসো—একথার কী মানে? একথার কি মানে কতগুলো মানুষ যারা দেশের স্নায়ুতন্ত্রের ঘাঁটিগুলো আগলে আছে তাদের কিংবা তাদের দলের বা তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়দের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসব? অর্থাৎ তারা যাতে আরও ভাল করে খেয়েদেয়ে নির্ভাবনায় ঘুমোতে পারে তার জন্যে আমাদের এগিয়ে এসে দরকার হলে জীবন বিসর্জন দিতে হবে?

অথবা অর্থনীতির ভাষা--জীবনের মানোন্নয়ন যথা, আমাদের জীবনের মানোন্নয়নই একমাত্র লক্ষ। তার মানে কি এই আমরা যারা নিমের দাঁতন আর ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁতমেজে সত্তর বছরেও বত্রিশপাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলাম তারা উন্নত অবস্থায় দুবেলা পেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে চল্লিশ পার হলেই দাঁত তুলবার জন্যে ডাক্তারের কাছে ছুটব? কিংবা একবারও ইস্ত্রী করতে হয় না এরকম জামার বুশশার্ট পরে বেয়ারাকে ডাকবার জন্যে ঘণ্টা টিপতে টিপতে পঁয়তাল্লিশে হৃদরোগে পটল তুলে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কাছ থেকে স্ত্রীপুত্রদের এক কাঁড়ি টাকা পাইয়ে দেব? মানোন্নয়ন মানে কী? পায়ে না হেঁটে গাড়িতে চলা, খড়ো ঘরের বদলে পাকা বাড়িতে থাকা, বাংলার বদলে ইংরেজী বলা?

ভাষা নিয়ে কি কেচ্ছা। কি যাচ্ছেতাই ব্যাপার! অথচ মানুষের এমন অসহায় অবস্থা, সত্যকে ধরার জন্যে সে হাজার হাজার বছর ধরে এই যন্ত্র নির্মাণ করেছে, তারপর সেই যন্ত্র এখন বিরাট রাক্ষস হয়ে সত্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। বাস্তবিক এখন এমন অবস্থা যে একটা বিখ্যাত পানীয়ের বিজ্ঞাপন আর কিং লীয়ারের লাইন একেবারে একাকার। বোঝাই যায় না কোনটা আসল কোনটা নকল। যেটা নকল সেটা আসলের চেয়েও ঝকঝক করে।

লক্ষ্মীপুরের কৃষি অফিসারের দোষ কি। সে বেচারা 'টেরাস কাল্টিভেশান' কথা দুটোকে আঁকড়ে ধরেছে মরীয়া ভাবে স্রোতের মুখে কুটোর মত কেন না এই শব্দ দুটোই তো তার ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে সাহায্য করেছে, তার স্ত্রীর গায়ে শাড়ী চড়াচ্ছে। একথা-গুলো যেন এক এক গ্রাস ভাত। একথাগুলো যদি সে জুতসইভাবে না বলতে পারে তাহলে তার ভাত জুটবে না। তার ছেলেদের স্কুল বন্ধ হবে, স্ত্রী মুহূর্তে হবেন এক বিষণ্ণ নারী।

তার মিনিস্টার বাবারও তো সেই কৃষি অফিসারের অবস্থা। ভেবে দেখতে গেলে তাঁর আসেপাশে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশী। প্রবোধবাবুকে অনেকগুলো সরকারী হস্তশিল্প সংস্থার উদ্বোধন করতে হয়েছে আর প্রথম প্রথম সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ীই মনে হয়েছে এগুলো আসলে ফাঁকি, তাঁতিদের শোচনীয় অবস্থার সমাধান এভাবে হবে কি না সন্দেহ। তারপর চিন্তা করেছেন অন্যভাবে কি করা যায়। কিন্তু অন্য পথে এতরকম বাধা, এত প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে যেতে হয়, এতরকম অন্যায়ের ঝুঁকি নিতে হয় যে মন্ত্রী থাকা যায় না। আর হতস্তশিল্প কেন, যে কোন শিল্পবিস্তারে খোলনলচে পাল্টে ফেলতে হবে। অর্থাৎ কিছু করতে গেলে মন্ত্রী থাকা যাবে না। প্রবোধবাবু প্রথম বছরের শেষ থেকেই সংকল্প করলেন তিনি মন্ত্রী থাকবেন, তখন থেকেই 'স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের ধাপে ধাপে অগ্রগতি,' 'মানোন্নয়নের জন্যে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টিযজ্ঞ,' 'আমরা সত্যের সাধক, ভারত-বর্ষের ঐতিহ্যের বাহক,' 'শুধু শ্লোগানে দেশ তৈরী হয় না, দেশ তৈরী করতে গেলে চাই কাজ,' 'দেখতে হবে আমরা অতীতের ভাবধারা কতখানি সমৃদ্ধ করতে পেরেছি,' 'দুনিয়ার সমস্ত দিকে আমরা বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছি, কি আমেরিকা, কি সোভিয়েট রাশিয়া' —এই ধরনের কথা অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন। যত দিন যাচ্ছে এই সব কথাগুলো যেন তাঁকে পেয়ে বসছে। আগে একটু জিভের জড়তা ছিল, নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে

দেখবার চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা দিত। তাতে দেখলেন ঠিক 'এফেক্টিভ' হওয়া যায় না। 'এফেক্টিভ' হতে গেলে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে কথার মালা গাঁথতে হয়। একটার পর একটা রং বেরং-এর ফুল দিয়ে একটার পর একটা মালা। তাদের কি রং কি বাহার! এ শব্দের মালা যেন তাঁরই বিজয়মাল্য। অথবা বলা যেতে পারে প্রবোধ সেন মানে কোন মানুষ নয়, কোন বিশেষ চিন্তা নয়, এমনকি কোন বিশেষ কর্ম নয়। প্রবোধ সেন একটা শব্দের মালা যা নতুন নতুন রং-এর গন্ধে আমাদের সামনে দোলে।

অথবা ধরা যাক প্রাতঃস্মরণীয় সাংবাদিকদের কথা কোন ঘটনাকে যাঁরা গুরুত্ব দিতে পারেন অথবা গুরুত্ব না দিতে পারেন। এবং তাঁদের খ্যাতির বেশীর ভাগই তো এই শব্দ প্রয়োগের কৃতিত্ব যে কৃতিত্ব এমন প্রবল যে সাদা কালো দেখায়, কালো সাদা দেখায়। এ ক্ষমতাকে যাঁরা তিলকে তাল করার ক্ষমতা ভাবেন তাঁরা এই ক্ষমতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। এ হচ্ছে সত্যের নাকে দড়ি দেবার ক্ষমতা। অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন নামজাদা সাংবাদিক একই ঘটনা পাঁচরকম কাগজে পাঁচরকমভাবে লেখেন। এ যেন মানুষের ব্রহ্মে পেঁছানর অবস্থা, একই ব্যাপারকে পাঁচভাবে দেখা যায়, একই রাজনৈতিক দলকে একই সঙ্গে ভাবা যেতে পারে প্রগতিবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, উদারনৈতিক বা প্রাচীনপন্থী। সত্যকে নিয়ে ফুটবল খেলার এই অপরিসীম ক্ষমতার জন্যেই সংবাদপত্রকে ফোর্থ স্টেট বলা হয় না? তাঁদের যে ক্ষমতা তা সত্যের নাকে দড়ি দেবার ক্ষমতা। সুব্রত বেচারী কি করবে! চারদিকে এই শব্দের জয়যাত্রা। তার বাবা কেন সবাই শব্দকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের ইচ্ছা-পূরণের সবচেয়ে সার্থক হাতিয়াররূপে। সত্যের প্রতিবিম্ব নয়, আমাদের মস্তিষ্কে যে ভাবোচ্ছ্বাস তার সার্থক চিত্রকল্প নয়, ভাষার শুধু প্রয়োজন সত্যকে সে কতখানি খেলাতে পারে, সেই সাফল্যের জন্যেই তার চাহিদা।

সুব্রতর কাছে কৃষি-অফিসারের কথার সরলীকরণের প্রবল ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে কতগুলো কথাকে অবলম্বন করে আমাদের দেশের ফসল বাড়ানো যায় না, তার মনে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক কৃষি অফিসারের কি দোষ? সুব্রত যদি একদিন কলকাতার হাইকোর্টে আসে তাহলেই শব্দের ওপর আইনজীবিদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় সে অনেকবেশী অভিভূত হবে। এক ঘরে ফাঁসীর আসামী মুক্তির আদেশ পেল তার মানে এ নয় সে হত্যা করে নি। বস্তুত ফরিয়াদী কেঁাসুলী বিলক্ষণ জানেন তাঁর মক্কেল হত্যাকারী। কিন্তু অপরিসীম কৌশলে আইনের বইয়ের কন্টকিত পথের মাঝখানে যে সরু মসৃণ পিচঢালা রাস্তাটি আছে তার ওপর দিয়ে আসামীকে হাঁটিয়ে এনেছেন, আর সেই হাঁটিয়ে আনাটা এমন কৃতিত্বের ব্যাপার যে জুরী ও জজ উভয়েই মুগ্ধ, আসামী খুন করল কি করল না সেটাই বড় কথা নয়, তাকে কি ভাবে সমস্ত বাধা পার করিয়ে আনা হয়েছে সেটাই বড় কথা।

প্রেমিক, প্রবোধবাবু, রাজনৈতিক নেতা, অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, কূটনৈতিক সাংবাদিক, জাঁদরেল আইনজীবি, সমাজের প্রত্যেক স্তরের সকল মানুষ যাঁদের কথা রোজ সংবাদপত্রে কীর্তিত হয়, ট্রামেবাসে যাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা চলে তাঁরা তো সবাই বেঁচে আছেন বা করে খাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের শব্দপ্রয়োগের সাফল্যের ওপর। বেচারী লক্ষ্মীপুরের অ্যাগ্রিকালচার অফিসার কি এমন দোষ করলে!

[ক্রমশঃ]

আধুনিক সাহিত্য

কাল অস্থির, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা অবলুপ্ত, এবং বিশেষ করে অপ্রতিহত মুদ্রাস্ফীতির ফলে সামাজিক প্রথাগত সম্পর্কে গত বিশ বছরে নানা উচ্চাবচতার সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা স্রেফ সাহিত্যিক হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, স্ব-স্ব নিষ্ঠায় নিমগ্ন থাকবার প্রয়াস ক'রেছিলেন, তাঁদের অচিরেই আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আসলে শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমন দু'একজন ছাড়া স্রেফ লেখার উপার্জনে বাংলা দেশে সংসার চালিয়েছেন, স্বাধীনতার আগে সেরকম দৃষ্টান্ত বিরলতম। অধিকাংশ সাহিত্যিক লেখা বিক্রি ক'রে যা পেতেন সেটা উপরির পাওনা হিশেবে ধ'রে নিতেন; জীবিকার প্রধান সংস্থান হতো হয় শিক্ষকতা নয় কেরানিগিরি থেকে, নয়তো জমিদারির লভ্য থেকে। মস্ত জমিদার কি বড়ো চাকুরে সাহিত্যিকদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই ছিলেন; ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, বাংলা দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত-অর্ধখ্যাত সাহিত্যিকের দিন কেটেছে আর্থিক অনটনের মধ্যে, অভাবের সংসারে কোনোক্রমে জোড়াতালি দিয়ে। অথচ এই অভাবের দিনযাপনে তেমন কোনো গ্লানির ভাব ছিল না। যেখানে নিষ্ঠা, সেখানে সৃষ্টি থেকে আনন্দবোধও। তাছাড়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও অবান্তর নয়; সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার স্বতঃপ্রকাশ ছিল। যাঁরা লিখতেন, তাঁদের নিয়ে সাধারণ লোকের হতচকিত বিস্ময়, সাহিত্যিক নামের গৌরব, ইত্যাদি মিলিয়ে এক ধরনের জ্যোতির বিচ্ছুরণ ছিল। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও তেমনি, সামাজিক সম্ভ্রমে আর্থিক অপ্রাচুর্যের খিন্নতা অনেকটা বিদূরিত হতো।

প্রথমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তারপর স্বাধীনতা-উত্তর যুগের নানা ভেল-ভেল্কি, সমাজের চেহারা-রুচি-আচরণ-অধিকরণ খোল-নলচে বদলে গেলো। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বিদেশী শাসকদের সংস্কৃত-সংস্কার কিছুমাত্র প্রভাবও আমাদের জাতীয় চেতনাকে নিগড়ে বাঁধেনি; ইংরেজরা বাইরে-দূরেই ছিলেন, ভারতীয় যে-ক'জন ইংরেজমন্য হয়ে বিদেশী সামাজিক চেতনায় নিজেদের রপ্ত করতেন, তাঁরা ঈষৎ কৌতুকের উপলক্ষ্য হয়েই থাকতেন। আসলে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সামাজিক মূল্যমান নির্ণীত হতো স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শের প্রভাবে। বাংলা-গুজরাট-দাক্ষিণাত্যের বিষয়াদর্শ প্রায় সর্বত্র সামাজিক সংবিধান হিশেবে গৃহীত হতো : জ্ঞানে ভক্তি, বিদ্যাচর্চায় সন্নত আগ্রহ, জীবনযাত্রায় সারল্য, নিছক অর্থোপার্জনে অনীহা। এই পরিবেশে শিক্ষক কিংবা সাহিত্যিকদের টাকার অনটন আদৌ সংকটের সংজ্ঞাবাহক ছিল না।

স্বাধীনতার পর আমূল পটপরিবর্তন। সামাজিক জীবনে শাসনতন্ত্রের প্রভাব হাজারগুণ বৃদ্ধি পেলো। তাছাড়া, প্রদেশ ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মানদণ্ড প্রধান হয়ে উঠলো। কেন্দ্রকে পাশে সরিয়ে রেখে, নিছক প্রদেশের প্রাক্তন স্বয়ংভরতায় নিরালম্ব থাকা অতঃপর অসম্ভব : রাজনীতিতে ভারতীয় চেতনা অন্য-সমস্ত আবেগকে ঢেকে-মুছে দিতে শুরু করলো। সাংস্কৃতিক-সামাজিক মূল্যবোধও সেই সঙ্গে আস্তে-আস্তে বদলে যেতে লাগলো। কেন্দ্রের নেতারা পাটাতন থেকে তখনও চেঁচাতেন, জীবনযাত্রায় সারল্য শ্রেয়,

জাতীয় লক্ষ্য সমাজতন্ত্রে পৌঁছনো, ইত্যাদি। কার্যত কিন্তু প্রতীপবিপ্লব: পঞ্জাব-উত্তর ভারতের প্রভাব রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে সারা দেশে সংক্রমিত হলো, সামাজিক আচার-কলায়ও সেই সঙ্গে বাংলা-দাক্ষিণাত্যের আদর্শ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবার পালা। রুক্ষ শোনালেও যাকে বলতে হয় পঞ্জাবী জীবনাদর্শ—চক্‌মকে-ঝক্‌মকে পোশাক-আসবাব, বিলাসাসক্তি, অর্থের প্রাচুর্য-অপ্রাচুর্য দিয়ে সামাজিক মান-নির্ধারণ—সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিক্রান্ত সমারোহ নিয়ে এলো।

কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র, বাংলারও অতএব রেহাই পাবার কোনো পথ ছিল না। রাজনীতির ছাপ জীবনধারাকে গড়ে, সমাজের চেতনাকে দুমড়ে মুচড়ে দেয়। তাছাড়া, স্বাধীনতার ঠিক পরে পশ্চিম বাংলার মস্ত দুঃসময় গেছে। দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতির কাঠামোয় বাংলার উপযোগিতা খর্বিত, কংগ্রেস দলের মধ্যে বাংলার নেতাদের পরিসর সংকুচিত, শরণার্থীসমস্যায় প্রদেশটি বিব্রত-জর্জরিত; হীনমন্যতার গ্লানি এই অবস্থায় অচিরে বাঙালি মানসে পরিব্যাপ্ত হলো। দিল্লির নির্দেশে রাজকীয় সম্ভার; আচারে-বিচারে উত্তর ভারতীয় মূল্যবোধ ক্ষীয়মান পশ্চিম বাংলায় সুতরাং অনুপ্রবেশ করলো।

সেই কালভ্রষ্ট ঋতু এখন পর্যন্ত মোটামুটি অব্যাহত। জাগতিক সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে গেলো: যাঁর যতো বিত্তের ঠমক, তাঁর তত সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ভূঁই ফুঁড়ে উঠলেন বেনে-ব্যবসাদাররা, তলিয়ে যেতে থাকলেন শিক্ষক-সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়। জীবনযাত্রার, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাত্রার, প্রয়োজনীয় উপকরণের ফিরিস্তিতে এখন থেকে পঞ্জাবি রঞ্জনের আভা। মাস্টারি কিংবা কেরানিগিরির উপর নির্ভর করে সাহিত্যিকদের বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে উঠলো। সমাজের নতুন-শেখা বিচারে যে-লেখকের অর্থসাচ্ছল্য নেই, তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও প্রায় শূন্যের কোঠায়।

লেখক-সাহিত্যিকদের তেমন দোষ দিয়ে লাভ নেই, যেমন লাভ নেই একদা, আদর্শবাদী শিক্ষককুলের সাম্প্রতিক অর্থগৃধ্নুতাকে গাল পেড়ে। সমাজের মান অধোগামী হলে পণ্ডিত সম্প্রদায় কিংবা বিদ্বান মনীষীরা খুব বেশিদিন সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। আমরা অধিকাংশই শাদামাটা; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেক ছাপিয়ে আমাদের ভীরুতা বড়ো হয়ে ওঠে। অবশ্য এ ধরনের সংকটমুহূর্তে যদি কোনো মহৎ ব্যক্তিত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অধঃপতনের রাস্তা আগলে দাঁড়ান, লেখক-সাহিত্যিকদের আত্মবিশ্বাসে সংহত হবার আহ্বান জানান, প্রাক্তন অধ্যায়ের মানে সবাইকে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে ইতিহাসের ধারা অন্য মোড় নিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাদেশে সেরকম ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা অবলুপ্ত।

ফলে যা হবার তা-ই হলো। গত কুড়ি বছরে পশ্চিম বাংলায় সাহিত্যচর্চা অর্থকরী সাফল্যের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে ছুটেছে। যে-করেই হোক, লিখে টাকা করতে হবে; যে-ধরনের লেখায় টাকা হয়, গাড়ি-বাড়ির সংস্থান হয়, দু'দশ বার বিদেশ ঘুরে আসার—বিশেষ করে মার্কিন দেশ দেখে আসার—সুযোগ হয়, সে-ধরনের লেখা তৈরি করবার তাগিদ লেখকদের একটি বৃহদংশকে তাড়া করে ফিরেছে। কোন্ ধরনের সেই রচনা? এই প্রশ্নের নিরসনও সহজেই হলো। পুরোনো দিনে সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা ছাপাতেন বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকায়: পত্রিকা প্রকাশের অর্থনীতি সে-যুগে সহজতর ছিল। যেহেতু লেখকদের অর্থাভীপ্সা অসম্ভবের কাছাকাছিও যেত না, সাহিত্যপত্রিকাগুলি থেকে মোটামুটি যা পেতেন—এবং পরে প্রকাশকরা দয়াপরবশ হয়ে মাঝে-মাঝে যা দিতেন—তাতেই তাঁরা বিনম্র-সন্তুষ্ট থাকতেন। এই ব্যবস্থায় সব-কিছু যে ভালো ছিল তা নয়, অনেক লেখক প্রকাশকের

নির্দয়তাহেতু কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কাটিয়েছেন, শঠতার শিকার হয়েছেন। কিন্তু হালে যা ঘটছে তাতেও কোনো আনন্দের উপচার নেই। ছাপার খরচ বহুগুণ বেড়েছে, লেখকদের খোরাকের দাবিও অনেক বেড়েছে, অথচ দেশভাগের ফলে বিক্রয়ের পরিধি সংকুচিত, সাহিত্যপত্রিকাগুলি তাই আস্তে-আস্তে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। একমাত্র সেই পত্রিকাই আজ বাঁচতে পারে, যার বিজ্ঞাপনের সংস্থান আছে; বিজ্ঞাপনের প্রসাদ ছাড়া পত্রিকা-চালানো অসম্ভব ক্রিয়াকর্ম। সুতরাং, প্রায় অপ্রতিরোধ্যভাবেই, সাহিত্যিকরা জড়ো হয়েছেন দৈনিক সংবাদপত্রের ছায়ায় : সেই রবিহীন করদৃপ্ত প্রদোষের তলে বিজ্ঞাপন আছে, অর্থের প্রাচুর্য আছে, জাগতিক সাফল্যের ইশারা আছে। পশ্চিম বাংলায় সাহিত্যচর্চার অধিনায়কত্ব তাই আপাতত দৈনিক সংবাদপত্রগোষ্ঠীর কুক্ষিগত।

এই প্রতিবিপ্লবের অন্য কারণও ছিল। খবরকাগজ শুধু বিজ্ঞাপনের প্রসাদপুষ্টই নয়, খবরকাগজ নিজে থেকে আবার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও করতে পারে। রচনার প্রকৃত উৎকর্ষ-অপকর্ষ যা-ই হোক না কেন, যদি খবরকাগজের মালিকরা খুশি থাকেন, দিনের-পর-দিন কাগজের পৃষ্ঠায় তাহলে গুণকীর্তন চলবে, কোনো বিশেষ লেখকের রচনাকে আকাশে তুলে ধরা হবে, তাঁকে প্রায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি অবতার বলে সাধারণের কাছে ঘোষণা করা হবে। দৈনিক সংবাদপত্র এক আশ্চর্য জাদু, যার ছোঁওয়ায় ছয় নয় হয়ে যায়, যিনি আপাদমস্তক নিরেট তিনি ক্ষুরধার প্রতিভাবান ব'লে রটিত হন। সংবাদপত্র শুধু বিজ্ঞাপন পায়ই না, বিজ্ঞাপিত করে, লেখকের খ্যাতি-অখ্যাতি নিরূপণ করে। এই খ্যাতি-অখ্যাতির উপর বইয়ের কাটতি নির্ভর, কে আমির হবেন আর কে নিঃস্ব থাকবেন তা আজ সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরাই বলে-কয়ে দেন। এক কথায়, তাঁরা প্রায় বিধাতার কাছাকাছি।

এই বিধাতাপ্রতিম ব্যক্তিরাই সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের মান নির্ণয় করছেন। এক ছত্র না লিখেও তাঁরা সবচেয়ে প্রভাবশীল সমালোচক; প্রথাগত সমালোচনা বাংলা সাহিত্য থেকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। মালিকরা যাঁদের দয়া করে পোষণ করেন, যাঁদের রচনা নিয়মিত এবং প্রভূত পরিমাণে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, যাঁদের লেখা প্রাতিনিয়ত বিজ্ঞাপিত করেন, তাঁরাই দু'দিনের মধ্যে প্রথিতযশা সাহিত্যিক বনে যান। তাঁদের বইয়ের কাটতি বাড়ে; চেহারায় চিক্কণ মসৃণতা আসে; সাংসারিক স্বাচ্ছল্যের সরোবর কাণায়-কাণায় ভরে ওঠে।

সংবাদপত্রের প্রসাদ কুড়িয়ে যেখানে সাহিত্যচর্চা, আদর্শের বালাই সেখানে থাকবার নয়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব এই অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিক, যা-ই লেখা হোক না কেন, খবরকাগজের ভেল্কিবাজিতে তা-ই অবলীলায় হাটে বিকোবে। কল্পনাশক্তি, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, এ-সমস্ত বৃত্তিই অপ্রয়োজনীয়। বরং, লেখায় যেন কোনো গম্ভীর স্বর না আসে, কোনো চিন্তার পীড়ন যেন রচনাকে দীর্ণ না করে : অলঘু প্রবণতা খবরকাগজের মালিকদের পছন্দ হবার নয়। রচনায় যেন চটুলতা থাকে, দিনের খবরের মতো তা যত ঠুনকো হয় তত ভালো; যত সস্তা তার আবেগ, তার তত বেশি তারিফ পাবার সম্ভাবনা।

এন্তার গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে ইদানীং বাংলাদেশে, উপন্যাসের ভণিতায় দেড়-দুহাজার পৃষ্ঠা-ফাঁপানো কেঁদো কাহিনী; যা আধ পাতায় বলে দেওয়া যায়, পঁচিশ পৃষ্ঠা জুড়ে তার বিস্তার। অপরিমিত, অসংস্কৃত ভাষণ। বাক্যগঠন দুর্বল, ব্যাকরণপ্রয়োগে ভুল, সস্তা চটকের ফুলঝুড়ি। যাঁরা আদৌ লিখতেই জানেন না, বাংলা গদ্যের চরিত্র নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামান নি, ভাষা ব্যবহার যে সাধনার ফসল, আগাছা নয়, এই চিন্তার উদ্বেগ

যাঁদের কোনোদিন ব্যাহত করে নি, তাঁরাও ভুরি ভুরি লিখছেন, লিখে বিখ্যাত হচ্ছেন। সৃষ্টি আর আদপেই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছায়া নয়; বোতাম টিপলেই হলো, কারখানার যন্ত্রের গহ্বর থেকে যেমন তৈরি তৈজস বেরিয়ে আসে, সাহিত্যও তেমনি দণ্ডে-দণ্ডে প্রস্তুত হচ্ছে, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বিক্রীত হচ্ছে। গত বছর দশকের সালতামামি থেকে ধরা পড়বে, যে-সমস্ত গল্প-উপন্যাস বাজারে ছাড়া হয়েছে, তাদের অন্তত শতকরা নব্বুই এই তাৎক্ষণিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

সবচেয়ে যেটা বেশি শোকের, এই মূর্খতার পরিবেশে, একদা যাঁরা সাক্ষর ছিলেন, তাঁরাও আজকাল নিরক্ষরতায় ফিরে যাচ্ছেন। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে সন্তোষকুমার ঘোষ যখন গল্প লিখতে শুরু করেন, আমি তাঁর অনুরাগী পাঠক ছিলাম। সে-যুগে তাঁর লেখার ভঙ্গিতে কোনো প্যাঁচ ছিল না, বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে অনাড়ম্বর স্পষ্ট চিত্রযোজনার মধ্যে নিবিড়-অন্তরঙ্গ সংবেদনা ছিল। বিশেষ করে, সীমিত পরিসরের মধ্যে 'কিনু গোয়ালার গলি' আশ্চর্য দ্যোতনাঘন। কিন্তু, পতনের আবেগতরঙ্গ কে রোধ করবে, সন্তোষকুমার ঘোষ দু'দিন বাদে সংবাদপত্রের পৃথিবী দ্বারা 'আবিষ্কৃত' হলেন। এই আবিষ্কারে পার্থিব সুখ-সুবিধা নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু আমার নিজের অকপট অভিমত ভদ্রলোককে তার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর: যিনি একদা 'কিনু গোয়ালার গলি' লিখতে পেরেছিলেন, তাঁকে নামতে হয়েছে অনেকদূর।

'জল দাও' বোধহয় প্রকাশকের ভাষায় 'উপন্যাস', যেহেতু একশো চোদ্দ পৃষ্ঠা ধরে কাহিনীটির বিস্তার। অথচ ছ' পৃষ্ঠায় এ-কাহিনী বলা চলতো: একমাত্র খবরকাগজের পৃথিবীর সংজ্ঞানুযায়ী পংক্তি মেপে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ছাড়া এই প্রগল্‌ভতার অন্য কোনো অজুহাতই থাকতে পারে না। কাহিনী যেখানে বিস্তারের ভার সইতে পারে না, বেশি কথা সেখানে বলতে যাওয়া মানেই ন্যাকামি। 'জল দাও', আমার বিবেচনায়, পুরোটাই ন্যাকামি। তদোপরি ভাষা কদর্য। সন্তোষকুমার ঘোষ নিজের স্বাভাবিক ভাষাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করেছেন; আমার সন্দেহ, বোধহয় কেউ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে, বড়ো সাহিত্যিক হতে গেলে ভাষাব্যবহারে মহৎ-মহৎ ভাব আনতে হবে। কিন্তু সন্তোষ-কুমার ঘোষ আসলে সন্তোষকুমার ঘোষই; তিনি বুদ্ধদেব বসু নন, অন্নদাশঙ্কর রায়ও নন। বুদ্ধদেবের কাব্য-ছোঁওয়া গদ্য মক্সোই করা যায়, আত্মসাৎ করা যায় না, সন্তোষকুমার ঘোষের ক্ষেত্রে সে-গলদ্‌ঘর্ম প্রয়াস শোকান্তিক হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায় স্বভাব-গুরুমশাই, চল্লিশ বছরের সাধনায় তাঁর গদ্যে এই গুরুমশাই-বৃত্তি স্বাবলীলতায় উদ্ভাসিত। কিন্তু সন্তোষ-কুমার ঘোষ তা হয়তো অজ্ঞাতসারেই অনুসরণ করতে গিয়ে যা দৃষ্টান্তিত করেন তা নিছক ডেঁপোমি।

এ সমস্তই ঘটছে, লেখকরা যা খুশি তাই লিখছেন, লিখে পার পেয়ে যাচ্ছেন, বাহবা কুড়োচ্ছেন, তার কারণ একদিকে সমালোচনার অভাব, অন্যদিকে সংবাদপত্রের ছত্রচ্ছায়া। সংবাদপত্রের মালিকানার উচ্ছেদ না ঘটাতে পারলে বাংলা সাহিত্য শিগ্‌গিরই আরো বহুগুণ ঘোরান্ধকার নরকগত হবে।

অশোক মিত্র

*জল দাও—সন্তোষকুমার ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। মূল্য। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

স মা লো চ না

The Lie *By* Alberto Moravia. Translated by Angus Davidson. Secker & Warburg. London, 30*s*.

অনেকদিন পরে মোরাভিয়ার উপন্যাসে এক বিশেষ স্বাদ পাওয়া গেল। বিশেষ, কিন্তু নতুন নয়। প্রথমতঃ, কিছুকাল যাবৎ আমরা যে রস মোরাভিয়ার সার্থক ছোটগল্পগুলির মধ্যে পেয়েছি এখানে তারই দেখা মেলে উপন্যাসের রূপে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিমানসের একান্তসত্তার অনুসন্ধান, আপাত-নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবানুসরণ মোরাভিয়ার অনেক উপন্যাসেরই উপজীব্য। *Woman of Rome* ও *Fancy Dress Party* বাদ দিলে বাকী সব উপন্যাসের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। এখানে রীতির আরো বৈচিত্র্য আছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে প্রধান হ'ল সত্যানুসন্ধানের আরো ঋজুভঙ্গী—যে অনুসন্ধান কোনো সংস্কারের ভয়ে আপোষ মানে না, সমস্ত ধারণার কুয়াশাকে ভেদ করে তন্নিষ্ঠভাবে ব্যক্তিসত্তাকে খুঁজে বার ক'রে, বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে রিয়্যালিটির সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয় করে। ভালো মন্দ সুন্দর অসুন্দরের কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন কেবল সত্যাসত্যের। বাস্তবের বাস্তবতাই তার সৌন্দর্য। সত্যই আমাদের যথেষ্ট মুগ্ধ করে রাখে যদি তার চেয়ে আকর্ষণীয় আরো কিছু থাকে তবে তা সত্য আবিষ্কারের চেষ্টার মধ্যে। যা সদাই আমাদের সামনে রয়েছে তাকেই আমরা আবিষ্কার করতে চাই। যখন কোনো এক মানুষের সত্তার মুখোমুখি দাঁড়াই তখন মুগ্ধ হতে হয় কারণ তার অস্তিত্বের মধ্যেই ভালোমন্দনিরপেক্ষ এক আশ্চর্য, জীবন্ত, অন্তর্নিহিত লজিক রয়েছে।

The Lie উপন্যাসের প্রধান ভূমিকায় লেখক স্বয়ং, যেমন ছিল *Empty Canvas*এ। প্রখর আত্মসচেতনার আলোকে তার অন্তর্জীবনের পথ যেমন সুস্পষ্ট, বহির্জীবনে সিদ্ধান্তশীল কর্মের ক্ষমতা তেমনি তন্দ্রাচ্ছন্ন। মোরাভিয়ার অনেক কাহিনীর অস্তিত্ববাদী চরিত্রদের মতোই এই লেখকের জীবনকে যেন কোনো আত্মবহির্ভূত কোনো শক্তি ঠেলে নিয়ে চলেছে, সেই অমোঘতার সৌন্দর্যেই সে অভিভূত। নিজেরি জীবননদীর ধারে নিশ্চুপ চেয়ে বসে থাকে, বিমুগ্ধভাবে প্রতীক্ষায় থাকে পরবর্তী ঘটনার জন্যে, যেন এ ঘটনা নিজের জীবনে নয় অন্য কারো জীবনে। কালে এ 'লেখক' বামপন্থী ছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে সত্যতা আছে আর কারো জীবনে নেই—এই রোম্যান্টিক আবেগে বিভোর হয়ে যাকে জীবনে টেনে এনেছিলেন, কিছুকাল পরে দেখলেন যে তার প্রতি আকর্ষণের মূলেই ছিল মিথ্যা। এই মিথ্যার মুখোস সম্পর্কের মধ্য থেকে খসে যেতেই কোরা-র শ্রেণীগত যে স্থূল বৃত্তিগুলি তা'কে আকর্ষণ করেছিল সেইগুলিই অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ঘটনার পরিণতি দেখার এক উৎসুক আবেশের ফলে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটল না। বরঞ্চ নিজের মনোভাবের ধারাকে আরো বিশ্লেষণ করার জন্যে এবং তার মধ্য দিয়ে এক উপন্যাসের মালমশলা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লেখক নিজের রোজনামচা শুরু করলেন। শেষে দেখা গেল এই রোজনামচাই উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়, কেননা নিজের অগোচরেই সমস্ত ঘটনাবর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে উপন্যাসরীতি এসে পড়েছে, আক্ষরিক সত্যের ওপর আরোহিত হয়েছে বিন্যাসের মিথ্যা,

উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে রোজনামচার নায়ক, ফলে রোজনামচা হয়ে উঠেছে উপন্যাস, তাতে ঘটনার বাহ্যসত্যতার চেয়ে তার মর্মই বেশি প্রকট।

The Lie কেবল গঠনশৈলীর দিক থেকে অনবদ্য নয়, ঔপন্যাসিকের শিল্পভাবনার সঙ্গে বাহ্য জগতের বিচিত্র লেনদেন, আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে সাধারণ সত্যের আবিষ্কারের দিক থেকেও চমকপ্রদ। একের পর এক মিথ্যার আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজের সঙ্গে মোকাবিলা করার প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে একাধারে উপন্যাসের শৈলী এবং তার শিল্পচরিত্র। নিজে বাহ্য এবং আন্তর ঘটনাস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে তা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে এক অস্তিত্ববাদী আত্মপর্যবেক্ষণের মধ্যদিয়ে উপন্যাসসৃষ্টি। অথচ অন্যান্য প্রতিটি চরিত্রও উজ্জ্বল, চরিত্রচিন্তা সুস্পষ্ট, ঘটনাবর্ণনায় সিদ্ধহস্ত নৈপুণ্য, সংলাপে গভীরতা এবং সবটাই বাস্তবের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। Empty Canvasএর শূন্যতায় যে উত্তাপের অভাব ছিল এখানে তা-ও উপস্থিত। ফলে *Two Adolescents*এর পরবর্তী কালে *The Lie* নিঃসন্দেহে মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

'If it was true—as I was convinced it was—that a novel cannot but be realistic,, any diary demonstrated that there were no limits to realism, that nothing could be Excluded from reality, not even dreams; not even lies. . even it partly made up of dreams, it seemed to me that the diary was better fitted than the novel itself I might have extracted from it, to give an idea of what the novel itself would have been; something I would have written in order to find out why I was writing it; just as it had always seemed to me that I was living in order to find out why I was living.'

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ। কলিকাতা ২৯। মূল্য ষোলো টাকা।

'অতিভক্তি ও ভক্তির অভাব—এই দুইই চরিত-লেখকের পক্ষে সমান বিপদের কারণ', মহর্ষির জীবনী লিখতে গিয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী এই মর্মে নির্দেশ রেখেছেন। মহর্ষির পৌত্রের রচিত "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থের প্রধান বিভূতি, ভক্তি এখানে একবারও ভারসাম্য হারায় নি। তার কারণ পিতৃস্মৃতি ও আত্মস্মৃতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্যবিধান রচয়িতার উদ্দেশ্য। মূল বিষয়কে কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যে বিবিক্ত না করে হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রতিবেশে রাখা হয়েছে বলেই সে তার যথাযথ মর্যাদায় ফুটে উঠেছে।

লেখক তাঁর *On the Edges of Time* বইখানি অবলম্বন করে বাংলায় একখানি বই লিখতে শুরু করেন। আরব্ধ কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। খানিকটা কাজ সম্পূর্ণ করেছেন ক্ষিতীশ রায়। তাছাড়া 'সংযোজন' ও 'ডায়ারি' অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে 'পল্লীর উন্নতি', 'আচার্য জগদীশচন্দ্র', 'রামগড় পাহাড়', 'ধর্ম', 'মেয়েদের অধিকার', 'বিলাত

যাত্রা : ১৯১২', পলাতকা ও চতুরঙ্গ প্রসঙ্গ'। পরিচয়-পর্যায়ে পুলিনবিহারী সেনের রচিত একটি তথ্যবহ স্মৃতিচিত্র আছে। সব মিলিয়ে তাই যে-আবেদন থেকে যায় সেটি একরঙা অনুবাদকর্মের নয়। প্রসঙ্গত জরুরি, ক্ষিতীশ রায়ের অনুবাদে রথীন্দ্রনাথের মূল রচনার গদ্যরীতি অক্ষুণ্ণ আছে বলে বইখানিকে অনুবাদগ্রন্থ হিসেবে সনাক্ত করার সুযোগ মেলে না।

এই গ্রন্থের জন্য লিখিত বিশেষ ভূমিকায় লিনার্ড কে. এল্‌ম্‌হর্স্ট রথীন্দ্রপ্রসঙ্গে বলেছেন : 'তিনি একজন কুশলী কারুশিল্পী ছিলেন—তাঁর আঁকা যাঁরা দেখেছেন, তাঁর রচনা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করবেন।' এই সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থের ঐশ্বর্য।

প্রমথনাথ বিশীর "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থই এই বইয়ের নিকটতম তুলনাস্থল। উভয় গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পূর্বোক্ত 'স্বাভাবিকতা'। এবং ঐ স্বাভাবিকতা যে কোথাও পান্ডুর হয় নি তার কারণ দুই স্মৃতিচারীর অনুসূক্ষ্ম অবলোকন ও কথনশৈলী। পর-পর দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হলো—

(১) 'শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন ঋতুতে গন্ধ অনুসরণ করিয়া আমি একখানি সম্পূর্ণ চিত্র আঁকিতে পারি। গ্রীষ্মের শেষে যখন প্রথম বৃষ্টি পড়ে, তখন দগ্ধ মাটি হইতে সে কি ভিজা মাটির গন্ধ উঠিতে থাকে—সেই গন্ধটি যেন পৃথিবীর আরামের 'আঃ' শব্দ!'

—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৭৩

(২) 'তারপর যখন গাছপালা ঘাস-পাতা সব যেন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তখন একদিন হঠাৎ নামে বর্ষা। এক মুহূর্তে প্রকৃতির উপর জাদুকর যেন বুলিয়ে দিয়ে যায় তার সবুজ রঙের তুলির স্পর্শ। গাছের পাতায় ঝরে কাঁচা রঙ, মাঠের উপর যেন বিছানো হয় কার্পেট, পাখিরা গান গেয়ে ওঠে। যা ছিল ধূসর মরুভূমি, হয়ে ওঠে শ্যামলসুন্দর একখানি বাগান।'

—পিতৃস্মৃতি, পৃ. ৭৬

সাধুভাষা ও কথ্যভাষার পার্থক্যসত্ত্বেও দুই বর্ণনার সামান্য লক্ষণ নিশ্চয় কথ্যধর্ম। এই সাদৃশ্য বিদীর্ণ করে প্রাধান্য পায় স্মৃতির পিছুটান কাটিয়ে উঠে সমকালীন স্রোতের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের এষণা।

এরই ফলে শাশ্বত রবীন্দ্রনাথের চেয়েও চলমান রবীন্দ্রসত্তার উপরেই লেখকের ঝোঁক। তার অর্থ এই নয়, রাবীন্দ্রিক চৈতন্যের আত্মস্থ পবিত্র সুদূরতাকে তিনি অস্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর কবিস্বভাবের অভিজাত অজ্ঞাতবাসের কয়েকটি নিবিড় প্রতিবেদনও এখানে রয়েছে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত রথীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ দ্রোহদীপ্ত গতিরূপের প্রতিমা—তাঁর ভাষায়—'জন্মপথিক'। চলতে-চলতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা রূপায়িত করেছেন, ব্যক্তিত্বের ঈথারস্পর্শে বিভাবিত হয়েছেন এবং সেই প্রাণময় সমাচার বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথকে ছোটোই করা হয়। রথীন্দ্রনাথের রচনায় এই ব্যক্তিজাগর বিবেকের একটি উদাহরণ—

'বার্ট্রান্ড রাসেল এসেছিলেন আগের থেকে কোনো খবর না দিয়ে, অকস্মাৎ। বাবার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় না থাকায়, ইনিও অলিভার লজ-এর মতো নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন। রাসেল বললেন, তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে সোজা এসেছেন লন্ডনে, কেবল বাবার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে। অতঃপর বেশ কিছু ভূমিকা না করেই বাবাকে প্রশ্ন করে বসলেন : আচ্ছা টাগোর, তোমার মতে 'সুন্দর' কী? এমন আচমকা প্রশ্নের জবাব কি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায়? বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মতামত

বলতে লাগলেন। পরে এই বিষয়ে তিনি তাঁর Creative Unity বইয়ে What is Art প্রবন্ধে বিশেষভাবে লিখেছেন।' (পৃ. ১৫৬)

"পথের সঞ্চয়ে"র 'ইংলন্ডের ভাবুকসমাজ' প্রবন্ধটিকে পাশে রেখে এই বিবরণ পড়লেই রবীন্দ্র-প্রকৃতির অন্তর্লীন চঞ্চলতার খবর পাওয়া যাবে। ঐ একটি সাক্ষাৎকারের অভিঘাতে যে সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির প্রাক্তন সমীক্ষণ খারিজ হয়ে গিয়েছিল, সে কথা মনে করবার সংগত কোনো কারণ নেই। কিন্তু ঐ আকস্মিক ঘটনা তাঁকে পুনর্বিচারে যে প্রবুদ্ধ করেছিল, সেই সত্যও অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে আকস্মিকতার সঙ্গে শিল্পসত্যের অমোঘ সম্পর্কের এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

পার্শ্বচরিত্রের অজস্রতা পাঠককে সজাগ করে রাখে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি নিজে একজন। নিজেকে আরোপ না করেও লঘু কৌতুকের রঙে কিরকম শিল্পিত করা যায় তার একটু নমুনা—

'জুজুৎসু ভালোই শিখেছিলুম। কিন্তু দুঃখ থেকে গেছে কখনো ব্যবহার করার সুযোগ পেলুম না। কবে কোন্ ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া হয় অপেক্ষা করে থাকতুম। মারামারি হলে কী কী প্যাঁচে তাকে জব্দ করব মুখস্থ করে রাখতুম।' (পৃ. ১০০) আবার অত্যন্ত প্রাত্যহ ধরনে এরকম আলাপচর্যা করতে গিয়েই পরক্ষণে এসে গিয়েছে স্বদেশ এবং বিশ্বদেশের কথা, ভগিনী নিবেদিতা ও ওকাকুরার অবদানকল্পলতা।

রথীন্দ্রনাথের আঁকা লাল গোলাপের ছবি দিয়ে অপূর্ব প্রচ্ছদ সাজিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। অন্তঃস্পট ও স্নিগ্ধ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রবেশ প্রস্থান—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সম্বোধি পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা ১। মূল্য আঠার টাকা।

এই শতকের প্রথমার্ধের বাঙলাদেশে কারো কারো কিছু করার ইচ্ছের যন্ত্রণা ছিল, দু'চারজনের চেষ্টাও ছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা, অনুশীলন যুগান্তর-এর সন্ত্রাসবাদ, অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলন, বাঙালীর ব্যাঙ্ক বীমা কোম্পানি কারখানা গড়ে তুলে শিল্পায়ন, বেয়াল্লিশের আন্দোলন, এ-সব ছিল। তারপর পরস্পরের রক্ত পান করে, দেশবিভাগ মেনে নিয়ে বাঙলাদেশ আত্মহত্যা করল। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা আত্মহত্যার আগের সেই বাঙলাদেশের মুখ দেখতে চেয়েছিল।

এখনকার বাঙলাদেশ অবশ্য সেই বাঙলাদেশের শব। আমরা শব আগলে বসে আছি। তাই খুব তরুণ লেখকদের গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলো প্রচুর মদ্যপানের পর শ্মশানের মাটিতে চেপে বসে অথবা চিৎ হয়ে শুয়ে গাঁজা টেনে সব জিজ্ঞাসার যন্ত্রণার বালাই থেকে খালাস।

"প্রবেশ প্রস্থান" উপন্যাসটিতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য আত্মহত্যার আগের বাঙলাদেশের মুখের নানা বিচিত্র বর্ণের ও রেখার আদল আনতে চেয়েছেন।

সেই শ্রেণীর পাঠক সেকালে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন যাঁরা উপন্যাসের গদ্যেও সৌন্দর্য দাবি করতেন। একই কারণে তাঁরা বুদ্ধদেব বসুর লেখার প্রতিও,

মন দিয়েছিলেন। কিন্তু বয়সে প্রবীণ বুদ্ধদেবের মনের কৈশোর কাটল না দেখে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাবনা আর যা-ই হোক কিশোরোচিত ছিল না। তাঁর ভাবনা ও অনুভবে ক্রমান্বয়ে গভীরতা ও তজ্জনিত জটিলতা এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপনার অধিকতর সরলতা, যাকে 'সাবলাইম সিম্‌প্লিসিটি' বলে। অবশ্য এই সরলতা আসলে সততার সঙ্গী, অশিক্ষিত পটুত্ব নয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সত্যিকার শিক্ষিত লেখকদের অন্যতম, ইতিহাসচেতনা থেকে যাঁর অধিকাংশ ভাবনা উৎসারিত। 'স্ট্রাইক, স্ট্রাইক' বলে যে "দিনান্ত" উপন্যাস শেষ হল তারপরের "রাত্রি" এবং "প্রবেশ প্রস্থান" তাঁর ভাবনার বিবর্তনের প্রমাণ। তাঁর প্রতি অন্তত সেই এক শ্রেণীর পাঠকের আগ্রহ তীব্র ছিল। সেই আগ্রহ এখন নেই, কারণ আমরা এখন গলিত শবের গন্ধে মাতাল, আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উপন্যাসে জীবন্ত বাঙলাদেশ।

নতুন নয় তবু "প্রবেশ প্রস্থান" নামটি সুন্দর, অর্থবহ, ডিলান টমাসের Deaths and Entrances-এর মতো। আবার গ্রেহাম গ্রীণের সর্বশেষ উপন্যাস "দি কমেডিয়ান্‌স্‌"-ও একই জাতের নাম। কারণ গ্রীণের উপন্যাসে জীবন অভিনয়মঞ্চ যেখানে প্রত্যেকে কৌতুকাভিনেতা, প্রেম এবং মৃত্যুও কৌতুক, তবে মৃত্যু মেন প্লট আর প্রেম সাব প্লট। গ্রীণের সঙ্গে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মেজাজের মিল না থাকলেও, বইয়ের নামের মিল মনে আসা নানা কারণে সঙ্গত। নামের কথায় এলাম এই কারণে যে "প্রবেশ প্রস্থান" নামের মধ্যে লেখকের ক্ষোভ লুকোন আছে বলে আমার সন্দেহ হয়েছে। অথচ জানি না এমন নয় যে গলিত শবের কাছে অভিমানপ্রসূত ক্ষোভ প্রকাশ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পক্ষে অস্বাভাবিক।

"প্রবেশ প্রস্থান" মূল চরিত্র সুদত্তর স্মৃতিকথা। মূল চরিত্রের সঙ্গে লেখকের সমীকরণ প্রায় নিখাদ। মাঝে মাঝে সুদত্তর আজন্ম সুহৃদ অভিজিতের কথা মিশ্রতরঙ্গের মতো এসেছে। স্মৃতিকথার আদলে রচিত হলেও বইটি পুরোপুরি উপন্যাস। সুদত্ত নিজেই বলছে, উপন্যাসকে যদি সত্যিকারের উপন্যাস হতে হয়, জীবন-কাহিনীর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? কোনো ইতিহাসে যার নাম থাকবে না সে-ই ত সুদত্ত রায়, তাই সুদত্ত রায়ের জীবনকথা উপন্যাস। জীবনের কী-কী স্বাদ নিয়ে গেল মূল চরিত্র তা-ই এ-উপন্যাসের বিষয়, বাইরের ঘটনা নয়, তার মনের ঘটনাগুলো নিয়ে তার স্মৃতিকথা।

অভিজিত সুদত্তকে এই শতকের প্রথমার্ধের বাঙলাদেশ বলে জেনেছিল। শিল্পকলায়, শিল্পায়নে, রাজনীতিতে, ভালবাসায় কিছু হয়ে ওঠার যন্ত্রণা নিয়ে এবং তারপর নিজের রক্তপান করে আত্মহননকারী এই শতকের প্রথমার্ধের যে-বাঙলাদেশ তার প্রতীক সুদত্ত। তাই এই উপন্যাসে মূলচরিত্র আত্মহত্যা করল।

বইটিকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ড কিছুটা ক্লান্তিকর। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের টান প্রায় অনিবার্য। প্রথম খণ্ডে চরিত্রগুলির শৈশবের চিত্র। সেখানে সুদত্ত পাঠককে তেমন টানে না, কারণ তখনই তার চরিত্রে প্রচুর মহত্ব আরোপিত। বরং একটি দুর্বল চরিত্রকে, যার ডাকনাম চোরা, দুর্বলতার জন্যই আপন মনে হয়।

উপন্যাসের গদ্যেও তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য আনার প্রযত্ন যাঁদের ছিল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁদের একজন। অথচ এই সুদীর্ঘ উপন্যাসে তাঁর বাক্যগঠন মাঝে মাঝে বড় শিথিল। শব্দ প্রয়োগেও সেই সৌন্দর্যচেতনার ধার অনেক জায়গায় নেই। এক-এক সময় মনে হয়, তিনি স্মৃতিচারণের মেজাজে মুখে বলে গেছেন, অন্য কেউ সামনে বসে লিখে নিয়েছেন কাগজে।

কোনো বিদেশী অভিধানে রামায়ণ বিষয়ে লেখা আছে : একটি স্ত্রীলোকের অপহরণ

ও পুনরুদ্ধারের কাব্যকাহিনী। সম্ভবত তাই দেখে ইদানীং কেউ কেউ উপন্যাস লিখে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, আধুনিককালের রামায়ণ রচনা করলাম। অন্তত রামায়ণের আকারগত সাদৃশ্যের প্রতি লেখক ও প্রকাশকদের আগ্রহের কারণগুলি সহজবোধ্য। কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এমন দীর্ঘ উপন্যাস কোনো প্রকাশক সাগ্রহে ছাপছেন দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

সুধাংশু ঘোষ

উনিশ বিঘা দুই কাঠা—ফকীরমোহন সেনাপতি। মৈত্রী শুক্ল কর্তৃক অনুদিত। সাহিত্য আকাদামি। নতুন দিল্লী। মূল্য পাঁচ টাকা।

ফকীরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯১৮) গত শতাব্দীর ওড়িষ্যার একজন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক ফকীরমোহনের বর্তমান যুগে সবচেয়ে বড় পরিচয় হইল যে তিনি আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা। প্রবন্ধ, কবিতা গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্বাগ্রে তাঁহার "আত্মজীবন চরিত" ও "ছ মান আঠ গুণ্ঠের" নাম করিতে হয়। প্রথোমক্ত বইটি ওড়িয়া ভাষায় সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী এবং গত শতাব্দীর মহত্তম বাংলা আত্মজীবনীগুলির সহিত সর্বতোভাবে তুলনীয়। "ছ মান আধ গুণ্ঠ" হইতে ওড়িয়া উপন্যাসের সূচনা এবং শুধু ওড়িয়া কেন সমগ্র ভারতীয় উপন্যাস-সাহিত্যে এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির তুলনা পাওয়া ভার।

১৯৬৫ সালে সাহিত্য আকাদামীর উদ্যোগে "ছ মান আঠ গুণ্ঠ" বইটি "উনিশ বিঘা দুই কাঠা" নাম দিয়া ফকীরমোহনের পৌত্রী শ্রীমতী মৈত্রী শুক্ল কর্তৃক বাঙ্গলায় অনুদিত হইয়াছে। ফকীরমোহন সরকারী চাকুরী হইতে অবসরের পর পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে "ছ মান আঠ গুণ্ঠ" লেখেন এবং ১৯০২ সালে ইহা প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা কম আক্ষেপের কথা নয় যে কটক হইতে কলিকাতা এই ২৫৪ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে ফকীরমোহনের মতন লোকেরও ৬৩ বৎসরের ওপর লাগিয়া গেল। ফকীরমোহন ইংরাজ হইলে অবশ্য আমরা "ছ মান আঠ গুণ্ঠে"র প্রশংসায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পঞ্চমুখ হইতাম।

"উনিশ বিঘা দুই কাঠা" যাঁহার উত্থান-পতনের কাহিনী সেই রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মেদিনীপুর জেলা নিবাসী শেখ দিলদার মিয়ার ফতেপুর সরষণ্ড নামক জমিদারীর নায়েব ছিলেন। মঙ্গরাজ লাটের খাজনা পুরাপুরি আদায় করিলেও মনিবকে জানাইতেন যে ফসল ভাল না হওয়ায় খাজনা উসুল হইতেছে না। দিলদার মাতাল, মাইফেলী লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার নায়েবের কথা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করিবার সময় কোথায়। তাঁহারই প্রাপ্য জমিদারীর খাজনা তিনি নায়েবের নিকট চড়াসুদে কর্জ করিয়া খরচ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার মত্ততার সুযোগ লইয়া মঙ্গরাজ মেদিনীপুরে গিয়া ত্রিশ হাজার টাকার একটি তমসুক সই করাইয়া লইলেন। ইহার পর ফতেপুর সরষণ্ড এলাকার জমিদারী যখন লাট-বন্দী হইল তখন মঙ্গরাজ তাহা কিনিয়া লইলেন। দিলদার দেওয়ানা হইলেন আর পিতৃমাতৃহীন কাঙালী মঙ্গরাজ স্বীয় বুদ্ধিবলে পরাক্রান্ত জমিদার হইয়া বসিলেন।

গোবিন্দপুর নামক যে গ্রামে মঙ্গরাজ বাস করিতেন সেইখানে ভগিয়া ও শারিআ নামে তাঁতি ও তাঁতিনী বাস করিত। তাহাদের উনিশ বিঘা দু কাঠা উর্বর জমি ছিল। নিঃসন্তান

এই গরীব দম্পতির জমির উপর মঙ্গরাজের নজর পড়িল। কিন্তু তাহারা জমিটি ছাড়িতে নারাজ হইলেও মঙ্গরাজ গাজুয়ারীর আশ্রয় না লইয়া মতলব করিয়া কাজ হাসিল করিতে প্রস্তুত হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সহায়ক হইল তাঁহার সকল দুষ্কর্মের সহচরী চম্পানামক দাসী ও গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী বুড়ী মঙ্গলা দেবীর পূজারী সনা রণাই। চতুরা চম্পা নির্বোধ ভগিয়া ও শারিআকে বুঝাইল যে বুড়ীমঙ্গলা দেবী তাঁহার পূজারী মারফৎ আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহার পূজা দিলে তিনি তাহাদের পুত্রলাভের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ পূজা দিতে রাজী হইয়া গেল। ইতিমধ্যে মঙ্গরাজ বুড়ীমঙ্গলা ঠাকুরাণীর পীঠস্থানের নিকট একটি গর্ত খুঁড়িয়া একজন অনুচরকে লুকাইয়া রাখিলেন। ভগিয়া ও শারিআ পূজার পর যখন বর প্রার্থনা করিল তখন সেই লুক্কায়িত ব্যক্তি দেবীর হইয়া বলিল : 'আমার মন্দির তৈরী করিয়া দিলে তোদের তিনপুত্র ও ধনরত্ন হইবে। আর আমার আজ্ঞা পালন না করিলে ভগিয়ার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

ভগিয়া ও শারিআ মহাফাঁপরে পড়িল : দেবীর মন্দির ত তুলিবে, কিন্তু টাকা কই। অবশেষে চম্পাই পথ বাতলাইয়া দিল। ভগিয়া তাঁহার জমি বাঁধা দিয়া মঙ্গরাজের নিকট টাকা কর্জ করিল। কবলা হস্তগত হইবামাত্র মঙ্গরাজ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সুদ অনাদায়ের দায়ে জমি ক্রোক করিয়া লইলেন। বেচারা ভগিয়া দুঃখে পাগল হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। এদিকে শারিআর 'নেত' নামে ভারি লক্ষ্মী, ভারি সাধের একটি কালো গরু ছিল। নেত নিঃসন্তান শারিআর চোখের মণি, সুদ না দেওয়া বাবদ মঙ্গরাজ তাহাকেও কাড়িয়া লইয়া গেলেন। শারিআ গরুটি ফেরৎ পাইবার জন্য মঙ্গরাজের দুয়ারে ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিল। মঙ্গরাজ অটল, শারিআ নেতর শোকে ও অনশনে মরিয়া গেল।

মঙ্গরাজের কপালে কিন্তু নেতর মিষ্টি দুধপানের সুখ বেশিদিন টিকিল না। গ্রামের চৌকিদার পুলিশে খবর দিল জমিদার শারিআকে লাঠি পিটিয়া মারিয়াছে, দারোগা তাহা সমর্থন করিয়া মঙ্গরাজকে চালান দিল। ইংরাজ হাকিম নরহত্যার দায় হইতে মঙ্গরাজকে রেহাই দিয়া গরু চুরীর অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড দিলেন। ইতিমধ্যে লালা রাম রাম নামক একজন ঘোড়েল উকীল মঙ্গরাজকে বেকসুর খালাস করিবার আশ্বাস দিয়া কটকোবালা করিয়া জমিদারী হাত করিয়া লইল। কিন্তু মঙ্গরাজের সাজা হইলে আপিলে খালাস করিব বলিয়া সরিয়া পড়িল।

ইহার পর দুষ্কৃতিকারীরা একে একে তাহাদের কর্মফলের পরিণাম ভোগ করিল। মঙ্গরাজের গ্রেফতারের পর চম্পা তাঁহার সমুদয় ধন রত্ন হস্তগত করিয়া গোবিন্দা নামক চাকরকে লইয়া পলাইয়া যায়। পথে গোবিন্দা তাহার প্রাপ্যাংশ না পাইয়া চম্পাকে হত্যা করে এবং পলাইতে গিয়া বিরূপা নদীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। কারাগারে মঙ্গরাজের দুর্দশার অন্ত রহিল না। তিনি অনেককেই সর্বনাশ করিয়া জেলে পুরিয়াছিলেন তাহারা এখন তাঁহাকে বাগে পাইয়া শোধ তুলিতে লাগিল। পাগলা ভগিয়া কয়েদখানায় ছিল। সে একদিন মৌকা বুঝিয়া মঙ্গরাজের নাক কামড়াইয়া লইল। মঙ্গরাজ গুরুতর পীড়িত অবস্থায় মুক্তি পাইয়া শূন্যগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী আগেই গত হইয়াছিলেন আর নিষ্কর্মা পুত্রেরা বাপের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব অবস্থায় অনুতপ্ত চিত্তে মঙ্গরাজ মারা গেলেন। সরষণ্ডের প্রবল প্রতাপশালী জমিদার শ্রীরামচন্দ্র মঙ্গরাজকে শেষমুহূর্তে এক ঘটি জল গড়াইয়া দিতে, তাঁহার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে কেহ ছিল না।

উপন্যাসের এই চুম্বকটি পড়িলে মনে হইতে পারে ইহা দুঃখ ও কান্নার বাষ্পে ঠাসা মামুলী কাহিনী। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে ঠিক উলটো। ইহার ভাষা সরল গ্রাম্য ভাষা, ওড়িয়া সংস্করণে আধুনিক সহুরে পাঠকগণের জন্যে ৪১ পৃষ্ঠা ব্যাপি একটি নির্ঘণ্ট আছে। আর যে হাস্যরস, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের ব্যবহারে ফকীরমোহন অদ্বিতীয়, এই বইটিতে তাহার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বইয়ের প্রারম্ভে মঙ্গরাজের একাদশী পালন হইতে সুরু করিয়া দিলদার মিয়ার মজলিশ, 'মাঝা-দোলা-জিভ-ছোলা-হাস্য-অবিরাম' চম্পার রূপ বর্ণনা, বাঘসিংহ গ্রামের মহিলাগণের কথোপকথন, অসুরদিঘী ঘাটে 'স্নান-যাত্রা', দারোগা সাহেবের ক্যাম্প-কাছারীতে সাক্ষীদের জবানবন্দীর বিবরণ ও দারোগা সাহেবের তদন্ত প্রণালী ও রিপোর্টের মুসাবিদা, কাছারীতে উকিলদের সওয়াল জবাব, ইংরেজ হাকিমের এজলাস, মঙ্গরাজের কবিরাজের চিকিৎসাবিধি—কোনোখানেই হাস্যরস, বিদ্রূপ ও শ্লেষের বিরাম নাই। অথচ মুখ্যতঃ বিদ্রূপাত্মক হইলেও বইটির আসল বক্তব্য কোথাও হাল্কা হইয়া ত যায় নাই-ই বরঞ্চ গল্পটিকে আরও গভীর, করুণ ও নির্মম করিয়া তুলিয়াছে। একটু ভাবিলে বোধ হয় ফকীরমোহনের আসল উদ্দেশ্য এই নয় যে তিনি গল্পটির মধ্য দিয়া পাঠক-পাঠিকাকে বলিতে চান : লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। কারণ ফকীরমোহন জানিতেন যে শাস্ত্র ও সংস্কার যাহাই বলুক না কেন পৃথিবীতে অধর্ম ও বলেরই জয় জয়কার। মঙ্গরাজের পতনের কারণ ভগিয়াকে ঠকাইয়া জমি আত্মসাৎ করার জন্য নয়, চালে ভুল করিয়া সামান্য গরু চুরী! পৃথিবীতে যাহাই কর না কেন মাত্রা ছাড়ানোই বিপদ। মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়াতেই মঙ্গরাজ মারা পড়িলেন অধর্মের জন্য নয়। লোভে নয়, অতিলোভে তাঁতি নষ্ট হইল।

ফকীরমোহনের লেখার ক্ষমতা অসামান্য—মাত্র একশ তিরিশ পাতার মধ্যে তিনি "উনিশ বিঘা দুই কাঠার" কাহিনীকে বিবৃত করিয়াছেন। স্থান বা ঘটনা, মানবচরিত্র বা সমাজ জীবন—এইগুলিকে বর্ণনা করিতে, বিশ্লেষণ করিতে ও ফুটাইয়া তুলিতে ফকীরমোহন যাদুকর। তাঁহার সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীগুলি সর্বকালের মানুষ। মঙ্গরাজের ন্যায় বকধার্মিক চরিত্র সনাতন। মানিয়াবন্ধের শাড়ি পরা কানে কাপ, নাকে বাসনী আর ফুলপণা পরা চম্পা রূপে না হইলেও গুণপনায় কামসূত্রের রসিকা নাগরী। ইহারা দুজন কয়েকশতাব্দী আগে জন্মিলে জমিদারী নয় রাজত্ব অর্জন করিতে পারিতেন। ভগিয়া-শারিআরা আজও দুষ্ট ধনবান লোকের লোভের চাপে পিষ্ট হইয়া মারা যাইতেছে। শেখ ইনায়েৎ হোসেনের ন্যায় পয়লা নম্বরের দারোগারা আজও একদিকে উপরিওয়ালার পদলেহন ও বুটজুতার গুঁতা খাইয়া আর অন্য দিকে গরীবদের যম সাজিয়া থানায় থানায় ঘাঁটি গাড়িয়া আছে। অসুর দিঘীর ঘাটের লক্ষ্মী আর বিমলীদের এখনও রাস্তার কলতলায় পরচর্চা ও কোঁদল করিতে দেখা যায়। এখনও কাছারীতে কাছারীতে ধকেই জানার ন্যায় সাক্ষীদের ('বাপের নাম নাঙ্গুড় জেনা, জাতি পাণ, বয়স জানা নাই, পেশা ক্ষেতমজুরী') হেনস্তা ও লালা রাম রামের ন্যায় উকীল-মোক্তারদের পোয়াবারো। আর কটক সেসন কোর্টের এজলাসে আজ না বসিলেও সেকালের ইংরিজ হাকিমরা এখন সওদাগরী আফিসের ঠাণ্ডাঘরে বসিয়া বিলাতে বিবি-সাহেবকে চিঠি লিখিয়া থাকেন। ফকীরমোহনের লেখার এই কালজয়ী ক্ষমতার কারণ যে ইহা যে অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত তাহা দেশি আঁটির চারাগাছের মতন মাটি হইতে উঠিয়া ও মাটির রসে পুষ্ট হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল ফকীরমোহনের মূল ওড়িয়ার রস বাংলায় কতখানি বজায় আছে।

এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় বারো আনা ভাগ। ইহার কারণ প্রথমত ওড়িয়া ও বাংলার ভাষাগত ও ভাবগত এবং সেগুলির পিছনের জীবনধারার গভীর মিল এবং দ্বিতীয়ত অনুবাদিকার শুধু শক্তি নহে সুরুচি। কেবল খুঁতখুঁতের মতন বলিতে হয় রসের হানি হইয়াছে স্থানে স্থানে যেখানে শ্রীমতী শুক্লা বইয়ের ছড়াগুলির মধ্যে কিছু কিছুকে মূল ওড়িয়াতে পেশ না করিয়া প্রয়োজন বোধে বাঙলায় অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা একটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য শেষ করিব। চম্পা টাঙ্গীর (গ্রামের নাম) মাসী সাজিয়া বাঘসিংহ গ্রামের জমিদার পরিবারের 'বেয়ান'দের নিকট পুরাকালের ওড়িয়া প্রথামত এই ছড়াটি কাটিয়া বিদায় নিল :

দেউন্তি মিলানি যাউঁছি সাঙ্গাত
মনটি রাখিলে বান্ধি
দিনরাতি সেনা সরিব নাহিঁটি
সকেই সকেই কাঁদি।

শ্রীমতী শুক্লর অনুবাদ হইল :

দাওগো মেলানি যাই হে সাঙ্গাত
মনটি রাখিলে বান্ধিয়া
দিন রাতি মোর ফুরাইবে না ত
গুমরি কান্দিয়া কান্দিয়া।

এই অনুবাদ ছন্দ ও ভাষার দিক দিয়া মূলের অবিকল প্রতিরূপ নয় যদিও ভাবটি যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু একটু মনোযোগ দিলে অনায়াসে ইহার আরও একটু ভাল অনুবাদ সম্ভব হইত। যেমন :

দাও গো মেলানি যাই লো সাঙ্গাত
মনটি রাখিলে বাঁধি
দিন রাতি হায় ফুরাবে না মোর
গুমরি গুমরি কাঁদি।

ফকীরমোহনের "ঊনিশ বিঘা দুই কাঠা" পড়িয়া পাঠকরা উপন্যাসের কি প্রচণ্ড ক্ষমতা হইতে পারে শুধু তাহাই নতুন করিয়া উপলব্ধি করিবেন নয় সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়া জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিবেন।

রামপ্রসাদ সেন

জগদ্দল—সমরেশ বসু। বাক্ সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯। মূল্য পনেরো টাকা।

"জগদ্দল" উপন্যাসখানি "উত্তরঙ্গে"র উত্তর পর্ব। বই দুখানির প্রকাশ কালের মধ্যে ব্যবধান প্রায় পনের বছর। পনের বছর আগে যে-বইয়ের পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল, পনের বছর পরে সেই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যাওয়া লেখকের পক্ষে যে একটু হঠকারিতার কাজ হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। প্রথম যৌবনে যে-কল্পনা সজীব ও সতেজ ছিল, যৌবনের প্রান্ত সীমায় সে কল্পনা মরে গিয়ে স্মৃতি-মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। সেই মৃত কল্পনার

ভূতকে লেখক কি শিল্পীর যাদু-দণ্ড স্পর্শে পুনর্জীবিত করতে পেরেছেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে "জগদ্দলে"র বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থিত করা আবশ্যক বলে মনে করি। কাহিনীর প্রথম তিনশো পৃষ্ঠা মোটামুটিভাবে লখাইয়ের পারিবারিক জীবনের চিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক বন্দী লখাই। এক বাগদী পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ পরিবারে সে শ্যামের ছোট ভাইয়ের মর্যাদা-লাভ করেছে। শ্যামের ভ্রাতৃবধূ কাঞ্চনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের ফলে সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে; তথাপি সে পরিবারের আশ্রয়চ্যুত হয় নি। শ্যামের ছেলে মধুর সঙ্গে তার বিরোধের কারণ ইংরেজ বিদ্বেষ বশতঃ লখাই চটকলগুলোকে দেখতে পারে না, অথচ মধুর স্বাভাবিক আকর্ষণ যন্ত্রের প্রতি। এই বিরোধের পরিণামে মধু গৃহত্যাগী হয়ে চটকলে চাকরি নেয়। কিন্তু তার প্রণয়িণী মোহ সাগর স্নানে গিয়েছে খবর পেয়ে সে চটকল থেকে পালিয়ে প্রণয়িণীর সন্ধানে যাত্রা করে।

পরবর্তী শ'দুই পৃষ্ঠায় লেখক চটকলের স্থাপয়িতা ইংরেজদের একটি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এক শত পৃষ্ঠার চেয়েও দীর্ঘ একটি দৃশ্যে লেখক এ ধরনের কয়েকজন উদ্যোক্তা ইংরাজ-পুরুষের একত্র পান আহার ও জল-বিহারের বিবরণ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই দীর্ঘ দৃশ্যের মধ্যে কোন কাহিনী নেই। কোন নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত নেই; শুধু ক্লান্তিকর সংলাপের ভিতর দিয়ে লেখক চটকলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস দিয়েছেন।

পরবর্তী অংশে লেখক কতকগুলি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত চরিত্র আমদানী করে ঊনিশ শতকের শেষ পর্যায়ের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ, ব্রাহ্মধর্ম, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি ঝোঁক, মদ্যপানের প্রতি আসক্তি, এমন-কি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং বঙ্কিমের জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গও লেখক বাদ দেন নি। কিন্তু এ-সমস্ত প্রসঙ্গই বৈঠকখানায় বন্ধুবান্ধবদের গল্পের উপাদান হিসাবে উত্থাপিত হয়েছে। বাস্তিল দিবস উপলক্ষ্যে তখনকার ফরাসী চন্দননগরে যে ফিয়েস্টা নামক উৎসব অনুষ্ঠিত হত, সেই উৎসবে যাওয়া এবং উৎসবের বিস্তারিত বিবরণে লেখক বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। এই সুযোগে লেখক সুবিস্তৃতভাবে ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাৎ ইতিহাসের বিবরণ আমাদের শুনিয়েছেন এবং তার সঙ্গে তখনকার আমাদের দেশীয় জাতীয় আন্দোলনের সংযোগ স্থাপন করতেও চেষ্টা করেছেন। চটকলের ইতিহাস শোনানোর জন্য লেখক যেমন কয়েকজন ইংরেজ চরিত্রকে এক জায়গায় উপস্থিত করেছেন এবং তাদের কিছু কিছু পশ্চাৎ ইতিহাস এবং চারিত্রিক বিশেষত্বের বিবরণ দিয়ে উপন্যাসের ঢঙ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, ঊনিশ শতকীয় সমাজ চিন্তার পরিচয় দিতে গিয়েও লেখক প্রায় একই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রকে কোন না কোন অজুহাতে এক জায়গায় মিলিত করে দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে তিনি বিগত দিনের ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে লেখক আবার মধুর প্রসঙ্গে ফিরে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে মধু তার প্রণয়িণীকে বিবাহ করে চটকলে চাকরি নিয়েছে। পিতা মৃত্যুশয্যায় এই সংবাদ পেয়ে মধু বৌ মোহকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। মধুর সঙ্গে তার অভিমান ক্ষুব্ধ মায়ের নীরব শব্দহীন সংঘাত এবং মধুর চটকলে ফিরে যাওয়ার বিস্ময়কর অনিচ্ছার বিবরণ দিয়ে লেখক কাহিনী শেষ করেছেন।

"জগদ্দলে"র বিষয়বস্তুর এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের দিকে নজর দিলে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে—লেখক কি বলতে চাইছেন? চটকলের উপস্থিতি একটি পরিবারের জীবনে যে

বিরোধ এবং ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছিল তা উদ্‌ঘাটন করাই কি লেখকের উদ্দেশ্য? কিন্তু সে-জন্য উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে বর্ণিত চটকলের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস কি কাহিনীর উপর অনাবশ্যক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি? শিল্পায়নের ফলে জগদ্দলের সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়াই কি লেখকের উদ্দেশ্য? কিন্তু এ উপন্যাসে জগদ্দলের সমাজের চিত্র কোথায়? জগদ্দলের একটি মাত্র পরিবারের—লখাই পরিবারের—কিছু ধারাবাহিক চিত্র আমরা পাচ্ছি। তা ছাড়া একটি দৃশ্যে লেখক কারখানার বিভিন্ন বিভাগের কিছু পরিচয় দিয়েছেন; এবং কারখানা সংলগ্ন বিমলার রঙের বাজারের রসাল বর্ণনা দিয়েছেন। জগদ্দলের সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সাকুল্যে প্রমাণ কি এই রঙের বাজার? লেখক কি সমগ্র চটকল অঞ্চলের একটি বিশেষ সময়কার চিত্র দিতে চেয়েছেন? কিন্তু তা হলে তো যে-সব ঘটনা ও চরিত্রের তিনি সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা খুবই অপ্রচুর। "উত্তরঙ্গে" লেখক মোটামুটিভাবে একটি গ্রামের সীমার মধ্যে ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। সেই সব চরিত্রের কিছু কিছু এই বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু এক লখাই ও তার পরিবারের লোক ছাড়া আর কেউ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় নি। বইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে লেখক যে ইতিহাস ও যে-সব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তা মোটেই আঞ্চলিক ব্যাপার নয়, বরং সারা বাংলার ব্যাপার।

সত্যি, বলতে কি, অনেক চেষ্টা করেও আমি বইখানির মধ্যে কোন পরিচ্ছন্ন বিষয়বস্তুর কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি। দশ পৃষ্ঠার গল্পই হোক, আর দু'হাজার পৃষ্ঠার একটি এপিক উপন্যাসই হোক, তার মূল বিষয়টা দশটি কথার মধ্যে উল্লেখ করতে পারা চাই। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে বলতে হবে কাহিনীটি কতকগুলি এলোমেলো বিশৃঙ্খল উপাদানের জট। এরকম কাহিনী কোন অখন্ড শৈল্পিক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় না বলে শিল্প হিসাবে ব্যর্থ। "জগদ্দল" উপন্যাস কতকগুলি অসংবদ্ধ, অগ্রথিত, শৃঙ্খলাহীন উপাদানের সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক কোন পরিচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে অগ্রসর হন নি। বিশেষ করে বহু শাখা সম্বলিত এপিক জাতীয় উপন্যাস লেখার সময় লেখক যদি লক্ষ্য স্থির না রাখেন এবং লক্ষ্য সম্পর্কে সতর্ক না থাকেন তা হলে তিনি বহু রাস্তার গোলোক ধাঁধার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলবেনই। সমরেশ বসু এ কথা মনে রাখেন নি যে কোন যুগ বা দেশ এত বৃহৎ ব্যাপার যে কোন উপন্যাসে তাকে সহজে ধরা যায় না। লেখক বহু বিচিত্র উপাদানের মধ্যে একটি প্যাটার্ন আবিষ্কার করেন, এবং সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী তিনি উপাদান-সমূহের অংশ বিশেষকে নির্বাচিত করেন। লেখকের উদ্দেশ্যই এই প্যাটার্নকে নিয়ন্ত্রিত করে। বড় উপন্যাস লেখার সময় লেখক যদি প্রতিমুহূর্তে তাঁর লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন না থাকেন তবে অসংখ্য অপ্রাসঙ্গিক, অসংলগ্ন, অনাবশ্যক উপাদানে কাহিনী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে। তাতে আর যাই হোক, উপন্যাস শিল্পকর্ম হয়ে উঠবে না। সমরেশ বসু "জগদ্দল" রচনার সময় উপন্যাস রচনার এই প্রাথমিক শর্তটি বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে আমার ধারণা।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ দেখে পাঠকের মনে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন জাগে তা হল—এ-বইয়ের মধ্যে কাহিনী কোথায়? প্রাকৃতবাদী উপন্যাসে কাহিনীর গুরুত্ব খুবই বেশী। সমাজ বা জীবন বা বাস্তব সম্পর্কে লেখকের যা ধারণা কাহিনীর মারফৎই তিনি তা প্রকাশ করেন। কাহিনীতে প্রতিপাদ্য নয় এমন কোন উক্তি বা মন্তব্য বা বক্তব্যের কোন মূল্য নেই। এপিক উপন্যাসে সাধারণের অনেক সমান্তরাল কাহিনী বা শাখা-কাহিনীর সমাবেশ ঘটে। এই সব

কাহিনীর মধ্যে কোন সংযোগ না থাকলেও ক্ষতি নেই; লেখকের লক্ষ্যের একাগ্রতাই বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলির মধ্যে ঐক্য-সূত্র রচনা করে। আশ্চর্যের বিষয় এই উপন্যাসে একমাত্র মধুর কাহিনী ছাড়া আর কোন কাহিনী নেই। ইংরেজ এবং মধ্যবিত্ত চরিত্রদের নিয়ে লেখক শুধু কতকগুলো দৃশ্য পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু কোন ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করেন নি। কোন কোন চরিত্রের তিনি চিত্তাকর্ষক পশ্চাৎ-ইতিহাস রচনা করেছেন; কিন্তু ভুলে গিয়েছেন যে পশ্চাৎ-ইতিহাস কাহিনী নয়। সিনেমার বিশেষ আঙ্গিকে ফ্ল্যাস্-ব্যাক্ অনেক সময় যথেষ্ট নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু উপন্যাসে পশ্চাৎ-ইতিহাস কাহিনীর পক্ষে এক অপরিহার্য বোঝা-মাত্র; বড় জোর তা পাঠকের মনে কিছু প্রত্যাশা সৃষ্টি করে মাত্র। আশ্চর্য এই যে অভিজ্ঞ লেখক সমরেশ বসু চরিত্রগুলির পূর্ব-কথা বলেছেন, তাদের নিয়ে কোন কাহিনী সৃষ্টি করেন নি।

একটি ধারাবাহিক কাহিনীর অংশ হিসাবে দীর্ঘ দৃশ্য অনেক সময় নিবিড় নাটকীয় আবেগ সৃষ্টির পক্ষে খুবই উপযোগী। কিন্তু লেখক কাহিনীর অংশ হিসাবে দৃশ্য-পরিকল্পনা করেন নি। দৃশ্য-পরিকল্পনার পিছনে লেখকের উদ্দেশ্য হল তথ্য সরবরাহ করা, 'জ্ঞান দেওয়া'। সমরেশ বসুর মনে হঠাৎ পাঠককে জ্ঞান-দেওয়ার বাসনা এমন তীব্র হয়ে উঠল কেন জানি না, কিন্তু উপন্যাস পড়ে অমারা জ্ঞান লাভ করতে চাই না। লেখক আমাদের অনেক তথ্য জানিয়েছেন: উনিশ শতকে দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল ছিল, ইংরাজরা তাদের উৎখাৎ করতে চেষ্টা করেছে, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার প্রভৃতি অত্যন্ত প্রবল ছিল, জমিদারেরা মিথ্যা দলিলে টিপসই নিয়ে নিরক্ষর চাষীদের ঠকাত প্রভৃতি। দুঃখের বিষয় এ-সব তথ্য জানার জন্য কেউ "জগদ্দল" পড়ার পরামর্শ দেবেন না।

উপন্যাসে কাহিনী নেই বলে চরিত্রও সৃষ্টি হয় নি। একমাত্র মধুকে নিয়ে একটি আধা-কাহিনী রচিত হয়েছে বলে মধুর সঙ্গে জড়িত কয়েকটি চরিত্রের নাম মনে করতে পারছি—লখাই, হীরা, কালী এবং মোহ। একটি ইংরেজ বা মধ্যবিত্ত চরিত্রের নামও মনে করতে পারছি না। উক্ত কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে লখাই একটি মানসিক ভঙ্গী মাত্র, কোন পূর্ণাঙ্গ চরিত্র নয়। সুতরাং উপন্যাসে এই চরিত্রটি স্থাণু, চলচ্ছক্তি-রহিত। যদিও লেখক তাকে নায়কের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন; কিন্তু কাহিনীর শেষে তাকে আমরা কোথাও দেখতে পাই না। কালী (মধুর মা) চরিত্রটির মধ্যে আমি আগের অংশের সঙ্গে পরের অংশের সামঞ্জস্য খুঁজে পাই নি। মধু আর মোহ গতানুগতিক রোমান্টিক চরিত্র। তাদের মধ্যে লেখক যে যৌন উন্মত্ততার চিত্র দিতে চেয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে পচা সওদা।

আসল কথা এ উপন্যাস লেখার সময় সমরেশ বসু অত্যন্ত বেশী মাত্রায় সচেতন ছিলেন। সেই জন্য তিনি ইতিহাসের পায়ে উপন্যাসকে বলি দিয়েছেন। একজন বাঙ্গালী চটকলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, একজন বাস কন্ডাক্টর (১৮৭৩ সালে কি বাস চলত?) এদেশে এসে চটকলের মালিক হয়েছিলেন, এ-সব তথ্য ইতিহাসের মাল-মসলা, ইতিহাস নয়। লেখক একটি পরিবর্তনমান যুগের ইতিহাস লিখতে বসেছেন। পরিবর্তনের লক্ষণ হিসাবে তিনি বিশেষ ভাবে অবাধ এবং অবৈধ যৌনতার উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু শিথিল নৈতিকতা শিল্পায়নের ফলে দেখা দিয়েছিল এ-কথা ঠিক নয়; আগে থেকেই, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অনুষঙ্গ হিসাবে তা দেখা দিয়েছিল। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যই তার প্রমাণ।

অচ্যুত গোস্বামী

কবিতার কথা—মৃগাঙ্ক রায়। সারস্বত লাইব্রেরি। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

নির্দিষ্ট পাঠকমণ্ডলীর ঊর্ধতম বয়ঃসীমার দিকে দৃষ্টি রেখে "কবিতার কথা" পরিকল্পিত। এ জাতীয় প্রচেষ্টার মূল্য সর্বদাই স্বীকার্য। কেননা এখনো কবিতাবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা শুধু অপ্রতুল যে তাই নয়—দুটি কি একটির বেশি নজরে পড়ে না। সাধারণতঃ এ জাতীয় গ্রন্থের লক্ষ্য উঠতি পাঠকেরা—বইগুলির সহজপাঠ্যতা সেই লক্ষ্যেরই হয়ত অপরিহার্য গুণ। অবশ্য দুষ্পাঠ্য হলেই যে কোনো গ্রন্থ সাবালক পাঠ্য গ্রন্থ হবার যোগ্যতা পাবে এমন কথা কেউ বলেন না। এমন কথাও কেউ বলেন না যে সহজে বোঝা গেলেই তা কিশোরপাঠ্য হবার মর্যাদা পাবে। সহজ করে লেখা মোটেই সহজ নয়—এ কথা যিনি জানেন তিনি বড় একটা এ পথে সহজে পা বাড়ান না। আর আসলে, কিশোরপাঠ্য গ্রন্থের প্রথম কথা সহজ হওয়া নয়, সজীব হওয়া। এবং কোনো লেখা সজীব হলে তা অবশ্যই হয়ে উঠবে চিত্তাকর্ষক, চিন্তাকর্ষক। সিসিল ডে লুই-র "পোয়েট্রি ফর ইয়ু"-গ্রন্থের এই গুণেই বইটিকে কিশোর-পাঠ্য করে তুলেছে, আবার বইটিকে কিশোরপাঠ্যতার সীমার বাইরে সসম্মানে পার করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত "পোয়েট্রি ফর ইয়ু"-র গ্রন্থকার যেভাবে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে কবিতার বিরুদ্ধে স্থূল সাংসারিকতায় আবিষ্ট মানুষদের অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করেছেন তা স্মরণীয়। এবং যে পদ্ধতিতে তিনি ভাল কবিতা আর মন্দ কবিতার বাছবিচার হাতেকলমে শিখিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়।

বাংলাভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ ছিল না। মৃগাঙ্ক রায়ের "কবিতার কথা" কথঞ্চিৎ সে অভাব দূর করবে। গ্রন্থকর্তা নিজে কবি বলেই "কবিতার কথা" তাঁর মনের কথা হয়ে উঠেছে, ফরমায়েসী কথার খুঁড়িয়ে মোড়লী তার মধ্যে নেই। কবিরাই কবিতার কথা ভাল বলতে পারেন। কয়েক বছর আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-বিষয়ক আলোচনা পড়েছি—এখনো তার কথা মনে আছে কবির কথা বলেই। মৃগাঙ্ক রায়ের এই অনাড়ম্বর রচনায় সেই কবির মনের ছাপ রয়েছে। কবিতা কেন, কবিতা কী, কী নয়, তন্ময় কবিতা আর মন্ময় কবিতার তফাৎ কোথায়, ভাল কবিতা চেনার রাস্তা কোনটা—স্বচ্ছন্দ স্নিগ্ধতায় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকর্তার বিশেষত্ব এখানে যে তিনি তত্ত্বকথার ভীড় জমিয়ে মূল ব্যাপারটিকে ঢেকে ফেলেন নি। সব থেকে উল্লেখযোগ্য আলোচনা শব্দ এবং ধ্বনি-প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্তার এই গুণটি আরো বিকাশ লাভ করেছে। শব্দ এবং ধ্বনির সূত্রে শব্দচিত্র এবং ছন্দ বৈচিত্র্যের আলোচনা জমেছে ভাল। 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায়'-এর ব্যাখ্যায় কাব্য সৌন্দর্যের রসগ্রাহিতা নূতন করে চরণটিকে চেনায়।

কিন্তু মনে হল লেখককে বইটি লিখতে হয়েছে একটা নির্দিষ্ট পত্রাঙ্ক-সীমা মনে রেখে। ফলে কতকগুলি জায়গায় প্রসঙ্গটিকে বেশ জমিয়ে তুলে হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন এগারো পাতায় বলা হল কবি কবিতা লেখেন কেন—লিখে প্রকাশ করবেন বলে। ঠিক কথা। কী প্রকাশ করবেন কবি? গ্রন্থকর্তা তার উত্তরও দিচ্ছেন, "মনের মধ্যে যে কথা বহুবর্ণে বিচ্ছুরিত তাকেই প্রকাশ করবেন বলে"। কিন্তু কেন এই প্রকাশের গরজ, এর সঙ্গে কবির মূল্যবোধের কোন্ সূত্রে জড়িয়ে আছে তার ঈষৎ ইঙ্গিত দেওয়া দরকার ছিল। দ্বিতীয়তঃ, কথা দিয়ে আঁকা ছবির বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে মৃগাঙ্ক রায় চিত্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন। 'ধূসর' এবং 'পাণ্ডু' শব্দের ব্যঞ্জনাগত পার্থক্যের আলোচনাটি এক্ষেত্রে সানন্দে স্মরণীয়। জীবনানন্দ থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতিও দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই চিত্রকল্পের থেকে প্রতীকে কবিরা কোথায় বেশী স্বাচ্ছন্দ্য পান, কেন পান এসব কথার আভাস দেওয়া দরকার ছিল। প্রতীকের প্রসঙ্গ অনুক্ত থেকে গেছে এটা দুঃখের। তৃতীয়তঃ, কবিতার ভালমন্দ বাছবিচারে একই ধরণের দুটি কবিতা নিলে আলোচনাটি আরো জমত। খারাপ কবিতাটি কেন খারাপ তার ব্যাখ্যা বিশ্বাস্য হয়েছে, অকাট্য হয়েছে যুক্তি। ভালটিও কেন ভাল, ভাল করেই বলা হয়েছে। কিন্তু যখন তুলনায় বিচারের প্রশ্ন উঠবে তখন ঈষৎ তারতম্যের নির্ণয় কীভাবে হবে সে কথা জানাতে গেলে একই বিষয়াত্মক কবিতা (যদিও একই বিষয়াত্মক কবিতা হয় কিনা সন্দেহের কথা) ধরা উচিত ছিল। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার পাশে বিদ্রোহাত্মক আর একটি কবিতা দুর্লভ হ'ত না।

তবে এ সব কথাই হ'ল 'হত ভালো আরো ভালো হলে'। কবিতাপ্রেমিকের কাছে এ বইয়ের একটা মূল্য আছে। এবং আস্তে আস্তে যখন আমাদের শিক্ষায়তনে কবিতা পড়ানো বলতে কবিতার মানে বলা এবং ভাবার্থকথন কমে যাবে, প্রকৃতই কবিতা পড়া সুরু হবে তখন এই ধরনের বইয়ের আদরও হতে থাকবে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলবায়ু—রত্নেশ্বর হাজরা। বাংলা কবিতা প্রকাশনী। কলিকাতা ২০। মূল্য আড়াই টাকা

মায়াকোভস্কির আত্মহত্যার অব্যবহিত আগে লেখা 'সুইসাইড নোট্' রত্নেশ্বর কখনো পড়েছেন কিনা জানি না। সুযোগ ও সুবিধা থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে নিতাম, তা'হলে তাঁর নতুন বই "জলবায়ুর" অনেক কবিতার পঙক্তি বুঝতে সুবিধা হতো। যতোদূর আর যেভাবে মনে আছে সেই দুরন্ত শেষ কবিতা উদ্ধার করার চেষ্টা করছি; 'এখন ঘড়িতে হয়তো বারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি, এসময়ে তুমি বিছানায় ঘুমিয়ে আছো, আমার হাতে সময় খুব অল্প, তোমায় ডাকলে সুবিধে হতো—কিন্তু থাক্, জেগে উঠলে তোমার বড়ো কষ্ট হবে।'—ইত্যাদি ইত্যাদি—এরকমই আর্তনাদ-মাখা সামান্য ক'টি পঙক্তি—ইতস্তত ছড়ানো, মর্মঘাতী রক্তের ফোঁটার মতনই যাকিছু কবিতা কৈশোর-হারা রত্নেশ্বর এতাবৎকাল লিখেছেন।

যে সামান্য আগ্রহ আমার পরবর্তী কবিদের প্রতি আছে, যতোদূর স্মরণে আনে, রত্নেশ্বরই সে জায়গায় প্রধান। বহুবিধ কারণের ভিতর একটি, বাইরের কবিতার সজ্জা বা সাজানোর কৌশল। এভাবে টুকরো টুকরো ক'রে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কবিতা-লেখা, যেন টাইপ-রাইটারে—আমাদের আগে-পরে কি কবিতার মধ্যে ছিলো? না ছিলো যদি, তবে কেন ছিলো না? মনে হয়, সেই পূর্ববর্তী কবিতার কায়, মনঃ ও বাক্ ভাঙা—সেই সঙ্গে জটিল হতে জটিলতর অবস্থায় উপস্থিতি—সব মিলে, বাস্তবিক ছেঁড়াখোঁড়া নতুন কবিতার রাজ্য।

যেমন, 'ঘুম' কবিতার মধ্যে

গিরিসংকটে সাদা হরিণেরা নাভি ফেটে গিয়ে
ছড়িয়ে পড়লে
একপাল খুর
ধমনী বেয়ে বেয়ে ছুটতে ছুটতে

ছুটতে ছুটতে
ছুটতে ছুটতে—

রত্নেশ্বরের প্রায় সব কবিতাই এমন নির্জনে টুকরো-করা! সবার কথার পাশাপাশি তাঁর নিজের কথাও বিস্তর। বিস্তর হলেও ভারি নম্র, নিরুত্তেজ ও একা। রত্নেশ্বর সব কবিতার ভিতর নিজেই নিজেকে কথা শোনাচ্ছেন। সে কথা, আমার মনে হয়েছে নিজেকে বুঝে দেওয়া—

যেমন, দেখা যাচ্ছে 'প্রহরী' কবিতায়

চলে যাওয়া কিংবা চলে আসায় সবার
সমান অধিকার নেই
সবার সব অধিকার থাকেও না
যেতে চাইছ—যাও—

*

ঘণ্টা বাজিয়ে দরজা খোলাবে ভেবেছিলে—
দরজা খোলার আগে কিন্তু ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় না
সর্বদা। যেতে চাইছ—যাও—
প্রথম ও তৃতীয় পুরুষের একটা আকাশ-পাতাল
দাঁড় করানো আছে।

এরকম হেলা-ফেলায় ছেড়ে-দেওয়ার বার্তা রত্নেশ্বরের বেশ কয়েকটি কবিতার মধ্যে আছে। ভারি সুন্দর, আক্রমণাত্মক।

রত্নেশ্বরের পূর্ববর্তী, আমাদের সময়ের কবি বিনয় মজুমদারের কবিতার মধ্যে যেমন অর্ধসত্যের বিপুল লব্ধ সাম্রাজ্য আছে, "জলবায়ু"-র মধ্যেও তেমন :

দেখি : 'যুবকেরা সুখ ও দুঃখের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী পার্থক্য মানে না' বা 'পিতৃত্বলাভের আগে মানুষেরা নিজের ছায়ায় বসে কাঁদে' কিংবা 'উৎসব এবং উৎসব নয় এ দুয়ের মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্য থাকে সেদিন—' প্রভৃতি।

কয়েকটি সামান্য প্রয়োগ সম্পর্কে যদি আশঙ্কা প্রকাশ করি, আশা করি কবি ক্ষুব্ধ হবেন না। ধরা যাক, 'জঙ্ঘা' নামক শব্দটি—সবারই জ্ঞাতার্থে জানাই, এর পরিমাণ 'গোড়ালি জানু পর্যন্ত খণ্ডাংশ কিছুতেই তার উপরের রহস্যময় দেহ নয়', এই প্রয়োগ ভ্রান্ত। "জলবায়ু"র মধ্যে জলপাই বন ও আঙুর বনের বহুল প্রয়োগও তাদের কোনো বৈশিষ্ট্য দেয় নি। মনে হয়, রত্নেশ্বর আঙুর বন দেখেন নি, তার মধ্যে কবিত্ব নেই কিন্তু, ভারি শিড়িঙ্গে চেহারা! 'রোজ' নামে কবিতায় পরপর 'জাহাজডুবিতে, মারীতে' কিংবা 'পরবাসে—বনবাসে' প্রয়োগ তাঁর মতন নিরবচ্ছিন্ন কবির মানায় নি। দীর্ঘ কবিতা 'তীর্থযাত্রা' ভিন্নভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, অবশিষ্টাংশের সঙ্গে একেবারেই যোগাযোগবিহীন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়